বাংলাদেশের খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

বাংলাদেশের খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল

BARDOS Library Dhaka

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস
বি.এজি (ঢাকা), এম.এস.(ইউ. এস. এ),
ডি.আই.ডি (অস্ট্রেলিয়া)
পরিচালক (অবঃ), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি কলেজ, ঢাকা

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANSDOC Library

বাএ ৪৩০২

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৯২/জুলাই ১৯৮৫। পাণ্ডুলিপি : জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ। প্রকাশক : পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪০৯/অক্টোবর ২০০২। প্রকাশক : ফজলুর রহিম, উপপরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক উপবিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প], বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : মোঃ হামিদুর রহমান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস। প্রচ্ছদ : [illegible] সরকার। মুদ্রণসংখ্যা : ১২৫০ কপি। মূল্য : ১৮০.০০ টাকা মাত্র।

BANGLADESHER KHADDA SHASHWA O ARTHOKORI FASHAL (Food and Cash Crops of Bangladesh in Bengali) : Written by Mohammad Abdul Quddus. Published by Bangla Academy Dhaka Bangladesh. First Reprint : October 2002. Price Taka : 180.00 Only.

ISBN 984-07-4311-2

পুনর্মুদ্রণের প্রসঙ্গ-কথা

'বাংলাদেশের খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল' গ্রন্থটি ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমী প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে। পুস্তকখানি কৃষিতে স্নাতক শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন ছাড়াও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী এবং কৃষি গবেষণা কাজে যাঁরা নিয়োজিত আছেন তাঁদের উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। পুনর্মুদ্রণকালে গ্রন্থটিতে বেশ কিছু সংশোধন করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণের ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘদিন পরে হলেও বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা নেওয়ায় আমি বাংলা একাডেমীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'কৃষিতত্ত্বের মৌলনীতি' নামক পুস্তকখানি বাংলা একাডেমী কর্তৃক ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হবার পর হতেই আমার বাসনা ছিল কৃষিতত্ত্বের দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'শস্য উৎপাদন' রচনা করে। তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ ও বাংলা একাডেমীর অর্থানুকূল্যে ইহা প্রকাশিত হলো। পুস্তকখানির নামকরণ 'বাংলাদেশের খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল' হলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে কৃষিতত্ত্বের দ্বিতীয় খণ্ড–'শস্য–উৎপাদন।' পুস্তকটির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে বাংলাদেশের পাহাড়ী এ পার্বত্য অঞ্চলে যে–সমস্ত মূল্যবান বৃক্ষ বা শস্য জন্মায়। সেগুলোর কিছু সংখ্যক নিয়ে এ পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে।

আগের পুস্তকটির ন্যায় এ পুস্তকটিও কৃষিতে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই রচনা করা হয়েছে। তবে ইহা পাঠে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাও উপকৃত হবে। কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা কার্যে যাঁরা নিয়োজিত আছেন তাঁহাদের কাছে পুস্তকখানি সমাদর লাভ করবে বলে বিশ্বাস রাখি। কৃষিতে ডিপ্লোমা ছাত্রছাত্রীগণও এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

যে কোনো পুস্তকের প্রথম প্রকাশনায় ভুল–ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই, সহৃদয় পাঠক–পাঠিকাদের নিকট বিনীত অনুরোধ তারা যেন ভুল–ত্রুটি দয়া করে গ্রন্থকারের গোচরীভূত করে পরবর্তী সংস্করণে পুস্তকখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর করে প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেন

যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও কৃষিকর্মীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই পুস্তকখানি রচনা করা হয়েছে তাদের জন্য ইহা কিছুমাত্র উপকারে অসলেও আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ফসলের শ্রেণিবিভাগ ১–৩

উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ, ব্যবহারিক শ্রেণিবিভাগ, চাষভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, ভূমির অবস্থান অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ, জলবায়ুভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ জন্মকালভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দানা জাতীয় শস্য ৪–৭০

ধান, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি, জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত আউশ ধান, রোপা ধান, ছিটা আমন ধান, বোরো ধান, আউশ ধানের চাষাবাদ প্রণালি, রোপা আমন ধানের চাষাবাদ প্রণালি, ছিটা আমন ধানের চাষাবাদ প্রণালি, বোরো ধানের চাষাবাদ প্রণালি ; গম, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ প্রণালি ভুট্টার ব্যবহার, বাংলাদেশে ভুট্টা চাষের ভবিষ্যৎ ; সরগম, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি জলবায়ু উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত চাষাবাদ প্রণালি, সরগমের ব্যবহার ; চীনা ও কাউন উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ প্রণালি ; গ্রন্থপঞ্জি।

তৃতীয় অধ্যায় : ডাল জাতীয় শস্য ৭১–৮৮

মসুর, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ প্রণালি ; মুগ মাষকলাই, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ পদ্ধতি, মুগ ও মাষকলাইর ব্যবহার ; খেসারি, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়, চাষাবাদ পদ্ধতি, খেসারির ব্যবহার, বাংলাদেশে খেসারি চাষের ভবিষ্যৎ ; ছোলা, মাটি, জলবায়ু উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত চাষাবাদ প্রণালি ছোলার ব্যবহার ; গ্রন্থপঞ্জি।

চতুর্থ অধ্যায় : তৈল শস্য ৮৯–১২৬

সরিষা, মাটি জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়, জাত চাষাবাদ প্রণালি, সরিষার ব্যবহার ; তিল, উৎপত্তি ও বিস্তার, মাটি, জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত চাষাবাদ প্রণালি, তিলের ব্যবহার; তিসি, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়, চাষাবাদ প্রণালি, তিসির ব্যবহার ; চীনাবাদাম, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি, জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ প্রণালি, চীনাবাদামের ব্যবহার ; সয়াবীন, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ পদ্ধতি, সয়াবীনের ব্যবহার ; গর্জন তিল, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়, চাষাবাদ প্রণালি ; কুসুম ফুল, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়, চাষাবাদ প্রণালি, ব্যবহার ; ভেরান্ডা, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়, চাষাবাদ প্রণালি ; ব্যবহার ; সূর্যমুখী, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়, জাত চাষাবাদ প্রণালি ; গ্রন্থপঞ্জি।

পঞ্চম অধ্যায় : সবজি জাতীয় শস্য ১২৭-১৪৬

গোলআলু, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি, জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ পদ্ধতি, আলু সংরক্ষণ, আলুর ব্যবহার ; মিষ্টি আলু, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ প্রণালি, মিষ্টিআলু গুদামজাত করণ, মিষ্টি আলুর ব্যবহার ; গ্রন্থপঞ্জি।

ষষ্ঠ অধ্যায় : চিনি উৎপাদনকারী শস্য ১৪৭-১৭০

আখ, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি, জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ প্রণালি ; খেজুর ও তাল, চাষাবাদ পদ্ধতি, বাংলাদেশের খেজুর চাষের ভবিষ্যৎ ; গ্রন্থপঞ্জি।

সপ্তম অধ্যায় : মসলা জাতীয় শস্য ১৭১-২০৪

মরিচ, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ পদ্ধতি ; পেঁয়াজ, উৎপত্তি ও বিস্তার, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ প্রণালি, পেঁয়াজ সংরক্ষণ ; রসুন মাটি ও আদা, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ পদ্ধতি, হলুদ প্রক্রিয়াজাত ও শুষ্ককরণ : গ্রন্থপঞ্জি।

অষ্টম অধ্যায় : ফলমূল জাতীয় শস্য ২০৫-২২৭

আনারস, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি, ভূমির উচ্চতা ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত আনারস বাগান সৃষ্টি, আনারসের ফলন ও বাগানের স্থিতিকাল ; কমলালেবু, জলবায়ু ও মাটি, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, কমলার বাগান সৃষ্টি ; কাজুবাদাম, চাষাবাদ প্রণালি কাজুবাদামের ব্যবহার ; গ্রন্থপঞ্জি।

নবম অধ্যায় : নেশাকর বা আমেজ সৃষ্টিকারী শস্য ২২৮-২৪৩

তামাক, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি মাটি ও জলবয়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ পদ্ধতি, সিগারেট তামাকপাতা কিউরিং বা শুষ্ক করা, তামাকের ব্যবহার ; গাঁজা, চাষাবাদ প্রণালি, গাঁজার ব্যবহার ; গ্রন্থপঞ্জি।

দশম অধ্যায় : উদ্দীপক পানীয় উৎপাদনকারী শস্য ২৪৪-২৬৮

চা, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি, জলবায়ু ও ভূমির উচ্চতা, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চা-বাগান স্থাপন বাজারে প্রাপ্ত চা-পাতা প্রস্তুত প্রণালি ; কফি, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটির প্রকৃতি ও ভূমির উচ্চতা, জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ প্রণালি, আঁশতুলার গুণাগুণ, তুলার ব্যবহার, বাংলাদেশে তুলা চাষের ভবিষ্যৎ ; গ্রন্থপঞ্জি।

একাদশ অধ্যায় : তন্তু জাতীয় শস্য ২৬৯-২৯৫

পাট, উৎপত্তি ও বিস্ততি, মাটি, জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ প্রণালি ; মেস্টা ও কেনাফ, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, মেস্টার চাষাবাদ পদ্ধতি, কেনাফের চাষ ;

তুলা, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি, জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত, চাষাবাদ প্রণালি, আঁশ তুলার গুণাগুণ, তুলার ব্যবহার, বাংলাদেশে তুলা চাষের ভবিষ্যৎ ; গ্রন্থপঞ্জি।

দ্বাদশ অধ্যায় : সবুজ সার জাতীয় শস্য ২৯৬–২৯৯

ধইঞ্চা, শণ, গ্রন্থপঞ্জি।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : বিশেষ অর্থকরী শস্য ৩০০–৩৪২

বাঁশ, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ, বাঁশবাগান সৃষ্টি, বাঁশের ব্যবহার ; রাবার, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি ও ভূমির উচ্চতা, জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়, রাবার বাগান সৃষ্টি, রাবারের কষ লওয়া ; অয়েল পাম, উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, মাটি ও জলবায়ু, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত অয়েল পামের বাগান সৃষ্টি, বাংলাদেশে অয়েল পাম চাষের ভবিষ্যৎ : পান, পান চাষ ; সেগুন, মাটি ও জলবায়ু উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়, সেগুন-বন সৃষ্টি, সেগুন গাছ আহরণ করার বয়ঃসীমা ; শাল, উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় শাল-বন সৃষ্টি, শাল-কাঠের ব্যবহার মুথার চারা হইতে শাল-বন সৃষ্টি ;

পরিশিষ্ট ৩৪৩–৩৪৪

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ, ক্ষেত্রফলের, পরিমাপ, ওজনের পরিমাপ, তরল পদার্থের পরিমাপ শব্দসূচি।

প্রথম অধ্যায়

ফসলের শ্রেণিবিভাগ

কৃষিবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় পশুচারণ বা পশু-পালন যুগের পরে আসে ফসল-উৎপাদন যুগ। এ যুগ হতেই পৃথিবীর আদি মানবেরা শিখতে লাগল তাদের আশেপাশের হাজারো গাছপালার মধ্যে কোনগুলি কাজে আসে আর কোনগুলি কাজে আসে না। পরবর্তী সময়ের মধ্যে সভ্য দুনিয়ার মানুষেরা ক্রমান্বয়ে আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারল কোন গাছ হতে দানা, কোন গাছ হতে ফল, কোন গাছ হতে সবজি কোন গাছ হতে তৈলবীজ ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, যে সমস্ত নির্বাচিত ও যত্নের সঙ্গে জন্মান গাছপালা হতে মানুষ দানা, ফলমূল, শাক-সবজি, তন্তু, শর্করা (চিনি) ইত্যাদি পেয়ে থাকে সেগুলিকে ফসল বলা হয়। তবে বৃহত্তর অর্থে মানুষের গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রয়োজনে জন্মানো গাছপালাকেও ফসলরূপে গণ্য করা হয়।

ফসলের শ্রেণিবিভাগ

ফসলের আর এক নাম শস্য। ফসল বা শস্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে সেগুলির পর্যালোচনা ও সুচারুরূপে পাঠের আবশ্যকতা আছে। যেহেতু জীববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উপকরণগুলির ন্যায় ফসলেরও শ্রেণিবিভাগের প্রয়োজন আছে। আর সে প্রয়োজনবোধে ফসলসমূহকে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন—

১. উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ (Botanical classification)
২. ব্যবহারিক শ্রেণিবিভাগ (Economic classification)
৩. চাষভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Cultural classification)
৪. ভূমির অবস্থান অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis of relief of land)
৫. জলবায়ুভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Climatic classification of crops)
৬. জন্মকালভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis of life cycle of crops)

লিনাস (linnaeus) নামে সুইডেনের এক বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ 'বাইনোমিয়াল পদ্ধতিতে' (binomial system) গাছপালার যে শ্রেণিবিভাগ করেন তাকেই উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ বলা হয়। সে পদ্ধতি অনুসারে উদ্ভিদসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে তিনি genus এবং species-এর প্রবর্তন করেন এবং এক একটি গাছ বা শস্যকে বাইনোমিয়াল অর্থাৎ দ্বিঘাত পদ্ধতিতে নামকরণ করেন। সে শ্রেণিবিভাগ অবলম্বনে

ফসলসমূহকে Legumes অর্থাৎ শুটীজাতীয় ফসল, Cereals অর্থাৎ দানাজাতীয় ফসল, Cucurbits অর্থাৎ লাউ কুমড়া জাতীয় ফসল ইত্যাদিকে নানা পরিবার বা গোত্রে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু ফসলের এ শ্রেণিবিভাগ কৃষিতত্ত্ববিদদের নিকট গৃহীত হয় নি বললেই চলে। তারা শস্যের যে শ্রেণি বিভাগটির উপর সব চাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো 'ব্যবহারিক শ্রেণিবিভাগ'। ফসলের তৎপরবর্তী চারটি অর্থাৎ ক্রমিক ৩ হতে ৬ পর্যন্ত শ্রেণিবিভাগকেই কৃষিতত্ত্ববিদগণ কিছু কিছু গুরুত্ব প্রদান করেছেন; এ পাঁচটি শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে এক্ষণে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

ব্যবহারিক শ্রেণিবিভাগ : ফসলের অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে অর্থাৎ কোন কোন ফসল মানুষের কি কি প্রয়োজনে আসে বা কি কি ভাবে ব্যবহৃত হয় সে কথা বিবেচনা সাপেক্ষে ফসলের এ শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এ শ্রেণির অন্তর্গত বিভিন্ন শস্যসমূহকে নিম্নোক্ত শিরোনামে বিভক্ত করা যায়, যথা—

ক. দানাজাতীয় শস্য, খ. ডালজাতীয় শস্য, গ. তৈল উৎপাদনকারী শস্য, ঘ. সবজি জাতীয় শস্য, ঙ. চিনি উৎপাদনকারী শস্য, চ. মসলাজাতীয় শস্য, ছ. ফলমূল জাতীয় শস্য, জ. নেশাকর শস্য, ঞ. উদ্দীপক শস্য, ট. তন্তুজাতীয় শস্য, ঠ. সবুজ–সারজাতীয় শস্য, ইত্যাদি।

চাষভিত্তিক শ্রেণির বিভাগ : সকল ফসল বৎসরের সব সময় হয় না। ফসল জন্মাবার সময়ের কথা বিবেচনা করে বৎসরকে ৩টি ভাগ বা কৃষি–ঋতুতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা —(১) খরিপ মৌসুম বা খরিফ খন্দ– ১, (২) খরিফ মৌসুম বা খন্দ–২ এবং রবি মৌসুম বা রবি খন্দ। এপ্রিলের মাঝামাঝি (শেষের ১৫ দিন) হতে অক্টোবরের মাঝামাঝি (প্রথম ১৫ দিন) পর্যন্ত সময়কে 'খরিফ মৌসুম' বলা হয় আর এ মৌসুমে যে সমস্ত ফসল জন্মে সেগুলিকে 'খরিফ ফসল' বলা হয়— আউশ ধান, পাট, মেস্টা, ভুট্টা, বর্ষাতি বেগুন, ঢেড়শ, পুঁইশাক ইত্যাদি খরিফ ফসল। অক্টোবরের মাঝামাঝি (শেষের ১৬ দিন) হইতে এপ্রিলের মাঝামাঝি (প্রথম ১৫ দিন) পর্যন্ত সময়কে বলা হয় 'রবি মৌসুম' আর এই সময়ের মধ্যে যে সমস্ত ফসল জন্মে সেগুলিকে বলা হয় 'রবি শস্য'। বোরো ধান, গম, গোল আলু, তামাক, মরিচ, বেগুন, সরিষা, মুগ, মুসুর, ছোলা ইত্যাদি রবি ফসলের অন্তর্গত।

এখন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আজকাল খরিফ মৌসুমকে দুটি উপ–মৌসুমে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা — খরিফ–১ এবং খরিফ–২। প্রথমোক্ত অর্থাৎ খরিফ–১ মৌসুমের সময় হলো ১৫ মার্চ হতে ১৫ জুন পর্যন্ত এবং সে সময় বা মৌসুমের ফসল হলো আউশ ধান, পাট, বুনা আমন, ভুট্টা, শশা, কুমড়া, ডাটা, ঢেড়শ, পুইশাক, ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়োক্ত অর্থাৎ খরিফ–২ মৌসুমের সময় হলো ১৬ জুন হতে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত এবং সে সময়ের ফসল হলো রোপা আমন।

ভূমির অবস্থান অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ : কোনো দেশের চাষের জমি একই সমতলে থাকে না—কোনো জমি উঁচু, কোনো জমি নিচু এবং কোনো জমি মাঝারি অবস্থানে থাকে। সে হিসেবে প্রথমোক্ত জমিকে বলা হয় উচ্চভূমি (uplands) আর এ জমিতে যে যে ফসল জন্মে সেগুলিকে বলা হয় উচ্চভূমির ফসল, যেমন— তোষা পাট, আউশ ধান, আঁখ, চীনাবাদাম, বর্ষাতি তিল ইত্যাদি। দ্বিতীয়োক্ত অবস্থানের জমিকে বলা হয় নিম্নভূমি (Low lands) আর

এরূপ জমিতে যে ফসল জন্মে সেগুলিকে বলা হয় নিম্নভূমির ফসল (Low land crops), যথা— বুনা আমন ধান, বোরো ধান, মিষ্টি আলু, মরিচ, খেসারী ও অদ্রূপ অন্যান্য রবিশস্য। শেষোক্ত শ্রেণির জমি যা খুব উঁচু নয় এবং খুব নিচু নয় তেমন জমিকে বলা হয় মাঝারি জমি (medium land) আর এ জমির উপযোগী ফসলগুলিকে বলা হয় মাঝারি জমির ফসল (medium land crops), যেমন— রোপা আমন, দেশী পাট, গম, গোল আলু, তামাক, সরিষা ইত্যাদি।

জলবায়ুভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ফসল জন্মে, তার প্রধান কারণ জলবায়ু অর্থাৎ বৃষ্টিপাত, তাপ ও আর্দ্রতার প্রভাব। এ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন ফসলকে কয়েকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে, যেমন— ১. গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের ফসল (tropical crops), যথা— ধান, আঁখ, চা, কফি, আম, লিচু, কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ ইত্যাদি ; ২. আর্দ্র অঞ্চলের ফসল (crops of humid region), যথা— ধান, পাট, রাবার, অয়েল পাম্প ইত্যাদি ; ৩. শীত প্রধান অঞ্চলের ফসল (crops of colder region), যথা— গোল আলু, তুলা, সরিষা, গম সুগারবীট ইত্যাদি ; ৪. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল (crops of temperate climate), যথা— গম, তুলা, ভুট্টা, আপেল, পিয়ার পিচ ইত্যাদি এবং ৫. মরু বা শুষ্ক অঞ্চলের ফসল (crops of arid region) ; যথা— সরগম, মিলেট, অড়হর, ছোলা, খেজুর, মালটা কেক্টাস ইত্যাদি।

জন্মকাল ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : ফসলের জীবনচক্র বিভিন্ন রকম, কারণ বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন সময়ের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করে অর্থাৎ জীবনচক্র সমাধা করে। দেখা যায়, কোনো ফসল ২-৩ মাস বা ৬ মাস বা ১২ মাসের মধ্যে জীবনচক্র শেষ করে ; কোনো কোনোটি ২ বৎসরের মধ্যে, আবার কোনো কোনোটি বহু বৎসর বেঁচে থাকে। এ জীবনকালের উপর নির্ভর করে ফসলকে কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন—

১. একবর্ষজীবী ফসল (annuals) : এক বৎসর বা তারো কম সময়ের মধ্যে যে সমস্ত ফসলের জীবনচক্র শেষ হয়, সেগুলিকে বলা হয় একবর্ষজীবী ফসল যথা— ধান, পাট, গম, কলা, সরিষা, মুগ, মসুর ইত্যাদি ;

২. দ্বিবর্ষজীবী ফসল (binnials) : সে সমস্ত ফসলের জীবনচক্র শেষ হতে এক বৎসরের বেশি হতে দু বৎসর পর্যন্ত সময় লাগে সেগুলিকে এ নামে অভিহিত করা হয়, যথা-- সুগারবীট, আঁখ (যুক্তরাষ্ট্রে ও কিউবা প্রভৃতি দেশে) এবং

৩. বহুবর্ষজীবী ফসল (perrinials) : যে সমস্ত ফসল অনেক বৎসর বেঁচে থেকে এক নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা হতে আরম্ভ করে বহুদিন পর্যন্ত ফুল-ফল প্রদান করে সেগুলিকে বহুবর্ষজীবী ফসল বলা হয়, যেমন— আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল, সুপারি, চা, কফি ইত্যাদি।

অতঃপর শস্যের ব্যবহারিক শ্রেণিবিভাগের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের চাষাবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়
দানাজাতীয় শস্য
(CEREALS)

গ্রিক ও রোমানদের খাদ্যদেবী 'সিরিস' (Ceres)-এর নাম অনুসারেই এ জাতীয় খাদ্যশস্যের নাম হয়েছে। 'সিরিয়েলস' (Cereals) অর্থাৎ দানাজাতীয় শস্য। Graminae পরিবারের অন্তর্গত শস্য ধান, গম, ভুট্টা, বার্লি, ওট এবং রাই-এর বীজই প্রকৃত দানাশস্য হিসেবে বিবেচিত। তবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মিলেট ও সরগমকেও দানাশস্য হিসেবে গণ্য করা হয়। এ দানাশস্যই পৃথিবীর মানব-সমাজের সর্বপ্রধান খাদ্য। জীবজন্তুর জন্যও ইহা গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সামগ্রী। এ জাতীয় শস্যের প্রধান খাদ্যোপাদান শ্বেতসার (starch) মানবদেহে তাপ ও শক্তি যোগায়। আমিষ, চর্বি, খনিজ এবং কিয়ৎ পরিমাণ ভিটামিনও দানাজাতীয় ফসলে বর্তমান থাকে।

দানাজাতীয় ফসলের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলি তুলনামূলকভাবে কম পরিশ্রম ও খরচে অথচ অধিক হারে উৎপাদন করা যায়। (যেমন—এক একর বা এক হেক্টর জমিতে ধান উৎপাদন করতে যে খরচ হয় তার চাইতে পাট উৎপাদন করতে অনেক বেশি খরচ হয় : যখন প্রতি হেক্টর গড়ে ৪.০ টন ধান উৎপাদিত হতে পারে তখন পাট উৎপন্ন হতে পারে মাত্র গড়ে ২.৬ টন। তদুপরি এ ফসল সহজেই নাড়াচাড়া করা যায় এবং শুষ্ক করার পর সেগুলিতে জলীয় অংশের পরিমাণ কম থাকে বলে সাধারণভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য গুদামজাতও করে রাখা যায়।

বাংলাদেশে দানাজাতীয় ফসল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র আবাদি জমির শতকরা ৮০-৮৫ ভাগেই এ ফসল জমিতে দেখা যায়। ধান এবং গম বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দানাশস্য। ইহা ছাড়া কিছু পরিমাণে ভুট্টা, সরগম ও চীনা কাউন, প্রভৃতি দানাশস্য চাষ হয়।

ধান

ধান পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। প্রাচ্যের নদনদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা, দিগন্ত প্রসারিত সমতল প্রান্তর এবং প্রশস্ত সমুদ্রোপকূল ধান্য ফসলে ভরপুর। চীন, ভারত, বাংলাদেশ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড, বার্মা মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের জীবনরক্ষাকারী ফসল এই ধান। এ দেশগুলির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক এবং এমনকি ধর্মীয় আচরণ এ ফসলটির সঙ্গে জড়িত।

বাংলাদেশের প্রধান ফসল বলতে কেবল ধান বুঝায়। এদেশের প্রত্যেকটি জেলার আনাচে-কানাচে বৎসরের প্রায় সময় নানা প্রকার ধান চাষ হয়। দেশের আবাদি জমির শতকরা প্রায় ৭৫-৮০ ভাগেই ধানের চাষ হয় ; অর্থাৎ চাষের মোট ২ কোটি ৯২ লক্ষ একর

অর্থাৎ ১ কোটি ১৮ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে ধানের চাষ হতে দেখা যায় প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ একর অর্থাৎ ৯০ লক্ষ ৮৬ হাজার হেক্টর জমিতে। ৯.১৪ এ হিসেবে ধানের আবাদি জমির এলাকা অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে চীন ও ভারতের পর তৃতীয় স্থানের অধিকারী সারণি–১)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তবুও এই দেশ ধান তথা চাউল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে।

এ জন্য বাংলাদেশ সরকারকে প্রতি বৎসর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় চাউল আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। এর প্রধান কারণ, আমাদের দেশে ধানের ফলন হার অত্যন্ত কম। যেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া, মিশর, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনে যথাক্রমে উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৮.০৯ টন ৭.৭৩ টন ৪.৫৮ টন ৬.১৮ টন এবং ৫.৯৬ টন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন মাত্র ২.৫০ টন (সারণি–১)।

সারণি –১ : বিশ্বের বিভিন্ন ধান উৎপাদনকারী দেশের উৎপাদন।

দেশের নাম	আবাদি এলাকা (০০০ হেক্টরে)	উৎপাদন (০০০ টনে)	উৎপাদন হার (টন/ হেক্টরে)
সার্ক দেশসমূহ			
বাংলাদেশ	১০৯৯০	২৮০০০	২.৫০
ভারত	৪১২০০	১১১০১১	২.৬৯
পাকিস্তান	২২০৭	৫৯২৭	২.৬৯
নেপাল	১২৪০	৩১০০	২.৫০
শ্রীলংকা	৭৯০	২৪৫০	৩.১০
আসিয়ান দেশসমূহ			
ইন্দোনেশিয়া	১০৯৩২	৪৭৮৮৫	৪.৩৮
মালয়েশিয়া	৬৬৫	২১০০	৩.১৬
থাইল্যান্ড	৮৯৭২	১৯০৯০	২.১৩
ফিলিপাইন	৩৪৫০	৯৫৩০	২.৭৬
মায়ানমার	৫৭৯৪	১৭৪৩৪	৩.০১
অন্যান্য দেশসমূহ			
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১১৪৬	৭০৮১	৬.১৮
ব্রাজিল	৪৪৩১	১০১৯৩	২.৩০
গণপ্রজাতন্ত্রী চীন	৩১৪০৩	১৮৭২১১	৫.৯৬
জাপান	২১৩৯	৯৭৯৩	৪.৫৮
মেক্সিকো	৮৫	৩২৫	৩.৮২
দক্ষিণ কোরিয়া	১০০০	২৯৪০	২.৯৪
উত্তর কোরিয়া	১১৩৫	৬৫৯৭	৫.৮১
তাইওয়ান	—	—	—
মিশর	৫৩৮	৪১৫৯	৭.৭৩
অস্ট্রেলিয়া	১০৬	৮৫৮	৮.০৯

সূত্র : বিশ্বের ধান ফসলের পরিসংখ্যান, ১৯৯৩–৯৪

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

ধান পৃথিবীর কোন দেশে বা কোন অংশে এবং কখন উৎপত্তি লাভ করেছিল তা কেউই সঠিক বলতে পারেন না। তবে কারো কারো মতে ধানের উৎপত্তি হয় ভারতবর্ষে অথবা দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়ার কোনো কোনো দেশে[৬]। তৎপর সেখান হতে ইহা খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে আসে চীন দেশে এবং খ্রিস্টের জন্মের ৭০০ বৎসর পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে[৬,৯]। ক্রমান্বয়ে ধানের চাষ অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ছড়ায়ে পড়ে। এ অঞ্চলসমূহের ধান উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলি হচ্ছে স্পেন, ইটালি, পর্তুগাল মিশর, সুদান, মালাগাছি, পশ্চিম আফ্রিকা, ব্রাজিল, কুইন্সল্যান্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস ইত্যাদি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধান উৎপাদনকারী দেশগুলি হলো চীন, ভারত, বাংলাদেশ, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং মায়ানমার।

মাটি

একমাত্র কঙ্কর ও বেলে মাটি ছাড়া আর প্রায় সব রকম মাটিতে ধান জন্মে। তবে ভারী অর্থাৎ এঁটেল ও এঁটেল–দোঁয়াশ মাটিই ধান চাষের জন্য সব চাইতে উপযোগী। নদনদীর অববাহিকা ও নিম্নাঞ্চলে হাওড়–বাওড় এলাকার পলিমাটি ধান চাষের জন্য সমপোযোগী। মাটির অম্লাত্মক হতে নিরপেক্ষ অবস্থা ধান চাষের অনুকূল। কিছুটা লবণাক্ত জমিতেও ধান জন্মাতে পারে।

জলবায়ু

প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উষ্ণ তাপমাত্রা ধান উৎপাদনের সহায়ক। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২১–২৪° সে. ও বৃষ্টিপাত ১৭৮০–২০৩০ মি.— এমন পরিবেশে ধান ভালো জন্মে। তাই বলা যায়, ধান গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফসল। তবে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও ধান জন্মিতে পারে।

ধান এমনই একটি অদ্ভুত শস্য যে সেটির বীজ পানিতে নিমজ্জিত মাটিতেও অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে করে অন্যান্য গাছ বা ফসলের মতো সেটির শিকড় পঁচে যায় না বা নষ্ট হয় না। ধান গাছের এমনই ক্ষমতা আছে যে তা পানিতে নিমজ্জিত শিকড়ে পাতায় উপস্থিত অক্সিজেন চালিত করে শিকড়কে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তাই কেউ কেউ যথার্থই বলেছেন ধান একটি জলজ উদ্ভিদ। মাঠ–ঘাট বৃষ্টির পানিতে ভেসে গেলেও সে পরিস্থিতিতে ধান বেঁচে যেতে পারে। বাংলাদেশের ছিটা বা বুনা আমন এমনই এক শ্রেণির ধান যা ২০–২৫ ফুট অর্থাৎ ৬–৭$\frac{১}{২}$ মিটার পানির মধ্যেও টিকে থাকতে পারে। বন্যা বা প্লাবনের সময় ইহা এত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে যে দিনে ৩০ সে. মি. ও বৃদ্ধি পায়।

উষ্ণ, আর্দ্র ও বৃষ্টিবহুল পরিবেশ ধান চাষের জন্য উপযোগী হলেও প্রচুর সূর্য কিরণ ধান উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। তাই দেখা যায়, বোরো ধান শীতের দিনের মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ হতে প্রচুর সূর্যালোক পায় বলে ইহার উৎপাদন আউশ ও আমন ধান হতে অধিক। অন্যদিকে জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ় হতে ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত আকাশ প্রায়শই মেঘে ঢাকা থাকে বলে আউশ ও রোপা আমন ধান প্রচুর সূর্যকিরণ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। ফলে উৎপাদন বোরো ধানের চাইতে কম হয়।

ধান আবার আফগানিস্তান ও মিশরের মতো বৃষ্টিহীন অঞ্চলেও জন্মাতে পারে। এ কথার অর্থ এই যে যদি সেচের বন্দোবস্ত থাকে তা হলে সেই পরিবেশেও ধান জন্মাতে পারে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

ধান ঘাসজাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ধানগাছ সরু সবুজ পত্র সন্নিবেশিত ফাঁপা গোলাকার পর্বযুক্ত কাণ্ডধারী ২-৬ ফুট অর্থাৎ ৬০ সে: মি: হতে প্রায় ২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একবীজপত্রী উদ্ভিদ। (রেখাচিত্র ২.১)।

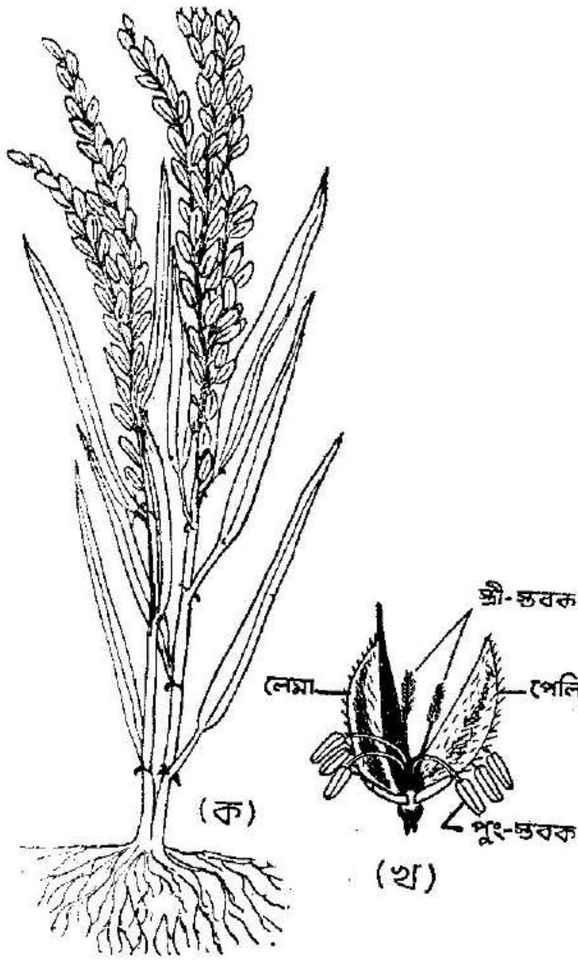

চিত্র ২.১ : ক. কুশী ও শীষসহ ধান গাছ ; খ. ধানের একটি ফুলের বিভিন্ন অংশ লেমা, পেলিয়া, পুংস্তবক, স্ত্রীস্তবক।

[illegible] জন্মে এবং তা প্রায় মাটির উপরি স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ ৩০ সে. মি. এর বেশি গভীর স্তরে প্রবেশ করে না। জাত ভেদে ধানগাছ কুশীর (tillers সংখ্য) ৫/৭ হতে [illegible]টি পর্যন্ত হতে পারে, শীষও ছোট–বড় হয়। প্রত্যেকটি শীষে ১০০–১০৫টি ধান দেখা যেতে পারে।

ধান Graminae পরিবারভুক্ত এ শস্যটির ২৪টি প্রজাতি আছে, তন্মধ্যে কেবল দুটি প্রজাতি আবাদযোগ্য — ১. Oryza sativa এবং ২. Oryza glaberrima steud. অন্য প্রজাতিগুলি, যথা O. officinalis woll. O. Minata Prest ইত্যাদি বন্য ধানের পর্যায়ভুক্ত। তবে কেউ কেউ অনুমান করেন যে, O. sativa L ধানটি O. sativa var. fatua নামক ভারতীয় একটি বন্য ধান হতে মিউটেশন (mutation) এবং নির্বাচনের মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করেছে। [৮]

পশ্চিম আফ্রিকায় O.glaberrima steud প্রজাতির ধান উৎপন্ন হতে দেখা যায়। আর এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় উৎপন্ন হয় O. sativa এ প্রজাতির ধান। এই sativa প্রজাতির ধানকে আবার তিনটি উপ-প্রজাতিতে (sub-species) বিভক্ত করা হয়েছে যথা ১. ইন্ডিকা (Indica), ২. জেপোনিকা (Japonica) এবং ৩. জাভানিকা (Javanica)।

জেপোনিকা ও জাভানিকা শ্রেণির ধান ছাড়া এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে যে শ্রেণির ধানের চাষ হয় তাকেই ইন্ডিকা শ্রেণির ধান বলা হয়। এ ধানের গাছগুলি লম্বা, পত্রবহুল ও প্রচুর কুশীযুক্ত। কতকগুলি জাতের জীবনকাল ৯০ দিন আবার কোনোটির জীবনকাল ২২০–২৫০ দিন। সাধারণত প্রতি হেক্টরে ১–১$\frac{১}{২}$ টন ধান পাওয়া যেতে পারে আর সেচের পানি ও সার ব্যবহার করলে উৎপাদন কিছু বেশি হতে পারে। তবে প্রায়শই গাছ নেতিয়ে পড়ে যে জন্য ফলন বেশ কমে যায়।

জেপোনিকা শ্রেণির ধান সম্ভবত জাপানেই উৎপত্তি লাভ করে। তবে মজুমদারের[৮] উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, রামিয়া মনে করে যে জেপোনিকা এবং জাভানিকা এই দুই শ্রেণির ধানই ইন্ডিকা শ্রেণির ধান হতে উদ্ভূত। জেপোনিকা জাতের ধানের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই জাতীয় ধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ভালো জন্মে, গাছ খাটো ও পাতা খাড়া শক্ত, ধানের আকৃতি অনেকটা গোল বা ডিমের মতো আর তার অগ্রভাগে ছোট ছোট শুং থাকে। শীষে ধানগুলি পাশপাশি ও ঘনভাবে থাকার দরুন ফলন খুব বেশি হয়। যে ক্ষেত্রে ইন্ডিকা ধানের চাষ করে প্রতি হেক্টর মাত্র ১.১ টন ধান পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে জেপোনিকা ধানের চাষে পাওয়া যায় হেক্টর প্রতি ৬ টনেরও অধিক ধান।

জাভানিকা শ্রেণির ধানকে বুলুজাতীয় ধান নামেও অভিহিত করা যায়। এই শ্রেণির ধান ইন্দোনেশিয়া ও প্রতিবেশী দেশগুলিতে জন্মাতে দেখা যায়। জাভানিকা ধানের বৈশিষ্ট্য এই যে গাছের খড় শক্ত, কুশীর সংখ্যা কম এবং ধানের মাথায় থাকে লম্বা শুং।

পৃথিবীতে হাজার হাজার ধানের জাত রয়েছে। বাংলাদেশেও শত শত ধানের জাত দেখা যায়। এদের কোনোটি মোটা, কোনোটি সরু, কোনোটি লাল, বাদামী, খয়েরী ; আবার কোনোটি কাজলা, হলুদ সোনালি, কাল ; কোনোটি আগুল, কোনোটি নাবী এবং কোনোটি সুগন্ধিযুক্ত। আবহমানকাল হতে এ সমস্ত ধানের জাত চাষ হয়ে আসছে বলে এদেশের চাষীরা সে সমস্ত ধানের জাত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। জলবায়ু, মাটির প্রকৃতি অবস্থান প্রভৃতির উপর

নির্ভরশীল এক একটি ধানের জাত যে বৎসরের এক একটি সময়ে জন্মাবার উপযোগী সেকথা তারা দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতায় জানতে পেরেছেন। তাই আমরা এদেশে ৪ শ্রেণির ধান দেখতে পাই, যথা ১. আউশ ধান, ২. রোপা আমন ধান, ৩. ছিটা আমন ধান ও ৪. বোরো ধান। এই প্রত্যেক শ্রেণির ধানের আলাদা জাত রয়েছে। এদেশের ধানের চাষাবাদ সম্বন্ধে জানতে হলে এই প্রত্যেক শ্রেণির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রথমেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আউশ ধান

বাংলাদেশে ১৯৯৩–৯৪ সালে ১৬৩০০০০ হেক্টর জমিতে আউশ ধানের চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় ১৮৫০০০০ মে. ধান[১৪]। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বৎসরের পর বৎসর আউশ ধানের আবাদ কমে যাচ্ছে। শস্যটির জেলাওয়ারী আবাদি এলাকা ও উৎপাদন সারণি–২ এ দেখানো হলো।

এই শ্রেণির ধান মৌসুমী বৃষ্টির প্রারম্ভে অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ মাসে বপন করা হয় এবং আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কাটা হয়। ইহার অন্তর্গত কোনো কোনো ধান বেশ অল্প সময়ের মধ্যে পাকে, যেমন কাল মাইট্যা ধান ৬০ দিনে পাকে। অল্প সময়ে পাকে বলিয়া এই সমস্ত ধানকে কেউ কেউ আশু ধান নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই আশু, কথা হতেই এই শ্রেণির ধানের নাম হইয়েছে আউশ ধান।

আউশ ধান একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করে। সেজন্য এটিকে বলা হয় Periodically fixed'। বৎসরের যে কোনো সময়েই বপন করা হোক না কেন জীবনচক্রের নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পর আউশ ধানের জাতে ফুল দেখা দিবে। শীত, গ্রীষ্ম অথবা বর্ষার কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে কর্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ চৈত্র–বৈশাখ মাসে বপন করলেই আউশ ধান বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সবচাইতে বেশি ফলন দেয়।

সারণি ২ : বাংলাদেশে আবাদকৃত আউশ ধানের জেলাভিত্তিক জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

	আবাদি জমির পরিমাণ (হেক্টরে)			উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টনে)		
জেলা	উফশী.	স্থানীয়	মোট	উফশী	স্থানীয়	মোট
ঢাকা	৮০০	১০০০০	১০৮০০	১৬০০	১০০০০	১১৬০০
নারায়ণগঞ্জ	২০০০	২০০০	৪০০০	৪০০০	২০০০	৬০০০
নরসিংদি	৩২০০	৩০০০	৬২০০	৬৪০০	৩০০	৯৪০০
গাজীপুর	৭০০০	৪০০০	১১০০০	১৪০০০	৪০০০	১৮০০০
মানিকগঞ্জ	৩০০	৩৫০০০	৩৫৩০০	৬০০	৩৫০০০	৩৫৬০০
মুন্সীগঞ্জ	৬০০	৯০০০	৯৬০০	১২০০	৯০০০	১০২০০
টাঙ্গাইল	৭০০০	৩৯০০০	৪৬০০০	১৪০০০	৩৯০০০	৫৩০০০
ময়মনসিংহ	৭৫০০০	৬৩০০০	১৩৮০০০	১৫০০০০	৬৩০০০	২১৩০০০
জামালপুর	৫০০০	১১০০০	১৬০০০	১০০০০	১১০০০	২১০০০

শেরপুর	৯০০০	১৪০০০	২৩০০০	১৮০০০	১৪০০০	৩২০০০
নেত্রকোনা	২৫৩০০	২৫০০০	৫০৩০০	৫০৬০০	২৫০০০	৭৫৬০০
কিশোরগঞ্জ	১৮০৫০	১৯০০০	৩৭০০০	৩৬০০০	১৯০০০	৫৫০০০
কুমিল্লা	৫০০০০	২০০০০	৭০০০০	১০০০০০	২০০০০	১২০০০০
বি, বাড়ীয়া	৬০০০	১১০০০	১৭০০০	১২০০০	১১০০০	২৩০০০
চাঁদপুর	১২০০০	১৭০০০	২৯০০০	২৪০০০	১৭০০০	৪১০০০
সিলেট	১৪০০০	৩৮০০০	৫২০০০	২৮০০০	৩৮০০০	৬৬০০০
মৌ:বাজার	৩০০০০	১৮০০০	৪৮০০০	৬০০০০	১৮০০০	৭৮০০০
হবিগঞ্জ	২৬৫০০	১১০০০	৩৭৫০০	৫৩০০০	১১০০০	৬৪০০০
সুনামগঞ্জ	৩০০০	৮০০০	১১০০০	৬০০০	৮০০০	১৪০০০
চট্টগ্রাম	২৬০০০	১২০০০	৩৮০০০	৫২০০০	১১০০০	৬৩০০০
কক্সবাজার	১২০০	১০০	১৩০০	২৪০০	১০০	২৫০০
নোয়াখালী	২৫০০০	৩০০০০	৫৫০০০	৫০০০০	৩০০০০	৮০০০০
ফেনী	১৩২০০	৯০০০	২২২০০	২৬৪০০	৯০০০	৩৫৪০০
লক্ষ্মীপুর	৬০০০	১৬০০০	২২০০০	১২০০০	১৬০০০	২৮০০০
রাঙ্গামাটি	২০০০	১২০০	৩২০০	৪০০০	১২০০	৫২০০
খাগড়াছড়ি	৩৫০০	২২০০	৫৭০০	৭০০০	২২০০	৯২০০
বান্দরবন	১৫০০	৭০০০	৮৫০০	৩০০০	৭০০০	১০০০০
বরিশাল	৮১০০	৩১০০০	৩৯১০০	১৬২০০	৩১০০০	৪৭২০০
পিরোজপুর	১৭০০০	২১০০০	৩৮০০০	৩৪০০০	২১০০০	৬৫০০০
ঝালকাঠি	৭৫০০	১৫০০০	২২৫০০	১৫০০০	১৫০০০	৩০০০০
ভোলা	২২০০০	৪২০০০	৬৪০০০	৪৪০০০	৪২০০০	৮৬০০০
পটুয়াখালী	৯৫০০	৩২০০০	৪১৫০০	১৯০০০	৩২০০০	৫১০০০
বরগুনা	১২০০০	২০০০০	৩২০০০	২৪০০০	২০০০০	৪৪০০০
রাজবাড়ি	৫০০	২০০০০	২০৫০০	১০০০	২০০০০	২১০০০
ফরিদপুর	৫৫০	৩৮০০০	৩৮৫৫০	১১০০	৩৮০০০	৩৯১০০
গোপালগঞ্জ	৫০	৩০০০০	৩০০৫০	১০০	৩০০০০	৩০১০০
মাদারীপুর	৭০	৩০০০০	৩০০৭০	১৪০	৩০০০০	৩০১৪০
শরীয়তপুর	৫০০	৩৩০০০	৩৩৫০০	১০০০	৩৩০০০	৩৪০০০
রাজশাহী	১৩০০০	১৯০০০	৩২০০০	২৬০০০	১৯০০০	৪৫০০০

নওগাঁ	১৪০০০	৫০০০	১৯০০০	২৮০০০	৫০০০	৩৩০০০
নাটোর	৪৮০০	১৪০০০	১৮৮০০	৯৬০০	১৪০০০	২৩৬০০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩০০০	৩৬০০০	৩৯০০০	৬০০০	৩৬০০০	৪২০০০
বগুড়া	৯০০০	১২০০	১০২০০	১৮০০০	১২০০	১৯২০০
জয়পুরহাট	৬০০০	৫০০	৬৫০০	১২০০০	৫০০	১২৫০০
পাবনা	৩০০০	৪০০০০	৪৩০০০	৬০০০	৪০০০০	৪৬০০০
সিরাজগঞ্জ	১০০০	১২০০০	১৩০০০	২০০০	১২০০০	১৪০০০
যশোর	২০০০০	১৯০০০	৩৯০০০	৪০০০০	১৯০০০	৫৯০০০
নড়াইল	৩০০	১৮০০০	১৮৩০০	৬০০	১৮০০০	১৮৬০০
মাগুড়া	২০০০	২০০০০	২২০০০	৪০০০	২০০০০	২৪০০০
ঝিনাইদহ	৬০০০	২৩০০০	২৯০০০	১২০০০	২৩০০০	৩৫০০০
কুষ্টিয়া	৭৬৬০	৪০০০০	৪৭৬৬০	১৫৩২০	৪০০০০	৫৫৩২০
মেহেরপুর	১৭০	১৭০০০	১৭১৭০	৩৪০	১৭০০০	১৭৩৪০
চুয়াডাঙ্গা	৪০০০	২৪০০০	২৮০০০	৮০০০	২৪০০০	৩২০০০
খুলনা	১০০০	১০০০০	১১০০০	২০০০	১০০০০	১২০০০
সাতক্ষীরা	২৫০০	১৩০০	৩৮০০	৫৫০০	১৩০০	৬৩০০
বাগেরহাট	৪২০০	৯০০০	১৩২০০	৮৪০০	৯০০০	১৭৪০০
রংপুর	৩৭০০০	২৫০০০	৬২০০০	৭৪০০০	২৫০০০	৯৯০০০
গাইবান্ধা	৭৫০০	৪০০০	১১৫০০	১৫০০০	৪০০০	১৯০০০
কুড়িগ্রাম	৫৫০০	৪৫০০০	৫০৫০০	১১০০০	৪৫০০০	৫৬০০০
লালমণিরহাট	৬০০০	২৪০০০	৩০০০০	১২০০০	২৪০০০	৩৬০০০
নীলফামারী	৩৭০০০	২০০০০	৫৭০০০	৭৪০০০	২০০০০	৯৪০০০
দিনাজপুর	৩৫০০০	৮০০০	৪৩০০০	৭০০০০	৮০০০	৭৮০০০
পঞ্চগড়	৪০০০	১৬০০০	২০০০০	৮০০০	১৬০০০	২৪০০০
ঠাকুড়গাও	১৫৫০০	২৫০০	১৮০০০	৩১০০০	২৫০০	৩৩৫০০

উৎস : খাদ্যশস্য উইং কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ১৯৯৫–৯৬

আউশ ধান চাষে আগাছার খুব প্রকোপ হয়। এ আগাছা পরিষ্কার করাই আউশ ধান চাষের এক বিরাট সমস্যা। 'জো' অর্থাৎ সাময়িক শুকনা পরিবেশ পাওয়া গেলে আচড়া ও নিড়ির সাহায্যে ঘাস পরিষ্কার করা সম্ভব হয়। আগাছা পরিষ্কার করার নির্দিষ্ট সময়ে এক নাগাড়ে বৃষ্টি হতে থাকলে সব কাজ করা সম্ভব হয় না। পরিণামে ফসলের ফলন একেবারে কমে যায়। অতি বৃষ্টির কোনো কোনো বৎসরে তাই চাষীরা আউশ ধানের ক্ষেত ভেঙ্গে ফেলে

কাদা করে আউশের চারা রোপা আমন ধানের রোপণ করে। উন্নত জাতের ইরি আউশের প্রচলন হওয়ার পর এখন অনেক জায়গায় আউশ ধানের চারা করে রোপণ করা হয়।

আউশ ধানের একরপ্রতি ফলন কম আর চাউল নিকৃষ্ট মানের। অনেক চাউল মোটা এবং বাদামী রংয়ের। তবে সরু ও সাদা চালের আউশ ধানও কিছু কিছু আছে।

আউশ ধানের জাত : আগের দিনে আউশ ধানের অনুমোদিত জাত ছিল কটকতারা, দুলার, পানিবিয়া, হাসিকলমি, মরিচবটি এবং ধারিয়াল। আজকাল এ সমস্ত জাতের ধানের আর চাষ হয় না বললেই চলে। বাংলাদেশ ধান-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হবার পর আউশ ধানের উচ্চফলনশীল (উফশী) বা আধুনিক জাতের বেশ কয়েকটি জাত উদ্ভাবিত ও অনুমোদিত হয়েছে। সে জাতসমূহ চাষ করলে ফলন অনেক বেশি পাওয়া যায়। সে জাতসমূহ হলো চান্দিনা, মালা, বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, গাজি, মোহিনী শাহিবালাম, নিয়ামত, রহমত ও শ্রাবণী।[৫]

আগেরদিনে একটি কথা প্রচলিত ছিল যে আউশ ও বোরো ধানের চালের ভাত নিকৃষ্ট বা স্বাদহীন এবং বাজারে কম দামে বিক্রি হয় আর যখন রোপা আমন ধানের চালের ভাত সুস্বাদু ও বাজারে চাল বেশি দামে বিক্রি হয়। স্থানীয় জাতের উৎপাদিত এ তিন রকম ধানের বেলায় তেমন কথা সঠিক ছিল কিন্তু আজকাল উফশী বা আধুনিক জাতের ধান উদ্ভাবিত হবার ফলে তেমন কথা আর খাটে না। আউশ, আমন ও বোরো এ তিন প্রকার ধানেই আধুনিক জাতের ধান রয়েছে। সেগুলোর কোনোটির চাল মোটা ও লালচে যেগুলোর ভাত খেতে স্বাদযুক্ত নয়। আবার কতগুলো জাতের চাল চিকন ও সাদা যেগুলোয় ভাত সুস্বাদু ও বাজারে চালের দাম বেশি।

রোপা আমন ধান

বাংলাদেশে ১৯৯৩–৯৪ সালে ৪৮৩৭০০০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধানের চাষ হয় আর উৎপাদিত হয় ৮৫৪৩০০০ মে. টন ধান –১৪ আষাঢ়–শ্রাবণ–ভাদ্র মাসে রোপণ করে কার্তিক–অগ্রহায়ণ–পৌষ মাসে যে ধান কাটা হয় তাই রোপা আমন ধান। এ ধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে বীজতলায় আলাদাভাবে চারা উঠিয়ে ৪/৫ সপ্তাহ বয়সের চারা উত্তমরূপে কর্দমাক্ত জমিতে রোপণ করা হয়। এ ধান চাষেই বাংলাদেশের চাষীরা সবচাইতে বেশি উদ্যোগ নেয় এবং বাস্তবিক পক্ষে এটিই দেশের প্রধান ধান্য শস্য। এ ধানের আবাদি এলাকা ও উৎপাদন (জেলাওয়ারী) সারণি–৩ এ দেখান হলো।

জমি কর্দমাক্ত করে রোপণ করা হয় বলে এবং বর্ষাকালীন বৃষ্টির পানি ক্ষেতে জমা হয় বলে রোপা আমন ধানের জমিতে আগাছা জন্মে না বললেই চলে। চাষীরা এ ধান চাষে আগাছা দমন করার কথা চিন্তা করেন না। তবে আধুনিক জাতের ধান এ মৌসুমে চাষ করা হলে আগাছা পরিষ্কার করার প্রয়োজন নিশ্চিত রূপেই দেখা দেয়। আর চাষীরা তা করেও থাকে।

শীতের খাটো দিনের আগমনের সাথে সাথে গাছে ফুল ধরে। জমিতে কখন চারা লাগান হলো বা না হলো তার উপর ফুল ধরা নির্ভর করে না। অর্থাৎ এ প্রকার ধান 'আলো সংবেদনশীল' (photo sensitive)।

সারণী ৩ : বাংলাদেশে আবাদকৃত রোপা আমন ধানের জেলভিত্তিক জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

	আবাদি জমির পরিমাণ (হেক্টরে)			উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টনে)		
জেলা	উফশী	স্থানীয়	মোট	উফশী	স্থানীয়	মোট
ঢাকা	৫৯৩২	১৫০০	৭৪৩২	১৪৮৩০	২২৫০	১৭০৮০
নারায়ণগঞ্জ	৬৩২৬	৫০০	৬৮২৬	১৫৮১৫	৭৫০	১৬৫৬৫
নরসিংদি	৩৪০২০	৬০০০	৪০০২০	৮৫০৫০	৯০০০	৯৪০৫০
গাজীপুর	৩৭৫৪০	৯০০০	৪৬৫৪০	৯৩৮৫০	১৩৫০০	১০৭৩৫০
মানিকগঞ্জ	১০০৮	৫০০	১৫০৮	২৫২০	৭৫০	৩২৭০
মুন্সীগঞ্জ	১৬০	১০০	২৬০	৪০০	১৫০	৫৫০
টাঙ্গাইল	৫১১১০	২৭০০০	৭৮১১০	১২৭৭৭৫	৪০৫০০	[illegible]
ময়মনসিংহ	[illegible]	১০৫০০০	২৭৩৫০০	৪২১২৫০	[illegible]	[illegible]
জামালপুর	৪৩৭৫০	৩৫০০০	৭৮৭৫০	[illegible]	[illegible]	[illegible]
শেরপুর	৩৯৬০০	৩৮০০০	৭৭৬০০	৯৯০০০	[illegible]	[illegible]
নেত্রকোনা	৬৫৬০০	৪১০০০	১০৬৬০০	১৬৪০০০	৬১৫০০	[illegible]
কিশোরগঞ্জ	৫০৭৯০	২০০০০	৭০৭৯০	১২৬৯৭৫	৩০০০০	১৫৬৯৭৫
কুমিল্লা	১০৯৩৩২	১৫০০০	১২৪৩৩২	২৭৩৩৩০	২২৫০০	২৯৫৮৩০
বি. বাড়ীয়া	১৩৫৩৬	১২০০০	২৫৫৩৬	৩৩৮৪০	১৮০০০	৫১৮৪০
চাঁদপুর	৩০৮৬৬	৭৫০০	৩৮৩৬৬	৭৭১৬৫	১১২৫০	৮৮৪১৫
সিলেট	৪৭২৭২	৭৩০০০	১২০২৭২	১১৮১৮০	১০৯৫০০	২২৭৬৮০
মৌ:বাজার	৭০৬৪০	৩৯০০০	১০৯৬৪০	১৭৬৬০০	৫৮৫০০	২৩৫১০০
হবিগঞ্জ	৩৮৪৩০	২০০০০	৫৮৪৩০	৯৬০৭৫	৩০০০০	১২৬০৭৫
সুনামগঞ্জ	১৫৯৬০	২৯০০০	৪৪৯৬০	৩৯৯০০	৪৩৫০০	৮৩৪০০
চট্টগ্রাম	১৪০১৫০	৪৭০০০	১৮৭১৫০	৩৫০৩৭৫	৭০৫০০	৪২০৮৭৫
কক্সবাজার	৬৪৫৫০	৫০০০	৬৯৫৫০	১৬১৩৭৫	৭৫০০	১৬৮৮৭৫
নোয়াখালী	৫৫১০০	৮৬০০০	১৪১১০০	১৩৭৭৫০	১২৯০০০	২৬৬৭৫০
ফেনী	৫৫২৫০	১৪০০০	৬৯২৫০	১৩৮১২৫	২১০০০	১৫৯১২৫
লক্ষ্মীপুর	৩৩০৫৪	৫৫০০০	৮৮০৫৪	৮২৬৩৫	৮২৫০০	১৬৫১৩৫
রাঙ্গামাটি	৯৯৭৪	৫০০	১০৪৭৪	২৪৯৩৫	৭৫০	২৫৬৮৫
খাগড়াছড়ি	১৭২২০	১০০০	১৮২২০	৪৩০৫০	১৫০০	৪৪৫৫০
বান্দরবন	৯৪৫০	৪০০	৯৮৫০	২৩৬২৫	৬০০	২৪২২৫
বরিশাল	৪২৮১৬	৭৩০০০	১১৫৮১৬	১০৭০৪০	১০৯৫০০	২১৬৫৪০

পিরোজপুর	১৫৯০৮	৫৪০০০	৬৯৯০৮	৩৯৭৭০	৮১০০০	১২০৭৭০
ঝালকাঠি	১৪৪৫০	৩২০০০	৪৬৪৫০	৩৬১২৫	৪৮০০০	৮৪১২৫
ভোলা	৫২২৪০	১০৪০০০	১৫৬২৪০	১৩০৬০০	১৫৬০০০	২৮৬৬০০
পটুয়াখালী	৫৩০০০	১৪৫০০০	১৯৮০০০	১৩২৫০০	২১৭৫০০	৩৫০০০০
বরগুনা	৩১২৯০	৭০০০০	১০১২৯০	৭৮২২৫	১০৫০০০	১৮৩২২৫
রাজবাড়ি	১৬৮৪২	৪০০০	২০৮৪২	৪২১০৫	৬০০০	৪৮১০৫
ফরিদপুর	৫৬২৮	১৪০০	৭০২৮	১৪০৭০	২১০০	১৬১৭০
গোপালগঞ্জ	১৬৮০	৩০০	১৯৮০	৪২০০	৪৫০	৪৬৫০
মাদারীপুর	২০২০	১৪০০	৩৪২০	৫০৫০	২১০০	৭১৫০
শরীয়তপুর	৩৬২২	৩৬০০	৭২২২	৯০৫৫	৫৪০০	১৪৪৫৫
রাজশাহী	৬১৪০০	১৬০০০	৭৭৪০০	১৫৩৫০০	২৪০০০	১৭৭৫০০
নওগাঁ	১০৫৮১০	৬৮০০০	১৭৩৮১০	২৬৪৫২৫	১০২০০০	৩৬৬৫২৫
নাটোর	২১৬৮২	৬৪০০	২৮০৮২	৫৪২০৫	৯৬০০	৬৩৮০৫
চা. নবাবগঞ্জ	৪৫৬৫০	৯০০০	৫৪৬৫০	১১৪১২৫	১৩৫০০	১২৭৬২৫
বগুড়া	১২৯৬৫০	৫৮০০০	১৮৭৬৫০	৩২৪১২৫	৮৭০০০	৪১১১২৫
জয়পুরহাট	৬৫৮৪২	১০০০০	৭৫৮৪২	১৬৪৬০৫	১৫০০০	১৭৯৬০৫
পাবনা	৩৮০২৬	৩০০০	৪১০২৬	৯৫৮১৫	৪৫০০	১০০৩১৫
সিরাজগঞ্জ	২৮৯২৮	২৭০০০	৫৫১২৮	৭২৩২০	৪০৫০০	১১২৮২০
যশোর	৯৯৫৭৪	৪০০০	১০৩৫৭৪	২৪৮৯৩৫	৬০০০	২৫৪৯৩৫
নড়াইল	৮৫২২	৩০০০	১১৫২২	২১৩০৫	৪৫০০	২৫৮০৫
মাগুড়া	২৯৭১৬	২০০০	৩১৭১৬	৭৪২৯০	৩০০০	৭৭২৯০
ঝিনাইদহ	৮১৮১০	২৭০০	৮৪৫১০	২০৪৫২৫	৪০৫০	২০৮৫৭৫
কুষ্টিয়া	৪৭৪৩৪	২০০০	৪৯৪৩৪	১১৮৫৮৫	৩০০০	১২১৫৮৫
মেহেরপুর	১২৭৮০	১৪০০	১৪১৮০	৩১৯৫০	২১০০	৩৪০৫০
চুয়াডাঙ্গা	২৯২৫২	৫০০	২৯৭৫২	৭৩১৩০	৭৫০	৭৩৮৮০
খুলনা	৫৩০০০	৬৮০০০	১২১০০০	১৩২৫০০	১০২০০০	২৩৪৫০০
সাতক্ষীরা	৯৫০০০	৩২০০০	১২৭০০০	২৩৭৫০০	৪৮০০০	২৮৫৫০০
বাগেরহাট	২৩১০০	৮৪০০০	১০৭১০০	৫৭৭৫০	১২৬০০০	১৮৩৭৫০
রংপুর	১২২৩০০	৩১০০০	১৫৩৩০০	৩০৫৭৫০	৪৬৫০০	৩৫২২৫০
গাইবান্ধা	৭৯২৫০	৪৩০০০	১২২২৫০	১৯৮১২৫	৬৪৫০০	২৬২৬২৫
কুড়িগ্রাম	৭০৭৬০	৪৬০০০	১১৬৭৬০	১৭৬৯০০	৬৯০০০	২৪৫৯০০
লালমনিরহাট	৫৯৬৪০	২১০০০	৮০৬৪০	১৪৯১০০	৩১৫০০	১৮০৬০০
নীলফামারি	৭৭৬৭৪	২৯০০০	১০৬৬৭৪	১৯৪১৮৫	৪৩৫০০	২৩৭৬৮৫
দিনাজপুর	১৬০১০০	৬১০০০	২২১১০০	৪০০২৫০	৯১৫০০	৪৯১৭৫০
পঞ্চগড়	৪৮৮০০	৪৮২০০	৯৭০০০	১২২০০০	৭২৩০০	১৯৪৩০০
ঠাকুরগাও	৪৯৩৮৪	৪৭১০০	৯৬৪৮৪	১২৩৪৬০	৭০৬৫০	১৯৪১১০

উৎস : খাদ্য শস্য উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ১৯৯৪–৯৫ ।

সময়মতো রোপণ করলে দীর্ঘকাল বৃদ্ধির সময় পায় আর শীতের রাতগুলিতে তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা পাওয়ায় শর্করা আত্মীকরণ সহজতর হয় বলে রোপা আমন ধানের ফলন আউশ ধান হতে অধিক হয়। অধিকাংশ চাউল উন্নতমানের অর্থাৎ সাদা, সরু এবং ... ভাত অধিক স্বাদযুক্ত।

রোপা আমন ধানের জাত : আউশ ধানের মতো রোপা আমন ধানেও আগের দিনে কিছু সরকার অনুমোদিত জাত ছিল। সেগুলো হলো ডিএ-৩১, লতিশাইল, ডিএ-২৯, ...শাইল, পাটনাই-২৩, নাইজারশাইল, কার্তিকশাইল। একমাত্র নাইজারশাইল ব্যতীত অন্য জাতগুলিরই আজকাল আর চাষ হয় না বললেই চলে। বর্তমানে যে সমস্ত উফশী বা আধুনিক রোপা আমন ধানের চাষ হয় সে জাতগুলো হলো— বিপ্লব, ব্রিশাইল, দুলাভোগ, ...ি, মুক্তা, কিরণ, দিশারি, নয়াপাজাম, ব্রিধান ৩০, ব্রিধান ৩১, ব্রিধন ৩২ এবং পাজাম।[৫]

ছিটা আমন ধান

আউশ ধানের মতো ছিটায়ে বপন করে যে আমন ধানের চাষ করা হয় তাকে ছিটা আমন ধান বলে। গভীর পানিতে উৎপন্ন হয় বলে কেউ কেউ এটিকে জলী আমন ধান নামেও অভিহিত করে। আউশ ধান যখন বপন করা হয় তখন এই আমন ধানও বপনের সময়। বাস্তবিকপক্ষে প্রায় ক্ষেত্রেই আউশ ধানের সঙ্গে এটির মিশ্র চাষ করা হয়। আউশ ধান যথাসময়ে পরিপক্ক হবার পর সেটি কেটে নেয়া হয়। এ সময় ছিটা আমন ধানের আগা কাটা যায়। তাতে অবশ্য এ ধানের কোনো ক্ষতি হয় না। প্লাবনের পানি আসার সাথে গাছগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিচু জমি যেখানে ১০/১২ ফুট অর্থাৎ ৩/৪ মিটার পর্যন্ত পানি হয় তেমন জমিতেও এই ধান টিকে থাকতে পারে। প্রয়োজন হলে পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে পারে, দৈনিক ৩০-৩১ সে. মি. করেও বৃদ্ধি পেতে সক্ষম।

রোপা আমন ধানের মতো এ ধানও আলো সংবেদনশীল। ফলে শীতের ছোট দিনের আগমনের সাথে সাথে পুষ্পমঞ্জরী বা শীষ দেখা দেয়। কার্তিক অগ্রহায়ণে ধান কাটা হয়।

দেখা যায়, ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশে ৯১৩০০ হেক্টর জমিতে জলী আমন ধানের চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় ৮৭৬০০০ মে. টন ধান।[১৪] প্রায় ৮/৯ মাস জমিতে থাকলেও এ ধানের ফলন তত ভালো নয়, তবে আউশ ধানের চাইতে ফলন বেশি। চাউল বাদামি রংয়ের ও মোটা; ভাত রোপা আমনের মতো স্বাদযুক্ত নয়।

ছিটা আমন ধানে রোপা আমন ধানের মতো তত জাত নেই। অনুমোদিত জাতগুলি হলো —গাবুরা, হবিগঞ্জ আমন-১ (কাটিয়া বাগদার), হবিগঞ্জ আমন-২ (গদালবি), হবিগঞ্জ আমন-... বুদ লাকি), হবিগঞ্জ আমন-৫ (ধলা আমন) এবং হবিগঞ্জ আমন-৮ (লাল আমন)। এ পর্যন্তও ছিটা আমন ধানের কোনো উফশী বা আধুনিক জাত উদ্ভাবিত হয় নি।

উল্লেখ্য যে আজকাল দেশের বন্যামুক্ত অঞ্চলে ছিটা আমন ধানের চারা রোপণ করা হয় এবং সন্তোষজনক ফলন পাওয়া যায়। দেশে ১৯৯৪-৯৫ সালে জেলাওয়ারী যে পরিমাণ জমিতে এ ধানের চাষ হয় তা সারণি- ৪ এ দেখান হয়েছে।

সারণি : বাংলাদেশে আবাদকৃত ছিটা আমন ধানের জেলাওয়ারী জমির পরিমাণ ও উৎপাদন।

জেলার নাম	আবাদি জমির পরিমাণ (হেক্টরে)		উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টনে)	
	বোনা	রোপা	মোট	মোট
ঢাকা	১৪৭৫০	--	১৪৭৫০	১৬২২৫
নারায়ণগঞ্জ	২১০০০	--	২১০০০	২৩১০০
নরসিংদি	৩৪০০	১১০০	৪৫০০	৪৯৫০
গাজীপুর	৩০০	১৫০	৪৫০	৪৯৫
মানিকগঞ্জ	৫৩০০০	১৫০০	৫৪৫০০	৬৯৯৫০
মুন্সীগঞ্জ	২১৪০০	--	২১৪০০	২৩৫৪০
টাঙ্গাইল	৩১৩০০	২৯৭০০	৬১০০০	৬৭১০০
ময়মনসিংহ	৩০০	৫০	৩৫০	৩৮৫
জামালপুর	২২০০	--	২২০০	২৪২০
শেরপুর	১০০	--	১০০	১১০
নেত্রকোনা	৩৮০০	৪৪০০	৮২০০	৯০২০
কিশোরগঞ্জ	৫০০	--	৫০০	৫৫০
কুমিল্লা	৫২০০০	৪০০০	৫৬০০০	৬১৬০০
বি. বাড়িয়া	৩৯৫০০	২৫০০	৪২০০০	৪৬২০০
চাঁদপুর	৩৬০০০	২৬০০	৩৮৬০০	৪২৪৬০
সিলেট	৩৫০০০	--	৩৫০০০	৩৮৫০০
মৌ:বাজার	৭৭৫০	--	৭৭৫০	৮৫২৫
হবিগঞ্জ	৩২৬০০	২৫৫০	৩৫১৫০	৩৮৬৬৫
সুনামগঞ্জ	১৩৭৫০	২৫০	১৪০০০	১৫৪০০
চট্টগ্রাম	--	--	--	--
কক্সবাজার	--	--	--	--
নোয়াখালী	৪২০০	১০০	৪৩০০	৪৭৩০
ফেনী	--	--	--	--
লক্ষ্মীপুর	১৫০০	--	১৫০০	১৬৫০
রাঙ্গামাটি	--	--	--	--
খাগড়াছড়ি	--	--	--	--
বান্দরবান	--	--	--	--
বরিশাল	১০৮৫০	১৫০	১১০০০	১২১০০
পিরোজপুর	১২৫০০	--	১২৫০০	১৩৭৫০
ঝালকাঠি	৫০০	১০৩০০	১০৮০০	১১৮৮০
[illegible]	--	--	--	--
[illegible]	৬৪০০০	--	৬৪০০০	৭০৪০০

[illegible]	—	—	—	—
রাজবাড়ি	১৮০০০	২০০০	২০০০	২২০০০
ফরিদপুর	৪৫০০০	২০০	৪৫২০০	৪৯৭২০
গোপালগঞ্জ	৬০৫০০	৫০০	৬১০০০	৬৭১০০
মাদারীপুর	৪১০০০	৫০০	৪১৫০০	৪৫৬৫০
শরীয়তপুর	৩০৮০০	৬০০০	৩৬৮০০	৪০২৬০
রাজশাহী	১২০০০	২০০০	১৪০০০	১৫৪০০
নওগাঁ	৫৪০০	৬১০০	১১৫০০	১২৬৫০
নাটোর	৩২০০০	২৫০০	৩৪৫০০	৩৭৯৫০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০০০	—	২০০০	২২০০
বগুড়া	—	—	—	—
জয়পুরহাট	—	—	—	—
পাবনা	৪৪০০০	২০০০	৪৬০০০	৫০৬০০
সিরাজগঞ্জ	২৬০০০	১৫০০	২৭৫০০	৩০২০০
যশোর	১২০০০	২২০০	১৪২০০	১৫৬২০
নড়াইল	৩৩০০০	২০০০	৩৫০০০	৩৮৫০০
মাগুরা	—	২৫০০০	২৫০০০	২৭৫০০
ঝিনাইদহ	৬০০০	২২০০	৮২০০	৯০২০
কুষ্টিয়া	৩৫৬০	—	৩৫৬০	৩৯১৬
মেহেরপুর	৬৫০০	—	৬৫০০	৭১৫০
চুয়াডাঙ্গা	৪৮০০	—	৪৮০০	৫২০০
খুলনা	২২২০০	—	২২২০০	২৪৪২০
সাতক্ষীরা	১৫০	—	১৫০	১৬৫
বাগেরহাট	১৩০০০	২০০০	১৫০০০	১৬০৫০
রংপুর	—	১০০	১০০	১১০
গাইবান্ধা	৫০০	১৫০০	২০০০	২২০০
কুড়িগ্রাম	১৮০০	—	১৮০০	১৯৮০
লালমণিরহাট	২০	—	২০	২২
নীলফামারি	১০০	—	১০০	১১০
দিনাজপুর	—	২০	২০	২২
পঞ্চগড়	—	—	—	—
ঠাকুরগাও	—	—	—	—

উৎস : খাদ্যশস্য উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ১৯৯৪–৯৫

[illegible]রো ধান

বাংলাদেশে শীতের মৌসুমে যে ধানের চাষ হয় বোরো ধান নামে পরিচিত। বর্ষাকালের শেষে নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় হতে যখন পানি সরে যায় তখন পৌষ-মাঘ মাসে এ ধানের চাষ করা হয়। রোপা আমন ধানের মতো বীজতলায় চারা উঠায়ে সে চারা কর্দমাক্ত

জমিতে রোপণ করা হয়। তবে এ ধানে সেচের পানি অবশ্যই ব্যবহার করতে হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ধান কাটা হয়।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল মেঘমুক্ত আকাশে ও শীতকালীন ঠাণ্ডা পরিবেশে বোরো ধান জন্মায় বলে এর ফলন যে-কোনো শ্রেণির অর্থাৎ আউশ ও রোপা আমন ধানের চাইতে বেশি। তবে চাউল আমন ধানের চাইতে নিকৃষ্ট এবং বাজারে কম দামে বিক্রি হয়।

বোরো ধানের জাত : উফশী বা আধুনিক বোরো ধানের জাতগুলো হলো— চান্দিনা, বিপ্লব, বি আর ৬, ব্রিবালাম, আশা, সুফলা, ময়না, গাজি, মোহিনী, শাহীবালাম, হাসি, শাহজালাল, মঙ্গল, শ্রাবণী, ব্রিধান ২৮, ব্রিধান ২৯ এবং পূর্বাচী।[৫] আগের দিনে অনুমোদিত বোরো ধানের জাত হিসেবে বিবেচিত ছিল হবিগঞ্জ বোরো-২, হবিগঞ্জ বোরো ৪, ও হবিগঞ্জ বোরো ৬।

বাংলাদেশে ১৯৯৩-৯৪ সালে ২৫৮১০০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় ৬৭৭২০০০ মে. টন ধান।[১৪] সে ধানের জেলাওয়ারী উৎপাদন সারণি -৫ এ দেখান হলো।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৭টি উচ্চফলনশীল (উফশী) ধানের চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে ৩১টি জাত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে আর ৬টি জাতের ৫টি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাকি একটি ধানের জাতের প্রচলন হয়েছে গণচীন হতে। এই জাতগুলির বৈশিষ্ট্য নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।[৫]

১. **চান্দিনা (বিআর) :** চান্দিনা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রথম ধান ১৯৭০ সালে ইহা আউশ ও বোরো মৌসুমে চাষ করার জন্য অনুমোদন লাভ করে।

চান্দিনা ধানের গাছ গড়ে ৮৬-৯১ সে. মি. পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা ছোট, পুরু এবং খাড়া আর গাছের সব অংশই সবুজ। বোরো মৌসুমে প্রতি গুছিতে গড়ে ১৫টি, আউশ মৌসুমে রোপা চাষে ১৩টি এবং বুনা চাষে ৮টি কুশী জন্মে। রোপা আউশের বেলায় প্রতি শীষে বা ছড়ায় গড়ে ১১০টি এবং বুনা আউশে ৮৫টি ধান হয়। বোরো মৌসুমে ধানের গড় সংখ্যা হয় ১২০টি। বোরো মৌসুমে বীজ বুনা হতে ধান পাকা পর্যন্ত ১৪৫-১৫০ দিন সময় লাগে। আউশ মৌসুমে রোপা ধানের বেলায় এই সময়সীমা ১১৫-১২০ দিন এবং বুনা ধানের বেলায় ১০৫-১১০ দিন।

উপর্যুক্ত পরিবেশে ও সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করলে বোরো মৌসুমে এই জাতের ধানের ফলন একর প্রতি ৬০-৭০ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৫৫-৬৪ কুইন্টাল হতে পারে. আউশ মৌসুমে রোপা চাষে এই ধানের গড় পড়তা ফলন হেক্টর প্রতি ৪৬-৫৫ কুইন্টাল অর্থাৎ একর প্রতি ৫০-৬০ মণ এবং বুনা চাষে ৪০-৫০ মণ (৩৭-৪১ কুইন্টাল/হেক্টর) পর্যন্ত হতে পারে

চান্দিনা ধানে সাধারণত টুংরো ও পাতাপোড়া রোগ হয় না। কিন্তু পাতায় খোলপোড়া এবং পাতার লালচে রং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পামরী ও মাজরা

সারণি ৫ : বাংলাদেশে আবাদকৃত বোরো ধানের জেলাভিত্তিক জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

	আবাদি জমির পরিমাণ (হেক্টরে)			উৎপাদনের পরিমাণ (মে. টন)		
জেলা	উফশী	স্থানীয়	মোট	উফশী	স্থানীয়	মোট
ঢাকা	৩৭০০০	১৫০০	৩৮৫০০	১১৮৪০০	২৫২৫	১২০৯২৫

নারায়ণগঞ্জ	২৭০০০	৮০০	২৭৮০০	৮৬৪০০	১১৪০	৮৭৫৪০
নরসিংদি	৪৩০০০	৮০০	৪৩৮০০	১৩৭৬০০	১২৪০	১৩৮৮৪০
গাজীপুর	৫৫০০০	১০০০	৫৬৮০০	১৭৬০০০	২৭৭০	১৭৮৭৭০
মানিকগঞ্জ	১৯০০০	১৩০০	২০৩০০	৭০৪০০	১৮৪০	৭২২৪০
মুন্সীগঞ্জ	২২০০০	১২০০	২৩২০০	৬০৮০০	২০১৫	৬২৮১৫
টাঙ্গাইল	১৩৩২০০	২৩০০	১৩৫৫০০	৪২৫৬০০	৩৫৬৫	৪২৯১৬৫
ময়মনসিংহ	১১০০০০	৫২০০	১১৫২০০	৩৫২০০০	৮০৬০	৩৬০০৬০
জামালপুর	৭২০০০	১৩০০০	৮৫০০০	২৩০৪০০	১৭০৫০	২৪৭৪৫০
শেরপুর	৫২০০০	২৭০০	৫৪৭০০	১৬৬৪০০	৪১৮৫	১৭০৫৮৫
নেত্রকোনা	৭০০০০	৩৪৫০০	১০৪৫০০	২২৪০০০	৫৩৪৭৫	২৭৭৪৭৫
কিশোরগঞ্জ	১৩৩০০০	৮২০০	১৪১২০০	৪২৫৬০০	১২৭১০	৪৩৮৩১০
কুমিল্লা	১০৬০০০	৫০০	১০৬৫০০	৩৯২০০	৭৭৫	৩৩৯৯৭৫
বি. বাড়িয়া	৮৩০০০	৫০০০	৮৮০০০	২৬৫৬০০	৭৭৫০	২৭৩৩৫০
চাঁদপুর	৫৩০০০	১৮০০	৫৪৮০০	১৬১৬০০	২৭৯০	১৬৪৩৯০
সিলেট	২২০০০	৩১০০০	৫৩০০০	৮০০০০	৪৮০৫০	১২৮০৫০
মৌলভীবাজার	২৫০০০	১১০০০	৩৬০০০	৮০০০০	১৭০৫০	৯৭০৫০
হবিগঞ্জ	৭১০০০	৯০০০	৮০০০০	২২৭২০০	১৩৯৫০	২৪১১৫০
সুনামগঞ্জ	৮১০০০	৭৩৪০০	১৫৪৪০০	২৫৯২০০	১৩৭৭৭০	৩৯৬৯৭০
চট্টগ্রাম	৮০০০০	—	৮০০০০	২৫৬০০০	—	২৫৬০০০
কক্সবাজার	৪১৫০০	২৫০	৪১৭৫০	১০২৮০০	৩৮৭	১০৩১৮৭
নোয়াখালী	৪০৫০০	৪৭৫০	৪৫২৫০	১২৯৬০০	৭৩৬৩	১৩৬৯৬৩
ফেনী	২৮০০০	—	২৮০০০	৮৯৬০০	—	৮৯৬০০
লক্ষ্মীপুর	২৩০০০	২০০	২৩২০০	৭৩৬০০	৩১০	৭৩৯১০
রাঙ্গামাটি	৭৫০০	—	৭৫০০	২৪০০০	—	২৪০০০
খাগড়াছড়ি	৫২০০	—	৫২০০	১৬৬৪০	—	১৬৬৪০
বান্দরবান	৪৩০০	১০০	৪৪০০	১৩৭৬০	১৫৫	১৩৯১৫
বরিশাল	৩১৯০০	৫৯০০	৩৭৮০০	১০০৮০০	৯১৪৫	১০৯৯৪৫
পিরোজপুর	৯৪০০	৮০০	১০২০০	৩০০৮০	১২৪০	৩১৩২০
ঝালকাঠি	৫৫০০	১০০	৫৬০০	১৭৬০০	১৫৫	১৭৭৫৫
ভোলা	১৯৪০০	৬১০০	২৫৫০০	৬২০৮০	৯৪৫৫	৭১৫৩৫
পটুয়াখালী	৬০০	৪৯০০	৫৫০০	১৯২০	৭৫৯৫	৯৫১৫
বরগুনা	৪০০	২০০	৬০০	১২৮০	৩১০	১৫৯০
রাজবাড়ি	১৫৩০০	৫০০	১৫৮০০	৪৮৯৬০	৭৭৫	৪৯৭৩৫
ফরিদপুর	২৬৫০০	১৮০০	২৮৩০০	৮৪৮০০	২৭৯০	৮৭৫৯০
গোপালগঞ্জ	২৪০০০	১০০০০	৩৪০০০	৭৬৮০০	১৫৫০০	৯২৩০০
শরিয়তপুর	৬০০০	৩০০০	৯০০০	১৯২০০	৪৬৫০	২৩৮৫০
মাদারীপুর	১৯৪০০	৪৫০০	২৩৯০০	৬২০৮০	৬৯৭৫	৬৯০৫৫
রাজশাহী	৪০০০০	১৫০০	৪১৫০০	১২৮০০০	২৩২৫	১৩০৩২৫

নওগাঁ	১০৯০০০	—	১১০০	৩৪৮৮০০	৩৪১০	৩৫২২১০
নাটোর	৪৯০০০	১০০০	৫০৫০০	১৫৬৮০০	২৩২৫	১৫৯১২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০০০০	১৫০০	২১৫০০	৬৪০০০	২৩২৫	৬৬৩২৫
বগুড়া	১৭৩০০০	১১৭০০	১৮৪৭০০	৫৫৩৬০০	১৮১২৫	৫৭১৭২৫
জয়পুরহাট	৫২০০০	৪৫০০	৫৬৫০০	১৬৬৪০০	৬৯৭৫	১৭৩৩৭৫
পাবনা	৪৫০০০	২২০০	৪৭২০০	১৪৪০০০	৩৪১০	১৪৭৪১০
সিরাজগঞ্জ	৬৬০০০	১৪০০০	৮০০০০	২১১২০০	২১৭০০	২৩২৯০০
যশোর	৪৭০০০	৮৫০	৪৭৮৫০	১৫০৪০০	১৩১৮	১৫১৭১৮
নড়াইল	৯০০০	৫৫০	৯৫৫০	২৮৮০০	৮৫২	২৯৬৫২
মাগুরা	১৪০০০	—	১৪০০০	৪৪৮০০	—	৪৪৮০০
ঝিনাইদহ	৪৪০০০	১০০	৪৪১০০	১৪০৮০০	১৫৫	১৪০৯৫৫
কুষ্টিয়া	১৫০০০	১৫০	১৫১৫০	৪৮০০০	২৩২	৪৮২৩২
মেহেরপুর	৮০০০	২৫০	৮২৫০	২৫৬০০	৩৮৮	২৫৯৮৮
চুয়াডাঙ্গা	২০৫০০	৫০	২০৫৫০	৬৫৬০০	৭৮	৬৫৬৭৮
খুলনা	৫০০০	১২৫০	৬২৫০	১৬০০০	১৯৩৭	১৭৯৩৭
সাতক্ষীরা	৪৫৫০০	—	৪৫৫০০	১৪৫৬০০	—	১৪৫৬০০
বাগেরহাট	৬০০০	৪৯০০	১০৯০০	১৯২০০	৭৫৯৫	২৬৭৯৫
রংপুর	৬৩০০০	৪৫০	৬৩৪৫০	২০১৬০০	৬৯৮	২০২২৯৮
গাইবান্ধা	৬৬০০০	১২৫০	৬৭২৫০	২১১২০০	২০৫৭	২১৩২৫৭
কুড়িগ্রাম	৪২০০০	৩৭০০	৪৫৭০০	১৩৪৪০০	৫৭৩৫	১৪০১৩৫
লালমনিরহাট	২৭০০০	৩০০	২৭৩০০	৮৬৪০০	৪৬৫	৮৬৮৬৫
নীলফামারি	২৯০০০	৩০০	২৯৩০০	৯২৮০০	৪৬৫	৯৩২৬৫
দিনাজপুর	৬০০০০	—	৬০০০০	১৯২০০০	—	১৯২০০০
পঞ্চগড়	৯০০০	১০০	৯১০০	২৮৮০০	১৫৫	২৮৯৫৫
ঠাকুরগাঁও	২৭০০০	২০০	২৭২০০	৮৬৪০০	৩১০	৮৬৭১০

উৎস : খাদ্যশস্য উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ১৯৯৪-৯৫

পোকার আক্রমণ এই ধানে হয়। তবে গলমাছির আক্রমণ তুলনামূলক কম হয়।

২. মালা (বি-আর ২) : এই জাতের ধান বাংলাদেশে আউশ ও বোরো চাষের জন্য ১৯৭১ সালে অনুমোদিত হয়। ইহা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দ্বিতীয় ধান।

প্রথমোক্ত ধানের চাইতে এই জাতের উচ্চতা অনেকটা বেশি। গড়ে ৪৫-৪৮ ইঞ্চি অথবা ১১৫-১২২ সে. মি.। গাছ শক্ত, খাড়া ও সবুজ। আউশ মৌসুমের চাইতে বোরো মৌসুমে ছড়া ও ধানের সংখ্যা বেশি হয়— এই সময় প্রতি গুছিতে ১২টি ছড়া এবং প্রতি ছড়ায় ১০০টি ধান জন্মে।

আউশ মৌসুমে বুনা হতে কাটা অবধি এই ধান ঘরে উঠতে সময় লাগে ১২০-১২৫ দিন এবং বোরো মৌসুমে ১৫০-১৬০ দিন। উপযুক্ত পরিবেশে ও সুষম সার ব্যবহারে বোরো মৌসুমে ফলন হয় প্রতি হেক্টরে ৫৫-৬৭ কুইন্টাল অর্থাৎ একরে ৬০-৭০ মণ। আউশ মৌসুমে বুনা চাষে ফলন পাওয়া যায় প্রতি একরে ৪০-৪৫ মণ (প্রতি হেক্টরে ৩৭-৪২ কুইন্টাল) এবং রোপা চাষে ৫০-৬০ মণ (৪৬-৫৫ কুইন্টাল/ হেক্টর।)

টুংরো, পাতাপোড়া ও লালচে রেখা রোগ দ্বারা মালা ধান আক্রান্ত হয় না বা হলেও কম হয়। তবে খোলপচা ও খোলপোড়া রোগের কিছুটা সম্ভাবনা থাকে। মালা ধানে পামরী ও মাজরা পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে, তবে গলমাছির আক্রমণ সাধারণত বোরো মৌসুমে দেখা যায় না, কিন্তু আউশ মৌসুমে এর আক্রমণের কিছুটা সম্ভাবনা থাকে।

২. **বিপ্লব (বি-আর ৩) :** দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশী ও বিদেশী ধানের শঙ্কর করে সর্বপ্রথম এই জাতের ধান উদ্ভাবন করে এবং ১৯৭৩ সালে ইহা বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে এ জাতের ধান বোরো আউশ ও আমন এই তিন মৌসুমেই ভালোভাবে চাষ করা যায় বলে অন্যান্য উফশী ধানের চাইতে কিছুটা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিপ্লব ধান অন্যান্য অনুমোদিত উফশী ধানের জাতের মতো বেশি ফলন দেয়, অথচ তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ বেশি প্রতিরোধ করতে সক্ষম। ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিপ্লব প্রথম হয়।

বিপ্লব খাটো আকৃতির উফশী ধান। ইহার পাতা ইরি-৮ এর মতোই খাড়া, খসখসে এবং গাঢ় সবুজ। ইহার উচ্চতা বোরো মৌসুমে ৩৬-৩৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ৯১-৯৭ সে. মি. এবং আউশ মৌসুমে ৩৮-৪০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৯৭-১০২ সে. মি. হয়। কুশীর সংখ্যা হয় বোরো মৌসুমে ১৫-১৮টি, আউশ মৌসুমে ১০-১২টি এবং আমন মৌসুমে ১২-১৫টি। প্রতিটি ছড়ায় পুষ্ট ধানের সংখ্যা হয় বোরো মৌসুমে ১১৫-১২৫টি। এবং আউশ ও আমন মৌসুমে ৯০-১০০টি। চাল মোটা ধরনের এবং পেটে সাদা দাগ আছে।

বিপ্লবের জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৬০-১৭০ দিন, আউশ মৌসুমে ১২৮-১৩০ দিন এবং রোপা আমন মৌসুমে ১৩৫-১৪০ দিন।

উপযুক্ত পরিবেশে বিপ্লব বোরো মৌসুমে একর প্রতি ৬০-৭০ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৫৫-৬৪ কুইন্টাল এবং আউশ ও আমন মৌসুমে যথাক্রমে ৫০-৫৫ মণ অর্থাৎ ৪৬ ও ৫০ কুইন্টাল ফলন দিতে পারে।

বিপ্লব ধানে টুংরো, পাতাপোড়া রোগ, পাতা ঝলসানো রোগ এবং পাতার খোল পড়া রোগ সাধারণত হয় না। মোটামুটিভাবে বিপ্লব ধান অধিকাংশ পোকা-মাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে। তবে এই ধানে মাজরা পোকার আক্রমণ হতে পারে।

৪. **ব্রিশাইল (বি-আর ৪) :** বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ এক সময়, বুঝতে পারলেন যে, ইরিশাইল (ইরি-২০) সব জমিতে চাষের উপযোগী নয় কারণ, এদেশের বহু জমিতে শ্রাবণ মাসে রোপা লাগাবার সময় ৬-১২ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৫-৩০ সে. মি. পানি জমে যায়। ফলে ইরিশাইলের ছোট ছোট চারা ঐসব জমিতে লাগান সম্ভব হয় না। এই

সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে গবেষণা চালায়ে অধিকতর লম্বা ব্রিশাইল জাতের ধান উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। ১৯৭৬ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ব্রিশাইল প্রথম স্থান লাভ করে।

ব্রিশাইলের পূর্ণ বয়স্ক গাছ উচ্চতায় ৫০ ইঞ্চি অর্থাৎ ১২৭ সে. মি. হতে পারে। গাছের পাতা খাড়া, গাঢ় সবুজ ও খসখসে। প্রতি গুছিতে ১০–১২টি কুশী জন্মে। ব্রিশাইলের ধানের ছড়া লম্বায় ৮–১০ ইঞ্চি অর্থাৎ ২০–২৫ সে. মি. এবং প্রতি ছড়াতে গড়ে ১২৫টি ধান থাকতে পারে। এক মাসে চারা প্রায় ৪৬ সে. মি. লম্বা হয়। ফলে ইহা ১৫–২০ সে. মি. দাঁড়ানো পানিতে রোপণ করা হয়। রান্না করা ভাত খেতে স্বাদযুক্ত।

ব্রিশাইলের বীজ বোনা হতে পাকা অবধি ১৪৫–১৬০ দিন সময় লাগে। শ্রাবণের মাঝামাঝি হতে শেষ নাগাদ পর্যন্ত রোপা লাগালে ধান অগ্রহায়ণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পাকে। উপযুক্ত পরিবেশ ও আবহাওয়ায় একর প্রতি ৬০–৭০ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৫৫–৬৪ কুইন্টাল ফলন দিতে পারে।

ব্রিশাইল টুংরো, বাকানি, পোড়া দাগ (blast) ও ঝলসানো রোগ ভালোভাবে এবং ধানের পাতা পোড়া, পাতা ঝলসানো ও খোল পচা রোগ কম বেশি প্রতিরোধ করতে পারে।

৫. দুলাভোগ (বি-আর ৫) : ইহা রোপা আমন মৌসুমে চাষ করা হয়। পূর্ণ বয়স্ক দুলাভোগ ধান গাছ উচ্চতায় ১০৭–১২৭ সে. মি. হতে পারে। গাছ শক্ত ও পাতা খাড়া। প্রতি গুছিতে ৯/১০টি ফলনশীল কুশী জন্মে। দুলাভোগের ছড়া লম্বায় ১৫–২০ সে. মি. এবং প্রতি ছড়ায় গড়ে ১৫০–১৬০টি ধান থাকতে পারে। ধান ও চাউল ছোট আকৃতির, পোলাও রান্নার জন্য বিশেষ উপযোগী।

এই জাতের ধান ছড়াতে ব্লাস্ট (blast) রোগের আক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। ইহা ছাড়া দুলাভোগ ধান টুংরো ভাইরাস ও ধানের পাতাপচা রোগজীবাণুও প্রতিরোধ করতে সক্ষম। পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দুলাভোগ অন্যান্য জাতের ধানের সমতুল্য।

৬. ব্রিবালাম (বি-আর ৭) : এই জাতের ধান গাছের উচ্চতা ও পাতার নমনীয়তা অনুসারে এই ধান আধুনিক জাতের অন্যান্য ধান হতে বেশ কিছুটা আলাদা। উচ্চতায় গাছ ৪২–৫২ ইঞ্চি অর্থাৎ ১০৭–১৩২ সে. মি. হতে পারে ; পাতা সরু, খাড়া ও সবুজ ; প্রতি গুছিতে কুশীর সংখ্যা ১২–১৫টি। চাউল লম্বা, সরু ও সাদা ; ভাত খেতে বেশ মোলায়েম

আউশ ও বোরো এই দুই মৌসুমেই ব্রিবালাম জাতের ধান চাষ করা যেতে পারে ; আউশ মৌসুমে জীবনকাল ১১৫–১৩০ দিন এবং বোরো মৌসুমে ১৩৫–১৫৫ দিন। উপযুক্ত আবহাওয়া ও পরিবেশে ইহার ফলন বোরো মৌসুমে হেক্টর প্রতি ৪৬ কুইন্টাল (৫০ মণ/একর) এবং আউশ মৌসুমে ৩৭ কুইন্টাল (৫০ মণ/একর)। ব্রিবালাম টুংরো ভাইরাস, ব্লাস্ট, বাকানি রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

৭. আশা (বি-আর ৮) : আশা আউশ ও বোরো মৌসুমে চাষের জন্য সরকারের অনুমোদন লাভ করে। এই জাতের ধানের চারা ও গাছ আধুনিক অন্যান্য জাতের ধান হতে অপেক্ষাকৃত লম্বা, যার ফলে আউশ ও বোরো মৌসুমে ১০–১৫ সে. মি. (৪–৬ ইঞ্চি

পানিতেও এই ধানের চারা রোপণ করা যায়। বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী এই জাতের পূর্ণবয়স্ক ধানগাছ উচ্চতায় ৪৫–৫১ ইঞ্চি অর্থাৎ ১১৪–১৩০ সে. মি. পর্যন্ত হতে পারে। ধানের পাতা খাড়া, কাণ্ড শক্ত ও ঘন সবুজ। ধান পাকার সময়ও ইরি ৮ জাতের ধানের মতো গাছ সবুজ থাকে। চাউল মাঝারি মোটা ও পেট সাদা।

এই জাতের ধানের জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৫০–১৫৫ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১২৪ দিন পর্যন্ত হতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশ ও আবহাওয়ায় আশা বোরো মৌসুমে একর প্রতি ৬০ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৫৫ কুইন্টাল এবং আউশ মৌসুমে একর প্রতি ৫০ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৪৬ কুইন্টাল ফলন দেয়।

আশা টুংরো ভাইরাস ও ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। তাহা ছাড়া এই ধান পাতা ঝলসানো রোগজীবাণুকেও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে।

৮. সুফলা (বি–আর ৯) : আশার মতো সুফলাও ১৯৭৮ সালে বোরো আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

এই জাতের ধান গাছ উচ্চতায় ৪২–৪৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ১০৭–১২২ সে. মি. হয়। গাছের কাণ্ড শক্ত, পাতা লম্বা, খাড়া ও সবুজ। ধান পেকে গেলেও কাণ্ড ও পাতা সবুজ থাকে ; চাল লম্বা এবং সাদা ধরনের।

এই ধানের জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৪০ দিন ও আউশ মৌসুমে ১১৫ দিন হতে পারে। ফলন বোরো মৌসুমে একর প্রতি ৫০ মণ (৪৬ কুইন্টাল/হেক্টর) এবং আউশ মৌসুমে ৪০ মণ (৩৭ কুইন্টাল/হেক্টর)।

সুফলা টুংরো ভাইরাস, পাতা ঝলসানো রোগ ও খোলপচা রোগজীবাণু প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

৯. প্রগতি (বি–আর ১০) : ইহা বাংলাদেশে শাইল মৌসুমের উপযোগী আর একটি উফশী ধান। ১৯৮০ সালে এই জাতের ধান সারাদেশে রোপা মৌসুমে চাষের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

প্রগতির পাতা ঘন সবুজ ও খাড়া ; মাত্র ৩০ দিনেই ইহার চারা প্রায় ১৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ৪০ সে. মি. লম্বা হয় যার ফলে যেসব রোপা জমিতে ৮–১০ ইঞ্চি (২০–২৫ সে. মি.) পানি জমে থাকে তেমন জমিতেও ইহার চারা অনায়াসে লাগান যায়। ইচ্ছা করলে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝিও রোপণ করা যায় অর্থাৎ নাবী রোপা আমন ফসল হিসেবেও প্রগতির চাষ করা যেতে পারে যা অন্যান্য উফশী ধানের বেলায় সম্ভব নয়। তবে শ্রাবণের প্রথম দিকে রোপণ করলে ভালো ফলন আশা করা যায় ; প্রতি একরে ৬০–৭০ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ৫৫–৬৫ কুইন্টাল ধান উৎপন্ন হতে পারে। এই জাতের ধান টুংরো, পাতা ফোস্কা, পাতা ঝলসানো ও পাতায় খোলপচা রোগ মোটামুটি ভালোভাবে প্রতিরোধ করতে পারে।

১০. মুক্তা (বি–আর ১১) : এই জাতের ধানটি উপরোক্ত জাত আশার সাথে একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৮০ সালে সারা বাংলাদেশে শাইল অর্থাৎ রোপা আমন ধান হিসেবে চাষের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। প্রকৃতিগত দিক হতে ইহা আশার কতকটা অনুরূপ যেমন মাত্র ৩০ দিনেই চারা বেশ বড় (১৪ ইঃ) হয়। যে–জন্য রোপা জমিতে ৯–১০ ইঞ্চি অর্থাৎ ২০–২৫ সে. মি. জমা পানিতেও রোপণ করা সম্ভব হয়। আর নাবী ফসল অর্থাৎ ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোপণ করে মোটামুটি ভালো ফসল (একর প্রতি ৪৫–৪৭ মণ)

পাওয়া যায়। বাংলাদেশের আর কোনো উফশী ধান এত দেরিতে রোপণ করে এত বেশি ফলন পাওয়া যায় না। তবে শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে চাষ করলে ভালো ফসল পাওয়া যায়; একরে ৬০-৭০ মণ অর্থাৎ হেক্টরে ৫৫-৬৫ কুইন্টাল পাওয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক পরীক্ষায় এই জাতের ফলন প্রতি একরে ১৬১ মণ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে।

মুক্তার জীবনকাল ১৪০-১৪২ দিন, এই হিসেবে ইহা প্রগতি হতে কিছুটা আগুল। ইহার চাউল মাঝারী মোটা ধরনের এবং সাদা। এক মণ ধান হইতে ২৯ সের চাউল পাওয়া যায়।

এই জাতের ধান টুংরো, পাতা ফোসকা, পাতার খোলপচা রোগ ভালোভাবে প্রতিরোধ সক্ষম।

১১. ময়না (বি-আর ১২) : এ জাতটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৩ সালে উদ্ভাবন করে। আউশ ও বোরো- এ দু মৌসুমেই এ জাতটির চাষ করা যায়। মৌসুমভেদে গাছ উচ্চতায় ৮০-১০৫ সে. মি. পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ড ও পাতা খাড়া এবং ঘন সবুজ। গাছের নিচের অংশ বেগুনি।

এ জাতের জীবনকাল আউশ মৌসুমে ১২৫-১৩০ দিন ও বোরো মৌসুমে ১৬০-১৬৫ দিন। বোরো মৌসুমে হেক্টর প্রতি ৪.৫-৫.০ টন এবং আউশ মৌসুমে ৪.০-৪.৫ টন ফলন হতে পারে।

১২. গাজি (বি-আর ১৪) : ময়নার মতো এ জাতটিও আউশ ও বোরো মৌসুমে চাষ করা যায়। তবে আগাম আউশ বা বোরো হিসেবে বিশেষ উপযোগী। মৌসুমভেদে গাছের উচ্চতা ৯৫-১২০ সে. মি. পর্যন্ত হতে পারে। গাছের কাণ্ড ও পাতা সবুজ ও খাড়া। এ ধানের জীবনকাল আউশ মৌসুমে ১১৫-১২৫ দিন ও বোরো মৌসুমে ১৫৫-১৬০ দিন। এ ধান পাতাপোড়া, কাণ্ডপচা ও ব্লাস্ট রোগ মোটামুটি ভালোভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। থ্রিপস, পাতামাছি ও পামরী পোকার আক্রমণ কম দেখা যায়। উপযুক্ত পরিবেশে বোরো মৌসুমে ৫.০-৫.৫ টন ও আউশ মৌসুমে ৪.০-৫.০ টন ফলন দিতে পারে।

১৩. হাসি (বি-আর ১৭) : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হাওর এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য এ জাতটি উদ্ভাবন করেছে। পূর্ণবয়স্ক গাছ ১১০-১৩০ সে. মি. লম্বা হতে পারে। এর জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন। এ ধান খোলপচা, ব্লাস্ট এবং কাণ্ডপচা রোগ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে। এ জাতটির ফলন হেক্টর প্রতি ৫.০-৬.৫ টন পর্যন্ত হতে পারে।

১৪. শাহজালাল (বি-আর ১৮) : হাসির মতো এ জাতের ধানটিও হাওড় এলাকায় চাষ করার জন্য উপযোগী পূর্ণবয়স্ক গাছ ১০০-১২০ সে. মি. লম্বা হয়। গুণগতে বিচারে এ ধান বি আর ৮ জাতের মতো। এ ধানের জীবনকাল প্রায় ১৫০ দিন। এ জাতের ধান খোলপচা, এবং কাণ্ডপচা রোগ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে। বাদামি গাছফড়িং ও সবুজ পাতাফড়িং এর আক্রমণ কিছুটা সহ্য করতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশে এ জাত হতে ৫.০-৬.০ টন ফলন পাওয়া যেতে পারে।

১৫. নিজামি (বি-আর ২০) : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বোনা আউশ হিসেবে যে দুটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে তার মধ্যে একটি হলো নিজামি। পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ সে. মি. গাছের ফসল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবুজ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ১১০-১১৫ দিনের মধ্যে ধান পাকে। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৩.০-৩.৫ টন ফলন হতে পারে। দেশী জাতের তুলনায় এ জাতের ধানে রোগ-পোকার আক্রমণ হয়

১৬. কিরণ (বি-আর ২২) : এটি একটি আলোক সংবেদনশীল জাত। এ জাতটি আষাঢ় মাস থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রোপণ করলেও দেশী জাতের তুলনায় ভালো ফলন পাওয়া যায়। গাছের উচ্চতা ১১০-১২৫ সে. মি. পর্যন্ত হতে পারে। জাতটির জীবনকাল ১৫৫-১৬০ দিন পর্যন্ত হতে পারে। দেশী জাতের তুলনায় এ ধানে পোকামাকড় ও রোগবালাইর আক্রমণ কম হয়। শ্রাবণের শেষে রোপণ করলে ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৫-৫.০ টন আর দেরিতে অর্থাৎ আশ্বিনের মাঝামাঝি রোপণ করলে ফলন হেক্টর প্রতি ৩.০-৪.৫ টন পর্যন্ত হতে পারে।

১৭. রহমত (বি-আর ২৪) : বোনা আউশ মৌসুমের জন্য এটি একটি উপযোগী জাত। দেশের সর্বত্র এর চাষ করা যেতে পারে। পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সে. মি পর্যন্ত হতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় রহমত ১০০-১০৭ দিনে পাকে। চাল মাঝারি সরু ও দেখতে সাদা। দেশী বোনা আউশের তুলনায় রহমতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ অনেকাংশে কম। এ ধান সবুজ পাতাফড়িং ও পামরী পোকার আক্রমণ সহ্য করতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশে রহমত হেক্টরপ্রতি ২.৫-৩.৩ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে।

১৮. নয়াপাজাম (বি-আর ২৫) : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানীগণ ১৯৯২ সালে নয়াপাজাম নামে একটি আলো ও সংবেদনবিহীন আমন ধানের জাত উদ্ভাবন করেন। বহুল পরিচিত পাজাম ধানের তুলনায় নয়াপাজাম বেশি ফলন দেয়। ধানের রঙ এবং আকার পাজামের মতোই, তবে একটু মোটা ; চাল মাঝারি সরু, সাদা চকচকে।

এ জাতের ধানের জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন। টুংরো রোগ খোলপোড়া, পাতাপোড়া, কাণ্ডপঁচা ও ব্লাস্ট রোগ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে ; সাদাপিঠ গাছফড়িং এবং পামরী পোকার আক্রমণ সহ্য করতে পারে। উপযুক্ত যত্ন পেলে এ জাতের ধানের ফলন প্রতি হেক্টরে ৫.০ টন পর্যন্ত হতে পারে।

১৯. শ্রাবণী (বি-আর ২৬) : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কেবলমাত্র রোপা আউশ হিসেবে চাষাবাদের জন্য এ জাতটি উদ্ভাবন করেছে। শ্রাবণীর পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সে. মি. পর্যন্ত হতে পারে। এ জাতের বিশেষত্ব হচ্ছে এর চাল লম্বা, সরু, ও দেখতে সুন্দর। স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রাবণী ১০৫-১১০ দিনে পাকে ; উপযোগী পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৪.০-৪.৫ টন ফলন দেয়। রোপা অন্যান্য উফশী ধানের চেয়ে শ্রাবণীর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো।

২০. ব্রিধান ২৭ : বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে এ ধান বোনা ও রোপা আউশ এ দুভাবেই চাষ করা যায়। এ ধানের গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবুজ, তবে পাতার খোল কিছুটা বেগুনি রঙের। এ জাতের পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১৩৫-১৪০ সে. মি. পর্যন্ত এবং জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন পর্যন্ত হতে পারে।

দেশী জাতের তুলনায় এ জাতের গাছে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ কম হয়। সঠিক পরিবেশে প্রতি হেক্টরে বোনা আউশে ৩.০-৩.৫ টন এবং রোপা আউশে ৩.৫-৪.০ টন ফলন হতে পারে।

২১. ব্রিধান ২৮ : শুধুমাত্র বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য এ জাতটির উদ্ভাবন করা হয়েছে। আধুনিক ধানের ফসল বৈশিষ্ট্য এ জাতটির মধ্যে রয়েছে কাণ্ড খাটো, পাতা খাড়া ও

সবুজ গাছের বোরো মৌসুমে চান্দিনা ধানের চেয়ে ব্রিধান ২৮ এর বিভিন্ন রোগ ও পোকার আক্রমণও কম নয় এবং উচ্চতা ৮৫–৯০ সে. মি. হতে পারে। ধান পাকতে ১৩৫–১৪০ দিন সময় লাগে। সঠিক যত্ন পেলে ব্রিধান ২৮ এর ফসল হেক্টর প্রতি ৪.৫–৫.০০ টন পর্যন্ত হতে পারে।

২২. ব্রিধান ৩০ : অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ জাতের ধানটি সমগ্র বাংলাদেশে রোপা আমন ধান হিসেবে চাষের জন্য উদ্ভাবন করেছে। এ জাতটিতে উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৫–১২০ সে. মি. ; চাল লম্বাটে, মাঝারি সরু ও সাদা।

এ জাতের জীবনকাল ১৪০–১৪৫ দিন। রোপা আমন মৌসুমের অন্যান্য উফশী ধানের চেয়ে ব্রিধানের অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অধিক। অনুকূল পরিবেশে এ জাতটি আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৪.০–৪.৫ টন ফলন দিতে পারে।

২৩. বিনাশাইল : এ জাতটি বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করে। সারাদেশে রোপা আমন ধান হিসেবে আবাদের জন্য ১৯৮৭ সালে অনুমোদিত হয়। বিনাশাইলের চারা পরিণত বয়সের গাছ নাইজার শাইলের চেয়ে লম্বা হয়। চাল সাদা সরু, ও অধিক আমিষযুক্ত। ফল আগাম পাকে বলে স্বাভাবিক সময়ে রোপণকৃত ধান কাটার পর একই জমিতে গম বা অন্য কোনো রবি শস্যের চাষ করা যায়।

এ জাতের ফসল রোগবালাই ও পোকামাকড় আক্রমণ মোটামুটি ভালো প্রতিরোধ করতে পারে। জীবনকাল স্বাভাবিক সময়ে ১৩৫–১৪৫ দিন এবং নাবী রোপা চাষে ১২০–১৩০ দিন ; প্রথমোক্ত অবস্থায় ফলন হেক্টর প্রতি ৪.২–৫.০ টন এবং শেষোক্ত অবস্থায় ৩.২–৪.০ টন।

২৪. পূর্বাচী : এ জাতের ধানটি বাংলাদেশে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ১৯৮৮ সালে অনুমোদিত হয়। পূর্বাচী আসলে গণচীনের ধান, সে দেশে সেটির নাম ছিল চেনচুআই ; বাংলাদেশে এর নাম দেওয়া হয় পূর্বাচী। গাছ গড়ে ৮৬ সে. মি. উঁচু হয়। পাতা কিছুটা ছড়ানো এবং অপেক্ষাকৃত সবুজ ; চাল মোটা ও সাদা।

বোরো মৌসুমে এর জীবনকাল হলো ১৪০–১৫০ দিন ; হেক্টরপ্রতি ফলন ৪.৫–৫.৫ টন। এ জাতের ধানের রোগবালাই ও কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা বেশ কম।

বাংলাদেশে উফশী বা আধুনিক ধানের বিভিন্ন জাতের কথা আলোচনা করতে গিয়ে পাজাম নামে একটি ধানের কথা আলোচনা না করে পারা যায় না। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করলেও আপন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দরুন পাজাম বাংলাদেশের চাষী সমাজের এক বিরাট অংশের নিকট যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি জেলার চাষীরা রোপা আমন মৌসুমে প্রধানত এ জাতটির আবাদ করেন। এ জাতটির জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হলো অন্যান্য উফশী ও আধুনিক ধানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম সার, পানি ও যত্নে ভালো ফলন দেয়। তদুপরি গাছ লম্বা ধরনের। তা হতে ভালো খড় উৎপাদিত হয় যা চাষীদের নিকট একটি অতীব পছন্দনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কারণ অধিকাংশ উফশী বা আধুনিক ধানের জাত খর্বাকৃতির বলে সেগুলো হতে ভালো খড় পাওয়া যায় না।

পাজাম জাতের এ ধানটি মালয়েশিয়ায় উদ্ভাবিত হয়। স্বাগতিক দেশে পাজাম–১ 'মালিঞ্চা' এবং পাজাম–২ 'মাহসুরী' নামে পরিচিত। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে জাপানি বিজ্ঞানী কর্তৃক কুমিল্লাস্থ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মাধ্যমে পাজাম ধান বাংলাদেশে আনয়ন করা হয়। প্রথমত কুমিল্লার চাষীগণ এ ধানের আবাদ শুরু করে এবং উৎসাহজনক ফল লাভ করে। আস্তে আস্তে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার চাষীগণ পাজাম ধান চাষে উৎসাহী হয়ে উঠে। এভাবে পাজাম প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আউশ ধানের চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : মাঘ–ফাল্গুন মাসে এক পশলা বৃষ্টি হবার পর পরই বুনা আউশ ধানের জমিতে প্রথমবারের মতো চাষ দিতে হয়। তৎপর কয়েকদিন পর পর ৪/৫ চাষ ও ২/৩টি মই দিয়ে জমি প্রস্তুতির কাজ সমাধা করতে হয়। রোপা আউশের জমি চৈত্র–বৈশাখ মাসে বৃষ্টি অথবা সেচের পানির সহায়তায় কর্দমাক্ত করে প্রস্তুত করতে হয়।

সার প্রয়োগ : দেশী আউশ ধানে সার ব্যবহারের কথা চাষীরা খুব একটা ভাবেন না। সে সময় তারা যে পাট ফসলের আবাদ করেন তাতেই সার দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন। কিন্তু ভালো ফলন পেতে হলে আউশ ধানেও সার ব্যবহার করতে হবে। শুধু তাই নয় নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সারের সাথে সাথে দস্তা ও গন্ধকজাতীয় সারও ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উফশী ধানে সার ব্যবহারের মাত্রা ও পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে।[৫]

সারণি ৬ : আউশ ধানের মৌসুম ও জাতভেদে সার ব্যবহারের পরিমাণ*

ধানের জাত	বিভিন্ন সারের পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)				
	ইউরিয়া	টি এস পি	পটাশ সার	গন্ধক সার	দস্তা সার
বোনা আউশ					
নিজামি, নিয়ামত, রহমত	১২৬	৭৫	৪০	৬০	১০
রোপা আউশ					
ক. চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজি, ব্রিবালাম, শ্রাবণী, ব্রিধান ২৭	১৩৫	৯০	৪০	৬০	১০
খ. বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহিবালাম	১৫০	৯০	৪০	৬০	১০

উৎস : আধুনিক ধানের চাষ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫।

* বেলে ও পাহাড়ের পদভূমির মাটিতে (পিডমন্ট) পটাশ সারের মাত্রা কমপক্ষে দেড়গুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। দস্তা সারের ব্যবহার শুধুমাত্র গঙ্গাবাহিত পললভূমি ও সেচ প্রকল্প এলাকায় সীমিত রাখাই সমীচীন হবে। হাওর এলাকার জমি উর্বর বিধায় সারের পরিমাণ কিছু কম করে ব্যবহার করা যেতে পারে। দেশী/স্থানীয় জাতের বেলায় উপরোক্ত সার অর্ধেক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি ৭ : আউশ ধানের মৌসুম ও জাতভেদে ইউরিয়া সারের উপরি-প্রয়োগের সময় ও সারের পরিমাণ।

ধানের জাত	রোপণের যতদিন পর (কেজি/হেক্টর)						
	০	১৫	২০	৩০	৪৫	৫০	৫৫
রোপা আউশ							
ক. চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজি, ব্রিবালাম, শ্রাবণী, ব্রিধান ২৭	০	৪৫	---	৪৫	৪৫	---	---
খ. বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহিবালাম	০	৫০	---	৫০	৫০	---	---
বোনা আউশ (বৃষ্টিনির্ভর)							
ক. নিজামি	৪২	---	৪২	---	---	৪২	---
গ. নিয়ামত	৪২	---	৪২	---	৪২	---	---
গ. রহমত	৪২	---	৪২	---	৪২	---	---

উৎস : আধুনিক ধানের চাষ— বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৩

চারা রোপণ : আজকাল এদেশে আধুনিক জাতের আউশ রোপা আমন ধানের মতো করে রোপণ করা হয়। ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা মধ্য ফাল্গুন হতে চৈত্র মাসের মধ্যে উত্তমরূপে কাদা করে জমিতে রোপণ করা হয়। এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব ১০ ইঞ্চি অর্থাৎ ২৫ সে. মি. এবং সারিতে একটি চারা হতে অপর চারার দূরত্ব ৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ২০ সে. মি. রাখা হয়। প্রতি গুছিতে চারার সংখ্যা হবে ১-৩টি।

আগাছা দমন : বোনা আউশ ক্ষেতে আগাছা দমন করার উপরই প্রধানত নির্ভর করে ফসলটির সফলতা। বৃষ্টির মৌসুম বলে আউশ জমিতে নানারকম আগাছা, যেমন —মুথা, দূর্বা শ্যামা, গচিয়া প্রভৃতি জন্মায়। ক্ষেতে চারা গজাবার ১০/১৫ দিন পর 'জো' বুঝে আড়াআড়ি দুইবার আচড়া ও একবার মই দিলে আগাছা অনেক উঠে যায়। আচড়া দেওয়ার ও তার পরের দিন যদি কড়া রোদ থাকে তা হলে আগাছা নিধনের কাজ সার্থক হয়। অন্যথায় অর্থাৎ বৃষ্টি পড়লে অনেক আগাছা আবার তাজা হয়ে উঠে। আচড়া দেওয়ার আর একটি সুফল এই যে তাতে চারার গোড়ার মাটি আলগা হয় এবং তাতে চারার মূল ও শিকড় গঠনের সহায়তা হয়। সময়ান্তরে নিড়ির সাহায্যে বাদবাকি আগাছা পরিষ্কার করতে পারলেই ফসল সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে দ্বিতীয়বার আগাছা পরিষ্কার করতে পারলে খুব ভালো হয়।

আধুনিক আউশের রোপা ক্ষেত্রেও আগাছা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। সারিতে রোপণ করা থাকলে দুই সারির মাঝখানে হস্তচালিত উইডার চালায়ে আগাছা পরিষ্কার করা যায়। ইহার অভাবে ছোট হাত কোদালী বা নিড়ীর সাহায্যে সেই কাজ করা যেতে পারে। এই সঙ্গে সারির মাঝখানের ও চারার গোড়ার মাটি আল্গা করে দিলে চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

সেচ প্রয়োগ : দেশী অনুমোদিত জাতের আউশ ধান রোপণ বা বপন যেটাই করা হউক না কেন তাতে সেচের প্রয়োজন নেই। মৌসুমের বৃষ্টির যে পানি ক্ষেতে জমা হয় তাতেই চলে। তবে আধুনিক জাতের ধান বিশেষ করে রোপণ করা হলে তাতে সেচের পানি ব্যবহার

করতে হবে। বর্ষার মৌসুমেও কোনো কোনো সময় খরা পড়ে যায় যার ফলে ক্ষেতের পানি যথেষ্ট কমে যায়। সেই পরিস্থিতিতে আধুনিক আউশে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেচ দিতে হবে।

রোগ-বালাই ও কীটপতঙ্গ দমন : আউশ ধান ব্লাস্ট (Blast), গোড়াপচা (stem rot), হেলমোনথস্পরিয়াম (Helmonsporium) প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ সমস্ত রোগে ফসল আক্রান্ত হওয়ার পর নিরাময় করা প্রায় একেবারে অসম্ভব। গ্রানোসান-এম (Granoson--M) এবং এগ্রোসান-জি (Agrosan--G) দ্বারা শোধিত বীজ বপন বা চারা জন্মানোর জন্য ব্যবহার করা উচিত। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের ধান জন্মানোও একটি ভালো উপায়। কটকতারা, হাসিকলমি, মরিচবটি, পানবিরা ও ইরি-৮ জাতের ধান ব্লাস্ট রোগ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে সক্ষম। ইরি-৮ এ পাতার লালচে রেখা, খোলপোড়া ও বাকানী ও গোড়পচা রোগও কম হয়। চান্দিনা ও মালা জাতের ধান টুংরো ও পাতা পোড়া রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। পূর্বাচী জাতে খোলপোড়া ও বাকানী রোগ সাধারণত হয় না।

সময়মতো আগাছা পরিষ্কার, পানি নিঃষ্কাশন, পরিমিত সার ব্যবহার, ফসলের উচ্ছিষ্ট অংশ পোড়ন প্রভৃতি উপায়ে উপরোক্ত রোগ প্রতিরোধও কিছুটা নিরাময় করা সম্ভব হয়।

আউশের দেশী অনুমোদিত আধুনিক এই উভয় জাতের ধানেই নানারকম পোকার আক্রমণ হয়। প্রথমদিকে পামরী ও গল মাছি এবং পরবর্তী সময়ে মাজরা ও পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হয়। পামরী পোকার আক্রমণে গাছের কচিপাতা সাদা হয়ে যায়, মাজরা পোকার আক্রমণে গাছে সাদা শীষ বের হয় এবং গল মাছির আক্রমণে পাতা লম্বা ও পিয়াজের পাতার মতো গোলাকার হয়ে যায় এবং গাছ হতে কোনো শীষ বের হয় না। কোন পোকা কোন কোন ঔষধ দ্বারা দমন করা যায় তা পরবর্তী পৃষ্ঠার তালিকায় দেওয়া হলো।

ধান কাটা : আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আউশ ধান পাকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে জাতের উপর নির্ভর করে ধান পাকার সময়ের মধ্যে তারতম্য ঘটে, যেমন— হাসিকলমি ধান পাকে ৯০–৯৫ দিনে, কটকতারা ১০০–১০৫ দিনে, ধারিয়াল ১১৫–১২০ দিনে, মালা ১১০–১১৫ দিনে এবং চান্দিনা ১০৫–১১০ দিনে।

কাস্তের সাহায্যে ধান গাছ ছোট ছোট আঁটি বাঁধা হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই কেবল ধানের আগ ভাগই কাটা সম্ভব হয়, বৃষ্টি বা প্লাবনের পানির দরুন গোড়ার দিকের খড়সহ আউশ ধান কাটা সম্ভব হয় না। মাথায় অথবা নৌকায় বা গরুর গাড়ির সাহায্যে ধানের আঁটি মাঠ হতে বাড়ির আঙ্গিনায় এনে পালা দিয়ে রাখতে হয়।

মাড়াই-ঝাড়াই ও ধান শুকানো : বৃষ্টির দরুন কোনো অসুবিধা না হলে আউশ ধানের পালা ভেঙ্গে যথাশীঘ্র গরুর সাহায্যে ধান মাড়াই করা উচিত। অন্যথা দেরি করলে ধান পঁচে যেতে পারে, কারণ বর্ষার গুমোট বাঁধা গরম আবহাওয়ায় ধানের পালা বেশ গরম হয়ে উঠে। খড় হতে ধান আলাদা করার পর কুলা চালনীর দ্বারা প্রয়োজনবোধে বাতাসের সাহায্য নিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। তৎপর আঙ্গিনা বা উঠানে রোদ্র বাতাসে ছড়ায়ে দিয়ে ধান শুকান হয়। বার কয়েক রোদ্রে ওলট-পালট করে ছড়ালেই ধান শুকিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, প্রায় সময়ই বৃষ্টির দরুন আউশ ধান খড়কুটা হতে আলাদা করে ও তৎপর শুকাতে যেয়ে ভয়ানক অসুবিধা পোহাতে হয়। এমন পরিস্থিতিও হয় যে, না শুকাতে পারার দরুন ধান পঁচে যায়। সমূহ ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য চাষী পরিবার কোনো কোনো সময় উত্তপ্ত কড়ায়ে ধান শুকাতে প্রয়াস পান। অল্পস্বল্প পরিমাণ ধানের বেলাতেই এরূপ করা যায়, ব্যাপকহারে তা সম্ভব নয়। বিদেশে যেমন জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি

দেশে যান্ত্রিক উপায়ে ধান শুকান হয়। আমাদের দেশেও এই বিষয়ে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

সারিণ ৭ : আউশ ধানের পোকায় ঔষধ ব্যবহার

পোকার নাম	ঔষধের নাম	পরিমাণ	কয়বারে ব্যবহারযোগ্য
১. পামরী ও পাতা মোড়ানো পোকা	১. ম্যালাথায়ন-৫৭ ই.সি, অথবা	১২ আউন্স (৩৪৮ গ্রাম)	একবারে
	২. নিথিল প্যারাথায়ন-৫০ ই.সি, অথবা	১ পাউণ্ড (৪৫৫ গ্রাম)	একবারে
	৩. ফেনথিয়ন লিবাইসিড-৫০ ই.সি,	১ পাউণ্ড (৪৫৫ গ্রাম)	একবারে
মাজরা পোকা	**দানাদার** ১. ডায়াজিনন (বাসুডিন ১০ জি)		১ম বার-১২.৫০ পাঃ (৫.৬৮ কেজি) ২য় বার- ১৫.০০ পাঃ (৬.৮২ কেজি) ৩য় বার-১৭.৫০ পাঃ (৭.৯৫ কেজি)
	অথবা ২. সোডিউল (সেভিন-গামা বি. এইচ. সি)		১ম বার –২০ পাঃ (৯ কেজি) ২য় বার-২৫ পাঃ (১১.৩৬ কেজি) ৩য় বার-৩০ পাঃ (১৩.৬৪ কেজি)
	তরল ১. ডায়াজিনন-৫০ ই.সি,		১ম বার-১.২৫ পাঃ (৫৬৮ গ্রাম) ২য় বার-১.৫০ পাঃ (৬৮৩ গ্রাম) ৩য় বার –১.৭৫ পাঃ (৭৯৬ গ্রাম)
	অথবা ২. ফেনিথায়ন (লিবাইসিড-৫০ ই.সি		১ম বার –১.২৫ পাঃ (৫৬৮গ্রাম) ২য় বার ১.৫০ পাঃ (৬৮৩ গ্রাম) ৩য় বার-১.৭৫ পাঃ (৭৯৬ গ্রাম)

* পানি ব্যবহারের পরিমাণ : ১০০ গ্যালন/ $১২\frac{১}{২}$ মণ, ২৫/ কেঃ টিন/ ৪৫৪.৬ লিটার

ফলন : ছাটিশ ধানের গড় ফলন অত্যন্ত কম, প্রতি হেক্টরে ০.৯৫ টন এবং আধুনিক জাতের ১.৮০ টন। তবে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে প্রতি হেক্টরে ফলন ৪.০ টন পর্যন্ত হতে পারে।

রোপা আমন ধানের চাষাবাদ প্রণালি

বীজতলা প্রস্তুত ও চারা উৎপাদন : রোপা আমন ধানের চাষ করতে গেলে প্রথমেই চারার জন্য চিন্তা করতে হয়। ক্ষেতে চারা রোপণ করার বেশ আগেই বীজতলায় চারা উৎপাদন করতে হবে।

বীজতলা কাদা ও শুকনা এই দুই অবস্থায়ই তৈরি করা যায়। যে জমিতে আগাম অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই চারা লাগাতে হয় এমন জমির জন্য চারা শুকনা বীজতলায় উঠাতে হয়। শুকনা বীজতলায় চারা ৫–৬ সপ্তাহ বয়সের হলে রোপণ করা হয়। এই চারা লম্বা ও শক্ত ধরনের হয় বলে বেশি পানিতে লাগাবার উপযোগী। কাদা বীজতলার চারা অল্প বয়সেই (৩-৪ সপ্তাহ) ক্ষেতে রোপণ করা হয়। রোপা আমন ধানের ভরা মৌসুমে যে জমিতে অল্প পানি জমে সেই পরিবেশেই এই চারা রোপণ করা হয়। চারা উচ্চতায় খাটো ও নরম ধরনের হয়।

কাদা বীজতলা প্রস্তুতি : যেখানে বর্ষার পানি জমে না বা প্লাবনের পানি উঠে না এমন স্থানেই বীজতলার জন্য জমি নির্বাচন করতে হবে। বীজতলা কত বড় হবে তা প্রধানত নির্ভর করে কি পরিমাণ চারা উৎপাদন করতে হবে তার উপর। তিন বিঘা অর্থাৎ এক একর জমি লাগাতে গেলে ৩ কাঠা পরিমাণ জমিতে চারা উঠালেই চলে। এক বিঘা জমির জন্য তা হলে প্রয়োজন হবে এক কাঠা বীজতলা।

এখন এক কাঠা জমিতে কিভাবে বীজতলা তৈরি করা যায় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

প্রথমে জমিতে ৫–৬ মণ (২–২.২৫ কুইন্টাল) পঁচা গোবর প্রয়োগ করার পর জমিতে উল্টি-পাল্টি করে দুই তিনটি চাষ দিতে হবে। তৎপর জমিকে ৪ ফুট অর্থাৎ ১.২৫ মিটার প্রস্থ ও ৩৩ ফুট অর্থাৎ ১০.২৫ মিটার লম্বা ৪টি টুকরায় বিভক্ত করতে হবে। এক টুকরা জমি হতে অপর টুকরার মাঝখানে ১$\frac{1}{2}$ ফুট অর্থাৎ ৪৬ সেঃ মি. ফাঁক থাকবে। সেই ফাঁক জমি হতে ৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৫ সেঃ মিঃ গভীর করে (চিত্র ২.২) মাটি উভয়দিকে জমিতে ফেলিলে টুকরা জমি উঁচু হবে এবং নালা ১৫ সেঃ মিঃ নিচু হবে। সেই নিচ জমি অর্থাৎ নালার মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত পানি সেচ ও নিষ্কাশন সহজতর হবে। এর পর ২৩৩ গ্রাম ইউরিয়া, ২৩৩ গ্রাম টি. এস. পি. ও ১১৭ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ টুকরা টুকরা জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে জমি কাদা করে নিতে হবে।

প্রতি কাঠা জমির বীজতলায় তিন সের অর্থাৎ ২ কেজি এবং ৮২০ গ্রাম বীজ ফেললেই চলবে। বীজতলায় ফেলার আগে ভারী বীজ হতে হাল্কা বা চিটা বীজ বের করে নেওয়া উচিত।

১০ কেজি পানিতে প্রায় ১.৫ কেজি ইউরিয়া সার গুলে নিয়ে তাতে বীজ ছেড়ে দিলে ভারী, পুষ্ট ও সুস্থ বীজগুলি নিচে পড়ে যায় আর অপরিপুষ্ট হাল্কা বীজগুলি ভেসে থাকে। হাত বা ছাঁকনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলি আলাদা করে ফেলে দিতে হয়। ভারী বীজগুলি নিচ হতে তুলে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ৩/৪ বার ধৌত করার পর জাগ দেওয়া হয়। দুই এক দিন

পর বীজের মুখ ফেটে উঠলে সেই বীজ বুনে দিতে হয়। বীজ বাছাই করার পর ইউরিয়া গোলা পানি বীজ তলাতেই সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

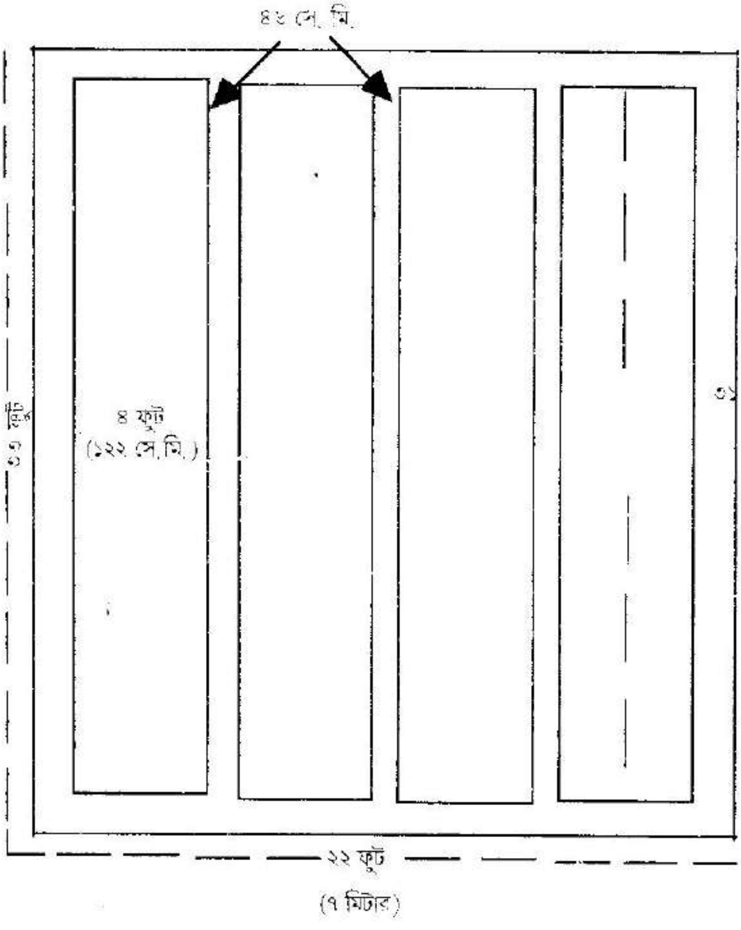

চিত্র ২.২ রোপা আমন ধানের বীজতলা

ভালো চারা উৎপাদন করতে হলে বীজতলার বর্ধিষ্ণু চারা গাছের যত্ন করতে হবে। বীজতলায় আগাছা জন্মিতে পারে, পোকামাকড় বা রোগ–বালাইর আক্রমণ হতে পারে। আগাছা জন্মালে তা পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন। রোগ–বালাই এবং পোকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সেভিন, ডায়াজিনন প্রভৃতি ঔষধ এক কাঠা বীজতলার জন্য ৮ সের (৭.৫ কেজি) পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে ১০/১২ দিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। অনবরত বৃষ্টি হতে থাকলে ঔষধ কিছু ঘন ঘন প্রয়োগ করা উচিত

সাময়িক খরা পড়ে বীজতলা শুকিয়ে যেতে থাকলে পানি সেচ করা প্রয়োজন। আবার অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে পানি জমে গেলে তা শীঘ্র শীঘ্র বের করে দিতে হবে। জমির মাঝের নালাপথে এই পানি সেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হবে।

শুকনা বীজতলা অনুরূপভাবে তৈরি করা যায়। বলা অনাবশ্যক এইক্ষেত্রে জমিতে কাদা না করে শুকনা অবস্থায় প্রস্তুত করতে হয়। তৎপর আড়াই কেজি বীজ বীজতলায় বপন করতে হয়। বীজ বুনার পর নালার ভিতর ভর্তি করে পানি দিলে টুকরা টুকরা জমির মাটি রসে ভরে উঠবে। বীজ অঙ্কুরিত হবার জন্য ইহা বেশ সহায়ক হয়। অন্যান্য যত্ন কাদা বীজতলার মতো করতে হবে।

চারা রোপণের জন্য জমি প্রস্তুতি : উত্তমরূপে কাদা করে জমি প্রস্তুত করতে হবে। চার পাঁচ বার আড়াআড়ি চাষ ও বার দুয়েক মই দিলেই জমি কাদা হয়ে যায়। তবে জমিতে সবুজ সার বা আউশ ধান বা পাটের গোড়া থাকলে সে ক্ষেত্রে আরো দুই একটি অধিক চাষের প্রয়োজন হতে পারে। জমির এই সমস্ত আবর্জনা যাতে পঁচার সময় পায় সে জন্য চাষ প্রথম দিকে ১০/১৫ দিন ও শেষের দিকে ৪/৫দিন অন্তর অন্তর দিতে হবে। আবর্জনা সম্পূর্ণ পঁচে না গেলে রোপা ধানের জমিতে শেষ প্রস্তুতি করতে নাই, কারণ এরূপ জমিতে চারা লাগালে চারার বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

জমি কাদা করার সময় ক্ষেতের চারিদিকের স্থায়ী আইলের কিনারা ও ক্ষেতের চারিদিকের কোণ কোপাইয়া ঠিক করে নিতে হবে। জমির ঢাল অনুসারে আইল দ্বারা ক্ষেতটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে। আইলগুলি এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে পানি আটকানো যায়। তা না হলে ক্ষেতের যে দিকে ঢালু সেদিকে পানি জমা হবে। এতে বৃষ্টি বা সেচের পানির অপব্যবহার হবে এবং জমিতে সার ব্যবহার করা ভয়ানক অসুবিধা হবে। সার মিশ্রিত পানি একদিকে জমা হয়ে যাওয়ার ফলে শস্য উৎপাদন বিঘ্নিত হবে।

সার প্রয়োগ : দেশী অনুমোদিত ধানের চেয়ে আধুনিক অর্থাৎ উফশী ধানে অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হয়। সার ব্যবহারের মাত্রা ও পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে।

সারণি ৮ : রোপা আমন ধানে সার ব্যবহারের পরিমাণ*

ধানের জাত	বিভিন্ন সারের পরিমাণ (কজি/ হেক্টর)				
	ইউরিয়া	টি এসপি	পটাশ সার	গন্ধক সার	দস্তা সার
ক. ব্রিশাইল প্রগতি, মুক্তা, বিপ্লব, নয়া পাজাম, ব্রিধান ৩০, ব্রিধান ৩১, ব্রিধান ৩২	১৫০	৯০	৪০	৬০	১০
খ. কিরণ, দিশারী, বিনাশাইল (নাবী)	৯০	৯০	৪০	৬০	১০

উৎস : আধুনিক ধানের চাষ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫।

* বেলে ও পাহাড়ের পাদভূমির মাটিতে (পিডমণ্ড) পটাশ সারের মাত্রা কমপক্ষে দেড়গুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। দস্তা সারের ব্যবহার শুধুমাত্র গঙ্গাবাহিত পললভূমি ও সেচ প্রকল্প এলাকায় সীমিত রাখাই সমীচীন হবে। হাওর এলাকার জমি উর্বর বলে সারের পরিমাণ কিছু কম করে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্থানীয় জাতের বেলায় উপর্যুক্ত সার অর্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

সারণি ৯ : রোপা আমনের মৌসুম ও জাতভেদে ইউরিয়ার উপরি প্রয়োগের সময় ও পরিমাণ

ধানের জাত	রোপণের যতদিন পর (কেজি/ হেক্টর)						
	০	১৫	২০	৩০	৪৫	৫০	৫৫
রোপা আমন							
ক. ব্রিশাইল, প্রগতি, মুক্তা, বিপ্লব, কিরণ, দিশারী	০	৫০		৫০		৫০	
খ. নয়াপাজাম, ব্রিধান ৩০, ব্রিধান ৩১, বিধান ৩২	০	৫০		৫০	৫০		
নাবী রোপা আমন							
ক. কিরণ, দিশারী *	৪৫	০		৪৫			
খ. নাইজারশাইল (দেশী)	২২			২২			

উৎস : আধুনিক ধানের চাষ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫

* চারার বয়স ৪০–৪৫ হওয়া দরকার

বীজতলা হতে চারা উঠানো : বীজতলা হতে চারা সাবধানে উঠাতে হয় যাতে গোড়া ছিড়ে না যায়। বীজতলার মাটি শুকনা থাকলেই এইরূপ সম্ভাবনা থাকে। কাজেই রসহীন বীজতলা হতে চারা উঠাবার আগে একটা হাল্কা সেচ দেওয়া ভালো। দেশী জাতের বেলায় মুঠি মুঠি চারা এক সঙ্গে ধরে টান দিয়ে উঠিয়ে পায়ের পাতায় আঘাত করলেই চারার গোড়ার মাটি পড়ে যায়। আধুনিক জাতের বেলায় দুই চারটি করে চারা গাছ উঠাতে হয় এবং হাতের পাতায় আঘাত করে মাটি ফেলতে হয়। দেশী জাতের চারা বেশি লম্বা হলে রোপণ করার পূর্বে আগার দিকে ৩/৪ ইঞ্চি অর্থাৎ ৭–১০ সে. মি. কেটে ফেলে দিতে হয়। লিকলিকে চারার বেলায় ইহা করা বিশেষ আবশ্যক। আধুনিক জাতের বেলায় কখনই চারার আগা কাটার প্রয়োজন হয় না।

চারা রোপণ : নিচু জমিতে আষাঢ় মাসের মধ্যে রোপা ধান লাগাতে হয়। তবে শ্রাবণ মাসের প্রথম হতে ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত নিরাপদে রোপা আমন ধানের চারা রোপণ করা যায়। কিন্তু নাবি করতে বাধ্য হলে ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত চারা লাগান যেতে পারে। নাবি চাষে অবশ্য রোপা আমন ধানের ফলন কমে যায়। যেহেতু এই ফসলটি 'আলোকস্পর্শকাতর' তাই কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা পরিবেশে ছোট দিনের আবির্ভাবে গাছের অবয়ব বড়–ছোট যাই হোক গাছে ফুল ধরে যায়। এমতাবস্থায় ফলন কমে যেতে বাধ্য। তবে জমিতে চারা গাছ ঘন করে লাগালে সেই ঘাটতি কিছুটা পূরণ হয়ে যায়।

আমাদের দেশের চাষীরা প্রায়শই এলোমেলোভাবে চারা রোপণ করে থাকেন। কিন্তু রোপা আমন ধানের চারা সারিতে লাগান কর্তব্য। ছিপছিপা পানিতে এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব ১০ ইঞ্চি (২৫ সে.মি.) এবং এক গোছা হতে অন্য গোছার মধ্যে ৬–৮ ইঞ্চি (১৫–২০ সে. মি.) ব্যবধানে চারা রোপণ করা নিষেধ। প্রতি গুছিতে ২/৩টি সুস্থ–সবল চারা লাগাতে হয়। নাবি রোপণ করলে চারা কম দূরত্বের ব্যবধানে রোপণ করতে হয় ও প্রতি গুছিতে ২/৩ টির স্থলে ৪/৫টি চারা ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

পরবর্তী যত্ন : দেশী অনুমোদিত জাতের ধানে আগাছা খুব একটা গজায় না। গজালে তা যথাসময়ে পরিষ্কার করে দেওয়া ভালো। আধুনিক জাতের রোপা আমন ধানে অধিক সার ব্যবহার করা হয় বলে জমিতে আগাছা দ্রুত গজিয়ে উঠে। রোপণের তিনচার সপ্তাহের মধ্যে সেই আগাছা পরিষ্কার করা উচিত। ধান নিড়ানি যন্ত্র (japanese weeder) দুই সারির মধ্যে চালিয়ে আগাছা সহজেই দূরীভূত করা যায়। ছোট হাত কোদালির সাহায্যেও আগাছা দমন এবং জমির মাটি উলট–পালট করে দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করা যায়। তৎপর জমিতে সারণি–৯ অনুযায়ী প্রতি হেক্টরে অনুমোদিত হরে ও সময়ে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। আধুনিক জাত ব্যবহার করে রোপা আমন ধান চাষ জমিতে দণ্ডায়মান পানির উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে ফলন ভালো হয়। ছিপছিপে পানিতে প্রথমবার ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের পর থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে ফসলের জমিতে দণ্ডায়মান পানির উচ্চতা যেন ৫–৭ সে. মি. বর্তমান থাকে। পানির সেরূপ উচ্চতায় গাছের গোড়ায় কুশী গজাতে কোনো অসুবিধা হবে না। দ্বিতীয়বার জমিতে সার দেওয়ার পর চারার বয়স যখন ৫০–৬০ দিন হয় তখন হতে পানির উচ্চতা ৭–১০ সে. মি. রাখা বাঞ্ছনীয়। ক্ষেতে ফসল পাকার ৩০–৪০ দিন আগ পর্যন্ত পানির উচ্চতা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করে গেলে শস্যের ফলন আশানুরূপ হবে। কোনো কোনো সময় রোপা ধানের জমি শ্যাওলায় ঢেকে যায়। সেগুলি মাটি হতে খাদ্য শুষে নেয় বলে ফসলের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। সেই পরিস্থিতিতে তুঁতে প্রয়োগ করে শ্যাওলা ধ্বংস করে দেওয়া উচিত।

রোপা ধান নানা প্রকার কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। রোপণের ৫/৭ দিন পর হতে কাটার আগ পর্যন্ত তেরোটির জাতের পোকার যে কোনো দুই একটি দ্বারা আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। পামরী পোকা কচি ধানের পাতায় সবুজ অংশ খেয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলতে পারে। মাজরা পোকার কীড়া গাছের কাণ্ডের নরম অংশ খেতে থাকে। ফলে গাছে সাদা শীষ বের হয়। শীষের কচি ধান গান্ধী পোকার আক্রমণে একেবারে চিটা হয়ে যেতে পারে। ধান পেকে যখন কাটার অপেক্ষায় থাকে তখন হঠাৎ করে ধানের শীষকাটা লেদা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এইভাবে রোপা ধান চারা অবস্থা হতে গাছে ধান ধরে পাকা পর্যন্ত নানা প্রকার পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে ধান ক্ষেতের পাশে বা মাঝে হাটাচলা করে দেখতে হবে কোনো প্রকার পোকার আক্রমণ হয়েছে কিনা। আক্রমণ হলেই কাল বিলম্ব না করে বিশেষ পোকার জন্য বিশেষ রকম ঔষধ ছিটিয়ে তা ধ্বংস করতে হবে। কোন ঔষধ কোন পোকার জন্য কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা সারণি ১০–এ দেখান হলো।

রোপা ধানে কিছু কিছু রোগ–বালাইরও আক্রমণ হতে পারে। টুংরো একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগের আক্রমণে আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং গাছগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কুশী জন্মান বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে গাছ টান দিলে তা সহজেই মাটি হতে উঠে আসে। ভাইরাস (virus) ঘটিত এই রোগ এক প্রকার সবুজ ফড়িং (green hopper) দ্বারা বিস্তার লাভ করে। কাজেই টুংরো রোগ হতে রক্ষা পেতে হলে আগে এই সবুজ ফড়িং ধ্বংস করতে হবে।

নবম সারণিতে নির্দেশ দেওয়া আছে কিভাবে টুংরো রোগের পোকা ঔষধ দ্বারা দমন করা যায়। ইহা ছাড়া টুংরো রোগ দেখা দিলে জমি হতে পানি নিকাশ করে প্রথম বা দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিয়ে মাটি খুব ভালোভাবে হাতড়িয়ে দিতে হবে। দুই তিন দিন জমিতে

পানি না দিয়ে কিছুটা শুকিয়ে দিলে ও পুনরায় পরিষ্কার পানি দিলে রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। অনেক সময় ইউরিয়া সারের সাথে হেক্টর প্রতি ১১.৫ কেজি পটাশ সার ও ২৩ কেজি ট্রিপল সুপার ফসফেট দিয়েও দুর্বল গাছগুলি সতেজ করা যায়।

পাতা পোড়া রোগ (bacterial leaf blight) রোপা আমন ধানের আর একটি বালাই। এই রোগ ইরি–৮ ও পূর্বাচীতে সাধারণত বেশি হয়। ইরি–৫ ও মালায় কিছু কম হয়। চান্দিনা ও ইরিশাইলে এই রোগ সাধারণত হয় না। চারা অবস্থায় হলে সম্পূর্ণ গোছা ঢলে পড়ে। অনবরত বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া এই রোগ বিস্তারের সহায়তা করে। পাতার লালচে রেখা রোগ চারা অবস্থা হতে ফুল ফুটা পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

সারণি ১০ : রোপা আমন ধানের পোকায় ওষধ ব্যবহার

পোকার নাম	ঔষধের নাম	পরিমাণ প্রতি একরে	কয়বারে ব্যবহারযোগ্য
পাতা সবুজ ফড়িং	১. ম্যালাথায়ন–৬৭ ই,সি অথবা ২. মিথিল প্যারাথায়ন–৫০ ই, সি অথবা ৩. ফসমেট (ইমিডান ৫০ ডব্লিউ, পি) ৪. ফেনথিয়ন (লিবাইসিড–৫০ ই, সি)	১ পাউন্ড (৪৫৫ গ্রাম) ১ পাউন্ড (৪৫৫ গ্রাম) ১ পাউন্ড (৪৫৫ গ্রাম) ১ পাউন্ড (৪৫৫ গ্রাম)	একবারে একবারে একবারে একবারে
শীষকাটা লেদা পোকা লেদাপোকা	১. নগোস–ভেপোনা ১. নগোস–ভেপোনা অথবা ২. সেভিন–৮৫ ই, সি	৮ আউন্স (২৩২ গ্রাম) ৮ আউন্স (২৩২ গ্রাম) ১.৫ পাউন্ড (৬৮৩ গ্রাম)	একবারে একবারে একবারে
পামরী পোকা, ফড়িং	১. ম্যালাথায়ন –৫৭ ই, সি অথবা ২. সেভিন–৮৫ ই,সি অথবা ৩. মিথিল প্যারাথায়ন–৫০ ই,সি অথবা ৪. লিবাইসিড ৫০ই, সি	১২ আউন্স (৩৪৮ গ্রাম) ১.৫ পাউন্ড (৬৮৩ গ্রাম) ১ পাউন্ড (৪৫৫ গ্রাম)	একবারে একবারে একবারে একবারে

গান্ধীপোকা ছাতরা পোকা	১. ম্যালাথায়ন –৫৭ ই, সি অথবা ২. মিথিল প্যারাথায়ন–৫০ ই,সি অথবা ৩. মেটাসিসটক্স 'আর'–২৫ ই,সি	১ পাউন্ড (৪৫৫ গ্রাম) ১২ আউন্স (৩৪৮ গ্রাম) ১২ আউন্স (৩৪৮ গ্রাম)	একবারে একবারে একবারে
মাজরা পোকা	দানাদার ১. ডায়াজিনন (বাসুডিন–১০ জি) অথবা		১ম বারে ১২.৫০ পাঃ (৫.৬৮ কেজি) ২য় বারে–১৫.০০ পাঃ (৬.৮ কেজি) ৩য় বারে ১৭.৫০ পাঃ)৭.৯৫ কেজি)
	২. সলভিগাম (ডাইসালফটন-গামা বি,এইচ. সি		১ম বারে – ২৫ পাঃ (১১.৩৬ কেজি) ৩য় বারে ১৭.৫০ পা: (৭,৯৫ কেজি) ২য় বারে – ৩০ পাঃ (১৩.৬৪ কেজি) ৩য় বারে ৩৫ পাঃ (১৫.৯১ কেজি)
	তরল ১. ডায়াজিনন–৬০ ই,সি অথবা		১ম বারে – ১ পাঃ (৪৫৫ গ্রাম) ২য় বারে ১.৫পাঃ (৬৮৩ গ্রাম) ৩য় বারে – ১.৫ পাঃ (৬৮৩) গ্রাম)
	২. লিবাইসিড-৫০ ই, সি		১ম বারে – ১.২৫ পাঃ (৬৫৮ গ্রাম) ২য় বারে – ১.৫০ পাঃ (৬৮৩ গ্রাম) ৩য় বারে – ১.৭৫ পাঃ (৭৯৬ গ্রাম)

* পানির পরিমাণ ১০০ গ্যালন বা ৪৫৫ লিটার বা ১২ মণ বা ২৫ টিন।

রোগের প্রথম অবস্থায় পাতার ডগার দিকে ভিজা, হলুদ ও সরু দাগ হয়। পরে এগুলি বড় হয়ে পাতা আংশিক নষ্ট হতে পারে এবং ইহা ধানের ফলন কমিয়ে দিতে পারে। এই দুইটি রোগের প্রাথমিক অবস্থাতেই প্রতি বিঘাতে ৬/৭ ছটাক কপার অক্সিক্লোরাইড নামক ঔষধ ৪ মণ ৬ সের পানিতে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করলে রোগ প্রশমিত হয়।

ধান কাটা : আগাম জাতের ধান কার্তিক–অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে পাকে। তবে রোপা আমন ধান পাকার ভরা মৌসুম অগ্রহায়ণ–পৌষ মাস। দেশী অনুমোদিত জাতের ধান গাছগুলি পাকার পর হেলিয়া বা মাটিতে শুয়ে পড়ে। গাছগুলির রং আর সবুজ থাকে না। আধুনিক জাতের ধান পাকার পর সাধারণত হেলে পড়ে না, তবে চান্দিনা, মালা ইরিশাইলের গাছ হেলে পড়তে পারে। গাছের রং কিন্তু তখনও সবুজ থাকে।

কাস্তের সাহায্যে ধান কেটে ছোট ছোট আঁটি বাঁধা হয়। শুকনা মাটিতে ধান কাটা হয় বলে গাছের গোড়াতেই কাস্তে চালিয়ে ধান কাটা হয়। তাই আমন ধানে যে পরিমাণ খড় পাওয়া যায় আউশ ধানে সে তুলনায় খুব কম খড় পাওয়া যায়। ধানের আঁটি মাথায়, কাঁধে, বা গরুর গাড়িতে করে চাষীদের বাড়ির আঙ্গিনায় এনে পালা দিয়ে রাখা হয়। তৎপর সুবিধামতো সময়ে পালার ধান মাড়াই করা হয়।

ধান মাড়াই–ঝাড়াই ও শুষ্ককরণ : অল্প জমির ধান হলে আঙ্গিনায় শক্ত মেঝে বা কাঠের বড় পিড়িতে ধানের আঁটি একটির পর একটি পিটিয়ে ধান আলাদা করা হয়। পরে সেই আঁটিগুলি গরুর সাহায্যে মাড়াই করা হয়। ধানের আঁটি অনেক বেশি হলে তা না পিটিয়ে সরাসরি গরুর পায়ের নিচে মাড়াই করে ধান গাছ হতে আলাদা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ধানের আঁটিগুলি খুলে আঙ্গিনায় বৃত্তের মতো অর্থাৎ গোলাকার করে ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর ৪ হতে ৬টি গরু ক্রমাগত ঘুরানো হতে থাকে। ইহাকে ধানের মলন বলে। চাষী পরিবার সবাই মিলে মলনের খড় ঝেড়ে ধান হতে আলাদা করে ফেলে। তৎপর কুলা চালনীর দ্বারা অনুকূল বাতাসের সাহায্যে ভাঙ্গা খড়কুটা হতে ধান পরিষ্কার করে নেয়া হয়। আজকাল কোনো কোনো সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে ও সরকারি খামারে ধান মাড়াই যন্ত্রের (paddle thresher) সাহায্যে আঁটির ধানমাড়াই করা হয়।

আমন ধানের মৌসুমে প্রচুর রৌদ্র পাওয়া যায় বলে আঙ্গিনায় ছড়িয়ে ধান শুকান হয়। বার কয়েক রৌদ্রে দিলেই ধান শুকিয়ে যায়।

ফলন : স্থানীয় এবং উফশী আমন ধানের গড় ফলন হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ১.৩৯ টন এবং ২.১৪ টন। তবে উন্নত প্রথায় চাষাবাদ করলে উফশী বা আধুনিক ধানের হেক্টর প্রতি ৩–৪ টন হতে পারে।

ছিটা আমন ধানের চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : আউশের জমির মতো করে ছিটা আমন ধানের জমি প্রস্তুত করতে হয়। মাঘ–ফাল্গুনের মধ্যেই জমি তৈরি কাজ শেষ করা প্রয়োজন। চার পাঁচটি চাষ দিয়ে দুই তিনটি মই দিলেই জমি তৈরি হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় জমিতে এমন ঢেলার সৃষ্টি হয় যেগুলি মই দ্বারা ভাঙ্গা যায় না। সেক্ষেত্রে মুগুরের সাহায্যে ঢেলগুলি ভেঙ্গে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ : ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, ফরিদপুর ও অন্যান্য জেলার নিম্নাঞ্চলে এমন জায়গায় ছিটা আমন ধানের চাষ করা হয় যেখানে প্রতি বৎসর প্লাবনের পানিতে ভরে যায়। ফলে এই সমস্ত জমি স্বভাবতই উর্বর। তাই চাষী সম্প্রদায় ছিটা আমন ধানের চাষ করতে যেয়ে সার প্রয়োগের কথা চিন্তা করেন না। তবে কিছু পরিমাণ সার ব্যবহার করলে ফসলের ফলন ভালো হয়। একর প্রতি ১ মণ ইউরিয়া (৯১ কেজি/ হেক্টর) ১ মণ ২০ সের (১৩৮ কেজি/ হেক্টর) টি. এস. পি. ও ২৫/৩০ সের (৫৭–৬৯ কেজি/হেক্টর) মিউরেট অব

পটাশ প্রয়োগ করলেই চলবে। অর্ধেক ইউরিয়া শেষ চাষের সময় এবং বাকি অর্ধেক জমির আগাছা নিড়াবার পর প্রয়োগ করলে ভালো হয়।

বীজ বপন : ফাল্গুনের শেষ হতে চৈত্র মাসের মধ্যে বীজ বপন করতে হয়। একর প্রতি ৩০–৪০ সের অর্থাৎ হেক্টর ৬৯–৭২ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই আউশ ধানের সাথে ছিটা আমন ধানের চাষ করা হয়। সেক্ষেত্রে বীজ আধাআধি করে ফেলতে হয়।

আগাছা দমন : ছিটা আমন ধান ক্ষেতের আগাছা যথাসময়ে দমন করতে হয়। প্লাবনের পানি আসার বেশ আগেই যাতে গাছগুলি বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠে এইজন্য এ কাজ সঠিক সময়ে করা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যথায় গাছ ছোট থাকে এবং প্লাবনের পানির সাথে পাল্লা দিয়ে তা বাড়তে না পেরে ডুবে যায়।

মধ্যবর্তী পরিচর্যা : ছিটা আমন ও আউশ ধানের গাছ এক সঙ্গে বাড়তে থাকলেও শেষোক্ত ফসলটি আপন বৈশিষ্ট্যের দরুন আষাঢ়–শ্রাবণ মাসের মধ্যে পেকে যায়। এই সময় বৃষ্টি ও প্লাবনের পানিতে ধানের খেত ভরে যেতে থাকে। কালবিলম্ব না করে আউশ ধান কেটে ফেলতে হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই ধান কাটার সঙ্গে ছিটা আমন ধানের আগাও কাটা যায়। কিন্তু তাতে ফসলটির কোনো ক্ষতি হয় না। এই সময় হতে একক ফসল হিসেবে ছিটা আমন ধান বৃদ্ধি পেতে থাকে। যতই পানি আসে ততই এই ধানের আগা বৃদ্ধি পায়। ১২ হতে ১৫ ফুট (৪–৫ মিটার) এমনকি ২০–২৫ ফুট (৬–৮ মিটার) গভীর পানিতেও এই ধান ভাসতে থাকে। এইজন্য ইহাকে কখনো কখনো ভাসমান ধান বলা হয়। (floating rice) পানি স্রোতে কোনো কোনো সময় এই ভাসমান ক্ষেত দূরে সরে যেতে পারে। ফলে খেতের মালিকানা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। সেজন্য, বাঁশের খুটা ইত্যাদি দ্বারা খেতের ভাসমান গতিতে বাধা দিতে হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্রোতের গতিতে বাধা দিয়ে যাতে পানির নিচে ডুবে না যেতে পারে তার বন্দোবস্ত করতে হয়। ভাসমান কচুরিপানাও এই ফসলের জন্য বিপদের সৃষ্টি করে। প্রবল বাতাসের দাপটে কোনো কোনো সময় কচুরিপানার চাক খেতের উপরে গিয়া ধানের গাছ নিচে ফেলে দিয়ে পচিয়ে ফেলে। এইরূপ অবস্থা হলে যথাশীঘ্র কচুরিপানা খেত হতে ঠেলে বের করে দিয়ে বাঁশ–খুটার সাহায্যে বাধার সৃষ্টি করতে হয় যাতে কচুরিপানা আর ক্ষেতে না ঢুকতে পারে।

ছিটা আমন ধানে চুঙ্গী পোকা ও শীষকাটা লেদা পোকার আক্রমণ হতে পারে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েও এই আক্রমণ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। সেইক্ষেত্রে উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে উড়োজাহাজের সাহায্যে ঔষধ ছিটিয়ে পোকা দমন করা যেতে পারে।

উফরা (Ufra) জলী বা ছিটা আমন ধানের একটি মারাত্মক রোগ। রোগের আক্রমণে গাছের পাতা শুকিয়ে পোড়ার মতো হয়ে যায় তাতে ধান বিশেষ কিছু হয় না। ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে এই রোগ দমন করা সুকঠিন কাজ। সুতরাং পরোক্ষ উপায়ে ইহা দমনের ব্যবস্থা করতে হয়, যেমন— ফসল উঠার পর নাড়া পোড়ায়ে দিতে হয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে জমি ও ফসলের চাষ করতে হয়, আক্রান্ত মাঠে পরবর্তী দুই এক বৎসর ছিটা আমন ধানের চাষ হতে বিরত রাখতে হয়, ইত্যাদি।

বেনলেট নামক ঔষধ একর প্রতি এক সের হারে সাড়ে বার মণ পানির সাথে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্র দ্বারা ছিটিয়ে মাটি শোধন করে নিলে রোগের প্রকোপ অনেক কম হয়।

ধান কাটা : কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ছিটা আমন ধান পাকে। বীজ বপনের পর এই ধান পাকতে ৮/৯ মাস সময় লাগে। কাস্তের সাহায্যে আগার দিকে ধান কেটে ছোট ছোট আঁটি বাঁধা হয়। তৎপর গরুর গাড়িতে অথবা মাথা বা কাঁধে করে এনে খামার বাড়ির আঙ্গিনায় পালা করে রাখা হয়।

মাড়াই-ঝাড়াই ও ধান শুষ্ককরণ : গরুর পায়ের নিচে মাড়াই করে গাছ হতে ধান আলাদা করা হয়। তৎপর রোপা আমন ধান যেভাবে কুলা চালনীর সাহায্যে পরিষ্কার করে শুকানো হয় এই ধানও ঠিক সেইভাবে পরিষ্কার করে শুকানো হয়। তবে অনেক ধানে শুঙ্গ থাকে বলিয়া কাজে কিছুটা অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

ফলন : রোপা আমন ধানের চাইতে এই ধানের ফলন অনেক কম। গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১ টন ১৪ মন। উল্লেখ্য যে, সত্যিকার অর্থে উফশী ছিটা আমন ধানের কোনো জাত উদ্ভাবন হয় নি বলে ইহার একর প্রতি ও মোট উৎপাদন খুব নিম্নস্তরে রয়েছে। অধুনা এই সম্বন্ধে কিছু কিছু গবেষণা চলছে।

বোরো ধানের চাষাবাদ প্রণালি

রোপা আমন ধানের মতো করেই এই ধানের চাষ করতে হয়। তবে এই ধানের রোপণকাল ভিন্ন ও ফসলটিতে সেচের পানি ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয়।

জমি প্রস্তুতি : রোপা আমন ধানের চাইতে বোরো ধানের জমি প্রস্তুত করা কিছুটা সহজতর। পলি পড়া মাটিতে অনেক সময় চাষের কোনো প্রয়োজনই হয় না। অন্যান্য জমিতে ৩/৪ টি চাষ ও দুটি মই দিলেই জমি প্রস্তুত হয়ে যায়।

সার প্রয়োগ : পলি পড়া জমি উর্বর বলে তাতে সার প্রয়োগের তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য জমিতে রোপা আমন ধানের চাইতে কিছুটা বেশি সার ব্যবহার করতে হয় (সারণি –১১)

সারণি : বোরো ধানে জাতভেদে সার ব্যবহারের পরিমাণ *

ধানের জাত	বিভিন্ন সার ব্যবহারের পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)				
	ইউরিয়া	টি.এস.পি	পটাশ সার	গন্ধক সার	দস্তা সার
ক. চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজী, ব্রিধান ২৮	১৮০	১০০	৫০	৬০	১০
খ. বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহী বালাম, বিধান ২৯	২১০	১২৫	৭০	৭০	১০
গ. হাসি শাহজালাল, মঙ্গল (হাওর এলাকার জন্য)	১৩৫	৯০	৪০	৬০	১০

উৎস : আধুনিক ধানের চাষ— বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫

* বেলে ও পাহাড়ের পাদভূমির মাটিতে পটাশ সারের মাত্রা কমপক্ষে দেড়গুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। দস্তা সারের ব্যবহার শুধুমাত্র গঙ্গাবাহিত পললভূমি ও সেচ প্রকল্প এলাকায় সীমিত রাখাই সমীচীন হবে। হাওর এলাকার জমি উর্বর বলে সারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দেশী জাতের বেলায় উপর্যুক্ত সার অর্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

সারণি ১২ : বোরো ধানের জাতভেদে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সময় ও পরিমাণ

ধানের জাত	রোপণের যতদিন পর (কেজি/ হেক্টর)						
	০	১৫	২০	৩০	৪৫	৫০.	৫৫
ক. চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজী, ব্রিধান ৬, ব্রিধান ২৮	০	৬০	--	৬০	--	৬০	--
খ. বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহী বালাম, ব্রিধান ২৯	০	৭০	--	--	৭০	--	৭০
গ. হাসি শাহজালাল, মঙ্গল (হাওর এলাকার জন্য)	--	৪৫	--	--	৪৫	--	৪৫

উৎস : আধুনিক ধানের চাষ— বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫

চারা রোপণ : কর্দমাক্ত বীজতলায় রোপা আমন ধানের জন্য যেভাবে চারা জন্মান হয় সেভাবে বোরো ধানের জন্যও চারা জন্মান যেতে পারে। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে বীজতলায় চারা জন্মাতে হয়। ৩৫–৪০ দিন বয়সের চারা কর্দমাক্ত জমিতে সারি করে লাগাতে হয়। এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব হবে ২৫ সে: মি: এবং সারির মধ্যে এক গোছা হতে অন্য গোছার দূরত্ব হবে ১৫–২০ সে: মি:। আর প্রতি গোছায় চারা সংখ্যা হবে ২/৩টি।

পরবর্তী পরিচর্যা : জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় চারা লাগাবার ৩/৪ দিন পর হতে ২–৩ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫–৮ সেঃমিঃ পানি রাখতে হয়। পানির এই উচ্চতায় গাছে কুশি জন্মাতে কোনো অসুবিধা হয় না।

উচ্চ ফলনশীল অর্থাৎ আধুনিক জাতের আবাদ করা হলে ক্ষেতের আগাছা প্রথমবার ২৫/৩০ দিনের মধ্যেই পরিষ্কার করতে হবে। সারির মধ্যে জাপানি উইডার বা ছোট হাত কোদালি চালিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ওলট–পালট —এই উভয় কাজ একই সঙ্গে করা যায়। দেশী জাতের ধান করা হলে এবং তাতে আগাছা উঠলে সেগুলিও উক্ত সময়ের মধ্যে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

বোরো ধান চাষে সেচের পানি সঠিকভাবে ব্যবহার করার উপরেই ইহার সার্থক উৎপাদন নির্ভর করে। শীত অর্থাৎ রবি মৌসুমে এই ধানের চাষ করা হয় বলে সেচের পানি ব্যবহার করা অত্যন্ত আবশ্যকীয়। অল্প জমিতে দোন বা সেউতির সাহায্যেই সেচ দেওয়া যায়। বেশি জমি হলে দমকল (Power Pump) অথবা গভীর বা অগভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ দিতে হবে। গাছে থোর হওয়ার পর হতে ৪/৫ ইঞ্চি (১০–১২ সেঃ মিঃ) পানি সর্বক্ষণের জন্য রাখতে হবে। এই পরিস্থিতিতে যতবার সেচ দেওয়া প্রয়োজন ততবারই দিতে হবে।

দেশী জাতের বেলায় তত পানি না রাখলেও চলবে। তবে পানির অভাবে মাটি যেন কখনো ফেটে না যায়। ধান পাকা আরম্ভ হলে তখন আর সেচ দেবার প্রয়োজন হয় না। তখন আস্তে আস্তে পানি শুকাতে থাকবে আর ধান পাকাও শেষ হবে।

বোরো ধান আউশ ও আমন ধানের মতো একই প্রকার কীটপতঙ্গ ও রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। রোগ ও পোকার আক্রমণের সাথে সাথে সেগুলি দমন করতে হবে। ৭ ও ১০ সংখ্যক সারণিতে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া আছে।

ধানকাটা, মাড়াই-ঝাড়াই ও শুষ্ককরণ : চৈত্র বৈশাখ মাসে বোরো ধান পাকে। পাকার সঙ্গে সঙ্গে বোরো ধান কেটে বাড়ি নিয়ে আসতে হয়, কারণ যে-কোনো মুহূর্তে ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে বোরো ধান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

গরুর পায়ে নিচে মাড়াই করে গাছ হতে ধান আলাদা করা হয়। যান্ত্রিক উপায়ে পা চালিত ধান মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যেও ধান মাড়াই করা যায়। মাড়াবার পর খড়কুটা মিশ্রিত ধান কুলা চালনীর সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়। ধান কয়েকবার রৌদ্রে দিয়ে নাড়াচাড়া করলেই শুকিয়ে যায়।

ফলন : যে-কোনো ধান অর্থাৎ আউশ, বোরো আমন ও জলী আমন ধানের চাইতে বোরো ধানের উৎপাদন হার বেশি। হেক্টরে স্থানীয় জাতের গড় উৎপাদন ১.৩৮ টন এবং উফশী জাতের ২.৫৯ টন। বর্ণিত উন্নত পদ্ধতির চাষ করলে আধুনিক বা উফশী জাতের উৎপাদন হেক্টরে ৪-৪.৫০ টন হতে পারে।[৫]

ধানের ব্যবহার : ধান হতে যে চাউল প্রস্তুত হয় আর তা হতে যে ভাত রাঁধা হয় তা এশিয়া মহাদেশের অনেক দেশের জনসাধারণের প্রধান খাদ্য যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই হিসেবে ভারত, বাংলাদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের একজন অধিবাসী বৎসরে ২০০-৩০০ পাঃ চাউল ৯০-১৩৫ কেজি খায় আর সেই তুলনায় একজন যুক্তরাষ্ট্রবাসী বৎসরে খায় মাত্র ৬ পাঃ (প্রায় ৩ কেজি) চাউল।[২৩]

গমের মতো চাউলকে আটা করে খাওয়ার রীতি নেই বললেই চলে। তবে কোনো কোনো উৎসব বা পর্ব উপলক্ষে চাউল ভিজিয়ে ঢেকি বা উল্কীর সাহায্যে আটা করে তা হতে রুটি বা চাপাতি তৈরি করে খেতে দেখা যায়। ভারত ও বাংলাদেশে ধান ও চাউল হতে খৈ, মুড়ি, মুড়ি, চিড়া ইত্যাদি প্রস্তুত করে খাওয়ার রীতি যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

মিলে প্রস্তুত অনেক কাপড়-চোপড় পরিপাটি করার কাজে যে কলপ বা স্টার্চ (Starch) ব্যবহার করা হয় তাহা চাউল হতে প্রস্তুত করা হয়। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে চাউল দ্বারা এক রকম মদ প্রস্তুত করা হয়।

ধানের খড় গো-মহিষের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। আবার আমাদের দেশের গরিব চাষীরা কেউ কেউ খড়ের সাহায্যে ঘরের চালা প্রস্তুত করে থাকে। চাউলের বি-ভিটামিন সমৃদ্ধ কুড়া গরু-বাছুর ও হাঁস-মুরগির জন্য পুষ্টিকর খাদ্য। তুষ আমাদের দেশে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জানা গেছে এই তুষ হতে এক রকম তৈল প্রস্তুত করা যেতে পারে।

গম

দানাজাতীয় ফসলের মধ্যে গম একটি অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য। সমগ্র পৃথিবীতে এলাকা ও উৎপাদনের দিক হতে প্রথম স্থান দখল করে আছে। পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের দেশগুলি হতে পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলিতেই অধিক পরিমাণে গম জন্মে।

ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানে স্মরণাতীত কাল হতেই গমের চাষ হয়ে আসছে। বাংলাদেশে ইহা একটি নতুন ফসল। তীব্র খাদ্য সঙ্কটের মুখে এই দেশে উত্তরোত্তর ফসলটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেক্ষেত্রে ১৯৭৪–৭৫ সালে এদেশে গমের এলাকা ও উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১,২৬,০০০ হেক্টর সেক্ষেত্রে তাহা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪–৮৫ সালে এসে দাঁড়ায় ৬৮৮২০৯ হেক্টরে কিন্তু ১৯৮৬ সাল থেকে গমের আবাদ কমে যেতে থাকে এবং ১৯৯৩–৯৪ সালে তা আবাদ হয় ৬১৫০০০ হেক্টরে এবং উৎপাদিত হয় ১১৩১০০০ টন গম।[১৫]

সেই তালিকা লক্ষ করলে আরো দেখা যাবে যে উচ্চফলনশীল জাতের (উফশী জাতের) গমের এলাকা ক্রমাগত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং স্থানীয় বা দেশী গমের জাতের উৎপাদন সেই হারে কমতে থাকে। ১৯৭৪–৭৫ সালে যে স্থলে দেশী গমের আবাদ ছিল ৯৩০০০ হেক্টর সেস্থলে ১৯৮০–৮১ সালে তা কমে এসে দাঁড়ায় ২০০০০ হেক্টরে অন্যদিকে সেই সময়ের মধ্যে উফশী গমের আবাদ ৩৩০০০ হেক্টরে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭২০০০ হেক্টরে উন্নীত হয়।[১৮]

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতেই গমের চাষ ভালো হয়। সে হিসেবে উল্লেখযোগ্য জেলাগুলি হচ্ছে কুষ্টিয়া, যশোর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও ফরিদপুর। তবে কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও খুলনা জেলাতেও গমের আবাদ ভালো হয়।

বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক গমের আবাদ ও উৎপাদন নিম্নের সারণি–১৩ তে দেখানো হলো।

সারণি ১৩ : বাংলাদেশে জেলাভিত্তিক গমের আবাদি এলাকা ও উৎপাদন

জেলার নাম	জমির পরিমাণ (হেক্টরে)	উৎপাদন (মে.টনে)
ঢাকা	৭৪০০	১৪০০০
নারায়ণগঞ্জ	৪১০০	৮২০০
নরসিংদী	২০০০	৪০০০
গাজীপুর	১০০০	২০০০
মানিকগঞ্জ	১৪৫০০	২৯০০০
মুন্সীগঞ্জ	৩৫০০	৭০০০
টাংগাইল	৩০০০০	৬০০০০
ময়মনসিংহ	১৬০০০	৩২০০০
জামালপুর	১৮০০০	৩৬০০০
শেরপুর	১১২৫০	২২৫০০
নেত্রকোণা	৮০০০	১৬০০০
কিশোরগঞ্জ	১২৫০০	২৫০০০
কুমিল্লা	২০০০০	৪০০০০
বি, বাড়িয়া	১৬৫০০	৩৩০০০
চাঁদপুর	৯০০০	১৮০০০
সিলেট	১০০০	২০০০
মৌলভীবাজার	৪০০	৮০০

হবিগঞ্জ	২৬০০	৫২০০
সুনামগঞ্জ	৩০০০	৬০০০
চট্টগ্রাম	৫০	১০০
কক্সবাজার	–	১২০
ফেনী	২৫০	৫০০
লক্ষ্মীপুর	৭৫০	১৫০০
রাংগামাটি	৫০	১০০
খাগড়াছড়ি	২০	৪০
বান্দরবান	–	–
বরিশাল	৯০০	১৮০০
পিরোজপুর	১০	২০
ঝালকাঠি	২০	৪০
ভোলা	৫০০০	১০০০০
পটুয়াখালী	১০০	২০০
বরগুনা	—	—
রাজবাড়ী	১০০০০	২০০০০
ফরিদপুর	২৩০০০	৪৬০০০
গোপালগঞ্জ	৩১৫০	৬৩০০
মাদারীপুর	৪০০০	৮০০০
শরীয়তপুর	৭০০০	১৪০০০
রাজশাহী	৩৫০০০	৭০০০০
নওগাঁ	২০০০০	৪০০০০
নাটোর	১৬০০০	৩২০০০
চা নবাবগঞ্জ	১০০০০	২০০০০
বগুড়া	১০০০০	২০০০০
জয়পুরহাট	৫৫০০	১১০০০
পাবনা	৩০০০০	৬০০০০
সিরাজগঞ্জ	২৫০০০	৫০০০০
যশোর	১০০০০	২০০০০
নড়াইল	২২৯০	৪৫৮০
মাগুড়া	৬০০০	১২০০০
ঝিনাইদহ	১২৬০০	২৫২০০
কুষ্টিয়া	২৪৫০০	৪৯০০০
মেহেরপুর	১৬০০০	৩২০০০
চুয়াডাঙ্গা	১৮৬০০	৩৭২০০

খুলনা	৩০০	৬০০
সাতক্ষীরা	৯০০	১৮০০
বাগেরহাট	২০০	৪০০
রংপুর	২৪০০০	৪৮০০০
গাইবান্ধা	১৫০০০	৩০০০০
কুড়িগ্রাম	২৩০০০	৪৬০০০
লালমনিরহাট	৬০০০	১২০০০
নীলফামারী	১৬০০০	৩২০০০
দিনাজপুর	৪৩৫০০	৮৭০০০
পঞ্চগড়	১৩৫০০	২৭০০০
ঠাকুরগাঁও	৩১০০০	৬২০০০

উৎস : খাদ্যশস্য উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৯৯৪-৯৫।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

গমের উৎপত্তি কখন ও কোথায় হয়েছে কেউ তা ঠিক করে বলতে পারে না। তবে অনেকের মতে গমের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া। সিরিয়া ও জর্ডান উপত্যকায় ইমার (Emmer) নামে যে এক ধরনের বন্য ফসল দেখা যেতো সেই আদি গম শস্য যা খ্রিঃ পূঃ ৭০০০ সালেও চাষ করা হতো।[৮]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীর পশ্চিম ও পূর্ব—এই উভয় অঞ্চলেই গমের চাষ বিস্তৃতি লাভ করেছে। তন্মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য দেশগুলি হচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইটালি এবং পূর্বাঞ্চলের দেশগুলি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক চীন, ভারত, পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়া।

মাটি

সাধারণত উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি গম চাষের জন্য উপযুক্ত। তবে মাঝারি নিচু জমিতেও গম চাষ চলে। দোঁয়াশ ও বেলে-দোঁয়াশ মাটি গম চাষের জন্য সর্বত্তোম। সহজে পানি নিষ্কাশিত হয় এমন ভারী অর্থাৎ এঁটেল ও এঁটেল-দোঁয়াশ মাটিতেও গমের চাষ করা চলে।

জলবায়ু (climate)

গ্রীষ্ম ও অব-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু হতে আরম্ভ করে নাতিশীতোষ্ণ ও তুন্দ্রাঞ্চলীয় জলবায়ুতেও গম জন্মে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৫-৪৫ ইঞ্চি অর্থাৎ ৩৮০-১১৪৩ মি. মি. গম চাষের জন্য খুব উপযোগী তবে ১০-৭০ ইঃ ২৫৪-১৭৭৮ মি. মি. পর্যন্ত বার্ষিক গড়পড়তা বৃষ্টিতেও গম ভালো জন্মে।[১৬] একদিকে সাইবেরিয়া ও মেরু অঞ্চলের প্রবল শৈত্যেও গম গাছ টিকে থাকতে পারে, অপরদিকে ২১-২৪° সে. তাপমাত্রায়ও গম চাষ করা চলে। তবে গরম আবহাওয়ায় ফুল ফুটার সময় ঠাণ্ডা পরিবেশ বর্তমান থাকা প্রয়োজনীয়, অন্যথায় গমগাছে দানার উৎপত্তি হয় না। ভূমির উচ্চতার দিক হতেও গম অদ্ভুত রকমে খাপ খাওয়াতে পারে। সমুদ্র সমতল হতে ১০,০০০ ফুট অর্থাৎ ৩১০০ মিটার উচ্চতায়ও গম জন্মিতে দেখা যায়।[১৬]

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

গম গ্রামিণী (graminae) পরিবারভুক্ত ও ট্রিটিকাম (triticum) সম্প্রদায়ভুক্ত এক প্রকার ঘাস জাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ (চিত্র ২.৩)।

গমের মূল শিকড় বিন্যাস ধানের মতো হলেও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে ধানের শিকড় যেক্ষেত্রে ৩০ সে. মি. মাটির নিচে যায় না সেক্ষেত্রে গমের শিকড় প্রায় ১.৫০ মিটারের মতো গভীরতায় পৌছাতে পারে। গাছে ছোট শীষে ২৫–৩০টি এবং বড় ৫০–৭৫টি দানা উৎপন্ন হতে পারে। বীজ বপন হতে দানা পাকা পর্যন্ত জাতভেদে ১০০ হতে ১১৫ দিন সময় লাগে।

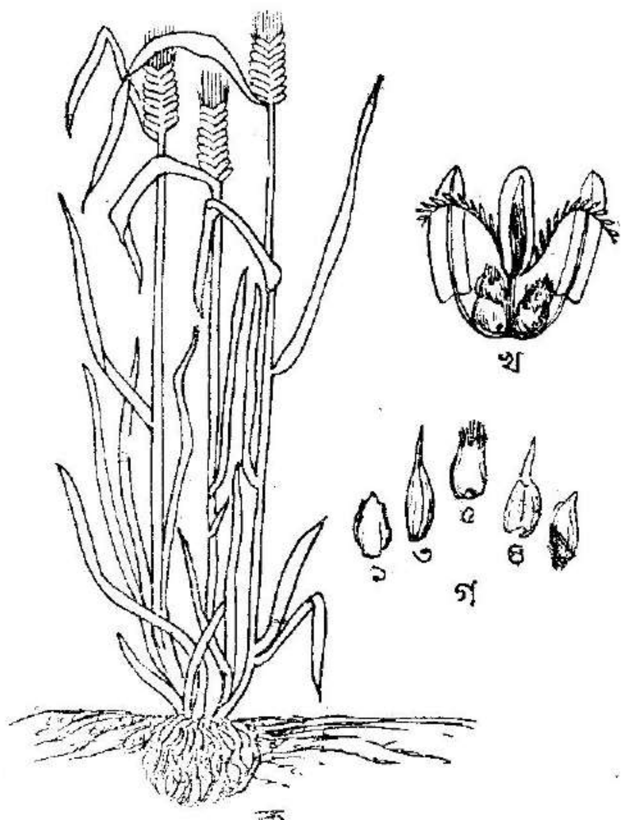

চিত্র : ২.৩ (ক) কুশী ও শীষসহ গম গাছ ; (খ) গমের একটি পুষ্পাংশে পুংস্তবক, স্ত্রীস্তবক ও লডিফুল (গ) বাহিরের মঞ্জরীপত্র (১.২), লেমা ও পেলিয়া (৩.৪), গর্ভাশয় ও লডিফুল (৫)

বাংলাদেশে আগের দিনে ভারত হতে আনীত 'পোষা' (pusha) নামক এক জাতীয় গমের চাষ করা হতো। ইহা ভালো জাতের একটা গম ছিল না। তদুপরি এই দেশের চাষীরা একেবারে অযত্নে এই গমের চাষ করতো বলে উৎপাদন অত্যন্ত নিম্ন মানের ছিল। আজকাল আর সে জাতের গমের চাষ হয় না। মেক্সিকোর আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্রে (Cymmit) যে সমস্ত উচ্চফলনশীল (উফশী) জাতের উদ্ভাবন করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি আমাদের দেশে আনয়ন করে সেগুলির চাষ করা হচ্ছে। এদেশে ১৯৬৫–৬৬ সালের রবি মৌসুম হতে সোনোরা–৬৪ (Sonora-64) ও পেনজামো–৬২ (Penjamo-62) এই দুইটি উচ্চফলনশীল মেক্সিকান জাতের গম চাষের মধ্য দিয়ে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়। তারপর সেই গবেষণাকেন্দ্র হতে আরো অনেক ও ভারত হতে দুই চারিটি গমের জাত আনয়ন করা হয়। সেইসব গমের জাত নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা–নিরিক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সেগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক জাত এদেশের জলবায়ু ও পরিবেশে উচ্চ ফলন দিতে সক্ষম। সোনোরা–৬৪ সহ সেই জাতিগুলি হচ্ছে ইনিয়া–৬৬ (Inia-66), নরটোনা–৬৭ (Norteno-67), টেনোরী–৭১ (Tanori-71), সোনালিকা ও কল্যাণসোনা অধুনা আরো কতকগুলি গমের জাত যেমন— পাভন–৭৬, বলাকা, দোয়েল, জুপাটেকো, আনন্দ ও কাঞ্চন এই দেশে চাষের জন্য সুপোযোগী বলে জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন প্রদান করেছে। এই রকম কয়েকটি আধুনিক গমের জাতের বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো।

ইনিয়া – ৬৬ : ইহা একটি লাল দানার গমের জাত ; উচ্চতায় ২ ফুট ৮ইঞ্চি অর্থাৎ ৮০–৮১ সে. মি. এবং প্রতি গাছে কুশির সংখ্যা ৪টি। কার্তিকের শেষ সপ্তাহ হতে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বপন করলে ভালো ফলন দেয় ; জীবনচক্র ১০৫–১০৭ দিনের মধ্যে শেষ হয় এবং প্রতি একরে ৪০–৪৫ মণ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ৩.৭৫–৪.০টন।

নরটোনা – ৬৭ : ইহা ইনিয়া জাতের মতো উচ্চতা বিশিষ্ট সাদা দানার একটি গমের জাত। জীবনকাল ১০৫–১০৭ দিনের মধ্যে শেষ হয় ; বপনের ভালো সময় কার্তিকের শেষ হতে মধ্য অগ্রহায়ণ। প্রতি গাছে কুশির সংখ্যা ৪টি। যত্ন সহকারে চাষ করলে প্রতি একরে ৩৫–৩৮ মণ অর্থাৎ হেক্টরে ৩.৩৩–৩.৫ টন।

ট্যানোরী ৭১ : লাল দানার গমের এই জাতটি ইনিয়া ও নরটোনা জাতের গমের মতই উচ্চতা বিশিষ্ট এবং তাতে একই সংখ্যক অর্থাৎ ৪টি কুশি উৎপন্ন হয়। কার্তিকের শেষ সপ্তাহ হতে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বপনের ভালো সময়, তবে ২২ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বপন করা যায়। জীবনচক্র ১০২–১০৬ দিনের মধ্যে শেষ হয় ; একর প্রতি উৎপাদন ৩৮–৪০ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৩.৫টন হতে ৩.৭৫ টন।

সোনালিকা : ইহা ভারত হতে আনীত একটি নাবী গমের জাত। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১০০–১০৪ দিনের মধ্যে ফসল ঘরে উঠে। দানার রং সাদা। প্রতি গাছে তিনটি করে কুশি জন্মে এবং ২ ফুট ৯ ইঞ্চি অর্থাৎ ৮৪ সে. মি. পর্যন্ত উঁচু হয়। কার্তিকের শেষ সপ্তাহ হতে মধ্যে অগ্রহায়ণের মধ্যে বপন করা শ্রেয় ; যত্ন সহকারে চাষ করলে একর প্রতি ৩৫–৩৭ মণ,(১৩–১৪ কুইন্টাল) অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ৩.২৫ টন হতে ৩.৫০ টন গমের দানা উৎপন্ন হতে পারে।

জোপাটেকো : ইহা লাল দানাদার আগাম জাতের একটি গম। গাছ উচ্চতায় ৩ ফুট অর্থাৎ প্রায় ১ মিটার হয় ; প্রতি গাছে ৫টি কুশি জন্মে। মধ্য কার্তিক হতে কর্তিকের শেষে বপন করার উত্তম সময় ; ১০৯–১১৪ দিনের মধ্যে জীবনচক্র শেষ হয় ; একর প্রতি উৎপাদন ৩৮–৪২ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৩.৫০ টন হতে ৪.০০ টন হতে পারে।

দোয়েল : ইহা একটি আগাম জাতের গম। প্রতি গাছে ৫টি কুশি জন্মে এবং গাছ উচ্চতায় ২ ফুট ১০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৮৬ সে. মি. হয়। মধ্য কার্তিক হতে কার্তিকের শেষ পর্যন্ত বীজ বপন করার উত্তম সময় ; ফসল পাকতে সময় লাগে ১০৭–১১২ দিন। উৎপাদন প্রতি একরে ৩৮–৪২ মণ অর্থাৎ হেক্টরে ৩.৭৫–৪.২৫ টন। দানার রং সাদা।

বলাকা : দোয়েলের মতো ইহাও সাদা দানাদার একটি গমের জাত। গাছের উচ্চতা ২ ফুট ৭ ইঞ্চি অর্থাৎ ৭৯ সে. মি. এবং প্রতি গাছে কুশির সংখ্যা ৫টি। নাবী জাতের এই গমটি বপন করার উত্তম সময় কার্তিকের শেষ সপ্তাহ হতে মধ্য অগ্রহায়ণ। ফসলটি পাকে ১০৫–১০৭ দিনে ; একর প্রতি উৎপাদন ৪০–৪৫ অর্থাৎ হেক্টরে ৩.৭৫ টন হতে ৪.২৫ টন।

পাভন : ইহা একটি আগাম জাতের গম ; বপন করার উপযুক্ত সময় মধ্য কার্তিক হতে কার্তিকের শেষ। গাছের উচ্চতা প্রায় ১মিটার এবং প্রতি গাছে কুশি জন্মে ৫টি। ১১২–১১৭ দিনের মধ্যে ফসলটি ঘরে উঠে ; একর প্রতি উৎপাদন ৪০–৪৬ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৩.৭৫ হতে ৪.২৫ টন। দানার রং সাদা।

আনন্দ : এ জাতটির জীবনকাল ১০৩–১০৮ দিন। উচ্চতায় মাঝারি। রোগ–বালাইর আক্রমণ এ জাতে নেই বললেই চলে। সেচসহ উপযুক্ত সময় অর্থাৎ কার্তিক হতে কার্তিকের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা চলে। সেচ দিয়ে আবাদ করলে জাতটির ফলন হেক্টর প্রতি ৩.৪–৩.৮ টন পর্যন্ত হতে পারে আর বিনা সেচে প্রতি হেক্টরে ২.১–২.৬ টন ফলন পাওয়া যেতে পারে।

কাঞ্চন : বর্তমানে আবাদকৃত গমের জাতগুলোর মধ্যে কাঞ্চন খুবই জনপ্রিয়। জাতটির জীবনকাল ১০৬–১১২ দিন, রোগ–বালাইর আক্রমণ এতে খুবই কম। নাবী চাষেও বিনা সেচে জাতটি ভালো ফলন দিতে পারে। উপযুক্ত সময়ে সেচসহ এ জাতটির ফলন ৩.৫–৪.৪ টন এবং সেচ ছাড়া ২.২– ২.৮ টন। উল্লেখ্য, এ জাতটি বাংলাদেশ গম গবেষণা কেন্দ্র হতে উদ্ভাবিত হয়েছে।

বরকত : এ জাতটির উচ্চতা মাঝারি ও জীবনকাল ১০৫–১১৩ দিন। এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো। সেচ দিয়ে আবাদ করলে প্রতি হেক্টরে ফলন ৩.৪–৩.৮ টন পর্যন্ত হতে পারে আর বিনা সেচে ফলন হয় ২.১–২.৮ টন।

আকবর : ফলন ও জনপ্রিয়তার দিক হতে কাঞ্চনের পরই এ জাতটির স্থান। এর জীবনকাল ১০৩–১০৮ দিন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো। সেচসহ জাতটির গড় ফলন হেক্টরে ৩.৫–৪.২ টন আর বিনা সেচে ফলন হয় ২.১–২.৬ টন।

অঘ্রাণী : দেরিতে চাষ করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত জাত। গাছে বীজ পরিপক্ব হতে সোনালিকা হতে ৩–৪ দিন বেশি সময় লাগে। জাতটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। সেচ দিয়ে আবাদ করলে প্রতি হেক্টরে ফলন হয় ৩.৪–৩.৮ টন এবং বিনা সেচে ২.১–২.৬ টন

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : বর্ষার মৌসুম চলে যাবার পর 'জো' বুঝে গমের জমিতে প্রথমবার চাষ দিতে হয়। তৎপর ৮/১০ দিনের মধ্যে ৩/৪ বার আড়াআড়ি জমি চায দিয়ে এবং বহু কয়েক মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে প্রস্তুত করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে। যে গমের জমিতে

যেন ঢেলা না থাকে, কারণ ঢেলাযুক্ত জমিতে বীজের অঙ্কুরোদগম বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং চারা গাছ সুচারুরূপে বৃদ্ধি পেতে পারে না।

সার প্রয়োগ : আজকাল বাংলাদেশে স্থানীয় জাতের গমের চাষ হয় না। সারাদেশেই উফশী বা আধুনিক জাতের গমের আবাদ হয়। এরূপ গম চাষে যথেষ্ট পরিমাণ সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে এবং ফলন মাত্রা প্রতি হেক্টরে ৩.০–৪.০ টন ধরে উফশী জাতের গম, যেমন, কাঞ্চন, বলাকা, আকবর, বরকত, অঘ্রাণী প্রভৃতি জাতের চাষ করতে হলে সেচসহ ও বিনা সেচে সার ব্যবহারের মাত্রা নিম্নরূপ হবে :

সারণি ১৪ : গম চাষে সার ব্যবহারের পরিমাণ (সেচসহ)

মৃত্তিকা পরীক্ষা ভিত্তিক উর্বরতা	বিভিন্ন সারের পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)				
	ইউরিয়া	টি. এস. পি	এম. পি	জিপসাম	জিঙ্ক সালফেট
কম উর্বর	২০০	১৬০	১০০	৮০	১২
মধ্যম উর্বর	১৭০	১৩০	৮০	৬০	৮
বেশি উর্বর	১৪০	১০০	৬০	--	--

উৎস : সার ব্যবহার নির্দেশিকা শহিদুল ইসলাম ও সদরুল আমিন, ১৯৮৮

সকল সার ও ১/৩ ভাগ ইউরিয়া জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে। সেচসহ চাষে দ্বিতীয় কিস্তির ১/৩ ভাগ এবং তৃতীয় কিস্তির ১/৩ ইউরিয়া বীজ বপনের যথাক্রমে সেচের সুবিধা না থাকলে সমস্ত সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে উপযুক্ত মাত্রার ২/৩ অংশ অর্থাৎ নিম্নহারে প্রয়োগ করলেই চলবে।

সারণি ১৫ : গম চাষে সার ব্যবহারের পরিমাণ (বিনা সেচে)

মৃত্তিকা পরীক্ষা ভিত্তিক উর্বরতা	বিভিন্ন সারের পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)				
	ইউরিয়া	টি. এস. পি	এম. পি	জিপসাম	জিঙ্ক সালফেট
কম উর্বর	১৩৩	১০৭	৬৬	৫৪	৮
মধ্যম উর্বর	১১৩	৮৭	৬৩	৪০	৬
বেশি উর্বর	৯৩	৬৬	৪০	--	--

উৎস : সার ব্যবহার নির্দেশিকা শহিদুল ইসলাম ও সদরুল আমিন, ১৯৮৮

বপনের জন্য গমের জাত নির্বাচন

গমের আবাদ করতে গিয়ে উফশী তথা আধুনিক জাতের গম নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। সে তিনটি বিষয় হলো—বীজ বপনের সময়, সেচ, পরিস্থিতি ও ঢেলাযুক্ত জমিতে বীজ বপন।

ক. বীজ বপনের সময় : আগাম বপনের ক্ষেত্রে নির্বাচন করতে হবে— কাঞ্চন, আকবর ও পাভন জাতের গম। উপযুক্ত অর্থাৎ সঠিক সময়ে বীজ বপনের জন্য উপযোগী জাত হলো— কাঞ্চন, আকবর, বরকত, অঘ্রাণী, বলাকা, ও আনন্দ। দেরিতে বপন করতে হলে নির্বাচন করতে হবে কাঞ্চন ও অঘ্রাণী জাতের গম।

খ. সেচ পরিস্থিতি : আধুনিক জাতের গম সেচ দিয়ে চাষ করতে পারলেই অধিক লাভবান হওয়া যায়, তবে বিনা সেচেও কিছু কিছু উফশী জাতের গম চাষ করা যায়। প্রথমোক্ত পরিস্থিতিতে অর্থাৎ সেচসহ চাষ করতে গেলে সব রকম আধুনিক জাতের গমই নির্বাচন করা যায়। বিনা সেচে চাষ করা যায় কাঞ্চন, অঘ্রাণী ও আকবর জাতের গম।

গ. ঢেলাযুক্ত জমি : এক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই অধিক কুশি উৎপাদনক্ষম জাত কাঞ্চন ও আকবর নির্বাচন করা সুবিবেচনার কাজ হবে।

বীজ বপনের সময়

বাংলাদেশের স্বল্পকালস্থায়ী শীত ঋতুতে গম সঠিক সময়ে বপন করা একান্ত কর্তব্য। গমের জাতভেদে বপনের সময়ের কিছুটা তারতম্য হতে পারে। তবে মধ্য কার্তিক হতে মধ্য অগ্রহায়ণ গম বীজ বুনার প্রকৃষ্ট সময়। দেরিতে বপন করলে ফলন কম হয়। শীত কমে যাবার দরুন দানা গঠনে ও পুষ্টতায় ব্যাঘাত ঘটে অথবা কালবৈশাখীর ঝড়ঝাপটায় ফসলের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

বীজ বপনের হার

সঠিক হারে বীজ বপন করতে গেলে তার আগে দুটি কাজ করতে হবে। রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রথমেই বীজ শোধন করে নিতে হবে। সে উদ্দেশ্যে প্রতি কেজি বীজের জন্য ৩ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ ব্যবহার করতে হবে। বীজে ঔষধ মিশ্রিত করে তা ভালোভাবে ঝাকিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত নির্বাচিত জাতের বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বপনের জন্য ৮৫% গজানোর ক্ষমতাবিশিষ্ট বীজ বিবেচনায় রাখতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে সত্যিকারের প্রত্যয়িত বীজ ব্যবহার করা হলে পরামর্শকৃত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করারই প্রয়োজন হবে না, কারণ বি এ ডি সি কর্তৃক প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদন কালে এ দুটি বিষয় অর্থাৎ বীজ শোধন ও অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতার মান বজায় রাখার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়।

বাংলাদেশের চাষীরা সাধারণত ছিটিয়ে গমের বীজ বপন করে থাকেন। সারিতে বা লাইন করে বীজ বপন করা বিজ্ঞানসম্মতো পদ্ধতি। সে ক্ষেত্রে এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব হবে ২০ সে: মি: এবং বীজ বপনের গভীরতা ৪–৫ সে: মি:। দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে লাইন টেনে এভাবে বীজ বপন করা যেতে পারে। এ নিয়মে সেচসহ গম চাষ করতে গেলে প্রতি হেক্টরে ১২০ কেজি আর বিনা সেচে ১০০ কেজি বীজ বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বপন করলে উভয় ক্ষেত্রেই শতকরা ২৫ ভাগ বেশি বীজ ব্যবহার করা উচিত হবে।

আগাছা দমন : গম ক্ষেতে মুথা, দুর্বা, বথুয়া প্রভৃতি আগাছা জন্মাতে পারে। ছিটিয়ে বোনা জমিতে চারা গজাবার ১৫/১৬ দিনের মধ্যে আড়াআড়ি দুইবার আঁচড়া দিলে আগাছা

অনেক উঠে যায়। তদুপরি মাটি আলগা হওয়ার ফলে চারা গাছের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়। আচড়া দেওয়ার কয়েক দিন পর নিড়ীর সাহায্যে বাকি ঘাসগাছড়া পরিষ্কার করে দিতে হবে। এই আগাছা দূরীকরণের কাজ বার দুয়েক করার প্রয়োজন হতে পারে। সারিতে আবাদ করা গমক্ষেতে আগাছা পরিষ্কারের কাজ সহজেই করা যেতে পারে। আচড়া দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, নিড়ির সাহায্যে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে উচ্চফলনশীল গম চাষে অধিক হারে সার প্রয়োগ করবার পর অবশ্য পরিমাণ মতো পানি সেচ করতে হবে। ফসল পাকা পর্যন্ত কয়বার সেচ দেওয়া প্রয়োজন তা প্রধানত নির্ভর করে মাটির গুণাগুণের উপর। তবে বেশির মধ্যে ৩ বার সেচ দিলেই চলে। প্রথম সেচ চারা তিন পাতার সময়, দ্বিতীয় সেচ শীষ বের হবার সময় এবং তৃতীয় সেচটি দানা গঠনের সময় প্রয়োগ করতে হবে। আরো ব্যাখ্যা করে বলা যায় বীজ গজানোর ১৭–২১ দিনের মধ্যে প্রথম সেচটি দেওয়া ভালো, কারণ এই সময়ের মধ্যে গমের চারার স্থায়ীমূল জন্ম নেয়। গাছের বয়স যখন ৫০–৬০ দিন হয়ে শীষে দানা ধরার সময় তখন দ্বিতীয় সেচটি দিতে হয়, গাছের ৭৫–৮০ দিন বয়সে তৃতীয় বা শেষ সেচ দিতে হয়। দানা শক্ত হওয়ার সময় সেচের পানি প্রয়োগ করলে তা ঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে পরিশেষে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়। উল্লেখ্য যে ধানের চাইতে গমের চাষে অনেক কম অর্থাৎ $\frac{1}{৫}$ ভাগ মাত্র সেচের পানি প্রয়োজন হয়।

কীটপতঙ্গ ও রোগ দমন : সুখের বিষয় বাংলাদেশে গমের ক্ষেতে রোগ ও পোকার আক্রমণ ধানের মতো তত প্রকট নয়। তবে গমে পাতার মরিচা রোগ, ঝুল রোগ, চারার মড়ক ও পাতার দাগ রোগ অনেক সময় দেখা যায়। ভিটাভেক্স–২০০ (প্রতি মণ বীজ ১$\frac{১}{২}$ ছটাক) দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করলে ঝুল রোগ, চারা মড়ক রোগ ও পাতার দাগ রোগ দমন করা যায়। গম গাছে শীষ আসার সময় ঝুল রোগ দেখা দিলে গাছের নিশান পাতা কিছুটা হলদে হয়ে যায়। ফলে, এই সমস্ত আক্রান্ত গাছ সহজে সনাক্ত করা যায় বিধায় সেইগুলি ক্ষেত হতে উঠায়ে অনেক দূরে মাটিতে পুতে ফেলা যায় অথবা পুড়ায়ে ফেলা যায়।

গম ফসলে কখনো কখনো জাব ও মাজরা পোকার আক্রমণ হয়। জাব পোকা দমন করতে হলে প্রতি একরের জন্য ১ পাঃ ম্যালাথায়ন–৫৭ ই. সি ৬$\frac{১}{২}$ মণ পানির সঙ্গে মিশায়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে ছিটায়ে দিতে হবে। মাজরা পোকা দমনের জন্য উপরোক্ত পরিমাণ পানিতে ১$\frac{১}{২}$ পাঃ ডায়াজিনন–৫০ ই.সি. সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করতে হবে।

গম গাছের চারা অবস্থায় কাটুই পোকা (cut worm) এবং তার পোকা (wire worm) ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। ১৯৭৫–৭৬ সালের রবি মৌসুমে এই দুই জাতীয় পোকার আক্রমণ কোনো কোনো এলাকায় দেখা গিয়েছিল। এইসব পোকা মাটিতে বাস করে, কাজেই সেই সব জমিতে বীজ বপনের আগেই মাটিকে শোধন করা প্রয়োজন। হেপ্টাক্লোর (Heptachlar) বা ডায়ালড্রিন (Dieldrin) নামক ঔষধ হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৪.৫ ও ৩.৫ কেজি জমিতে ছিটিয়ে চাষ করে নিলে জমি শোধিত হয় এবং এমতাবস্থায় উল্লিখিত পোকার আক্রমণ হয় না।

গম কাটা : বপনের ৬৫/৭০ দিনের মধ্যে গম গাছে ফুল ধরে। আর ৪০/ ৫০ দিন পর অর্থাৎ বীজ বপনের পর ১০০–১১৫/১২০ দিনের মধ্যে গম পাকে। গমের দানা পাকার সাথে সাথে গাছও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। এই অবস্থায় শুকনা দিন দেখে সকাল বা বিকেলে ক্ষেতের

গম কাস্তের সাহায্যে ধানের মতো কাটতে হয়। কাটার পর আঁটি বেঁধে মাড়াইয়ের জন্য উঠানে বা আঙ্গিনায় স্তূপীকৃত করে রাখা হয়।

গম মাড়াই-ঝাড়াই ও শুষ্ককরণ : গরুর পায়ের নিচে মাড়াই করে গমের দানা গাছ হতে আলাদা করতে হয়। খড়কুটা সহ গমের দানা কুলা ও চালনীর দ্বারা বাতাসের সাহায্যে পরিষ্কার করে নিতে হয়। কয়েকবার রৌদ্রে শুকানোর পর গম গোলাজাত করতে হয়। বীজের জলীয় অংশ শতকরা ১২–১৩ ভাগে নেমে আসলেই বুঝতে হবে বীজ ভালোভাবে শুকিয়েছে।

ফলন : বাংলাদেশে গমের গড়পড়তা ফলন কম, প্রতি একরে ২০.৬ মণ। উচ্চফলনশীল গম উন্নত পদ্ধতিতে চাষবাস করলে প্রতি হেক্টরে ২.০ টন থেকে ৪.০০টন পর্যন্ত দানা উৎপাদিত হতে পারে।[৮]

গমের ব্যবহার

গমের আটা হতে নানা রকম খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করা হয়। পাশ্চাত্যের দেশে অনেক রকম পাউরুটি, বিস্কুট তৈরিতে গমের ময়দা ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ, কুঁড়া ও নিম্ন মানের অংশ গরু ও শুকরের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে গম হতে পাউরুটি, বিস্কুট প্রস্তুত করা ছাড়াও চা-পাতি, তন্দুর রুটি পরোটা ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে, যেমন— আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াতে গম হতে এক প্রকার মদ (Beer) প্রস্তুত করা হয়। মিলে, কারখানায় প্রস্তুত কাপড়ে কলপ ব্যবহার করার জন্য গমের স্টার্চ (Starch) অনেক দেশে ব্যবহার করা হয়

নিম্ন তালিকায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গম চাউল হতে অধিকতর পুষ্টিকর।[১৭] তাই আমাদের পক্ষে ভাতের চাইতে অধিক গম খাওয়া ভালো।

সারণি ১৬ : চাউল ও গমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ

	চাউল (ঢেকী ছাঁটা)	গম
জলীয় অংশ	১২.২ ٪	১২.৫ ٪
আমীষ	৮.৫ ٪	১২.৫ ٪
তৈল	০.৬ ٪	১.৭٪
কার্বোহাইড্রেটস	৭৮.০ ٪	৭১.০ ٪
খনিজ	০.৭ ٪	১.৮ ٪

ভুট্টা

পৃথিবীর দানাজাতীয় শস্যের মধ্যে ভুট্টা একটি অন্যতম প্রধান ফসল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইহা একটি প্রধান দানা শস্য ; পৃথিবীর সমুদয় ভুট্টার অর্ধেক এই দেশে উৎপন্ন হয়। সেজন্য সে দেশে ভুট্টাকে 'ফসলের রাজা' নামে অভিহিত করা হয়। মানুষ ও পশুর খাদ্য-এই দুই হিসেবেই সে দেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মেক্সিকো দেশেরও ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য। সেই দেশে এই ফসলটির চাষবাসের অনেক উন্নতি বিধান করা হয়েছে। ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের ন্যায় মেক্সিকোতে একটি আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্র (Cymmit) স্থাপিত হয়েছে।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকো দেশে ভুট্টার উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তৎপর সেই অঞ্চল হতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তা বিস্তার লাভ করে। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ভুট্টা উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশগুলি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, প্রজাতন্ত্রী চীন, ব্রাজিল, রুমানিয়া, আর্জেন্টিনা, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

বাংলাদেশে ভুট্টা অনেক আগে থেকেই প্রবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় এ ফসলটির চাষ তেমন প্রসার ঘটেনি। অন্যদিকে একই সময়ে প্রবর্তিত শস্য গমের চাষে যথেষ্ট সাফল্য দেখা গিয়েছে। এরূপ হবার প্রধান কারণ হলো খাদ্য হিসেবে গম তেমন এ দেশবাসীর জনগণের মন জয় করতে পেরেছে, ভুট্টা তেমনটি পারে নি। তাছাড়া ভুট্টার আবাদ এদেশে গমের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। তবে ভুট্টার চাষ বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে যাওয়ার ফলে দেশের কোনো কোনো স্থলে এর আবাদ কমবেশি শুরু হয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৩০০০ হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টার চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় প্রায় ৩০০০ মে.টন দানা।[১৪] নিম্নের ১৭ নং সারণিতে জেলাভিত্তিক ভুট্টার আবাদি এলাকা ও উৎপাদন দেখানো হলো।

সারণি ১৭ : বাংলাদেশে জেলাভিত্তিক ভুট্টার আবাদি এলাকা ও উৎপাদন

জেলার নাম	জমির পরিমাণ (হেক্টরে)	উৎপাদন (মে.টনে)
ঢাকা	২০০	৬০০
নারায়ণগঞ্জ	২০	৬০
নরসিংদী	২০	৬০
গাজীপুর	১০০	৩০০
মানিকগঞ্জ	২০	৬০
মুন্সীগঞ্জ	২০	৬০
টাংগাইল	৩৫০	১০৫০
ময়মনসিংহ	২০০	৬০০
জামালপুর	৫০	১৫০
শেরপুর	৫০	১৫০
নেত্রকোণা	---	---
কিশোরগঞ্জ	৫০	১৫০
কুমিল্লা	৪০	১২০
বি, বাড়িয়া	১০০	৩০০
চাঁদপুর	২৫	৭৫
সিলেট	৩০	৯০
মৌলভীবাজার	৫	১৫
হবিগঞ্জ	৫০	১৫০
সুনামগঞ্জ	২৫	৭৫
চট্টগ্রাম	১৫০	৪৫০

কক্সবাজার	৫০	১৫০
নোয়াখালী	১০	৩০
ফেনী	৫০	১৫০
লক্ষ্মীপুর	৫০	১৫০
রাঙ্গামাটি	২৫০	৭৫০
খাগড়াছড়ি	২০০	৬০০
বান্দরবান	২৫০	৭৫০
বরিশাল	১২৫	৩৭৫
পিরোজপুর	২৫	৭৫
ঝালকাঠি	৫০	১৫০
ভোলা	৫০	১৫০
পটুয়াখালী	--	--
বরগুনা	২০	৬০
রাজবাড়ী	১০	৩০
ফরিদপুর	২৫	৭৫
গোপালগঞ্জ	--	--
মাদারিপুর	১০	৩০
শরিয়তপুর	৫০	১৫০
রাজশাহী	১২০	৩৬০
নওগাঁ	৩০	৯০
নাটোর	৫০	১৫০
চাঁ.নবাবগঞ্জ	৫০	১৫০
বগুড়া	২০০	৬০০
জয়পুরহাট	৫০	১৫০
পাবনা	১০০	৩০০
সিরাজগঞ্জ	১০০	৩০০
যশোর	১২৫	৩৭৫
নড়াইল	--	--
মাগুরা	২৫	৭৫
ঝিনাইদহ	৫০	১৫০
কুষ্টিয়া	৫০	১৫০
মেহেরপুর	৫০	১৫০
চুয়াডাঙ্গা	২৫	৭৫
খুলনা	৫০	১৫০
সাতক্ষীরা	১০	৩০
বাগেরহাট	১০	৩০
রংপুর	২০০	৬০০

গাইবান্ধা	১০০	৩০০
কুড়িগ্রাম	৫০	১৫০
লালমনিরহাট	১০০	৩০০
নীলফামারী	১২৫	৩৭৫
দিনাজপুর	৩৫০	১০৫০
পঞ্চগড়	৫০	১৫০
ঠাকুরগাঁও	২০০	৬০০

উৎস : খাদ্যশস্য উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ১৯৯৪-৯৫।

মাটি

উত্তম নিষ্কাশনযুক্ত হাল্কা ধরনের উর্বর মাটি ভুট্টা চাষের উপযোগী। এই হিসেবে দোয়াশ মাটি সর্বোত্তম গভীর পলিমাটি ও লাল দোয়াশ মাটিতেও ভুট্টা ভালো জন্মে। তাই মধুপুর অঞ্চলের লাল মাটিতে ভুট্টা ভালো জন্মিতে দেখা যায়। অম্লাত্মক হইতে ক্ষারাত্মক (পি. এইচ–৫.৫ হইতে ৮.০০) এই উভয় রকম মাটিতেই ভুট্টা জন্মাতে পারে।

জলবায়ু

গ্রীষ্মকালীন অর্থাৎ উষ্ণ আবহাওয়ায় (২১° সে. হতে ২৭° সে. তাপমাত্রায়) ভুট্টা ভালো জন্মে। তবে ঠাণ্ডা পরিবেশেও জন্মাবার উপযোগী ভুট্টার জাত রয়েছে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫ হতে ৪০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৬৩৫–১০১৫ মি. মি. ভুট্টা চাষের উপযোগী, তবে ১৫০–২০০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৩৮১–৫০৮ সে. মি. বৃষ্টিপাত অঞ্চলেও ইহা জন্মিতে পারে। অন্যদিকে রাশিয়ার শুষ্ক অঞ্চলে বার্ষিক ২৪৫ মি. মি. বৃষ্টিপাতেও ভুট্টার আবাদ হয়। সমুদ্র সমতল হতে ১২০০০ ফুট অর্থাৎ ৪০৩০ মিটার পর্যন্ত উঁচু পরিবেশেও ভুট্টা জন্মাতে পারে।[৮]

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

ভুট্টা graminae পরিবারভুক্ত ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম (Zea mays) ইহা বর্ষজীবী দণ্ডাকার নরম কাণ্ডবিশিষ্ট ও আখের পাতার ন্যায় লম্বা ও সরু পত্রযুক্ত একবীজপত্রী উদ্ভিদ গাছের গোড়ায় ধানের ন্যায় গুচ্ছমূল মাটির উপরিস্তরেই সঞ্চালিত হয়। মাটির উপর হতে গাছের উপরের কয়েকটি পর্বসন্ধিতে বায়বীয় মূল জন্মে। ভুট্টা গাছ ২ ফুট হতে ২৫ ফুট অর্থাৎ ০.৬২ মিটার হইতে ৮ মিটার উঁচু এবং ব্যাসে ½ ইঞ্চি হইতে ২ ইঞ্চি অর্থাৎ ১.২৫–৫ সে. মি. পর্যন্ত হতে দেখা যায়। একই গাছের মাথায় পুরুষ ফুল ও মাঝখানের পাতার গোড়ায় মুচার আগায় স্ত্রী ফুল জন্মে। এক মিটার উঁচু গাছে ৮/৯টি পাতা হয়, ২–৩টি মোচা ধরে ও দানা ৫০ দিনের মধ্যে পাকে আর ৬–৮ মিটার উঁচু গাছে ৪২–৪৪টি পাতা জন্মে, ১–২টি মোচা ধরে এবং তাহার দানা পাকতে ৩৩০ পর্যন্ত সময় লাগে।[৮] দানার শক্ত ও নরম শর্করা এবং চিনির ভাগের উপর ভিত্তি করে ভুট্টার জাতকে ৭টি ভাগে বা শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে যথা— ক. ফ্লিন্ট (flint), ডেন্ট (dent) সুইট (sweet), পপ (pop), ওয়াক্সি এবং ফ্লাওয়ারি (floury) ভুট্টা। (চিত্র ২.৪)।

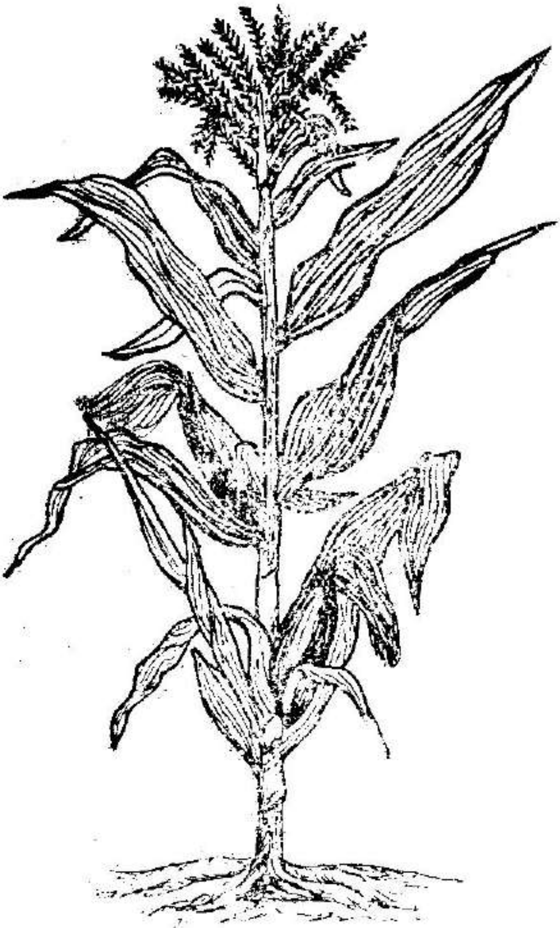

চিত্র : ২.৪. : ভুট্টা গাছ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর শঙ্কর ভুট্টা (hybrid corn) উৎপাদনের মাধ্য ভুট্টার চাষ করা হয়। দেখা গিয়েছে কোনো ভুট্টার জাত দুই এক বৎসরের বেশি ভালো ফল দেয় না। কাজেই প্রতি বৎসরের জন্য নতুন নতুন শঙ্কর জাতের ভুট্টা উদ্ভাবন করা হ যেগুলি অধিক ফলন দিতে সমর্থ।

বাংলাদেশে ভুট্টার জাতের কোনো স্থিরতা নাই। বিদেশ হতে যখন যে জাতের ভুট্টা হাতে আসে তাই চাষ করা হয়। সাধারণত আমাদের দেশে সুইট ও পপ কর্ণের চাষ হতে দেখা যায়। প্রতি বৎসর শঙ্কর জাতের ভুট্টা উদ্ভাবন করার মতো ব্যবস্থা এদেশে নাই। আর সে জন্যই ভুট্টার উৎপাদন হার খুবই কম।

বর্তমান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে Cymmit হতে অধিক ফলনশীল ভুট্টার অনেক স্ট্রেন (strain) এনে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ইতঃমধ্যেই কিছু কিছু ভুট্টার জাত বাংলাদেশের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়েছে এবং জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সে জাতগুলো শুভ্রা, বর্ণালি, খই, ভুট্টা, মোহর ইত্যাদি।[৩১]

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : বাংলাদেশে খরিপ ও রবি এই দুই মৌসুমেই ভুট্টার চাষ করা চলে। ভুট্টার জমি ৪–৫ বার আড়াআড়ি চাষ ও দুই বার মই দিয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত করতে হয়। বর্ষাকালীন চাষের জমি প্রস্তুতের সময় মাঝে মাঝে দুই চারটি সরু নালা রাখতে হয় যার মধ্য দিয়ে বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে।

সার প্রয়োগ : ভুট্টা অধিক খাদ্য গ্রহণকারী ফসল। সেজন্য এ ফসলটির চাষে উপযুক্ত পরিমাণে সার ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ–এ তিন রকম খাদ্যোপাদনবহনকারী সার ব্যবহার করারই প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নের ১৮ নং সারণিতে দেখান হলো কোন্ সার কি পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে।

সারণি : ১৮ ভুট্টা চাষে সার ব্যবহারের মাত্রা

রাসায়নিক সারের নাম	কেজি / হেক্টর	সারের পরিমাণ কেজি / একরে
ইউরিয়া	২২০	৯০
টিএসপি	১১০	৪৫
এম পি	৫০	২০
জিংক সালফেট (মাটিতে দস্তার অভাব থাকলে)	১০	৫

উৎস : ভুট্টার চাষ, বাংলাদশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৮৯

গোবর সার প্রয়োগ করতে পারলে ভুট্টার ফলন আরো ভালো হয়। সেক্ষেত্রে সে সার হেক্টর প্রতি ৫–৭ টন অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৬৫–৭০ টন ব্যবহার করা যেতে পারে। এ অবস্থায় ইউরিয়া কিছু কম পরিমাণে ব্যবহার করলেও চলবে। জমির উর্বরতা ভেদেও সমস্ত সারের প্রয়োগমাত্রা কমবেশি হতে পারে।

জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে অনুমোদিত ইউরিয়া সারের ১/২ ভাগ ও অন্যান্য সমস্ত সারের সবটুকুই ছিটিয়ে দিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান দু'ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ রবি মৌসুমে বীজ গজানোর ৩০–৩৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় ভাগ ৬০–৬৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। খরিপ মৌসুমে বীজ গজানোর ২০–২৫ দিন পর প্রথম ভাগ এবং ৪০–৪৫ দিন পর দ্বিতীয় ভাগ প্রয়োগ করতে হবে।[৪]

বীজ বপন : খরিপ মৌসুমে ফাল্গুন–চৈত্র ও রবি মৌসুমে কার্তিক–অগ্রহায়ণ মাসে ভুট্টার বীজ সারিতে বপন করতে হয়। ভুট্টার জন্য বাংলাদেশে এখনো কীটপতংগ ও রোগবালাই তেমন কোনো সমস্যা নয়। তবে কোনো কোনো সময় চারা অবস্থায় ভুট্টা ক্ষেতে কাটুই পোকার উপদ্রব দেখা যায়। পোকার কীড়াগুলো সাধারণত দিনের বেলায় চারা গোড়ায় মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রিবেলা বের হয়ে এসে চারাগাছের গোড়া কেটে দেয়। উরচুঙ্গাও কখনো কখনো এভাবে গাছের গোড়া কেটে ফেলে। গাছের গোড়ায় মাটি সরিয়ে নিলে কাটুই পোকার কীড়া দেখা যাবে। তখন সেগুলো ধরে নিয়ে মেরে ফেলা যায়। উরচুংগা মারার জন্য অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। অলড্রিন বা গ্যামাক্সেসান– ১০% চাউলের গুড়া বা গমের ভূষি ও ঝোলা গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে ছোট ছোট বড়ি তৈরি করতে হয়। তৎপর সে বড়িগুলো রাত্রিবেলা ক্ষেতে ছড়াতে রাখলে উরচুংগা সেগুলো খেয়ে মারা যাবে।

ভুট্টা গাছে মোচা পরিপক্ক হবার সময় টিয়া পাখি, কাক ও শিয়ালের আক্রমণ হতে পারে। পাহারার বন্দোবস্ত করে এ সমস্ত বালাইর হাত হতে ফসল রক্ষা করতে হবে।

বীজের পরিমাণ : বর্ণালি, শুভ্রা, ও সোয়ান–২ জাতের বীজ প্রতি হেক্টরে ২৫–৩০ কেজি এবং খৈ ভুট্টার ১৫–২০ কেজি বপন করতে হয়।[৪]

বপন পদ্ধতি : বীজ অবশ্যই সারিতে বপন করতে হবে। এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব হবে ৭৫ সে. মি. এবং এক এক সারিতে ২৫ সে. মি. দূরে দূরে ২টি করে বীজ বপন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ২.৫–৩.৫ সে. মি. গভীরতায় বীজ বপন করা হয়। চারা কিছু বড় হয়ে উঠলে একটি রেখে অপরটি টেনে তুলে ফেলে দিতে হবে।[৫]

আগাছা পরিস্কার ও গাছের গোড়ায় মাটি প্রয়োগ : ভুট্টার বীজ ৪/৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে বিশেষ করে খরিপ মৌসুমে আগাছাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। চারার বয়স সপ্তাহ তিনেক হলে প্রথমবারের মতো আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। কোদালীর সাহায্যে সারির মধ্যে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি আলগা করার দুটি কাজ একই সঙ্গে করা যায়। অলগা মাটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক ইউরিয়া মিশিয়ে দিয়ে তাহা সারির গাছের গোড়ায় কিছুটা উচু করে দিতে হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা : যদি দেখা যায় সারির মধ্যে কোনো কোনো জায়গায় চারাগাছ ঘন রয়েছে সেই স্থলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাছ রেখে বাকি গাছগুলি উঠিয়ে ফেলে দিতে হবে। সারিতে গাছ ঘন থাকলে তাহা মুচা কম ধরে ও ছোট আকারের হয়।

খরিপ মৌসুমে কোনো সময় ভারি বৃষ্টি হলে ক্ষেতে পানি জমে যেতে পারে। তৎক্ষণাৎ সে পানি নালাপথে বের করে দিতে হবে। ক্ষেতে কয়েকদিন পানি জমে থাকলে চারাগাছ হলুদ রং ধারণ করে এবং বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যায়।

গাছে মুচা ধরার সময় হয়ে আসলে শেষবারের মতো বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সারির মাটিতে জড়িয়ে গাছের গোড়ায় দিতে হয়। গাছের গোড়ায় মাটি বিশেষ করে খরিপ মৌসুমে যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে দিতে হবে কারণ গাছের গোড়া শক্তভাবে মাটিতে আটকিয়ে না থাকলে বর্ষাকালীন ঝড়বৃষ্টিতে তা সহজেই কাৎ হয়ে পড়ে যাবে। রবি মৌসুমে সেই সম্ভাবনা নেই বলে গোড়ার মাটি তত দৃঢভাবে না দিলেও চলবে।

খরিপ ফসলের জন্য সেচের কোনো প্রয়োজন নেই। বরং অতিরিক্ত পানি জমি হতে [illegible] বের করে দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। রবি মৌসুমে তিনটি না হলে দুইটি [illegible] প্রয়োজন রয়েছে। গাছে দুবার ইউরিয়া দেওয়ার পরপরই সেচ দুটি দিলে ভালো [illegible]

[illegible] ২০–৩৫ দিন পর ১ম সেচ, ৬০–৬৫ দিন পর ২য় সেচ ও প্রয়োজনবোধে [illegible] দিন পর ৩য় সেচ দিতে হয়।[১]

ফসল সংগ্রহ : ভুট্টার প্রতি গাছে সাধারণত একটি করে মোচা হয়। তবে কোনো [illegible] দুইটিও হতে পারে। আবার কখনো কখনো তিনটি করেও মোচা জন্মাতে পারে, [illegible] কোনো মোচাই ভালো হয় না। এই পরিস্থিতিতে দুইটি মোচা রেখে বাকিগুলি [illegible] দিলেই ভালো হয়।

[illegible] অধিকাংশ গাছে মোচা পাকার পর গাছ হতে মোচা উঠাতে হয়। দণ্ডায়মান গাছ [illegible] করে মোচা সংগ্রহ করা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উন্নত দেশে যান্ত্রিক [illegible] মোচা উঠাবার পর সেগুলি ট্রাক ভর্তি করে গুদাম ঘরে নিয়ে মজুদ করা হয়।

ভুট্টার মোচার দানাগুলি লম্বালম্বি সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকে যা দেখতে বেশ সুন্দর [illegible] মোচা ভেদে ৮–১২ লাইনে ৫০০–১০০০টি দানা থাকে। দানা হলুদ, লাল, বাদামি, [illegible] রঙের হয়। একই মোচায় একক রঙের না হয়ে বিভিন্ন রংয়ের দানা হতে [illegible]

ভুট্টার মুচা হতে দানা হাতের সাহায্যে উঠান যায় না। ইহা যান্ত্রিক উপায়ে উঠাতে হয়। [illegible] দানা হতে কত দানা উঠে আসে তা শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রকাশ করাকে [illegible] হার (shelling percentage) বলে সুষ্ঠুরূপে শুকানো পুষ্ট দানাযুক্ত ভালো মুচার শেলিং [illegible] অর্থাৎ প্রতি ১০০টি দানার মধ্যে উঠিয়া আসে ৮০টি দানা।

ফলন : ভুট্টার ফলন মৌসুম ও জাতভেদে বিভিন্ন হয়। সাধারণত খরিপ মৌসুমের ভুট্টার চেয়ে রবি মৌসুমে ফলন বেশি হয়। বর্ণালি, শুভ্রা, সোয়ান–২ এবং খই ভুট্টার ফলন রবি মৌসুমে প্রতি হেক্টরে যথাক্রমে ৫.০ টন ৫.৫ টন, ৫.০০ টন এবং ৪.০০ টন হয় আর খরিপ মৌসুমে ফলন যথাক্রমে ৪.০ টন, ৪.৫ টন, ৪.০ টন ও ৩.০ টন হয়।[৪]

ভুট্টার ব্যবহার : সয়াবীনের পরে ভুট্টার মতো রকমারী ব্যবহার হয় এমন ফসল [illegible] পৃথিবীতে আর নেই। ইহার দানা মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য এবং কাণ্ড খাদ্য হিসেবে গরু–বাছুরের প্রিয়

ভুট্টার মোচার কাঁচা নরম দানা খাওয়ার একটা রীতি পাক-ভারত–বাংলা উপমহাদেশে [illegible] মোচার দানাগুলি যখন দুধ–পর্যায়ে (milk stage) থাকে তখন সেগুলি গাছ হতে উঠান [illegible] মোচার আবরণ ফেলে দিয়ে তাতে মাখন বা সরিষার তৈল মাখান হয়, তৎপর আগুনে ঝলসিয়ে খাওয়া হয়। ইহা মুখরোচক ও পুষ্টিকর। পৃথিবীর অন্য কোনো কোনো দেশেও এই রকমভাবে ভুট্টার নরম দানা খাবার রীতি প্রচলিত আছে।

ভুট্টার শক্ত দানা হতে আটা করে রুটি প্রস্তুত করা হয়, পপ কর্ণ হতে সুন্দর খই ভাজা হয় ; আর এক জাতের দানা হতে চিড়ার মতো কর্ণ ফ্লেকস তৈরি করা হয় ; দুধ ও চিনি সহযোগে সকালবেলার নাস্তা হিসেবে ইহা বেশ তৃপ্তিদায়ক।

যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের চাইতে শুকর, গরুবাছুর ইত্যাদি প্রাণীকে অধিক ভুট্টা দানা খাওয়াে হয়। আবার প্রাণীর মধ্যে অধিক মাংস উৎপাদনের জন্য সব চাইতে বেশি খাওয়ানো হ শূকরকে।[১৬]

ভুট্টাদানার শর্করা হতে গ্লুকোজ ও ডেক্সট্রিন প্রস্তুত করা হয়। সেই দানা হতে আবা এক প্রকার ভোজ্য তৈল (Corn oil) ও মদ প্রস্তুত করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টার তৈ মেজোলা তৈল নামে পরিচিত।

বাংলাদেশে ভুট্টা-চাষের ভবিষ্যৎ

ভুট্টা একটি অতি বহুল ব্যবহৃত ফসল হওয়া সত্ত্বেও ইহা বাংলাদেশে সমাদর লাভ করতে পারে নাই— একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু সমাদর লাভ করতে পারেনি সেহেতু এর চাষও এদেশে অত্যন্ত সীমিত।

ফসলটি এদেশে দুই মৌসুমে চাষ করা যেতে পারলেও বিপত্তি অনেক। খরিপ মৌসুমে ইহা আউশ ধান ও পাটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। ফলে এদেশের খুব কম চাষীই এই ফসলটির দিকে দৃষ্টিপাত করে। দ্বিতীয়ত এই মৌসুমে ঝড়-ঝাপটায় ফসলটি সহজেই নেতিয়ে পড়ে, ফলে উৎপাদন দারুণভাবে কমে যায়। আবার রবি মৌসুমে চাষ করলে গম, গোল আলু প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। এই দুইটি ফসল বাদ দিয়ে কোনো চাষীই ভুট্টা চাষে আগ্রহ দেখায় না। সেই সময়ে সেচের পানি ব্যবহার করে ভুট্টার চাষ করাটা অত্যন্ত অবান্তর বলে তারা মনে করে।

চাউল ও গমজাত দ্রব্য এদেশের গ্রামবাসী বা শহরবাসী যেভাবে ব্যবহার করে সেভাবে ভুট্টা ব্যবহার করতে তারা মোটেই অভ্যস্ত নহে। সময় সময় ভুট্টার কচি দানা কেউ কেউ আগুনে ঝলসিয়ে খেয়ে থাকলেই ভুট্টাদানা আটা করে তা হতে রুটি বিস্কুট তৈরি করার কোনো ব্যবস্থা এদেশে নেই। তা ছাড়া সে রকম জিনিস তাদের কাছে উপাদেয়ও নয়। শুধু এদেশের কথাই কেন, ভুট্টার আটা ইউরোপের মতো সভ্য ও উন্নত মহাদেশেও সমাদর লাভ করতে পারে নি।

তাছাড়া ভুট্টার বাজারদর করিতে এদেশে কিছুই নেই। অধিকন্তু এক একর জমিতে একজন চাষী কমপক্ষে ২৫–৩০ মণ ধান উৎপন্ন করে যে টাকা মুনাফা করবে সেক্ষেত্রে ৮/১০ মণ ভুট্টা উৎপাদন করে তার চাইতে যে কম টাকা আয় করবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তাই পরিশেষে অনেকটা জোর দিয়া বলা যায় যে, বাংলাদেশে ভুট্টা চাষের ভবিষ্যত বলিতে তেমন কিছু নেই। তবে ডিমপাড়া হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে ভুট্টাদানার জন্য ও গাছ গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য সীমিত পরিমাণ কিছু ভুট্টার আবাদ করা যেতে পারে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান দানাজাতীয় শস্যের মধ্যে সরগমও একটি। গম, ধান ও ভুট্টার পরেই সরগমের স্থান। দুনিয়ার সমুদয় উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ সরগম উৎপন্ন হয় এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের নিরক্ষীয় ও উপ-নিরক্ষীয় অঞ্চলে।

প্রতিবেশী দেশ ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সরগমের চাষ হয়। তথায় ইহা জোয়ার নামে পরিচিত। মজুমদারের[৬] বিবরণীতে দেখা যায় ১৯৭৫–৭৬ সালে ভারতে প্রায় ১,৬০,৯২,৩০০

টি জমিতে সরগমের চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় ৯৫,০৪,০০০ মে টন সরগম। ভারতে যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম সেখানেই সরগমের চাষ হয়, তাই দেখা যায় মধ্য ও দক্ষিণ ভারতেই সব চাইতে সরগমের চাষ বেশি হয়। আর এইসব অঞ্চলে সরগমকে 'গরিব লোকের খাদ্য' বলা হয়।

বাংলাদেশে সরগম একটি অতি নগণ্য ফসল— মাত্র ২০০০ একর অর্থাৎ ৮১০ হেক্টর জমিতে ইহার চাষ হয়। অনেক চাষীর কাছে ইহা জোয়ার নামে পরিচিত। আবার কেউ কেউ ইহাকে "দৈত্যধান (giant rice)" নামে অভিহিত করে থাকে।

সাধারণত যে রকমের সরগম ফসলটি এদেশে জন্মান হয় তাহা আসলে দীর্ঘাকৃতির ঘাসজাতীয় সরগম যাতে সামান্য কিছু দানা জন্মে। ইদানীং দানা প্রধান সরগম চাষের জন্য এই দেশে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও থাইল্যান্ড হতে ভালো জাতের সরগম এনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান (M. C. C.) নোয়াখালী জেলায় সরগমের চাষাবাদ নিয়ে বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ কাজ করছে। তারা বেশ উৎসাহজনক ফল পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সরগমের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বিনা সেচেও অনেক ফসলের অনুপযোগী ক্ষারাত্মক ও লবণাত্মক অর্থাৎ অনুর্বর মাটিতেও ইহা জন্মাতে পারে। আবার খরিপ ও রবি— এই দুই মৌসুমেই সরগমের চাষ করা হয়। তাই বাংলাদেশে ফসলটির আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

পূর্ব–আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে সরগমের উৎপত্তি হয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়।[১০] সেই স্থান হতেই আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ও এশিয়া মহাদেশের চীন ও জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স হতে সরগম যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নীত হয়। ইউরোপ মহাদেশে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব হতেই সরগমের আবাদ প্রচলিত হয়।[১০]

মাটি

পাথুরে ও একেবারে বেলে মাটি ছাড়া প্রায় সব রকম মাটিতেই সরগম জন্মাতে পারে। তবে এঁটেল–দোয়াশ মাটিই সর্বোত্তম। একদিকে অল্প রসযুক্ত মাটিতেও যেমন জন্মাতে পারে অপরদিকে তেমনি সিক্ত মাটিতেও ফসলটি বেশ কিছুদিন টিকে থাকতে পারে। অম্লাত্মক, ক্ষারাত্মক ও লবণাত্মক —মাটির এই তিন অবস্থাতেই সরগম আশ্চর্যজনকভাবে খাপ খায়িয়ে নিতে পারে।

জলবায়ু

নিরক্ষীয় ও উপ–নিরক্ষীয় জলবায়ু সরগমের উপযোগী ; ২৭–২৯° সে: তাপমাত্রা সর্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়। তবে অত্যধিক এমনকি ১০৫° ফা: অর্থাৎ ৪০° সে. তাপমাত্রাও ফসলটি বিনা ক্ষতিতে টিকে থাকতে পারে ; সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬° সে. এর বেশি নয়। বাৎসরিক ১৭ হইতে ২৫ ইঞ্চি অর্থাৎ ৪৩০–৬৩৫ মি: মি: বৃষ্টিপাত হলেই চাষ করা চলে।[১২] যে অঞ্চলে বৎসরে ৪০ ইঞ্চি অর্থাৎ ১০২০ সে. মি. এর বেশি হয় সে অঞ্চলে সরগম ভালো হয় না।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

সরগম ধান ও ভুট্টার মতো Graminae পরিবারভুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Sorgum vulgari গাছটি দেখতে অনেকটা ভুট্টার মতো (চিত্র ২.৫) তবে গাছের আগায়ই কেবল ছড়াতে বীজ জন্মে। ভুট্টার মতো পাতার গোড়ার কিনারায় মোচা জন্মে না।

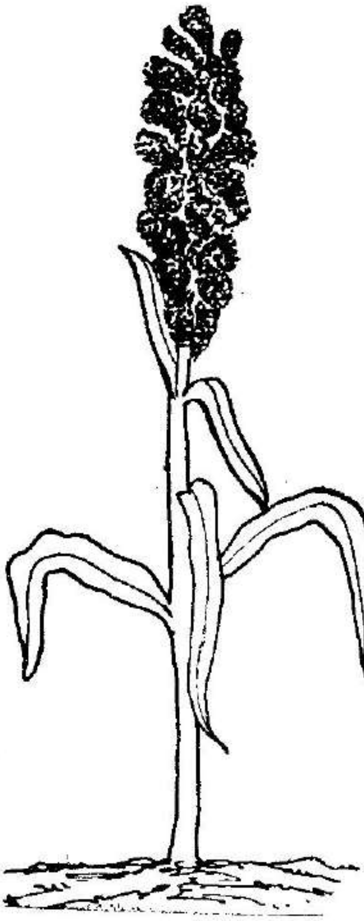

চিত্র : ২.৫ সরগম গাছ

সরগমের গাছ বিভিন্ন প্রকার হয়— লম্বাকৃতির গাছ যা উচ্চতায় ১০–১৫ ফুট অর্থাৎ ৩–৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে ; কখনো মিষ্টি রসযুক্ত, আবার কখনো শুধু রসযুক্ত আবার অল্প রস ও মিষ্টিযুক্ত হয় ; দানা অল্পস্বল্প ধরে। খর্বাকৃতির গাছ উচ্চতায় মাত্র ২–২½ ফুট অর্থাৎ ৬১–৭৬ সে: মি : হয় ; দানা যথেষ্ট ধরে, একটি শীষে ২০০০ পর্যন্ত দানা ধরতে পারে।

সরগম বর্ষজীবী গাছ হিসেবে বিবেচিত হলেও ইহা কয়েক বৎসর পর্যন্ত (৬–১৩ বৎসর) বাঁচতে পারে। তাই আঁখ ফসলের মতো মুড়ি সরগমের (raloon) চাষ করা যায়।

সরগম নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষণা কাজ চলছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বিদেশ হতে বেশ কিছু জাত আনিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে আর্জেন্টিনা হতে আনীত একটি জাত granadar INTA ইতঃমধ্যে এদেশের উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে। থাইল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র হতে আনীত Strain গুলির মধ্যে রয়েছে TS3--18-24, 498003 এবং 498023*

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে পরিপাটি করে প্রস্তুত করতে হবে। তিন চারটি চাষ ও বার দুই তিনেক মই দিলেই চলবে। জমিতে যেন কোনো ঢেলা এবং ঘাস-গাছড়া না থাকে।

সার প্রয়োগ : সরগম চাষে গোবর সার ব্যবহার করতে পারলে ভালো। নচেৎ রাসায়নিক সার তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি একরে ৪০ সের অর্থাৎ ৩৭ কেজি ইউরিয়া, ৩০ সের অর্থাৎ ২৮ কেজি টি. এস. পি ও ২০ সের অর্থাৎ ১৯ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে পারলেই চলে। গোবর জমি প্রথমবার চাষ করার পর পরই প্রয়োগ করতে হয়। টি. এস. পি. মিউরেট অব পটাশ এবং ইউরিয়া একত্রে জমি শেষবার চাষ করার পর সারিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি সারি হতে ২–৩ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫–৭ সে: মি: দূর পট্টি (band) বেঁধে সার ব্যবহার করা সমীচীন হবে।

বীজ বপন : সরগম বাংলাদেশে খরিপ ও রবি---এই দুই মৌসুমেই চাষ করা যায়। তবে দেশের সীমিত জমির কথা মনে রেখে রবি খন্দে চাষ করাই ভালো, বিশেষ করে ফসলটি যখন বিনা সেচেই জন্মান যায়।

জানুয়ারি মাসের মধ্যভাগ হতে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে সময় পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়; সারিতে বীজ বপন করা ভালো ; এক সারি হতে অন্য সারির ব্যবধান হবে ১½ ফুট অর্থাৎ ৪৬ সে: মি: এবং সারির মধ্যে এক গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব হবে ৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৫ সে: মি:। প্রতি গর্তে দুইটি বীজ বপন করা ভালো, কারণ একটি বীজ নাও গজাতে পারে। বপনের জন্য প্রতি হেক্টরে প্রায় সাড়ে সাত কেজি বীজ প্রয়োজন হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা : চারার বয়স ১০–১২ দিন হলে সারির মধ্যভাগের মাটি আলগা করে দিতে হয়। তৎসঙ্গে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হয় এবং সারির মধ্যে যেখানে দুটি করে গাছ এক সঙ্গে দেখা যায় সেখান হতে একটি গাছ উপড়ায়ে ফেলে দিতে হবে। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ৪ সপ্তাহের মধ্যে আবার আগাছা উঠলে পরিষ্কার করার কাজ শেষ করতে হবে।

সরগমে পোকামাকড় বা রোগবালাইর তেমন কোনো মারাত্মক আক্রমণ নাও হতে পারে। কোনো কোনো সময় এফিডের (Aphid) আক্রমণ হতে পারে : ইহারা সরগমের কচি ডগার রস খেয়ে গাছকে দুর্বল করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতি একরের জন্য আধসের ম্যালাথায়ন ৬¾ মণ পানিতে মিশায়ে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

---

* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের শস্য প্রজনন বিভাগের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে।

কয়েক রকম পাখি সরগমের যখন দানা পাকিতে থাকে তখন তা খেয়ে সাবাড় করে দিতে পারে। সে রকম পরিস্থিতিতে ক্ষেত হতে পাখি তাড়িয়ে ফসল বাঁচাতে হবে।

বাংলাদেশে যেখানে গড়ে বার্ষিক ৭৫ ইং অর্থাৎ ১৯০০ সি: মি: বৃষ্টি হয় যেখানে বিনা সেচেই সরগমের চাষ করা যেতে পারে। তবে কোনো জমি যদি একবারে রস ধরে না রাখতে পারে এবং সেচের সহজ বন্দোবস্ত থাকে সেক্ষেত্রে গাছের বয়স যখন মাসখানেক হয় তখন একটি সেচ দেওয়া যেতে পারে। ইহাতে নিশ্চিতরূপে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ফসল কাটা ও মাড়াই করা : খরিপ মৌসুমে সরগম ১০০ দিনের কম সময়েও পাকে, কিন্তু রবি মৌসুমে তা পাকতে প্রায় ৪ মাস অর্থাৎ ১২০ দিন সময় লেগে যায়। গাছে দানা পেকে যখন সোনালি রং ধারণ করে তখন কাস্তের সাহায্যে শীষগুলি গাছ হতে কেটে নেয়া হয়। অথবা শীষসহ গাছ গোড়া হতে কেটে নেয়া যায়। তৎপর গাছ হতে শীষ আলাদা করে নিতে হয়। শীষগুলি একদিন রোদ দেওয়ার পর লাঠির সাহায্যে পিটালেই দানা শীষ হতে আলাদা হয়ে আসে। শীষসহ গাছ ধান মাড়াই কলে (Paddle thresher) মাড়াই করা যেতে পারে।

বীজ পরিস্কারকরণ ও শুষ্ককরণ ও গুদামজাতকরণ : কুলা চালনীর সাহায্যে বীজ পরিষ্কার করে নেয়া যায়। দুই তিনবার রোদ্রে দিয়ে নাড়াচাড়া করলে বীজ শুষ্ক হয়ে যায়। মুখ বাধানো টিনে অথবা অন্য কোনো ভাণ্ডে বীজ রেখে গুদামজাত করা যায়। সরগমের বীজ ঠিকমতো গুদামজাত করে রাখা না হলে অল্প সময়ের মধ্যেই তা বীছনের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এই জন্য যথেষ্ট সাবধানতার সাথে এই বীজ সংরক্ষণ করতে হয়। যথানিয়মে সরগমের বীজ গুদামজাত করে রাখলে তাতে এক বৎসরকাল এমনকি তার অধিক দিন সময়ও অঙ্কুরোদগমক্ষতার বজায় থাকে।

ফলন : সরগমের গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৭০০–৮০০ কেজি। তবে উচ্চফলনশীল জাতের সরগম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করলে ইহার প্রায় ৪ গুণ অর্থাৎ ১১২০–১৩০৬ কেজি ফলন পাওয়া যেতে পারে।

চীনা ও কাউন

চীনা ও কাউন–এ দুটিই ক্ষুদ্র দানাজাতীয় ফসল। বাংলাদেশে চীনা–কাউন ধান ও গমের তুলনায় খুব অল্প পরিমাণে আবাদ হয়। যে সমস্ত জমিতে ধান, গম বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক শস্যের আবাদ করা হয় না তেমন প্রান্তিক জমিতেই (marginal land) চীনা–কাউনের চাষ করা হয়া। এ ছাড়া ফসল দুটির বৈশিষ্ট্য এরূপ যে নদ–নদীর চর এলাকায় পলি ও বেলে–দোঁয়াশ মাটিতে ভালো জন্মে।

বাংলাদেশে প্রতি বৎসর গড়ে ৩২৯৮৬ হেক্টর জমিতে চীনা–কাউনের আবাদ হয় আর তা হতে উৎপন্ন হয় ২৬২৮৫ টন দানা। উল্লেখ্য যে চীনার চেয়ে কাউনের আবাদ অনেক বেশি হয়। লক্ষণীয় যে শস্য দুটির আবাদ বৎসরের পর বৎসর কমে যাচ্ছে।

বিশেষ উৎপাদন এলাকা

বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা ও কুমিল্লা জেলায় চীনা–কাউনের যথেষ্ট পরিমাণ চাষ হয়। তবে টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মুন্সীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলাতেও চীনা–কাউনের আবাদ হয়।

মাটি ও জলবায়ু

হাল্কা অর্থাৎ পলি ও বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে চীনা-কাউনের চাষ ভালো হয়। তবে দোঁয়াশ মাটিতেও ফসল দুটির আবাদ করা চলে। মাঝারি তাপমাত্রা ও অল্প পরিমাণ বৃষ্টিযুক্ত এলাকাতেও চীনা-কাউনের সাফল্যজনকভাবে চাষ করা চলে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

চীনা-কাউন ধান এবং গমের সমগোত্রীয় উদ্ভিদ। কাউনের বৈজ্ঞানিক নাম Setaria italica (L) Beauv এবং চীনার Panicum millaceim L. গাছ দেখতে অনেকটা ধান গাছের মতো, তবে তাতে ধানের ন্যায় তত কুশী জন্মে না। কাউনের উচ্চতা চীনা গাছের চেয়ে বেশি; শীষসহ চীনা গাছের উচ্চতা ৬০–৭০ সে: মি: আর কাউনের ১২০–১৫০ সে: মি:। চীনার শীষ ও দানা দেখতে অনেকটা ধানের মতো, কিন্তু কাউনের শীষ ও দানা ঘাসের মতো—শীষ দেখতে অনেকটা শিয়ালের লেজের ন্যায় আর দানা গোলাকার।

কৃষকগণ সাধারণত স্থানীয় জাতের চীনা-কাউনের চাষ করে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বিজ্ঞানীগণের প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে কাউনের 'তিতাস' ও চীনার 'তুষার' নামে একটি করে উফশী জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে।[৫] সুতরাং এখন থেকে চাষীরা চীনা-কাউনের জাত দুটি ব্যবহার করে অধিক হারে উৎপাদন লাভে সমর্থ হবেন।

জাত দুটির বৈশিষ্ট্য

কাউনের জাত-তিতাস : এ জাতের গাছগুলো মাঝারি উচু, গড়ে ১২০ সে: মি: ; তুলনামূলকভাবে বেশ শক্ত, সহজে হেলে পড়ে না। এর শীষগুলো বেশ লম্বা, গড়ে ১৮ সে: মি:, মোটা এবং লোমশ; বীজ ঘিয়ে রঙের এবং মাঝারি আকারের। স্থানীয় জাতের চেয়েও আধুনিক জাতের ফলন প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ বেশি। জাতটি রবি মৌসুমে গড়ে ১১০ দিনে এবং খরিপ মৌসুমে গড়ে ৯০ দিনে পাকে।[৫]

চীনার জাত–তুষার : এ জাতের গাছের উচ্চতা মাঝারি, ৭০–৭৫ সে: মি: গাছগুলো বেশ শক্ত, ফলে সহজে নুয়ে পড়ে না। গাছের শীষ তুলনামূলকভাবে বেশ লম্বা–২০ সে: মি: এবং শীষে বীজগুলো গুচ্ছ আকারে থাকে। বীজের রং হালকা ঘিয়ে এবং তুলনামূলকভাবে বেশ বড়। স্থানীয় জাতের চেয়ে তুষারের ফলন শতকরা ৩৭ ভাগ বেশি এবং প্রায় ১০ দিন আগে পরিপক্কতা লাভ করে।[৫]

কাউনের চাষাবাদ পদ্ধতি

মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে কাউনের চাষ করা সম্ভব হলেও বেলে-দোঁয়াশ মাটি সর্বোত্তম।

জমি প্রস্তুতি : জমিতে 'জো' আসার পর মাটির প্রকারভেদে ২–৪ আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে নরম করে তৈরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ : কাউন চাষে সাধারণত সার ব্যবহার করা হয় না। তবে জমি অনুর্বর হলে তাতে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টি.এস. পি এবং ৩৫ কেজি এমপি ব্যবহার করলে ফলন ভালো হয়।[২] সেচবিহীন চাষে ইউরিয়াসহ সব রকম সার জমি প্রস্তুতির প্রাক্কালে শেষ সময় প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। আর যদি সেচ দেওয়া হয় তাহলে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করা উচিত হবে। সেক্ষেত্রে মোট ইউরিয়া সারের অর্ধেক জমি তৈরির সময় এবং বাকি অর্ধেক সমান দু কিস্তিতে প্রয়োগ করলে ভালো হবে। প্রথম কিস্তি বীজ বোনার ৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ বোনার ৫৫ দিন পর প্রয়োগ করা উচিত।

বীজ বপনের সময় ও পরিমাণ : দেশের উত্তরাঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করা ভালো। অন্য ফসলের সাথে সাথী ফসল হিসেবে খরিপ মৌসুমে চৈত্র মাসেও বীজ বপন করা যায়।

ছিটিয়ে বপন করলে প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি আর সারিতে বপন করলে ৮ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।[২] সারিতে বুনলে এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব হবে ২৫–৩০ সে: মি:। হাত লাঙ্গল দিয়ে ৩–৪ সে: মি: গভীর করে সারি টেনে নিয়ে তাতে বীজ বপন করে উপযুক্ত পরিমাণ মাটি দিয়ে সারিগুলো ঢেকে দিতে হবে।

আগাছা দমন ও গাছ পাতলাকরণ : যে কোনো ফসলে আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং কাউনের জমিতেও খরিপ বা রবি মৌসুমেই কিছু না কিছু আগাছা জন্মাবে। সময়মতো সেগুলি নিড়ি দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। এ সময়ে গাছ জমিতে বেশি জন্মালে ৬–৮ সে: মি: এর মধ্যে চারা গাছগুলো রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলে দিতে হবে।

সেচ প্রদান ও পানি নিস্কাশন : কাউন একটি খরা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ফসল হলেও রবি মৌসুমে কোনো সময় তীব্র খরা দেখা দিলে ২–১টি হাল্কা সেচ দেওয়া ভালো, তাতে ফলন বেশি পাওয়া যাবে। খরিপ মৌসুমে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, বরং বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করে দিতে হবে, অন্যথায় ফসল ভালো হবে না।

কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই দমন : তিতাস জাতে রোগবালাই তেমন একটা দেখা যায় না। স্থানীয় অনেক জাতে চারা অবস্থায় গোড়াপচা রোগ দেখা দিতে পারে। কিন্তু তিতাস জাতের এ রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে।

কাউনের নতুন জাত তিতাসে পোকামাকড়ের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম। তবে কোনো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রমণের ব্যাপক তা বুঝে হেক্টর প্রতি ৩০–৪০ আউন্স অর্থাৎ ৮৫০ গ্রাম – ১১৩৫ গ্রাম ডায়াজিনন তা ম্যালথিয়ন কীটনাশক (২.৫ গ্যালন পানিতে ৪৫ মি: লি: বা ঔষধের শিশির ৯ ক্যাপ) ছিটানো যেতে পারে।[২]

ফসল কাটা ও মাড়াই–ঝাড়াই : কাউনের শীষ খড়ের রং ধারণ করলে এবং দু একটি বীজ দাঁতে কাটার সময় 'কট' করে শব্দ হলে বুঝতে হবে ফসল কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে। এ অবস্থায় ফসল কেটে নিয়ে রোদে ভালোভাবে শুষ্ক করার পর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অথবা ফসল বেশি হলে গরুর পায়ে নিচে মাড়াই করে দানা ছাড়াতে হবে। খড়কুটাযুক্ত দানা চালনি–কুলার সাহায্যে পরিষ্কার করে নিয়ে কয়েকটি রোদ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর বীজ মুখবন্ধ টিনে বা অপর কোনো ভাণ্ডে যেমন পলিথিন ব্যাগে রেখেও গুদামজাত করা যেতে পারে।

ফলন

কাউন রবি ও খরিপ এ দু মৌসুমেই চাষ করা যায় তবে রবি মৌসুমে চাষ করাই ভালো, কারণ এ সময় ফলন ভালো হয়। এ মৌসুমে হেক্টরে ফলন হয়–২.৫ টন আর খরিপ ২ টন।

কাউনের ব্যবহার

তিতাস জাতের কাউন অন্যান্য কাউনের জাতের ও ধানের চাউলের মতো আতপ ও সিদ্ধ এ দুভাবেই ব্যবহার করা যায়। একশত কেজি খোসাযুক্ত কাউন ঢেঁকি বা খাইলে ছেটে নিলে ৮০–৮৫ কেজি চাল পাওয়া যায়। এ চালের সাথে মুগ বা মসুর ডাল মিশিয়ে সুস্বাদু খিচুরি রান্না করা যায়। দুধ ও চিনি মিশিয়ে এ দ্বারা সুস্বাদু পায়েশ তৈরি করা যায় যা শিশু রোগী ও গর্ভবতী মায়েদের সহজপাচ্য ভালো খাবার বলে বিবেচিত। এছাড়া তিতাসের চাল ভেজে তাতে গুড় মিশিয়ে এই ধরনের মোয়া তৈরি করা যায়। বলা যায় এ সমস্ত খাবারগুলো মুখরোচক এবং যথেষ্ট উপাদেয়।

বাংলাদেশে মশুরের ২টি উন্নত জাত রয়েছে। একটি জাতের নাম হলো বারি মশুর – ১ (উৎফলা) এবং অপরটির নাম বারিমশুর – ২। প্রথম জাতটি ১৯৯১ সালে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৯৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে।[১১] বারিমশুর–১ এর বৈশিষ্ট্য হলো গাছের পাতা গাঢ়, সবুজ কাণ্ড হাল্কা সবুজ এবং ফুলের রং সাদা। গবেষণা কেন্দ্রে জাতটির সর্বোচ্চ ফলন হয়েছে হেক্টর প্রতি ২৫০০ কেজি, তবে এটির গড় ফলন হলো ১৩০০–১৪০০ কেজি। বারিমশুর – ২ জাতটির গাছের আকৃতি মধ্যম ও গাছের উপরিভাগ সামান্য লতানো এবং শেষ অংশের পত্রাংশগুলো সরু আকৃতির। এ জাতটির ফলন উৎফলা অর্থাৎ বারিমশুর–১ এর চেয়ে অধিক, গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ১৫৮৫–১৬৮০ কেজি।[২]

চীনা চাষাবাদ পদ্ধতি

জমির প্রকৃতি ও প্রস্তুতি : বেলে–দোঁআশ অথবা দোঁআশ মাটি চীনা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। জমিতে অবশ্যই পানি অতিরিক্তি জমে থাকবে না। জমিতে চাষ দেবার 'জো' হয়েছে এমন দেখে ২–৪টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি নরম ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ : তুলনামূলকভাবে অনুর্বর জমিতেও চীনার আবাদ করা গেলেও সার প্রয়োগে ফলন বেশ বৃদ্ধি পায়। চীনা চাষের জন্য নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে।[৩]

সারের নাম	ব্যবহারের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)
ইউরিয়া	৯০ কেজি
টি এস পি	৭০ কেজি
মিউরেট অব পটাশ (এম পি)	৩৫ কেজি

সেচযুক্ত চাষে জমি প্রস্তুতের শেষ পর্যায়ে অর্ধেক পরিমাণ ইউরিয়াসহ অন্যান্য সমস্ত সার জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ৩৫–৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে এ সময় একটি হাল্কা সেচ দিতে হবে। কিন্তু সেচবিহীন চাষে সমস্ত সার এক সঙ্গে প্রয়োগ করাই ভালো।

বীজ বপনের সময় ও বীজ বপন : চীনার চাষ কেবল রবি মৌসুমেই করতে হয়। তুষার জাতের বীজ ব্যবহার করে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে পৌষ মাসের মধ্যে বীজ বপনের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তবে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বীজ বুনলে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

বীজ ছিটিয়ে বা সারি করে বপন করা যায়। প্রথম পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরের জন্য প্রয়োজন হবে ২০ কেজি বীজ আর দ্বিতীয় পদ্ধতির জন্য ১৮ কেজি।[২]

আগাছা দমন ও চারাগাছ পাতলাকরণ : সময়মতো ক্ষেতের আগাছা নিড়ি দিয়ে উঠিয়ে ফেলতে হবে। আগাছার প্রকোপ বেশি থাকলে দ্বিতীয়বারেও আগাছা পরিষ্কারের প্রয়োজন হতে পারে। চারা জমিতে বেশি জন্মে থাকলে অতিরিক্ত চারা [illegible] সময় উঠিয়ে ফেলে গাছের সংখ্যা সঠিক মাত্রায় রাখতে হবে। সে উদ্দেশ্যে [illegible] সে: মি: দূরত্ব বজায় রাখলেই চলবে।

সেচ প্রদান ও পানি নিস্কাশন : চীনা চাষে সাধারণত পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে মাটিতে রসের অভাব দেখা গেলে দু একটি হাল্কা সেচ দিলে ফলন ভালো হয়। [illegible] লক্ষ রাখতে হবে ক্ষেতে যেন বৃষ্টি বা সেচের পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না করে। [illegible] ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কারণে জমে যাওয়া পানি ভালোভাবে নিস্কাশিত করে দিতে হবে।

কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই দমন : স্থানীয় জাতের বীজ ব্যবহার করলে [illegible] দেখা দিতে পারে। কিন্তু তুষার জাতটি ব্যবহার করলে তেমন সম্ভাবনা থাকে না, কারণ এ জাতটির গোড়াপচা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়া, [illegible] আক্রমণও কম দেখা যায়। তবে তেমন আক্রমণ দেখা দিলে হেক্টর প্রতি [illegible] ডায়াজিনন বা ম্যালাথিয়ন কীটনাশক (২.৫ গ্যালন পানিতে ৪৫ মি: লি: বা [illegible] ক্যাপ) ছিটিয়ে দিতে হবে।[২]

ফসল কাটা ও মাড়াই-ঝাড়াই : গাছের শীষের দানার দু-তৃতীয়াংশ যখন [illegible] ধারণ করে তখন বুঝে নিতে হবে ফসল কাটার সময় হয়েছে। এ অবস্থায় ফসল [illegible] সাহায্যে কেটে নিয়ে ছোট ছোট আটি বেঁধে বসতবাটীর আঙ্গিনায় [illegible] শুকিয়ে নিতে হবে। এসব ফসল অল্প পরিমাণ বলে লাঠি দিয়ে [illegible] আলাদা করে নেয়া যায়। তবে যদি তা পরিমাণে বেশি হয় সেক্ষেত্রে [illegible] করাই সুবিধাজনক হবে। তৎপর কুলা, চালনী ব্যবহার করে [illegible] করে নিয়ে কয়েকদিন রোদে দিয়ে ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। [illegible] পলিথিনের ব্যাগে বীজ রেখে গুদামজাত করা [illegible]

ফলন : সাধারণ অর্থাৎ স্থানীয় জাতের [illegible] মতো আধুনিক জাত ব্যবহার করে চীনার আবাদ করলে ফলন প্রতি [illegible] পর্যন্ত হতে পারে।

চীনার ব্যবহার

কাউনের মতো চীনার চাল সিদ্ধ বা আতপ এ দু'ভাবেই খাওয়া যায়। [illegible] ছেটে নিলে ৮৫ সের অর্থাৎ ৭৯ কেজি চাল পাওয়া যায়। চীনার চাল দিয়ে [illegible] খাওয়া গেলেও আর বহুরকম ভাবে তা খাবারের জন্য ব্যবহার করা যায়। [illegible]

চালের সাথে ডাল মিশিয়ে খিচুরী পাক করা যায়। এর সাথে নানা প্রকার সবজি মিশালে খিচুরী আরো উপাদেয় ও পুষ্টিকর হয়। দুধ চিনি মিশিয়ে চীনার চাউল দিয়ে পায়েসও রান্না করা যায় যা বেশ সুস্বাদু। অতএব চীনার চাউলের আটা দিয়ে তৈরি নানা রকমের তেলে ভাজা পিঠা সবার জন্য সুস্বাদু খাবার। এছাড়া চীনার চাল ভেজে নিয়ে গুড়ের সাথে মিশিয়ে এক রকম মোয়া তৈরি করা যায়। ভাজা চালের গুড়া দিয়ে ছাতু তৈরি করেও খাওয়া যায়।

সরগমের ব্যবহার

এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীরা সরগম খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। তবে মানুষের খাদ্য হিসাবে ইহা গম, ভুট্টা ও চাউলের চাইতে নিকৃষ্ট। বীজ হতে আটা করে সেই আটা হতে চাপাতি ও পায়েস তৈরি করে বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের লোক খেতে শিখেছে। সরগমের দানা ভেজে খৈ ও মোয়া তৈরি করা যায়। দানা দ্বারা চাউলের মতো খিচুরী করেও খাওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ায় সরগমের দানা গাভীর দুধ বৃদ্ধি এবং গরু ও শুকরকে মোটা করার জন্য খাওয়ানো হয়। এইসব দেশে সরগমের সবুজ গাছও সাইলেজ করে গরু বাছুরকে খেতে দেওয়া হয়। মিষ্টি রসালো গাছের রস হতে কোনো কোনো দেশে সিরাপ প্রস্তুত করা হয়।

অল্প বয়স্ক সরগমের গাছ বিশেষ করে সবুজ অবস্থায় গরুবাছুরকে খাওয়ালে অনেক সময় সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সরগমের ছোট ছোট চারা, বড় বড় গাছ কেটে নেয়ার পর সেগুলির গোড়া হতে যে ফেকরী (ratoon) বা কুশী বের হয় এবং অনাবৃষ্টির ফলে যে গাছগুলি ছোট অবস্থায় থেকে যায়, সেই সমস্ত গাছ গরুবাছুরের জন্য বিষাক্ত। সেইরূপ গাছ খেলে গরুমহিশ মারা যেতে পারে। এই ধরনের গাছের কাণ্ডে ও পাতায় এক রকম বিষাক্ত রস (glucocides) সঞ্চিত হয়।[৫] সেইগুলি খাওয়ার ফলে গরুর পাকস্থলীতে হাইড্রোসায়ানিক (hydrocyanic acid) এসিড নামে এক প্রকার অত্যন্ত বিষাক্ত রাসায়নিকের সৃষ্টি হয় যার ফলে গরুবাছুর শীঘ্র মারা যায়।

সুতরাং গরুবাছুরকে খাওয়ানোর জন্য বয়স্ক এবং কিছুটা শুষ্ক ও সাইলেজ করা গাছ ব্যবহার করতে হয়। গাছ যত বড় হতে থাকে গ্লুকোসাইডের পরিমাণ তত কমে যেতে থাকে; ২½ মাস বয়স্ক গাছে ইহার পরিমাণ একবারে কমে যায় এবং তখন সেই গাছ গরুবাছুরকে নিরাপদে ভক্ষণের জন্য দেওয়া যায়। তবে আরো বেশি বয়সের গাছ গো খাদ্যরূপে ব্যবহার করা ভালো। কারণ ইহাতে একদিকে গাছের ফলন বেশি পাওয়া যায় এবং অন্যদিকে বিষাক্ততার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।[৭]

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গম গবেষণা কেন্দ্র নশিপুর, দিনাজপুর : লাভজনক পদ্ধতিতে গম উৎপাদনের উপায়, ১৯৯০।

২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জয়দেবপুর, গাজীপুর : কাউনের নতুন জাত তিতাস, ১৯৯০।

৩. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর : চিনার উফশী জাত তুষার, ১৯৯৬।

৪. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল : ভুট্টার চাষ, ১৯৮৯।
৫. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর : আধুনিক ধানের চাষ, ১৯৯৫।
৬. মজুমদার, ম : পূর্ব-ভারতের ফসল, ১৯৮১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। আর্য ম্যানসন, ৬/এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা – ৭০০১৩। পৃ. ৩৩–৩৫।
৭. ঐ, পৃ. ১৩১–১৪১।
৮. হাছানুজ্জামান, শা. মোঃ মেক্সিকান গমের চাষ, ১৯৬৭। বাংলাদেশ কৃষিতথ্য সংস্থা। কৃষি কমপ্লেক্স, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
৯. Ahmad. K. U : Bangladesh Agriculture and field crops. 1980. Publisher : Mrs. Mumtaj Kamal. Bunglow No. 2, FarmGate, Dhaka.
10. ADAB NEWS. Vol. V. no. 7 : Sorghum. 1978.
11. ADAB NEWS. Vol. VI. no. 1 : Plant, Soil and Water, 1979.
12. Aiyar, A. K. Y. N : Field Crops of India. 1947. Bangalore. Printed by the Suptd. at the Govt. press. PP. 42-115.
13. Ibid, pp. 371.
14. B.B.S : The Yearbook of statistics. 1995.
15. Hill. A. F : Economic Botany. 1972 Tata Mcgrow-Hill Publishing Co. Ltd. New Delhi. pp. 296-319.
16. Martin, J. H. and Leonard, M : Principles of Field Crop Production, 1967. The Macmillan Co. N. Y. pp. 291-305.
17. Ibid, pp. 349-495.
18. Ministry of Agriculture : Development Statistics of Bangladesh Agriculture. Series No. 6 Dec. 1981.
19. Palapac. A. C. World Rice Statistics, 1982. The IRRI Deptt. of Agril. Econ pp. 12-15.
20. Rather, H. C. and Harrison, C. M : Field Crops. 1951. Mcgraw-Hill Book Company. INC.N P. 245.
21. Seed Certification Agency, Gazipur : Approved crops Varieties, 1955.
22. Wolfe, T. K. and Kipps, Ms : Production of Field crops. Macgraw-Hill Book Company, N.Y. P . 300.

তৃতীয় অধ্যায়
ডাল জাতীয় শস্য
[PULSES]

মুগ, মশুর মাষকলাই, খেসারি, ছোলা, মটর, প্রভৃতি ডালজাতীয় শস্য হিসেবে পরিচিত। সমস্ত ডালশস্যই Leguminoseae পরিবার Papilionaceae উপ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন বা আমিষ (২০-২৫%) থাকে। যারা দারিদ্র্যের জন্য মাছ-মাংস ক্রয় করে খেতে অক্ষম তারা তুলনামূলকভাবে স্বল্প মূল্যের ডাল ভক্ষণে আমিষের অভাব দূর করতে পারে। সেইজন্য ডালকে 'গরিব লোকের মাংস' (poor men's meat) নামে অভিহিত করা হয়। আমিষ ছাড়াও ডালে খনিজ (ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস) ও বি-ভিটামিন থাকে। উপরন্তু ডাল মানবদেহে শক্তি যোগাতেও সক্ষম। এই হেতু নিরামিষভোজীরা ডাল ভক্ষণে আমিষ ও অন্যান্য খাদ্যোপাদানের যোগান পেয়ে স্বাস্থ্য রক্ষায় সমর্থ হয়। ভারতবর্ষের কোটি কোটি নিরামিষভোজীদের কাছে ডাল অপরিহার্য খাদ্যবস্তু। তারা ডাল শস্যের সাহায্যে ডাল ছাড়াও রকমারি রান্নাবান্না করে থাকে।

ডাল শস্যগুলির একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে ইহারা তাদের শিকড়ের গুটি বা অর্বুদে (nodules) বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে সক্ষম, যার ফলে তাহাদের চাষের সময় তেমন একটা সার বিশেষ করে নাইট্রোজেন ঘটিত সার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। মাটি উর্বর হলে সার একটুও ব্যবহার না করলেও চলে। উপরন্তু ইহাদের শিকড়ে সঞ্চিত নাইট্রোজেনের কিছু অংশ মাটিতে থেকে যায় বলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। শিকড়ে ভালো গুটি হলে হেক্টর প্রতি ১০০ হতে ২৫০ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে যোগ হয়।

ডাল জাতীয় শস্য উৎপাদনে জমি চাষবাসেরও বিশেষ একটা প্রয়োজন হয় না। কোনো কোনোটি —যেমন মুগ, মাষ ও খেসারির জমিতে একটি চাষ না দিয়াও বীজ বপন করা যায়। রসযুক্ত জমিতে অথবা মৌসুমে দুই এক পশলা হাল্কা বৃষ্টি হলে সেচের পানি ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হয় না। বরং একটু বেশি বৃষ্টি হলে বা সেচের পানি বেশি ব্যবহার করে ফেললে ইহাদের ফলন কমে যায়।

বাংলাদেশে প্রধানত রবিখন্দে মশুর, ছোলা, মুগ, মাষ, খেসারি, মটর প্রভৃতি ডাল শস্যের চাষ করা হয়। মুগ ও মাষকালাই খরিপ মৌসুমেও চাষ করা চলে।

মশুর

বাংলাদেশের ডালজাতীয় ফসলগুলির মধ্যে মশুর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাঙ্গালির উদ্ভিজ্জ আমিষ হিসেবে ইহা শীর্ষস্থানীয়। ইহাতে শতকরা ২৫.১ ভাগ প্রোটিন বা আমিষ সহ ৫৯.৭ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ০.৭ ভাগ চর্বি, ২.১ ভাগ খনিজ পদার্থ এবং ১২.৮ ভাগ পানি আছে।[৪] শহরবাসী প্রায় সবার ঘরে প্রতিদিন মশুর ডাল রান্না হয়। গ্রামাঞ্চলে মাষ, মুগ প্রভৃতির সাথে সাথে মশুরের ডাল ব্যবহৃত হলেও শহরবাসীরা যেন এই ডাল ছাড়া আর কিছুই বুঝেনা। ইহার কারণ, মশুরের ডাল একদিকে যেমন উপাদেয়, অন্যদিকে তেমনি রান্না করা অতি সহজ।

বাংলাদেশে আবাদি এলাকা ও উৎপাদন খেসারির পরে মশুরের স্থান। রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, ও ঢাকা জেলায় প্রধানত মশুরের চাষ হয়। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক হিসেবে দেখা গিয়েছে ১৯৯৩–৯৪ সালে দেশে ৮৩৭৫৫ হেক্টর জমিতে মশুরের আবাদ হয় আর উৎপন্ন হয় ১৬৮০০০ মে. টন ডাল।

কারো কারো মতে এশিয়া মাইনর, গ্রিস, মিশর প্রভৃতি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মশুর উৎপত্তি লাভ করে পূর্বদিকে এর চাষ বিস্তার লাভ করেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে মশুর হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যাঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে।[৪]

মাটি ও জলবায়ু

বেলে-দোঁয়াশ এবং এঁটেল-দোঁয়াশ মাটিতে মশুর ভাল জন্মে। মাটি সুনিষ্কাশন যুক্ত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়, কারণ জলাবদ্ধতা এই ফসলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

শুষ্ক ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মশুর ভালো জন্মে ; মাঝারি হতে কম বৃষ্টিপাত হলেই চলে। সারা মৌসুমে এক ইঞ্চি বৃষ্টিপাত না হলেও একটি সেচ দিয়েও ফসলটি জন্মান যায়। সমুদ্র সমতল হতে ১১৫১০ ফুট অর্থাৎ ৩৫৬৫ মিটার উঁচু উপত্যকায়ও মশুর, জন্মাতে পারে।[৪,৫]

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

মশুর শিম্বিজাতীয় (Leguminoseae) বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম লেন্স এসকুলেন্টা Lens culnaris Medik. ঝোপবাঁধা গাছ উচ্চতায় এক ফুট হতে দুই ফুট অর্থাৎ ৩১–৬১ সে: মি: হয় ; পাতাগুলি খুবই ছোট, ফুল কখনো সাদা আবার কখনও গোলাপি। সীম বা বীজের ছড়া ½ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৩ মি: মি: লম্বা হয় এবং তাতে চেপ্টা উত্তল লেন্সের আকারের দুটি বীজ উৎপন্ন হয়। (চিত্র ৩.১)

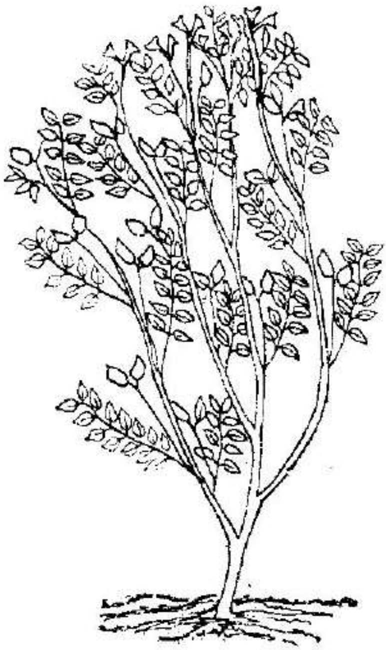

চিত্র ৩.১ মুশুর গাছ

চাষাবাদ প্রণালী

জমি প্রস্তুতি : এদেশের চাষীরা মশুরের জমি ভালোভাবে প্রস্তুত করেন না। দুই তিনটি চাষ দিয়ে মাটি উলট–পালট করে বীজ বোনেন কিন্তু তা অনুচিত, ভালোভাবে মশুরের আবাদ করতে হলে ৫/৬ বার চাষ ও বার কয়েক মই দিয়ে পাইট করে জমি প্রস্তুত করতে হবে।

সার প্রয়োগ : মশুর শিম্বীজাতীয় ফসল বলে তাতে বিশেষ সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। চাষীদের ধারণা এই ধারণা ফসলে সার প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরীক্ষা–নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে কিছু কিছু সার ব্যবহার করলে ফসলটির ফলন বেশ বৃদ্ধি পায়। সার নিম্নে উল্লেখিত পরিমাণে ব্যবহার করতে হয় :

	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
ক. পচা গোবর	৫০ মণ	৪.৫ টন
খ. ইউরিয়া	৩০–৩৫ সের	৩০ কেজি
গ. টি. এস. পি	১ মণ ২০ সের	৪০ কেজি
ঘ. মিউরেট অব পটাশ	২৫ সের	২০ কেজি

গোবর জমিতে প্রথমবার চাষ দেওয়ার পর ছড়িয়ে দিতে হয়। টি. এস. পি ও পটাশের সবটুকু এবং ইউরিয়া অর্ধেক ভাগ জমিতে শেষ চাষ ও মই দেওয়ার সময় প্রয়োগ করতে হয়. গাছে ফুল ধরার কিছু আগে বাকি অর্ধেকটা ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়।

বীজ বপন : কার্তিক মাসের দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই বীজ বপন করা ভালো। বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বপন করা হয়। সারি করেও বীজ বপন করা যেতে পারে ইহা কখনো কখনো সরিষার সাথে মিশ্র ফসল হিসেবে চাষ করা হয় মশুর একক ফসল হিসেবে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ৩০–৩৫ কেজি বীজ বপন করতে হয়; সারি করে বপন করলে ২০–২৫ কেজি বীজ বপন করলেই চলে। সরিষার সঙ্গে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করলে বীজের পরিমাণ ১০–১৫ কেজি লাগবে। বীজ বপন করার পর একটি হাল্কা চাষ ও মই দিয়ে বীজগুলি মাটির নিচে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হয়, তা হলে বীজ অঙ্কুরোদগম ভালো হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা : ভালোভাবে জমি প্রস্তুত করলে ও ফসলের গাছগুলি বৃদ্ধি পেয়ে ঢেকে ফেললে আগাছা দমন করার কোনো প্রয়োজন হয় না। তবে একবার আগাছা পরিষ্কার করে ও মাটি আলগা করে দিলে ফসলের যথেষ্ট উপকার হয়।

জমিতে রস থাকিলে সেচ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। তবে যদি দেখা যায় ফসল বৃদ্ধিকালীন সময়ে মাটিতে রসের অভাব ঘটেছে তেমন অবস্থায় একটি হাল্কা ধরনের সেচ দিলে ফসলের খুব উপকার হয় এবং ফলন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে এই ফসলে কখনো বেশি সেচ দিতে নেই। তাহলে গাছ পচে যাবে অথবা লেপটানো সুন্দর গাছ হতে পারে, কিন্তু তাতে ফুল ও গুটি খুব কম হবে। মশুর ফসলে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের তেমন কোনো শঙ্কাজনক আক্রমণ হয় না।

ফসল কাটা : একশত পাঁচ হতে একশত দশ দিনের মধ্যে মশুর পাকে। হাতে টেনে গাছ উঠিয়ে মাঠে দু একদিন রাখতে হয়। তৎপর বোঝা বেঁধে মাথায় করে বাড়ির আঙ্গিনায় এনে রাখা হয়. বলা প্রয়োজন যে গাছ হাতে টেনে গোড়াসহ না উঠিয়ে কাস্তের সাহায্যে গোড়া কেটে উঠান উচিত। তাতে জমির উর্বরতা নষ্ট না হয়ে বরং বৃদ্ধি পায়।

মাড়াই-ঝাড়াই ও বীজ শুষ্ক করা : দুই তিন দিন রোদে দেওয়ার পর গাছগুলি যখন শুকিয়ে মচমচা হয় তখন সেগুলি লাঠির সাহায্যে একটু মৃদু আঘাত করলেই বীজ গাছ হতে আলাদা হয়ে যায়। পরিমাণে বেশি হলে গরুর পায়ের নিচে দিয়েও এই কাজটি সম্পন্ন করা যায়। তৎপর চালনীর সাহায্যে গাছের টুকরা হতে বীজ আলাদা করা হয়। পরিশেষে কুলার সহায্যে বীজ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা যায়। এই পর্যন্তও বীজগুলি বেশির ভাগ খোসার মধ্যে থেকে যায়।

দুই তিন বার রৌদ্রে দিয়ে নাড়াচড়া করলে শুকিয়ে যায়। খাওয়ার জন্য যে ডাল বাজারে দেখা যায় সে অবস্থায় পেতে হলে প্রথমত খোসা ছাড়ায়ে নিতে হয়। তৎপর খোসা ছাড়ান বীজ ঢেকিতে কুটলে বীজের বহিরাবরণ চলে যাওয়ার পর বীজগুলি কমলা রংয়ের দেখায় এবং এগুলিই বাজারে প্রাপ্ত মশুরের ডাল।

ফলন : মসুরের গড় উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ৭০০ কেজি, তবে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে [illegible] কেজি পাওয়া যেতে পারে।

মুগ ও মাষকলাই

বাঙ্গালির অতি পরিচিত ডালশস্য মুগ ও মাষকলাই। মাষকলাই ও অন্যান্য ডালশস্য, যেমন– [illegible] মসুরি, ছোলা, অড়হড় ইত্যাদি হতে মুগ ডাল বাঙ্গালির কাছে অতীব উপাদেয় ও [illegible] পক্ষে মুগ অন্যান্য ডাল হতে শ্রেয়, কারণ খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি [illegible] ও ভক্ষণে অন্যান্য ডালের মতো পেটফাপা ইত্যাদি গোলমালের সৃষ্টি করে না। তবে [illegible] সরবরাহ বাজারে এত কম যে সেজন্য ইহার দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। [illegible] মাষকলাই মুগের চাইতে সহজলভ্য, কারণ ইহার আবাদ অনেক বেশি।

বাৎসরিক প্লাবনের পর নদীর চর এলাকা ও অন্যান্য নিচু অঞ্চলের পলিপড়া মাটিতে মুগ ও মাষকলাইর চাষ করা হয় ; ১৯৯৩–৯৪ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে [illegible] হেক্টর জমিতে মুগ এবং ৬৬৪০০ হেক্টর জমিতে মাষকলাইর আবাদ হয় এবং যথাক্রমে উৎপাদিত হয় ৩০০০০ মে. টন মুগ এবং ৫২০০০ মে.টন মুগ এবং ৫২০০০ মে. টন মাষকলাই।[৮]

মাটি ও জলবায়ু

পলি ও দোয়াশ মাটি মুগ ও মাষকলাইর জন্য উপযোগী। তবে সুনিষ্কাশনযুক্ত এটেল-দোয়াশ মাটিতে মাষকলাই জন্মিতে পারে।

মাঝারি বৃষ্টিপাত অর্থাৎ ৭৬২–৮৯০ মি: মি: হলেই চলে। অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বর্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফসল দুইটির চাষ করা চলে যেমনটি আমাদের দেশে করা হয়। উষ্ণতা ১৬–২১° সে. ফসল দুইটির জন্য উপযোগী।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

মুগ ও মাষকালাই উভয়ই শিম্বী-পরিবারভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বর্ষজীবী উদ্ভিদ। মুগের বৈজ্ঞানিক নাম Vigna radiata (L) Willezek. এবং মাষকলাইর বৈজ্ঞানিক নাম Phaseolus mungol. উভয় প্রকার গাছের উচ্চতা ৩০–৪৫ সে: মি:।[২,৯] কোনো জাতের গাছ খাড়া থাকে এবং কোনো জাতের গাছ কিছুটা লতিয়ে যায় ; বোটাযুক্ত পত্রফলক তিন ভাগে বিভক্ত। মাষকলাইর পাতা গাঢ় সবুজ রংয়ের এবং তাতে কিছু কিছু শুঙ্গ থাকে ; কাণ্ড ঈষৎ লাল রঙের এবং তাতেও কিছু শুঙ্গ দেখা যায় (রেখা চিত্র ৩.২ এবং ৩.৩) আবার মাষকলাইর ফুল হলুদ রংয়ের, দণ্ডাকার শুঁটি শুঙ্গযুক্ত, কোনো জাতে লম্বা, কোনো জাতে খাটো ; শুঁটি $1\frac{1}{2}$ হতে $2\frac{1}{2}$ ইঞ্চি অর্থাৎ ৪–৬ সে: মি: লম্বা এবং শুঁটিতে ৮ হতে ১৫টি কাল অথবা গাঢ় বাদামি অথবা সবুজ রংয়ের বীজ থাকে। অন্যদিকে মুগে ফুলের রং কিছুটা হাল্কা হলুদ : শুঁটি দণ্ডাকৃতির ও সরু এবং শুঙ্গবিহীন ; বীজের রং হলুদ বা সোনালি হলুদ এবং আকারে কিছু ছোট।[৪,৬]

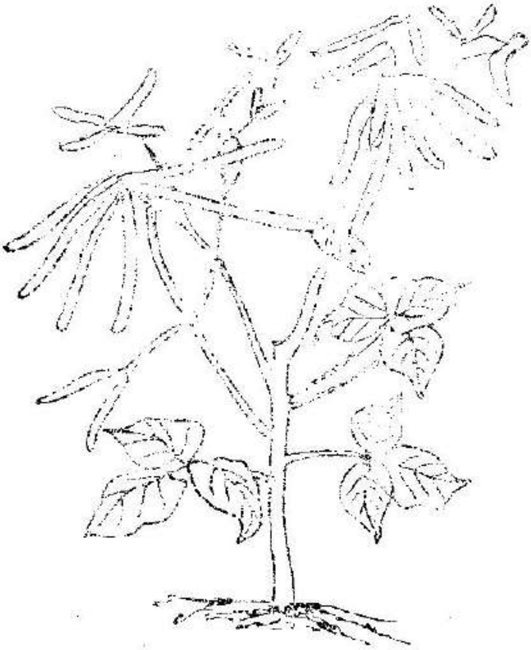

চিত্র : ৫.১ মুগ গাছ

এতদিন পর্যন্তও চাষীরা তাহাদের নিজেদের হাতের মুগ ও মাষকলাই জাতের চাষ করে আসছেন। অধুনা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ডাল গবেষণা বিভাগের প্রচেষ্টায় মুগ ও মাষকলাই এই উভয় শ্রেণীর কলাইর কয়েকটি করে জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। সেই জাতগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো।[১২]

মুগ

কান্তি (বারি মুগ ২) : খরিপ ও রবি মৌসুমের মাঝামাঝি অর্থাৎ জমি পতিত থাকার সময় এ জাতের মুগ ডালটি চাষ করার উপযোগী। গাছের উচ্চতা ৪৫–৫০ সে: মি: এবং জীবনকাল ৬০–৬৫ দিন। স্থানীয় জাতের চেয়ে শতকরা ৩০–৩৫ ভাগ বেশি ফলন দেয়। প্রতি হেক্টরে ৯০০–১২০০ কেজি বীজ উৎপন্ন হয়। বীজের সবুজ জাতটির ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে।

চিত্র : ৫.৫ মাষকলাই গাছ

২. মুবারিক (বারি মুগ-১) : মুগের এই জাতটিও ভারতীয় একটি জাত হতে নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। উপরোক্ত জাতটির চাইতে ইহা স্বল্প দিনের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করে অর্থাৎ ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে ইহাই স্বল্পতম মেয়াদি মুগের জাত। গাছের উচ্চতা ১৮ হতে ২০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৪৬-৫০ সে: মি:, মাঝারি আকারের বীজ সবুজ রংয়ের। এই জাতটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ইহার শুঁটিগুলি একই সময়ে পাকে বলে বারবার আহরণ করার প্রয়োজন হয় না, মাঠের সমস্ত গাছ গোড়া কেটে একবারেই আহরণ করা যায়। এই জাতটিও সম্পূর্ণভাবে 'দিন নিরপেক্ষ' জাত অর্থাৎ বৎসরের যে কোনো সময় চাষ করা যেতে পারে। তবে খরিপ মৌসুমের গোড়াতেই ইহার চাষ করা ভালো। উপরোক্ত জাতটির চাইতে ইহার ফলন কিছু কম, প্রতি একরে ৮-১২ মণ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ৭০০-৯০০ কেজি। কিছুদিন আগে মুগের এই জাতটি দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে। ইহার জনপ্রিয় নামকরণ করা হইয়াছে 'মুবারিক'। তবে দিনে দিনে নানাকারণে জাতটির জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে।

মাষকলাই

১. **বারিমাশ-১** : পান্থ-৩০ নামক একটি মাষকলাইয়ের জাত ১০৮১ সনে ভারত থেকে বাংলাদেশে আনয়ন করা হয়। কয়েক বৎসর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ জাতটি হতেই বারিমাশ-১ জাত-এর উদ্ভাবন করা হয় যা ১৯৯০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে।[১১] কৃষকদের প্রচলিত মাষকলাই জাতগুলোর মতো এ জাতটির অগ্রভাগ লতানো হয় না। বীজের রং কালচে বাদামি ও বীজের আকার বড়। গাছের উচ্চতা ৩২-৩৬ সে: মি: এবং আয়ুষ্কাল ৭০-৭৫ দিন। জাতটি দিন নিরপেক্ষ হবার দরুন খরিপ-১ এবং খরিপ-২ এ দু' মৌসুমেই তা চাষ করা যায়। জাতটি বংশগতভাবে 'হলুদ পাতা রোগ' সহিষ্ণু। গবেষণা কেন্দ্রে জাতটির ফলন প্রতি হেক্টরে ১৯০০ কেজি পাওয়া গিয়েছে। কৃষকদের জমিতে হেক্টর প্রতি ১৭৬০ কেজি ফলন দিতে দেখা গেছে।[২]

২. **বিনামাশ** : বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ জাতটি উদ্ভাবন করে যা ১৯৯৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে।[১১] কেবল খরিপ-২ মৌসুমে জাতটি সারা বাংলাদেশে চাষ করা যায়। এটির 'হলুদ পাতা' রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে এবং ফলনের দিক হতে স্থানীয় জাতগুলোর চেয়ে অনেক বেশি।

মাষকলাই-২১৪০ : ইহা অনেকটা উপরোক্ত বারমাসী মাষকলাই এর মতই। তবেই ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে শুঁটি গাছে এক সময়েই পাকে যে জন্য একেবারেই গাছের গোড়া কাটিয়া ফসল সংগ্রহ করা যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

মুগ ও মাষকলাই চাষের জন্য জমি সাধারণত চাষ করা হয় না। মৌসুমী বর্ষাকাল ও বাৎসরিক প্লাবন শেষে নদীর চর ও নিচু এলাকা হতে পানি সরে গেলে নরম পলিমাটিতে বিনা চাষে বীজ বপন করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আউশ ও পাটের খালি জমিতে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রোপা ও বোনা আমনের জমিতে বীজ ছিটায়ে বপন করা হয়। খরিপের শেষ মৌসুমেও কোনো কোনো জাতের বীজ বপন করা হয়। সেক্ষেত্রে জমিতে দুই একটি চাষ দিয়ে বীজ বোনা হয়। শেষ-খরিপে কিছু কিছু চাষ করা সম্ভব হলেও মুগ ও মাষকলাইর প্রকৃত মৌসুম হলো রবিখন্দ। আশ্বিনের শেষ হতে কার্তিকের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ফল দুটি বপনের উপযুক্ত সময়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বীজ ছিটিয়ে বোনা হয়। প্রতি হেক্টরে মাশের বীজ ৩৭-৩৮ কেজি এবং মুগের বীজ ২৫-৩০ কেজি বোনাতে হয়। অন্য ফসল, যেমন মরিচ বা তিলের সঙ্গে মিশায়ে বোনলে উভয় ক্ষেত্রেই বীজের পরিমাণ কম লাগে। তখন নির্দিষ্ট পরিমাণে বীজের $\frac{২}{৩}$ ভাগ বপন করলেই চলে।

সাধারণত চাষীরা বীজ বপন করার পর আর কিছুই করেন না, শুধু পাকার পর ফসল মাঠ হতে উঠিয়ে ঘরে আনেন। কিন্তু ভালো ফল পেতে হলে কিছু কিছু পরিচর্যার প্রয়োজন আছে।

মাষকলাই ঘাস বা আগাছার সঙ্গে বেশ প্রতিযোগিতা করতে পারলেও মুগ ততটা পারে না। সেজন্য মুগ চাষে আগাছা একবার পরিষ্কার করে দিলে ভালো হয়। ঘাস খুব বেশি দেখা দিলে মাষকলাই ক্ষেতেও আগাছা পরিষ্কার করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

উভয় শস্যই শিম্বীজাতীয় নিজেরাই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে। তদুপরি নদীর চর এলাকার অতি উর্বর জমিতে চাষ করা হয় বলে নাইট্রোজেন বা অন্যান্য কোনো সার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। উঁচু জমিতে চাষ করলে কিছু কিছু সার যেমন প্রতি হেক্টরে ২০–৩০–২০ কেজি হারে ইউরিয়া, টি. এস. পি ও এমপি সার ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কোনো কোনো গৌণ খাদ্যোপাদনের অভাব হলে ফলন কমে যায়। সেজন্য কিছু পরিমাণ গোবর সার ব্যবহার করতে পারলে ভালো হয়।

মাটির সঞ্চিত রসেই ফসল দুটির চলে যায়। তাছাড়া দুটি ফসলেরই মূল ও শিকড় বেশি নিচে যায় বলে অপেক্ষাকৃত নিচু স্তরের রসও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। সুতরাং জমিতে সেচ দিবার কোনো প্রয়োজন হয় না। আগাম অর্থাৎ শেষ–খরিপ মৌসুমে লক্ষ্য রাখতে হয় ক্ষেতে যেন বৃষ্টির পানি না জমে।

ফসল দুটিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ তত প্রকট নহে। তবে ইয়োলো ভাইরাসের (yellow virus) আক্রমণ বিশেষ করিয়া মাষকলাইর অহরহ দেখা যায়। মাঠে এমন একটি মাষকলাই ক্ষেত দেখা যায় না যেখানে অন্তত আট দশটি গাছ হলুদ ভাইরাসে আক্রান্ত না হয়েছে। চাষীরা এ জন্য তেমন কোনো ভাবনা করেন না, কারণ এই রোগের আক্রমণে ফলন কিছুটা কমে গেলেও ফসলের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া এ রোগ নিরাময়ের কোনো ব্যবস্থাপত্র অদ্যাবধিও জানা যায় নি।

ফসল কাটা : বীজ বপনের ২½ হতে ৩½ মাসের মধ্যে ফসল পাকে। শুঁটি পরিপক্ব হলে কিছুটা কাল রং ধারণ করে এবং গাছের পাতা মরে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় কাস্তের দ্বারা গুড়া কেটে গাছ তুলতে হয়। হাত দ্বারা টেনে তুলতে পারলেও তা উচিত নয়, কারণ তাতে শিকড়সহ গুটি উঠে আসে যার ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের যোগসাধনের কাজে বাধার সৃষ্টি হয়। গাছের গোড়া কেটে উঠানোর পর কয়েকদিন মাঠে রেখে কিছুটা শুকিয়ে লওয়া হয়। তৎপর বোঝা বেঁধে অথবা গরু–মহিষের গাড়ির সাহায্যে ফসল মাঠ হতে খামার বাড়ির প্রাঙ্গণে এনে পালা দিয়ে রাখতে হয়।

মাড়াই–ঝাড়াই ও বীজ শুস্ককরণ : কয়েকদিন রোদে দেওয়ার পর গাছ ভালোমতো শুকিয়ে গেলে গরুর পায়ের নিচে তা মাড়িয়ে নিতে হয়। পরিমাণ অল্প হলে লাঠির সাহায্যে পিটিয়েও মাড়ান যায়। মাড়ানোর পর চালুনীর সাহায্যে ঢেলে বীজ গাছের টুকরা ও খোলস হতে আলাদা করা যায়। তৎপর কুলার সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে লওয়া হয়। কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে মুখ ঢাকা টিন বা ভাণ্ডে গুদামজাত করে রাখা যায়।

ফলন : উৎপাদনের দিক হতে মাষকলাই মুগের চেয়ে ভালো। প্রতি হেক্টরে মুগের উৎপাদন গড়ে ১২৫০ কেজি ও মাষকলাইর উৎপাদন ১৭৫০ কেজি হয়। উফশী জাতের চাষ করলে প্রায় এর দ্বিগুণ ফলন পাওয়া যেতে পারে।

মুগ ও মাষকলাইর ব্যবহার

উভয় শস্যেই যথেষ্ট পরিমাণ (২৪%) আমীষ আছে। এই আমীষে এমাইনো (amino acid) এবং মিথোনাইন (Methionine) এসিডের কিছুটা কমতি থাকলেও চাউলের আমীষের চাইতে

লাইসিন (lycine) এবং ট্রিপটোফেনের (tryptofane) পরিমাণ বেশি আছে। তাহা ছাড়া ইহাতে আছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন।[১]

মুগ ও মাষকলাই উভয়ই ডাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মাষ ডাল গ্রামবাসীরা বেশি খায় আর মুগ ডাল বেশি খায় শহরবাসীরা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মাষ ডালের চাইতে মুগ ডাল সহজপাচ্য ও স্বাদযুক্ত। মাষ ডালের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে উহা রান্নার পর আঠালো হয়ে যায় যা আর কোনো ডালেই হয় না। আঠালো ডাল কারো কাছে খেতে ভালো লাগে।

মুগ কখনো ভেজে ছোলার মতো খাওয়া হয়। মাষ ডাল কুমড়ার সঙ্গে মিশিয়ে এক রকম বড়ি প্রস্তুত করা হয় যাহা মাছ বা মাংসের সঙ্গে তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়। ইহা ছাড়া মাষকলাই ময়রার দোকানেও কিছু কিছু ব্যবহার করা হয়।

খেসারি

আবাদি এলাকা ও উৎপাদনের দিক হতে খেসারি বাংলাদেশের প্রধান ডালশস্য। তবে গুণগত মানের দিক হতে ইহা অন্যান্য ডাল-যেমন মুগ, মসুর হতে নিকৃষ্ট। সেজন্য ইহা শহর-বাংলার চাইতে গ্রাম-বাংলায়ই বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে রমজান মাসে ইফতারির সময় শহরবাসীরাও এই ডালের বড়া যথেষ্ট পরিমাণে খেয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ১৯৯৩–৯৪ সালে ২৬৬০০০ হেক্টর জমিতে খেসারির চাষাবাদ করা হয় আর সে পরিমাণ জমিতে উৎপন্ন হয় ১৯৯০০০ মে. টন ডাল।[১] ফসলের একটি বড় অংশ বীজ হবার আগেই তা দুগ্ধবতী গাভীকে ঘাস হিসেবে খাওয়ানো হয় বলে দানার মোট উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেশ কম হয়। তবুও খেসারি ও মসুর এই দুইটি মিলে বাংলাদেশে ডাল শস্যের শতকরা ৫২ ভাগ উৎপাদিত হয়।[২]

দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতেই খেসারির উৎপাদন বেশি হয়, যথা— পাবনা, রাজশাহী যশোহর ও কুষ্টিয়া। তবে ঢাকা, বরিশাল, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলাতেও যথেষ্ট পরিমাণে খেসারির চাষ হয়।

প্রতিবেশী দেশ ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে খেসারির চাষ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ফ্রান্স, ইতালি এবং স্পেনেও কিছু কিছু খেসারির চাষ হতো।[৩]

মাটি ও জলবায়ু

পলি ও পলি-দোয়াশ মাটি খেসারির জন্য সব চাইতে ভালো, তবে এঁটেল মাটিতেও খেসারি ভাল জন্মে।

খেসারি শীতকালীন ফসল, তাই বাংলাদেশে রবিখন্দের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ইহা জন্মান হয়। ১০–১৫° সে: তাপমাত্রা ইহার উপযোগী, ও বাৎসরিক ১৫–২৫ ইঃ অর্থাৎ ৩৮০–৬৩৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতেও ইহা উৎপাদন হতে পারে। শুষ্ক আবহাওয়াও ইহা বেশ কিছুদিন সহ্য করতে পারে। অতিবৃষ্টিতেও ইহা মুসুর ছোলা প্রভৃতির মতো কাবু হয় না।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়

খেসারির বৈজ্ঞানিক নাম Lathyrus sativus L.। ইহা শিম্বিজাতীয় দ্বি–বীজপত্রী বর্ষজীবী উদ্ভিদ, চেপ্টা কাণ্ডে সরুপত্রবিশিষ্ট গাছ সব সময় লতিয়ে চলে। ধানের নাড়াতে আশ্রয় পেয়েই কেবল উপরের দিকে উঠে। ডালপালাতে আচ্ছাদিত ঘন সবুজ গাছ যখন ভালোভাবে জন্মে তখন নিচের

চিত্র : ৩.৪ খেসারি গাছ

মাটি একটুও দেখা যায় না। গাছে গোলাপি রংয়ের ফুল ধরে, ফল এক রকম চেপ্টা শুঁটি —লম্বায় ১-১½ ইঞ্চি অর্থাৎ ২.৫–৩.৮ সেন্টিমিটার। প্রতি শুঁটিতে ৪-৫ টি বীজ জন্মে। পরিপক্ক মেটে রংয়ের বীজ বেশ শক্ত এবং আকারে অনেক ডালবীজের চাইতে বড়। বাংলাদেশে চাষীদের হাতে খেসারির যে জাতগুলো ছিল সেগুলোই এতদিন পর্যন্ত চাষ হয়ে আসছিল। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গত ৮/১০ বৎসর যাবত একটি উন্নত খেসারির জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করে আসছিল। সে প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে খেসারির একটি নতুন জাত, বারিখেসারি-১ এর উদ্ভাবন ঘটেছে যা ১৯৯৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে।[১১] খেসারির এ আধুনিক জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্রই চাষ আবাদ করা যাবে।

খেসারি উৎপাদনে সাধারণত জমিতে কোনো রকম চাষ দেওয়া হয় না। নদীর চর অথবা নিম্নাঞ্চলে বাৎসরিক প্লাবনের পর নরম মাটিতে বীজ ছিটিয়ে বপন করা যায়। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে পানি যখন শুকায়ে আসে তখন দণ্ডায়মান আমন ধান ক্ষেতের নরম মাটিতে

বীজ বুনে দিতে হয়। খেসারি প্রধানত এইভাবেই চাষ করা হয়, তবে কখনো সরিষার সাথে মিশ্র ফসল হিসেবে জন্মান হয়।

বীজ বপন : আশ্বিনের শেষ হতে কার্তিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত খেসারি বীজ বোনার প্রকৃষ্ট সময়। একক ফসল হিসেবে প্রতি হেক্টরে ৪৫-৫৫ কেজি এবং মিশ্র ফসল হিসাবে প্রতি হেক্টরে ৩৫ কেজি বীজ বোনতে হয়। বপনের পূর্বে বীজ আগের দিন হতে ভিজিয়ে রাখা ভালো, তাতে শক্ত বীজ ভিজে ফলে নরম হয়ে উঠে এবং অঙ্কুরোদ্গমের সহায়ক হয়। অন্যথায় অনেক বীজই গজাতে পারে না বা গজাতে বেশি সময় লাগার দরুন এই ফাঁকে কবুতর, ঘুঘু প্রভৃতি পাখি মাটির উপরে পড়ে থাকা বীজ খেয়ে ফেলে।

পরবর্তী পরিচর্যা : এই ফসলে [illegible] পরিচর্যা বলতে কিছু নেই বললেই চলে [illegible] [illegible] [illegible]

ফসল উত্তোলন : সাধারণত [illegible] গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাত [illegible] পরিপক্বতা লাভ করে।

গাছের পাতা যখন হলুদ রং ধারণ করে তখনই বুঝতে হবে ফসল তোলার সময় হয়েছে। গাছের শুঁটির দিকে লক্ষ্য রেখে এই সময় নির্ধারণ করা হয়। শুঁটি বেশি পেকে গেলে সেই অবস্থায় গাছ একটু নাড়াচাড়াতেই শুঁটি ফেটে বীজ বের হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। কাজেই শুঁটি অতি পরিপক্বতা লাভ করার আগেই খেসারি ফসল মাঠ হতে উঠান বাঞ্ছনীয়। গাছ হতে টেনে না উঠিয়ে কাস্তের সাহায্যে গাছের গোড়া কেটে উঠান বাঞ্ছনীয়। ইহাতে কাজ সহজ হয় এবং মাটির নিচে গাছের শিকড় সংলগ্ন গোড়া থেকে যায়। ফলে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

খেসারি গাছ : জমি হতে উঠানোর পর কয়েকদিন মাঠে রেখে কিছু শুকিয়ে লওয়ার পর সেগুলি বোঝা বেঁধে মাথায় করে অথবা গরুর সাহায্যে খামারে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তৎপর কয়েকদিন রৌদ্রে ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে গরুর সাহায্যে মাড়াই করে নিতে হয়। ইহাতে অতি সহজেই বীজ শুঁটি হতে বের হয়ে যায় এবং গাছ ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। গাছের টুকরা মিশ্রিত বীজ কুলা, চালনী ইত্যাদির সাহায্যে পরিষ্কার করে নিতে হয়।

ফলন : খেসারির গড়-পড়তা ফলন প্রতি হেক্টরে ১০০০-১২০০ কেজি। তবে বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় চাষাবাদ করিলে হেক্টর প্রতি ১৫০০ কেজি পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে।

খেসারির ব্যবহার

খেসারির দানা আমাদের দেশে প্রধানত ডাল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, তবে রমজান মাসে মোখরোচক বড়া হিসাবে খেসারি দানার ব্যবহার যেন অপরিহার্য। খেসারির ভূষী গরু-বাছুরের পুষ্টিকর খাদ্য।

রাজশাহী, কুষ্টিয়া ও আরো কয়েকটি জেলায় অভাবের দিনে খেসারি দানার সাহায্যে এক রকম পিঠা তৈরি করে খাওয়া হয়। তবে এতে এক চরম বিপত্তি হতে দেখা গিয়েছে যাঁরা

খেসারি ডালের এই রুটি ক্রমাগত ৩–৬ মাস পর্যন্ত খেয়ে গিয়েছে তাহাদের নিম্নাঙ্গ বিশেষ করে পা অবশ হয়ে গিয়েছে যাকে বিশেষজ্ঞগণ "লেথাইরিজম (Lathyrism)" রোগ নামে অভিহিত করেছেন। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় এই রোগ ভয়াবহরূপে দেখা দেয় যা জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সেই দুর্ভিক্ষের পর পরই "শ উন্নয়ন সংস্থা" এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় একটি সমীক্ষা চালান হয়। সেই সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে ১০৭৯৬ জন লোক 'লেথাইরিজম' রোগে আক্রান্ত হয়।[১১]

খেসারি ডাল অতিরিক্ত পরিমাণে ও ক্রমাগত খেলে যে উপর্যুক্ত রোগ হয় তাতে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। BOAA (B-N-oxalyl amino L alanine) নামে খেসারিতে একটি রাসায়নিক পদার্থ বর্তমান আছে যা স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিষক্রিয়া করে যার ফলে মানুষের নিম্নাঙ্গ বিশেষ করে পা ও কোমর অবশ হয়ে যায়।[১২] ফলে রোগীকে লাঠিতে ভর দিয়ে অথবা হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। ইহার অর্থ সে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়।

তবে খেসারি ভক্ষণে উপরোক্ত রোগ যে হবেই এমন কোন কথা নেই। আসল কথা এই—কম পরিমাণে অর্থাৎ ডাল ও বড়া হিসেবে মাঝে মাঝে খেলে এই রোগে আক্রান্ত হয় না বললেই বিশেষজ্ঞদের মত। অভাবের তাড়নায় যখন কেউ কেউ ভাত ও রুটির বিকল্প হিসেবে ক্রমাগত (৩–৬ মাস) খেসারি খেতে থাকে তখনই কেবল এই রোগ দেখা দেয়। সুতরাং খেসারি ব্যবহারে কারো মনে কোনো আতঙ্ক থাকার কারণ নেই।

বাংলাদেশে খেসারি চাষের ভবিষ্যৎ

১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহুত এক আলোচনা সভায় খেসারি ডাল ভক্ষণের সাথে 'লেথাইরিজম' অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গ রোগের নিকট সম্বন্ধ রয়েছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বাংলাদেশ সরকারের কাছে এক অনুমোদন পেশ করে বলা হয় যে এই দেশে যেন খেসারির চাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১২] এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে খেসারির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাময়িকভাবে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়।

কিন্তু কিছুটা চিন্তা–ভাবনা করে দেখলেই বুঝা যাবে খেসারির চাষ আমাদের দেশে বন্ধ হওয়া উচিত নয়। প্রতিবেশী দেশ ভারতবর্ষেও একবার এই রকম অবস্থা অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গ রোগের জন্য খেসারির চাষ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন উঠেছিল এবং ভারত সরকারও তা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। চাষী–সমাজ সেই সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে খেসারির চাষ চালিয়ে যেতে থাকে।

আসল কথা এই, খেসারি ডাল ভক্ষণে অর্দ্ধাঙ্গ রোগ হয় বটে, মাঝে মাঝে যারা উহা রুটি হিসেবে এবং রমজানের দিনে বড়া হিসেবে খায় তাতে কখনো ইহা হতে পারে না এবং বস্তুতঃ তা হয়ও না। যখন অভাবের তাড়নায় দরিদ্র চাষী বা জনসমাজ ভাত বা গমের পরিবর্তে খেসারি প্রধান খাদ্য হিসেবে দীর্ঘদিন অর্থাৎ ক্রমাগত ৩–৬ মাস পর্যন্ত খেয়ে যেতে থাকে তখনই কেবল 'লেথাইরিজম' বা অর্দ্ধাঙ্গ রোগের সৃষ্টি হয় সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি খেসারির ডাল যদি আগেই ভিজিয়ে রেখে পরের দিন রোদে শুকান হয় এবং ৩০ মিনিটের জন্য সিদ্ধ (steaming) করে লওয়া হয় তাহা হলে অর্দ্ধাঙ্গ রোগ সৃষ্টিকারী

বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে যায়।[১১] তখন সেই ডাল ব্যবহারে আর ভয় থাকেনা। ইহা ছাড়া গবেষণার মাধ্যমে এমন খেসারির জাত সৃষ্টি করা সম্ভব যে গুলিতে সেই বিষাক্ত রাসায়নিকের প্রভাব থাকবেনা বা থাকলেও তার পরিমাণ খুব সামান্য হবে।

এমতাবস্থায় "বাংলাদেশে খেসারির চাষ বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক"–এমন শ্লোগান না উঠাই যুক্তিসঙ্গত। খেসারি সম্বন্ধে যদি কিছু শ্লোগান উঠে তবে তাতে বলা হউক কেউ যেন অধিক পরিমাণে অধিক দিন যাবত খেসারির ডাল ভক্ষণ না করেন। তা হলেই খেসারির প্রতি সুবিচার করা হবে।

সবার উপর মনে রাখতে হবে যে খেসারি এমন একটি ডালশস্য যা বিনা চাষে, বিনা সারে, বিনা পরিশ্রমে অর্থাৎ অতি অল্প খরচে চাষ করা যায়। তদুপরি ইহার চাষে যে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহাই বাংলাদেশের একমাত্র ডালশস্য যাহা বেশ কিছু পরিমাণে গোখাদ্য হিসেবে এই দেশে ব্যবহার করা হয়। তাই দেখা যায় পাবনার শাজাদপুর এবং ঢাকার মানিকগঞ্জ যেখানে খেসারির চাষ ভালো হয় সেখানে ভালো দুধাল গাভী পাওয়া যায়।

তাই পরিশেষে বলা হয় বাংলাদেশে খেসারি চাষে কোনো প্রতিবন্ধকতার প্রশ্ন উঠতে পারে না; বরং ইহার চাষের কিভাবে উন্নতি হতে পারে সেইজন্য কৃষিবিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবীমহল ও দেশের সরকারের পক্ষে এগিয়ে আসা উচিত।

ছোলা

ছোলার অপর নাম বুট বা চানা। বলা যায়, প্রায় ১০,০০০ বৎসর পূর্ব হতে পৃথিবীতে ছোলার আবাদ শুরু হয়েছে। হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াডে' ছোলার প্রথম উল্লেখ করা হয়। [illegible]

ছোলা দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়ায় উৎপত্তি লাভ করেছে বলে অনুমান করা হয়। [illegible] দক্ষিণ ইউরোপ তথ্য তুরস্ক ছোলার আদি নিবাস বলে ধরা হয়। [illegible] বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশে–এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের [illegible] ইহার চাষ হয়ে আসছে, ও উল্লেখযোগ্য দেশগুলি হচ্ছে [illegible] গ্রিস, ইরান, পূর্ব–আফ্রিকা, তুরস্ক এবং ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষে মাঠে ফসলের মধ্যে ছোলা একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে, [illegible] লক্ষ হেক্টরের মতো জমিতে ইহার চাষ হয় এবং ৬০ লক্ষ মে. টন [illegible] উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশেও ছোলা একটি উল্লেখযোগ্য ডালশস্য। সারাদেশে [illegible] হেক্টর জমিতে ছোলার চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় ৬২০০০ মে. টন [illegible]

মশুরের মতো ছোলাও বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপন্ন হয় [illegible] ফরিদপুর, যশোহর ও পাবনা জেলায়। অন্যান্য জেলার মধ্যে রংপুর, [illegible] জেলাতেও কিছু কিছু ছোলা উৎপন্ন হয়।

মাটি ও জলবায়ু

এঁটেল হতে এঁটেল–দোয়াশ মাটিতে ছোলা ভালো জন্মে। [illegible] ভালো হয়। কম বৃষ্টিপাত ও ঠাণ্ডা পরিবেশ ছোলা চাষের উপযোগী। [illegible] জমিতেও ছোলা টিকতে পারে, কিন্তু জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে [illegible]

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

ছোলা শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদ (Leguminosae) সাধারণত ১০০–১৭০ দিনে, জীবনচক্র শেষ হয়। ছোলার বৈজ্ঞানিক নাম Cicer arietinum গাছ এক ফুট হতে দেড় ফুট অর্থাৎ ৩০–৪৫ সে: মি: উঁচু গাছে অনেক ডালপালা জন্মায় এবং সেগুলি ছোট ছোট সুদৃশ্য পল্লবে সুসজ্জিত (চিত্র নং ৩.৫) গাছের মূল শিকড় ছয় ইঞ্চি হতে বারো ইঞ্চি অর্থাৎ ১৫ হতে ৩০ সে: মি: পর্যপ্ত গভীরতায় প্রবেশ করতে পারে। পাতার বোটার খাচে একটি একটি গোলাপি রংয়ের ফুল ধরে; ফল প্রায় ২.৫ সে: মি: লম্বা শুঁটি তাতে দুইটি বীজ থাকে।

সাধারণত দুই প্রকার ছোলা দেখা যায়। প্রথম প্রকার ছোলাকে বলা হয় 'দেশী ছোলা'। এই ছোলা গাছের পত্রাংশ খুব ছোট, ফুলের রং গোলাপি এবং বীজ ছোট। বীজের রং বাদামি; প্রতি ১০০টি বীজের ওজন ২৫ গ্রামের চাইতে কম। দ্বিতীয় প্রকারের ছোলাকে বলা হয় 'কাবুলি ছোলা'। এই ছোলা গাছের পত্রাংশ বড় (দুই সে: মি:) ফুল সাদা। বীজের আকার ভেড়ার মাথার আকৃতির মত; প্রতি ১০০ বীজের ওজন ২৫ গ্রামের চাইতে বেশি। বাংলাদেশে প্রথম প্রকারের ছোলাই ভালো হয়। দ্বিতীয় প্রকারের ছোলা যা চাষীদের কাছে 'পাটনাই ছোলা' নামে পরিচিত, এদেশের আবহাওয়ায় ভালো একটা ফলন দেয় না।

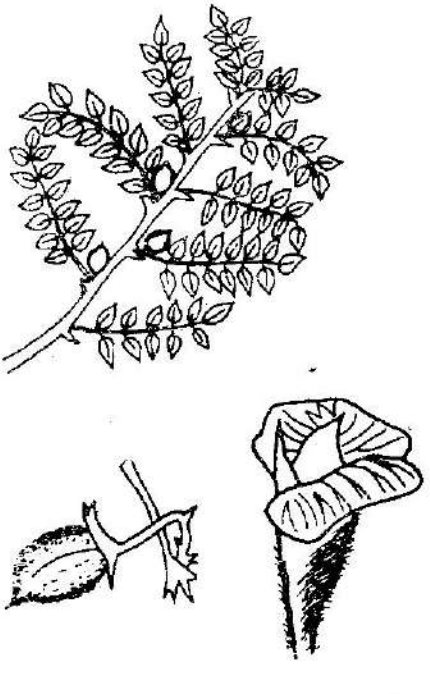

চিত্র : ৩.৫ ছোলা গাছের একাংশসহ ফুল ও শুঁটি

ছোলার উন্নত জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডাল গবেষণা কেন্দ্র ও বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রচেষ্টায় ১৯৮১ হতে ১৯৯৪ সালের মধ্যে ছোলার কয়েকটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে যেগুলো জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে।[১১] সে জাতগুলো হলো বারিছোলা-১ (নবীন), বারিছোলা-২, বারিছোলা-৩ এবং বিনাছোলা-২। এগুলোর মধ্যে কয়েকটির বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।[২]

১. **বারিছোলা-১ :** এ জাতের গাছের রং হাল্কা সবুজ ; গাছগুলো খাড়া ৬৫-৭০ সে: মি: উঁচু, বীজ প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে বেশ বড়। মসৃণ ও উজ্জ্বল রঙের ছোলা সহজেই ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গবেষণা কেন্দ্রে এটি সর্বোচ্চ হেক্টর প্রতি ৪৮১০ কেজি এবং চাষীদের মাঠে গড়ে ২০০ কেজি ফলন দিয়েছে।

২. **বারিছোলা-২ :** এ জাতের ছোলার বীজ নবীন জাতের চেয়েও বড় ; বীজের দু' পাশ সামান্য চেপ্টা এবং এর রং হাল্কা বাদামি। বীজের আকার নবীন জাতের চেয়েও বড় হওয়ায় সহজেই চাষী ও অন্যান্য ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশে 'ফিউজেরিয়াম উইল্ট' ছোলার একটি মারাত্মক রোগ যা এ জাতটি প্রতিরোধ করতে পারে। জাতটির আয়ুষ্কাল ১২০-১৩০ দিন, বীজ বপনের পর প্রায় দু' মাসের মধ্যে ফুল ধরে ; গড়ে এ জাতটির ফলন অন্যান্য জাতের চেয়ে ১৫-২০ ভাগ বেশি, প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতিতে কৃষকের মাঠে হেক্টর প্রতি ৫০-৫৫ মণ অর্থাৎ ১৯-২১ কুইন্টাল (১৯০০-২১০০ কেজি) ফলন পাওয়া গেছে।

৩. **বারিছোলা-৩ :** এ জাতের গাছের রং হাল্কা সবুজ এবং পত্র ফলকগুলো প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে একটু চওড়া। এ জাতটি কেবল বরেন্দ্র এলাকায় চাষের জন্য অনুমোদিত। এ অঞ্চলে সঠিক সময়ে বপন করলে ১২০ দিনের মধ্যে ফসল ঘরে উঠে, কৃষকের মাঠে এ জাতের ফলন হেক্টর প্রতি ১৯০০ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তবে গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১২০০ কেজি। উল্লেখ্য এ জাতের বীজ সব জাতের চেয়ে বড়, নবীন জাতের চেয়ে ৪০-৫০ ভাগ বড়। এ কারণে ক্রেতাদের নিকট সর্বাগ্রে গ্রহণীয়।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : ছোলার শিকড় বেশ নিচে যায় বলে জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে। ৩ হতে ৪ বার চাষ ও দুবার মই দিলে জমি প্রস্তুতির কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়

সার প্রয়োগ : মশুরের অনুরূপ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৮.৫ টন গোবর, ৭৮ কেজি ইউরিয়া, ১২৩ কেজি টি.এস. পি এবং ৫৯ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হয়। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া তিস্তা অঞ্চলে হেক্টর প্রতি ১-১.৫ কেজি বোরণ ব্যবহার করা ভালো।[২]

জমি প্রথমবার চাষ দেওয়ার পর গোবর ছড়িয়ে দিতে হয়। সম্পূর্ণ টি. এস. পি, মিউরেট অব পটাশ ও অর্ধেক ইউরিয়া জমি শেষবারের মতো চাষ দেওয়ার সময় প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপন : অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে নভেম্বরের মাঝামাঝি ছোলা বপনের প্রকৃষ্ট সময়। তবে নিম্নাঞ্চলে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছোলা বপন করা যায়। ছিটিয়ে বপন

করলে হেক্টর প্রতি ২৪ কেজি বীজ বপন করতে হয়। বপনের পর একটি হাল্কা চাষ মই দিয়ে বীজ মাটির নিচে ফেলে দিলে ভালো হয়।

ছোলা সারিতে বপন করা ভালো। সেক্ষেত্রে দুই সারির মধ্যে ৩০ সে: মি: ও সারির এক বীজ হতে অন্য বীজের দূরত্ব হবে ৭-৮ সে: মি:। বীজ ৫-৭.৫ সে: মি: গভীরে বপন করা ভালো।[২]

পরবর্তী পরিচর্যা : ছোলার মাঠে চারা ঠিকমতো জন্মালে সমস্ত মাটি ঢেকে যায়। এমতাবস্থায় আগাছা বিশেষ জন্মাতে পারে না। তবে গাছ ঘন থাকলে পাতলা করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই সময় কিছু কিছু আগাছা পরিষ্কার এবং তৎসঙ্গে মাটিও নরম করে দেওয়া যায়।

কোনো কোনো দেশে যেমন ভারতে গাছের আগা ছিড়ে দেওয়া হয়।[৩] ইহাতে গাছে অধিক সংখ্যক ডালপালা হয় এবং ফলে অধিক সংখ্যক ফুল ও বীজ হয়। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশে ভেড়া চরায়ে গাছের ডগা ছেড়ার কাজ করা হয়।

যদি সেচ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ হয় তা হলে বাকি অর্ধেক ইউরিয়া প্রয়োগের পর দিলেই ভালো হয়। বেশি সেচ ছোলা চাষে মোটেই ভালো নয়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই ফসলটির তেমন কোনো ক্ষতি করে না। তবে কোনো কোনো সময় কাটুই পোকা (Cut worms) গাছের চারার গোড়া কেটে ক্ষতি করতে পারে। আক্রমণ খুব গুরুতর হলে মাটিতে অলড্রিন (Aldrin) ব্যবহার করা যেতে পারে। গাছে ফুল ধরার পর তাতে গুটি ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। প্রতি হেক্টরে ০.৬৮ কেজি এন্ডোসালফান (Endosulfan) ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।[৭]

একই জমিতে প্রতি বৎসর ছোলার চাষ করলে ফিউজেরিয়াম (Fusarium) ও রাইজোকটনিয়ার (Rhizoctonia) আক্রমণে 'ঢলেপড়া' রোগ দেখা দিতে পারে। তাতে পাতার মাঝে মাঝে 'ভিজা ছাতা' (wet mold) পরিলক্ষিত হয়। এম.সি.সি (M.C.C) সংস্থার নোয়াখালীতে পরীক্ষামূলক ছোলাক্ষেতে ১৯৭৬ সালে এ রকম দেখা গিয়েছিল। সকালবেলার ঘন কুয়াশা ইহার জন্য দায়ী বলে তারা মনে করে। ডাইথেন-এর (Dithane-M-45.3%) প্রতি দশ দিন অন্তর প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।[৭]

ফসল উত্তোলন : একশত বিশ দিন হতে একশত ত্রিশ দিনের মধ্যে ছোলা গোড়াসহ উপড়ায়ে তোলা হয়। মাথায় বা গরুর গাড়িতে বোঝা বেঁধে খামার বাড়ির অঙ্গনে নিয়া যাওয়া যায়। আঙ্গিনায় গাছগুলি ছয় সাতদিন পালা করে রাখতে হয়।

মাড়াই-ঝাড়াই ও বীজ শুষ্ককরণ : রৌদ্রে গাছগুলি শুকানোর পর শুষ্ক গাছ গরুর পায়ের নিচে অথবা লাঠির আঘাতে মাড়াই করা হয়। বীজ হতে গাছের ভাঙ্গা অংশ ও খোসা চালুনী ও কুলার সাহায্যে আলাদা করা হয়। বীজগুলি বড় বলে খড় কুটা হতে পৃথক করা বেশ সহজ। কয়েকবার রৌদ্রে দিলেই বীজগুলি শুকিয়ে যায়।

ফলন : খুব ভালো হলে প্রতি একরে ১৬/১৭ মণ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ১৫০০-১৬০০ কেজি ছোলা উৎপাদিত হতে পারে। বাংলাদেশের গড় উৎপাদন হার এর অর্ধেক মাত্র।

ছোলার ব্যবহার

ছোলা একটি উদ্ভিদ আমিষ ও চর্বি সরবরাহকারী দানাদার শস্য। ইহাতে শতকরা ১৮-২০ ভাগ আমীষ ও ৪-৫ ভাগ চর্বি থাকে।

ছোলাকে ডাল হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়াও ভেজে ও ভুনা করে খাওয়া যায়। অঙ্কুরিত কাচা ছোলা খেতেও কেউ কেউ অভ্যস্থ। ছোলার ময়দা নানা রকম বিস্কুট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাজারে ব্যসন নামে ভাজাপুড়ার কাজে ব্যবহৃত যে জিনিষ দেখতে পাওয়া যায় তা ছোলা হতে প্রস্তুত হয়।

ছোলা ঘোড়ার অতি প্রিয় খাদ্য। ইহা ভক্ষণে ঘোড়া সতেজ ও সবল হয়। ছোলার খোসা ও গাছের ভগ্নাংশ উৎকৃষ্ট গো-খাদ্য।

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (ডাল গবেষণা কেন্দ্র), জয়দেবপুর, গাজীপুর মাষ, মুগ ও ফেলনের উন্নত জাতসমূহ, ১৯৯৪।

২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (ডাল গবেষণা কেন্দ্র), জয়দেবপুর গাজীপুর : মসুর ও ছোলার উন্নত জাতসমূহ, ১৯৯৪।

৩. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (ডাল গবেষণা কেন্দ্র) জয়দেবপুর, গাজীপুর : খেসারির উন্নত জাত, ১৯৯৪।

৪. মজুমদার, ম : পূর্ব-ভারতের ফসল, ১৯৮১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। আর্য মেনসন। ৬/এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩। পৃ. ১২৪-১২৮।

৫. Alyar. A. K. Y. N :Field Crops of India. 1947. Bangalore. Printed by the Suptd. at the Govt. Press. PP.127-46.

৬. ADAB NEWS. Vol. V. No 10. Nov. 1978 : Khesari and Lentil.

৭. ADAB NEWS LETTER. VOL. v. No. 20 Nov. 1978. Chickpea

৮. B. B. S : The Yearbook of Agricultural Statistics. 1995.

৯. Ministry of Agriculture and Forests Handbook of Agricultural Statistics. Sector Monitoring Unit 1995.

১০. Proceedging of the National Workshop on Pulses. 1981. (Sponsored by Bangladesh Agricultural Research Institute).

১১. Sed Certification Ageneg. Gazipur : Approned crop Vaities. 1995.

১২. Wahab. M. A. Khesari Dal and Lathyrism (A memiograph paper presented in a seminar held at Dhaka. Nov. 1981)

চতুর্থ অধ্যায়
তৈলশস্য
[OIL CROPS]

উদ্ভিদ বা গাছপালা হতে দু প্রকার তৈল পাওয়া যায়, যথা—১. উদ্বায়ী তৈল এবং ২. অনুদ্বায়ী তৈল। যে সমস্ত তৈল বায়ুতে খোলা অবস্থায় রেখে দিলে অতি শীঘ্র অথবা আস্তে আস্তে উড়ে বায়ুর সঙ্গে মিশে যায় সেগুলিকে উদ্বায়ী তৈল (Volatile oil) বলা হয়। এই প্রকার তৈল দ্বারা মূল্যবান সুগন্ধি প্রস্তুত করা হয়। এই তৈল উদ্ভিদের যে কোনো অংশ, যেমন— ফুল (গোলাপ), ফল (কমলালেবু), পাতা (লেমন ঘাস), ত্বক (দারুচিনি) প্রভৃতি অংশ হতে উৎপন্ন হতে পারে। উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ খুব কম হয়, যেমন— ৯০০০ কেজি গোলাপ ফুল হতে মাত্র ০.৪৫ কেজি তৈল তথা আতর উৎপন্ন হয়।[১৩]

যে সমস্ত উদ্ভিজ্জ তৈল বায়ুতে খোলা অবস্থায় রেখে দিলে সেই অবস্থায় থেকে যায় অর্থাৎ উড়ে যায় না সেগুলিকে অনুদ্বায়ী তৈল (Non-volatile) বলে। সাধারণ তাপমাত্রায় ইহারা তরল থাকে এবং কোনো কোনোটি নিম্ন তাপমাত্রায় জমে যায়। অনুদ্বায়ী উদ্ভিজ্জ তৈলই মানুষের ভোজ্য তৈল। রান্নাবান্নার মাধ্যম হিসেবেই এই তৈল ব্যবহার করা হয়। তবে গায়ে মাথায়ও ইহা ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত সাবান, উদ্ভিজ্জ ঘি বা মাখন, বার্ণিশ তৈল, জ্বালানি তৈল প্রভৃতি হিসেবেও অনুদ্বায়ী তৈল ব্যবহার করা হয়। প্রধানত গাছের বীজেই এই তৈল অধিক পরিমাণে (৪০–৬০%) সঞ্চিত থাকে, তবে গাছের অন্যান্য অংশ যেমন— ফল, কাণ্ড, প্রকন্দ এবং অন্যান্য অংশেও কিছু কিছু তৈল উৎপন্ন হয়।

ভোজ্য তৈল যে যে গাছ বা ফসলের বীজ হতে পাওয়া যায় তাই প্রধানত এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। Cruchferae Compositeae, Legumimosae প্রভৃতি পরিবারভুক্ত বিভিন্ন প্রকার গাছের বীজ হতে এই তৈল উৎপন্ন হয়। যে যে প্রজাতি বা শস্য হতে তৈল উৎপন্ন হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, কুসুমফুল ইত্যাদি। ইহাদের কোনোটির বীজ ঘানিতে পিষে এবং কোনোটির বীজ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈল বের করা হয়। সরিষা, তিল ও সূর্যমুখীর বীজের তৈল যান্ত্রিক অথবা দেশীয় ঘানির সাহায্যে বের করা যায়। তৈল বের করে নেওয়ার পর যা পড়ে থাকে তাকে খৈল বলা হয়। ইহাতে কিছু পরিমাণ তৈল ও অধিক পরিমাণ আমিষ থেকে যায়। এই খৈল গরু–বাছুরের উৎকৃষ্ট খাদ্য।

তৈলবীজ বা তৈলশস্য হিসেবে বাংলাদেশে প্রধানত সরিষার চাষ করা হয়। এইরূপ অন্যান্য শস্য হচ্ছে তিল এবং চীনাবাদাম। আর কিছু পরিমাণে চাষ হতে দেখা যায় কুসুমফুল গর্জন, তিল, সয়াবীন ও সূর্যমুখী।

সরিষা (Rape and mustard)

সরিষা বাংলাদেশের তৈলজাতীয় ফসলের মধ্যে সর্বপ্রধান। ইহা এই দেশের চাষীদের কাছে অতি পরিচিত ফসল। সরিষার তৈল আবহমান কাল হতে এদেশে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীরা মাথায় ও গায়ে সরিষার তৈল মাখতে অভ্যস্থ। সর্দি-কাশি হলেও তারা সরিষার তৈল নাকে-মুখে ব্যবহার করে থাকেন।

বাংলাদেশের গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ২.২৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সরিষা ও রাইয়ের চাষ হয়, ৯৩-৯৪ সালে এটির চাষ হয় ৩৩২৮০০ হেক্টরে আর সেই পরিমাণ জমিতে উৎপন্ন হয়। ২৩৯০০০ টন সরিষা ও রাই বীজ।[১৩] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সরিষা তৈল শস্যের মধ্যে সর্বপ্রধান, সুতরাং দেশে যে বিরাট পরিমাণ তৈলের ঘাটতি রয়েছে তা যথেষ্ট পরিমাণ সরিষার চাষের মাধ্যমে পূরণ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

এই দেশের অধিকাংশ কৃষক বেশ অবহেলা ভবে সরিষার চাষ করে থাকেন। জমিতে ২/৩টি চাষ দিয়া সরিষার বীজ বুনেই খালাস, তারপর ফসল তোলা। এইভাবে ফসল জন্মানো হয় তাতে ভালো একটা ফলন আশা করা যায় না। তাই দেখা যায় প্রতি একরে মাত্র ৬-৭ মণ অর্থাৎ প্রতি হেকটরে ৫০০-৬০০ কেজি সরিষা উৎপন্ন হয়, অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যত্ন সহকারে অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ করলে এদেশে সরিষার উৎপাদন অনায়াসেই দ্বিগুণ হতে পারে। আশার কথা এদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে, যেমন কুমিল্লার কৃষক সম্প্রদায় সরিষার জমিতে অধিক পরিমাণ সার ও পরিমাণ মতো সেচের পানি ব্যবহার করে হেকটর প্রতি ১৪০০-১৮০০ কেজি অথাৎ একর প্রতি ১৫-২০ মণ সরিষা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন।

সরিষা বাংলাদেশের অনেক জেলাতেই কিছু না কিছু চাষ হয়। তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, ঢাকা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, যশোর, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও গাজীপুর জেলায় অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এলাকাভিত্তিক পর্যাপ্ত পরিমাণে সরিষা চাষ করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সদর) সরাইল, কসবা, দাউদকান্দি, মুরাদনগর, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, ধামরাই, কালিয়াকৈর, ফতুল্লা এবং সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলায়।

সরিষা উৎপাদনে ভারত ও পাকিস্তানের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া পৃথিবীর আর খুব কম দেশেই সরিষা জন্মে। স্কেন্ডেনেভিয়ান দেশগুলির মধ্যে সুইডেন ও ডেনমার্কে সরিষা ভালো জন্মে। ক্যানাডার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরিষা সার্থকভাবে জন্মায়।

মাটি ও জলবায়ু

হাল্কা অর্থাৎ পলি, দোঁয়াশ, পলি-দোঁয়াশ এবং বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে সরিষা ভালো জন্মে। তন্মধ্যে শেষোক্ত মাটিই সব চাইতে উপযোগী। মাটি কিছুটা ভারী হলেও তাতে সরিষা জন্মাতে পারে যদি তা সুষ্ঠুরূপে নিষ্কাশনযুক্ত হয়। স্যাতস্যাতে জমিতে সরিষা গাছ মোটেই টিকে থাকতে পারে না। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত ঠাণ্ডা অঞ্চলে সরিষা ভালো জন্মে। তাই বাংলাদেশে রবি মৌসুমে শীতের আগমনে মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্রকরোজ্জ্বল পরিবেশে সরিষার চাষ করা হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়

সরিষা Crucifere পরিবার এবং Brassica গণভুক্ত উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম প্রজাতি অনুযায়ী বিবিধ, যেমন— Brassica Cambostrisl. Brassica Juneca এবং Brassica napus. এই বিভিন্ন প্রজাতিগুলির মধ্যে, প্রথমোক্তটিই বাংলাদেশে প্রধানত চাষ করা হয় তবে দ্বিতীয় প্রজাতিটিও কিছু কিছু জন্মে, আর তৃতীয় প্রজাতিটির চাষ পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে।

সরিষা একটি দ্বিবীজপত্রী বর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ (herb)। ইহা সাধারণত ২-৩ ফুট অর্থাৎ ৬০–৯০ সে: মি: উঁচু হয়। গাছের ৩০-৪০ দিন বয়স হতেই তাতে অজস্র হলুদ রংয়ের ফুল জন্মে। সাধারণত ফুল নিচের দিক হতে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে ফুটতে থাকে এবং সেই নিয়মেই শুঁটি ধরে। কোনো জাতের শুঁটি দুই কক্ষ বিশিষ্ট, যেমন—টরি-৭ এবং কোনো জাতের চার কক্ষ বিশিষ্ট, যেমন—সোনালি সরিষা।

চিত্র : ৪.১ সরিষা গাছ

বাংলাদেশে নানা প্রকার সরিষা উৎপন্ন হয়, যেমন— টরি রাই এবং শ্বেত সরিষা। টরি শতকরা ৬০–৬৫ ভাগ জমিতে, রাই ২০–২৫ ভাগ জমিতে এবং শ্বেত সরিষা ১০ ১৫ ভাগ

জমিতে উৎপন্ন হয়। রাইয়ের চাষ উত্তরবঙ্গে এবং টাঙ্গাইল জেলায় বেশি হয়। শ্বেত বা সোনালি সরিষা পাবনা, কুমিল্লা এবং বাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অধিক জন্মে।

টরি, রাই ও শ্বেত সরিষার বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো।[১]

টরি সরিষা : এই প্রকার সরিষা গাছের পাতার রং ফিকে সবুজ, পাতার গোড়ার দিকটা কাণ্ডের সাথে লাগানো। পাতা প্রায় ১০ সে: মি: লম্বা ও ৫ সে: মি: চওড়া। পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা প্রায় ৭৯ সে: মি:। প্রতি গাছে গড়ে ৪–৫টি শাখা হতে পারে, শাখা কাণ্ডের সাথে ৩০–৪০° কোনো উৎপন্ন করে। গাছে মোট ১৪–১৫টি ফুলের গোছা হয়ে থাকে। ফল বা শুঁটি লম্বায় ৪ সে: মি: হতে ৬ সে: মি: পর্যন্ত হতে পারে। পরিপক্ক বীজের রং কালচে বাদামি এবং বীজের মাঝামাঝি অংশে একটি ছোট ঘন বাদামি রংয়ের দাগ দেখা যায়। প্রতিটি শুঁটিতে ১০–১৫টি বীজ জন্মে এবং প্রতি ১০০০টি বীজের ওজন ২.৫ গ্রাম। পনেরই আশ্বিন হতে ৩০ কার্তিক পর্যন্ত ইহা বপন করার উত্তম সময়। গাছে ৭৫–৯০ দিনের মধ্যে বীজ পরিপক্কতা লাভ করে।

রাই সরিষা : রাই সরিষার পাতা সবুজ আর নিচের পাতাগুলির বোঁটা আছে। পাতা লম্বায় প্রায় ১৬ সে: মি: এবং প্রস্থে ৭ সে: মি: টরির পাতা যেক্ষেত্রে মসৃণ সেক্ষেত্রে রাইয়ের পাতা খসখসে। সমস্ত সরিষার মধ্যে রাই সরিষার গাছ সবচাইতে উচুঁ, গাছের উচ্চতা ১.২৫ মিটার হতে ১.৮০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রতিটি গাছে ৫–৬টি শাখা হয়। শাখা কাণ্ডের সাথে ২০–৩০° কোনো উৎপন্ন করে। প্রতি শাখায় ২৪–২৫টি ফুলের গোছা হয়। ফুলগুলি টরি সরিষার চেয়ে কিছু ছোট। ফল বা শুঁটি ৫ সে: মি: হতে পারে, প্রতিটি ফল বা শুঁটিতে ১২–১৮টি বীজ হয় ; পাকা বীজের রং ঘন বাদামি। রাইয়ের বীজগুলি টরির বীজ হতে কিছুটা ছোট, তবে টরির তুলনায় হেক্টর প্রতি রাইয়ের উৎপাদন বেশি। ১০০০টি বীজের ওজন ২.৪৭ গ্রাম। রাই সরিষা মাঝারী বা নাবী ফসল। সম্পূর্ণ কার্তিক ও অগ্রহায়ণের ১৫ তারিখ পর্যন্ত বোনা যায়। বপনের সময় হতে ফসল পাকা পর্যন্ত ৯৫–১০০ দিন সময় লাগে।

শ্বেত সরিষা : এই সরিষা গাছ দেখতে অনেকটা রাই সরিষার মতো লম্বা, তবে ক্যামপেষ্ট্রিস গোত্রভুক্ত। গাছ টরি ও রাই সরিষার চাইতে মোটা ও ভিন্ন ধরনের। ভারতে এই সরিষা 'ইয়েলো সারসে' নামে পরিচিত। বীজ হলুদ রংয়ের, খোসা পাতলা ও আকারে বড়। অন্যান্য সরিষার চাইতে ২–৩% তৈল বেশি থাকে। বীজ বোনা হতে ফসল কাটা পর্যন্ত মোট ৯৫ হতে ১০৫ দিন সময় লাগে। প্রতি ১০০০ বীজের ওজন ৩.২০ গ্রাম।

নেপাস সরিষা : এ প্রকার সরিষা সাধারণত ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও কানাডার শীত প্রধান অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন দীর্ঘদিনের শস্য। কাজেই এ সরিষা বাংলাদেশের শীত মৌসুমের খাটো দিনে আবাদ করা সম্ভব নয়। তবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে আমাদের দেশের উপযোগী এ প্রকার সরিষার দুটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। নেপাসের পাতা গাঢ় সবুজ, মসৃণ, লোমহীন ও কতকটা ফুলকপি পাতার সদৃশ পাত বোটাহীন ও পুষ্প পত্রের গোড়ার অংশ কাণ্ডকে অর্ধেক ঘিরে রাখে। এর শুটির আকার বড় হওয়াতে অধিক বীজ জন্মে, বীজও বড় আকৃতির হওয়াতে তেলের পরিমাণ ৩–৪% বেশি থাকে। নেপাস সরিষা সাময়িক জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। সরিষার প্রধান রোগ পাতায় দাগ পড়া বা অলটারনেরিয়া ব্লাইট নেপাসে কম হয়।

জাত : অন্যান্য তেলশস্যের তুলনায় সরিষার বেশ কিছু জাত রয়েছে। টরি নং ৭ এবং রাই নং ৫-এ দুটি সরিষার জাত অনেক দিন পূর্ব থেকেই কৃষি বিভাগ কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত। এরপর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্য প্রজনন বিভাগ ও বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় মোট ১০টি উন্নত সরিষার জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রথমোক্ত ইনস্টিটিউটের জাতগুলো হচ্ছে সোনালি সরিষা, কল্যাণীয়া, দৌলত, বারি সরিষা-৬, বারি সরিষা-৭, ও বারি সরিষা-৮, দ্বিতীয়োক্ত ইনস্টিটিউটের দুটি হলো সম্পদ ও সম্বল এবং শেষোক্ত ইনস্টিটিউটের দুটি জাত হচ্ছে সফল ও অগ্রণী।[১] উল্লেখ্য সমস্ত জাতগুলোই জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে।[১৭] এ জাতগুলো হতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হলো : [১]

১. টরি-৭ : এটি খাটো আকারের সবচেয়ে স্বল্পমেয়াদি সরিষার জাত যা অগ্রাম আবাদ করা যায়। আশ্বিনের শেষ থেকে পুরো কার্তিক মাস বীজ বপনের সাধারণ সময়। তবে উঁচু জমিতে এর আগেও বীজ বোনা সম্ভব। টরি-৭ এর গাছ ৬০-৭৫ সে: মি: উঁচু হয়, তাতে ৩-৫টি শাখা ও শাখা থেকে প্রশাখা বের হয়, শাখাগুলো বেশ সবল হয় এবং কাণ্ডের আকার ধারণ করে ; পাতা বৃন্তহীন এবং পুষ্পপত্রের গোড়ার অংশ কাণ্ডকে পুরোপুরি ঘিরে রাখে। গাছে ফুটন্ত ফল কুঁড়ির উপর অবস্থান করে, শুঁটি রাই সরিষার চেয়ে মোটা এবং দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। এ জাতটি উন্নত অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ৯৫০-১১০০ কেজি অর্থাৎ একরে ১১-১২ মণ ফলন হতে পারে। এর বীজে তেলের পরিমাণ ৪০-৪১%।

২. রাই-৫ : এ জাতটি টরি-৭ জাত হতে অনেক বেশি অর্থাৎ ১২০-১৩৫ সে: মি: উঁচু হয়। এটি একটি নাবী জাত, টরি-৭ এর তুলনায় বেশ দেরিতেও বপন করা চলে, আশ্বিনের শেষ থেকে পুরো অগ্রহায়ণ মাসই রাই সরিষার চাষ করা যায়। রাই-৫ এর গাছে প্রশাখার সংখ্যা প্রায় টরি-৭ হতে কম, পাতাগুলো খসখসে ও বোটাযুক্ত। বীজের রং প্রায় টরী-৭ এর মতো, তবে একটু গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের, দেখতে প্রায় লালচে বাদামি মনে হয়; বীজের আকার টরি-৭ এর চেয়ে কিছুটা ছোট, বীজে তেলের পরিমাণ টরি-এ এর চেয়ে কম (৩৯-৪০%)। ফসলটি পাকতে টরি-৭ এর তুলনায় বেশি সময় নেয়, যেখানে টরি-৭ ৭০-৭৫ দিনেও ঘরে তোলা যায় সেখানে রাই পরিপক্কতা লাভ করতে সময় নেয় ৯০-১০০ দিন।

৩. সোনালি সরিষা (এস এস-৭৫) : বারির (BARI) তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত এ জাতটি ১৯৭৯ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সারাদেশে ব্যাপক চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়। [১৬] সোনালি সরিষার গাছ রাই সরিষার মতো লম্বা পরিমাপে ৯০-১০০ সে: মি: ; কাণ্ড টরি-৭ ও রাই-৫ এর চেয়ে বেশ মোটা। এ জাতের গাছে সাধারণত ৪-৬টি প্রাথমিক শাখা জন্মায়, কিন্তু কোনো প্রশাখা বের হয় না। সোনালি সরিষার শুঁটি টরি ও রাই সরিষার চেয়ে অনেকটা মোটা এবং চার কক্ষবিশিষ্ট, এ জন্য প্রতি শুঁটিতে বীজের সংখ্যাও বেশি ; বীজের রং সোনালি এবং আকারে টরি-৭ ও রাই-৫ এর বীজের চেয়ে বড়, বীজে তৈলের পরিমাণও বেশি (৪৪%)। শ্বেত সরিষার অন্তর্গত এ জাতটি উন্নত অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ১৮০০-২০০০ কেজি অর্থাৎ একরে ২০-২২ মণ ফলন হতে পারে।

৪. কল্যাণীয়া (টি এস-৭২) : বাংলাদেশের টরি-৭ এবং সুইডেনের সরিষার জাত এস ভি ৭০-১৩২৩ এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক এ জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে। জাতীয় বীজ বোর্ড ১৯৭৯ সালে সারা বাংলাদেশে এ জাতটি চাষাবাদের অনুমোদন প্রদান করে।[২৬] এ জাতের সরিষা টরি-৭ এর চেয়ে একটু বেশি উঁচু (৭৫-৯০ সে. মি.), এর পাতাতে বোঁটা নেই ও পুষ্পপত্রের গোড়ার অংশ কাণ্ডকে পুরোপুরি ঘিরে রাখে। ফসল পাকতে টরি-৭ এর চেয়ে ৫-১০ দিন বেশি সময় নেয় এবং ফলন শতকরা ১৫-২০ ভাগ বেশি হয়। উন্নত পদ্ধতি অবাদ করলে প্রতি হেক্টরে ১৪৫০-১৬৫০ কেজি অর্থাৎ প্রতি একরে ১৬-১৮ মণ ফলন হয়. বীজের রং টরি-৭ এর মতো পিঙ্গল বর্ণের এবং বীজে তেলের পরিমাণ ৪১-৪২%।

৫. দৌলত (আর এস-৮১) : তৈলবীজ গবেষণা কর্তৃক উদ্ভাবিত এ জাতটি ১৯৮৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।[২৬] এটি রাই ৫ এর চেয়ে কিছুটা ছোট আকৃতির। পরিমাণে ১০০-১১০ সে: মি:। প্রতিটি গাছে ৪-৮ প্রাথমিক শাখা এবং অনেক প্রশাখা বের হয়। ফসল বপন করা থেকে কাটা পর্যন্ত ৯৫-১০৫ দিন সময় লাগে, হেক্টর প্রতি ফলন ১১০০-১২৫০ কেজি অর্থাৎ একরে ১২-১৪ মণ ফলন হতে পারে। জাতটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে তা খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল। এ কারণে জাতটি রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে এবং নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী, ও সাতক্ষীরার মতো উপকূলীয় জেলাসমূহের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। রোপা ধান কেটে পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে বপন করেও ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সারণি ১৫ : সরিষার বিভিন্ন জাতে সারের প্রয়োগমাত্রা*

সোনালি, বারি সরিষা-৬ বারি সরিষা-৭ বারি সরিষা-৮			টরি-৭, কল্যাণীয়া, রাই-৫, দৌলত	
সার	হেক্টর প্রতি (কেজি)	একর প্রতি (কেজি)	হেক্টর প্রতি (কেজি)	একর প্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	২৫০-৩০০	১০০-১২০	২০০-২৫০	৮০-১০০
টি এস পি	১৭০-১৮০	৬৮-৭২	১৫০-১৭০	৬০-৭০
এম পি	৮৫-১০০	৩৪-৪০	৭০-৮৫	৩০-৩৫
জিপসাম	১৫০-১৮০	৬০-৭০	১২০-১৫০	৫০-৬০
জিংক অক্সাইড	০-৫	০-২	০-৫	০-২
বোরন	১-১.৫	০-০.৫	১-১.৫	০-০.৫

উৎস : সরিষা ফসলের চাষ তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বা: কৃ: গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৪

* উপরোক্ত সারের মাত্রা কৃষি অঞ্চল ভেদে কম-বেশি হতে পারে। ইউরিয়া সারের অর্ধেক বীজ বপনের আগে এবং বাকি অর্ধেক গাছে ফুল ফোটার সময় উপরি-প্রয়োগ করতে হবে। সার উপরি-প্রয়োগ করার সময় মাটিতে রস থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়।

৬. **বারি সরিষা-৭ (ন্যাপ-৩১৪২) :** ন্যাপজাতীয় অধিক ফলনশীল এ জাতটির উদ্ভাবন করে তৈল বীজ গবেষণা কেন্দ্র যেটি ১৯৯৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে।১৬ এ জাতের গাছের উচ্চতা টরি ও সোনালি সরিষার মাঝামাঝি (০.৮১-১.০ মিটার)। প্রতিটি গাছের প্রাথমিক শাখা ৪-৫টি, ফুলের পাপড়ির রং সাদা। হলুদ ফুলের সরিষার চেয়ে এতে জাবপোকার আক্রমণ কম, অলটারনেরিয়া অর্থাৎ পাতায় দাগপড়া রোগও কম দেখা যায়। প্রচলিত জাত টরি-৭ এর চেয়ে ৩০-৪০% ও সোনালি সরিষার চেয়ে এ জাত ১৫-২০% বেশি ফলন দেয়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ২০০০-২৩০০ কেজি অর্থাৎ একরে ২২-২৫ মণ ফলন পাওয়া যেতে পারে।

বীজ বপন : আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হতে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সরিষা বপন করা যায়। তবে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সরিষা বপন করতে পারলে খুব ভালো হয়। বীজ বোনার পর পরই বৃষ্টি হলে সরিষার খুব ক্ষতি হয়। অধিকাংশ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পচে যায়। কার্তিক মাসে বৃষ্টি হবার ভয় থাকে বলে অনেক চাষী এই সময়ে সরিষা বপন করতে চান না। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির আগে উঠে যায় বলে কার্তিক মাসে বীজ বপন করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের চাষীরা স্বভাবতই বৃষ্টির ভয়ে দেরিতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে সরিষা বপন করে এতে সরিষার ফলন কমে যায়. প্রতি হেক্টরে জাতভেদে সরিষার বীজ গড়ে ৮ কেজি বপন করতে হবে।

সরিষার বীজ বপন করা একটা পারদর্শিতামূলক কাজ। সব চাষীই সুন্দরভাবে সরিষার বীজ বপন করতে পারেন না। এই বীজ সহজেই হাত হতে ছুটে যায় বলে অনভিজ্ঞ চাষী দ্বারা বপন করা বীজ জমিতে সমানভাবে পড়ে না। কোনো জায়গায় বেশি, কোনো জায়গায় কম, আবার কোনো জায়গায় বীজ একেবারেই পড়ে না। জমিতে বীজ গজাবার পরই এই দৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। কাজেই সরিষার বীজ কিছু ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে পারদর্শী চাষীর সাহায্যে ছিটিয়ে এমনভাবে বপন করা উচিৎ যাতে বীজ জমির সর্বত্র সমানভাবে পড়ে।

সরিষার বীজ খুব অল্প সময় অর্থাৎ ৩/৪ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে যায়। জমিতে পরিমাণ মতো রস থাকলে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সরিষার বীজ উপ্ত হতে দেখা যায়।

আগাছা দমন ও সেচ প্রয়োগ : রবি মৌসুমে সাধারণত আগাছা কম হয়। জমি খুব পরিষ্কার করে চাষ করলে আগাছা আরো কম জন্মায়। যে অবস্থায়ই হউক না কেন চাষীরা সরিষা ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করার কথা মোটেই চিন্তা করেন না। কিন্তু কোনো কোনো সময় সরিষার জমিতে এমন ঘাসযাছড়া জন্মায় যা সময়মতো দূরীভূত না করলে ফলন বেশ কমে যায়। সুতরাং অবস্থা বুঝে সরিষা ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সরিষার জমিতে বিশেষ করে যখন অধিক মাত্রায় সার ব্যবহার করা হয় তখন সেচ দেওয়া আবশ্যক। তবে বেশি সেচ দিবার কোনো প্রয়োজন নেই। বেশির মধ্যে দুইটি সেচ দিলেই চলে— বীজ বপনের সময় ২০-২৫ দিনের মধ্যে প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার। লক্ষ্য রাখতে হবে যে সেচের পর যেন কোনো পানি জমে না থাকে। পানি জমলে তা যথাশীঘ্র নালা পথে বের করে দিতে হবে।

কীটপতঙ্গ ও রোগ দমন : সরিষা ফসলের প্রধান শত্রু জাবপোকা (Aphids)। ফুল ফুটার সময় হতে এই পোকার আক্রমণ হয়। দেরিতে সরিষা বপন করা হলে এই পোকার আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। আক্রমণের পর সপ্তাহ দুইয়ের মধ্যে পোকা সমস্ত গাছ খেয়ে ফেলে। তখন লক্ষ্য করলে সরিষা গাছগুলি কাল রঙে আবৃত দেখা যায়। ছোট ছোট অসংখ্য পোকা ফসলের রস চুষে খেতে থাকে, তখন ফলে আর দানা সৃষ্টি হতে পারে না। জাব পোকার আক্রমণ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করে তা নিধন করা উচিত। মেলাথায়ন ২০ তোলা অথবা ডায়জিনন ২৫ তোলা প্রতি সোয়া ছয় মণ পানির সঙ্গে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে আক্রান্ত গাছে ভালোভাবে ছিটিয়ে দিলে সহজেই জাব পোকা ধ্বংস হয়ে যায়। বিকালের দিকেই ঔষধ প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়, কারণ এই বেলা মৌমাছি আর সরিষা ক্ষেতে থাকে না। মৌমাছির উপস্থিতি সরিষা ক্ষেতে বিশেষ প্রয়োজন। তাতে ফলে ধরার কাজে সহায়তা হয়। সকাল বা দুপুর বেলা যখন মৌমাছি গাছে উড়ে বেড়ায় সেই সময় ঔষধ প্রয়োগ করলে অনেক মৌমাছি অযথা মারা যাবে।

অরোবাঙ্কি (Orobanche) নামক এক প্রকার পরগাছা সরিষার শিকড়ে জন্ম নেয়। সেগুলি সরিষা গাছের খাদ্য শুষে নিয়ে গাছকে খুব দুর্বল করে ফেলে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতেই এই পরগাছার আক্রমণ দেখা যায়। এই পরগাছাগুলি প্রথমে মাটির নিচে থাকে, সেজন্য সেগুলি দেখা যায়ে না। পরে ঐগুলি হতে গোছা গোছা হাল্কা বেগুনি রংয়ের ফুলের ছড়া মাটির তলা হতে উঠে আসে ; ফুলে ছোট ছোট অসংখ্য বীজ জন্মে মাটিতে ছড়ায়ে পড়ে এবং পরবর্তী ফসলে তাহা আরো তীব্রভাবে আক্রমণ করে। কাজেই ইহার আক্রমণ বন্ধ করতে হলে গাছে ফুল দেখা মাত্রই তাহা উপড়িয়ে ফেলতে হবে।

বাংলাদেশের সরিষার প্রধান রোগ অলটারনেরিয়া (Alternaria) বা পাতায় দাগপড়া রোগ। এই রোগ দিলে দেখা প্রতি একরে ১০০ গ্যালন বা ১২½ মণ পানিতে তিন আউন্স হিসেবে কপার অক্সিক্লোরাইড ১৫ দিন পর পর প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

সরিষা উঠান ও মাড়াই-ঝাড়াই করা : সরিষা গাছের বয়স যখন ৩০-৪০ দিন হয়, তখন হতেই গাছে ফুল ধরা শুরু হয় ; আর এক মাস বা কিছু বেশি সময়ের মধ্যে ছড়া পাকতে শুরু করে। গাছের তিন ভাগের দুই-ভাগ ছড়া পাকলেই তা কাটা বা উঠানোর উপযুক্ত সময়। সব ছড়া পাকিয়ে উঠাতে চাইলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। কারণ, এমতাবস্থায় অনেক ছড়া ফেটে দানা মাটিতে পড়ে যাবে। সরিষা গাছ হাতে টেনে বা কাচি দ্বারা গোড়া কেটে উঠাতে হয়। তৎপর বোঝা বেঁধে মাথায় বা গরুর গাড়িতে মাঠ হতে এনে খামার বাড়ির আঙ্গিনায় রাখা হয়। আঙ্গিনায় সরিষার বোঝা স্তূপ করে কয়েকদিন না রেখে সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে শুকিতে দিতে হয়। স্তূপ করে রাখলে সরিষা পচে যাবার সম্ভাবনা থাকে ; রৌদ্রে গাছগুলি শুকিয়ে যখন মচমচা হয় তখন লাঠির সাহায্যে নরম হাতে আঘাত করলে ছড়া হতে বীজ বের হয়ে যায়। পরিমাণে বেশি হলে গরুর সাহায্যে সরিষা মাড়াই করে নেওয়া যায়।

মাড়াই করার পর প্রথমে সরিষা গাছগুলি আলাদা করিয়া নিতে হয়। তৎপর ফলের খোসাসহ বীজগুলি চালনিতে নিয়ে চালতে হয়। এতে বীজগুলি নিচে পড়ে যায় আর খোসাগুলি চালনিতে থেকে আলাদা হয়ে যায়। কুলার সাহায্যে পরিশেষে বীজগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয়। বার কয়েক রোদ দিবার পর সরিষা গোলাজাত করা যায়।

ফলন : সরিষার গড় ফলন বাংলাদেশে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক, মাত্র হেক্টরে ৬৫০–৬৫০ কেজি আধুনিক জাত ব্যবহার করে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন প্রতি হেক্টরে গড়ে ১৫০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

সরিষার ব্যবহার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সরিষার তৈল আমাদের প্রধান ভোজ্য তৈল। বিজ্ঞানীদের মতে অবশ্য এই তৈল ব্যবহারের উপযোগী নয়, কারণ তাতে ৪৫–৫০% ইরোসিক এসিড (Urocic acid) নামক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বর্তমান থাকে।[7] তবুও এই দেশে রীতিমতো সরিষার তৈল খাওয়া হয় এবং তাতে খুব একটা বিপদের কথাও শুনা যায় না। মনে হয় তৈল ফুটিয়ে এবং খুব স্বল্প পরিমাণে খাওয়ার দরুন কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

আমাদের দেশের সরিষার সাধারণত ৪০–৪৪% তৈল ও ২৪–২৫% প্রোটিন থাকে। দেশীয় ঘানিতে ভাঙ্গিলে এই সরিষা হতে ৩৩% বিদ্যুত চালিত ঘানিতে ভাঙ্গিলে ৩৫% এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে ভাঙ্গিলে ৩৬–৩৮% তৈল পাওয়া যায়। তৈল নেওয়ার পর যে সরিষার খৈল পাওয়া যায় তা গরুবাছুরের জন্য উত্তম খাদ্য। ইহাতে ৪০% প্রোটিন থাকে। খৈল জমিতে সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

সরিষা বাটা জলপাই, কুল ইত্যাদি ফলের চাটনি বা আচার প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে ইলিশ রান্নাতে কোনো কোনো গিন্নি সরিষাবাটা ব্যবহার করে থাকেন।

ডাক্তারি মতে সরিষার তৈল নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। তন্মধ্যে বড় ও বিশেষ করে শিশুদের গায়ে সরিষার তৈল মেখে রোদ পোহালে ভিটামিন–ডি সেবন করা হয় যা শিশুদের হাড় শক্তরূপে গঠন করতে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া সর্দি–কাশিতে সরিষার তৈল রসুন দ্বারা গরম করে নাকে মুখে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায় বলে আয়ুর্বেদী মতে বিশ্বাস করা হয়।

তিল (Sesame)

তিল একটি গুরুত্বপূর্ণ তৈলজাতীয় ফসল। উৎপাদন এলাকার দিক হতে সরিষার পরই ইহার স্থান। তবে আমাদের দেশে ইহার তৈল ভোজ্য তৈল হিসেবে সরিষার তৈলের মতো তত জনপ্রিয় নহে। মাথায় ব্যবহারের তৈল হিসেবে অবশ্য ইহার কদর আছে। ভারতবর্ষে তিল তৈলের ব্যবহার ব্যাপক। সে দেশে প্রচুর তিল উৎপন্ন হয়। সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের $\frac{১}{৩}$ তিল সে দেশে উৎপাদিত হয়।[১২]

বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বৎসর ৪৭৭৫৩ হেক্টরে ১৯৯৩–৯৪ সালে এটির আবাদ হতে দেখা যায় ৭৮৮০০ হেক্টরে যা হতে উৎপন্ন হয় ৪৮০০০ টন তিল।[১৩] বাংলাদেশে দুই মৌসুমেই তিলের উৎপাদন লাভজনক। রবিখন্দে গাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং জমিতে রসের অভাবে উৎপাদন কম হয়। এই কারণে খরিপ মৌসুম তিল চাষের জন্য প্রকৃষ্ট সময়। তবে এই সময় আউশ ধান ও পাটের জমিতে তিল প্রতিযোগিতা করে বলে অনেক চাষী ইহার চাষ হতে বিরত থাকে। যারা তিলের চাষ করে তাহাদের মধ্যে অনেকেই আউশ ধানের সঙ্গে মিশ্র

ফসল হিসেবে ইহার চাষ করে থাকেন। একক ফসল হিসেবে খুব কম চাষীই তিলের চাষ করে থাকেন। এসব কারণে তিলের চাষ এদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অথচ ইহার চাষে গুরুত্ব দেওয়া হলে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করা হলে ভোজ্য তৈলের একটা বিরাট চাহিদার অংশ ইহা হতে মিটতে পারত।

উৎপত্তি ও বিস্তার

তিলের উৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ আছে। কেউ কেউ বলেন ভারতবর্ষ ইহার আদি নিবাস; আবার কোরো মতে তিল আফ্রিকায় প্রথম উৎপত্তি লাভ করে।[১৩]

গ্রীষ্ম এবং অব-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের নানা দেশে চাষ হতে দেখা যায়। সারা পৃথিবীতে এক কোটি বিশ লক্ষ হেকটরেরও অধিক জমিতে তিলের চাষ হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তিল উৎপাদনের দিক হতে পৃথিবীতে ভারতের স্থান প্রথম এবং পরের স্থান চীন দেশের। আফ্রিকা মহাদেশের মিশর, সুদান এবং নাইজেরিয়ায় প্রচুর তিল উৎপন্ন হয়। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে থাইল্যান্ড, ইন্দো-চায়না ফরমোজা ও জাপানে তিলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া রাশিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো দেশে যথেষ্ট তিল জন্মে।

বাংলাদেশে খুলনা, ফরিদপুর, পাবনা, বরিশাল, রাজশাহী এবং ঢাকা জেলায় অধিক পরিমাণে তিল উৎপাদিত হয়।

মাটি

বেলে-দোঁয়াশ মাটি তিল চাষের জন্য সর্বোত্তম। তবে অন্যান্য হাল্কা ধরনের মাটিতেও তিল জন্মিতে পারে। কিছুটা এঁটেল জাতীয় মাটিতেও তিল জন্মিতে দেখা যায়।

জলবায়ু

উষ্ণ আবহাওয়া ও মধ্যম ধরনের বৃষ্টিপাত অঞ্চলে তিল ভালো জন্মে। ফসল উৎপাদনকালীন মৌসুমে ৪০-৫০ ইঞ্চি অর্থাৎ ১০১৬-১২৭০ মি: মি: বৃষ্টিপাত ও ২১-২৪° সে: তাপমাত্রা বজায় থাকলেই চলে। বৃষ্টি-নির্ভর ফসল ২০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫০৮ মি: মি: বৃষ্টিপাতের কমে হয় না। তাই বাংলাদেশে শীতের মৌসুমে এই ফসল চাষ করে সেচের পানি ব্যবহার না করলে উৎপাদন খুবই কম হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

তিলগাছ সাধারণত ৩½ ফুট হতে ৪ ফুট অর্থাৎ ১-১½ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেতের গাছ তুলণামূলকভাবে এত বড় হয় যে তা তিলগাছ বলে বিশ্বাস হয় না।[১৩] সেক্ষেত্রে গাছের উচ্চতা ২ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা যায় এবং মূল কাণ্ড বেশ শক্ত ধরনের হয়। ফসল পাকলে সেই সব গাছ টেনে উঠান যায় না। কাস্তে বা দায়ের সাহায্যে কেটে নিতে হয়।

তিল Pedaliaceae পরিবারভুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Sesamum indicum L. কাণ্ড সরল ও তা হতে চতুর্দিকে ছোট ছোট ডালা বের হয় (চিত্র ৪.২)। পাতা লম্বা ধরনের

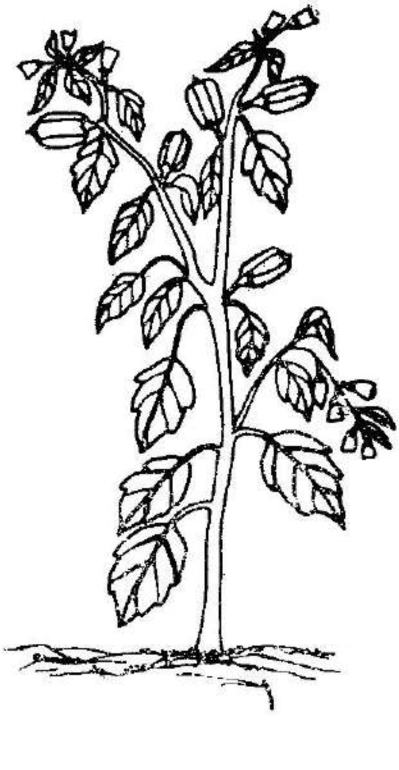

চিত্র : ৪.২ তিল গাছ

ও রং সবুজ। পত্রবৃন্তের গোড়ায় সাদা বা গোলাপি রংয়ের ঘণ্টাকৃতির ফুল জন্মে। ফল লম্বাকৃতির চার কোনো কেপসুল। পাকলে সেগুলি ফেটে বীজ বের হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে চাষীরা নানা স্থানীয় জাতের বীজ ব্যবহার করে থাকেন। কোনোটির বীজ সাদা, কোনোটির ঈষৎ বাদামি ও কোনোটির বীজ ঘন কাল রংয়ের। তিল-৬ এবং তৈল ৫৮০৭৭ নামে দুটি তিলে জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তিলের আরো উন্নত জাত উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে।[১] কিছু দিনের মধ্যে কয়েকটি জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের সম্ভাবনা আছে।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : তিলের জমি হাল্কা বলে বেশি চাষ মইয়ের প্রয়োজন হয় না। তিন চারটি চাষ ও গোটা দুই মই দিলেই জমি প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়ে যায়।

সার প্রয়োগ : একক ফসল হিসেবে চাষ করলে তিলের জমিতে সার ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে। সেইক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে সার ব্যবহার করতে হবে।[১]

সারণি ১৬ : তিল চাষে সার ব্যবহারের মাত্রা

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি / হেক্টর)
ইউরিয়া	[illegible]
টি এস পি	[illegible]
এম পি	[illegible]
জিপসাম	[illegible]
জিঙ্ক সালফেট	[illegible]
বরিক এসিড	[illegible]

উৎস : তিল ফসলের চাষ- তৈল বীজ গবেষণা কেন্দ্র, বাং : কৃ : গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৪

ইউরিয়া সারের অর্ধেক এবং অন্যান্য সারের সবটুকু জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে সমস্ত সার যেন মাটির সাথে ভাল ভাবে মিশে যায়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সার গাছে ফুলের কুঁড়ি দেখা দিলেই উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সে সময় যেন মাটি রসযুক্ত থাকে।

বীজ বপন : বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। খরিপ মৌসুমে আগাম ফসলের জন্য ফাল্গুন এবং নাবী ফসলের জন্য ভাদ্র মাসে বীজ বোনতে হয়। রবি মৌসুমে আশ্বিন-কার্তিক মাস বপনের উত্তম সময়। প্রতি হেক্টরের জন্য ৭.৫-৮.৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। অন্য ফসলের যেমন আউশ ধানের সাথে বপন করা হলে এর অর্ধেক বীজ ব্যবহার করলেই চলে।

পরবর্তী পরিচর্যা : বর্ষার সময় প্রধানত তিলের আবাদ হয় বলে জমিতে যথেষ্ট আগাছা জন্মায়। সময়মতো সেই আগাছা একবার বা দুইবারে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। গাছ ঘন হয়ে জন্মালে তা অবশ্যই আগাছা নিড়ানির সময় পাতলা করে দিতে হবে। গাছ ঘন থাকলে তাতে ডালপালা খুব কম বের হয় এবং ফুল কম ধরে। পরিণামে ফলন অনেক কমে যায়। তিলক্ষেতে এক ধরনের বিছা পোকার আক্রমণ হতে পারে। বিছাগুলি পাতা খেয়ে ফেলে

: আগার দিকে নরম কাণ্ডে ছিদ্র করে কাণ্ডের নরম অংশ খেতে থাকে এবং বীজের [illegible] ছিদ্র করে কচি অংশ খেয়ে ফেলে। বিপকর্ড ১০ ই সি বা নগল ১০০ সি ১ মি : লি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করলে সে পোকা দমন হয়ে যাবে। [illegible] হক মথও অনেক সময় ফসলটির যথেষ্ট মারাত্মক ক্ষতি করে। এর ক্রীড়া সবুজ [illegible] এগুলো রাক্ষুসে স্বভাবের, গাছের পাতা খেয়ে সাবাড় করে দেয়। এ পোকার দমনের জন্য [illegible] ইসি অথবা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি এ দুইটির কোনো একটি [illegible] প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে।[২]

[illegible] মধ্যে তিল গাছের কাণ্ড পচা রোগ উল্লেখযোগ্য। আক্রান্ত [illegible] লম্বা, [illegible], গভীর খয়েরী এবং কাল দাগ দেখা যায়। পরিশেষে গাছের [illegible] মারা যায়। জমিতে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করলে রোগের উপশম হয়। [illegible] রোগটি বীজবাহিত ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট হয় বলে ভিটাভেক্স-২০০ দ্বারা প্রতি ১ কেজি বীজে [illegible] গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিলে বীজবাহিত এ ছত্রাক শুরুতেই দমন করা যায়।[২] [illegible] কখনো পাতায় দাগজনিত রোগ দেখা যায়। দাগগুলো ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং [illegible] [illegible] খেয়ে ফেলে। বেভোস্টিন নামক ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম [illegible] মিশিয়ে প্রতি ১০ দিন অন্তর অন্তর আক্রান্ত ফসলে ছিটিয়ে রোগের প্রকোপ কমে যায়।[২]

ফসল কাটা : জাতভেদে তিল ৮৫–৯০ দিনের মধ্যে পাকে। গাছে তিলের শুঁটি [illegible] থাকলে সেইগুলি হলুদ রং ধারণ করে শক্ত হতে থাকে। এই সময় গাছের কিছু কিছু [illegible] ঝরে যায়। গাছ কাস্তের সাহায্যে কেটে বোঝা বেঁধে খামার বাড়ির প্রাঙ্গণে নেয়া হয়। [illegible] [illegible] গাছগুলি প্রাঙ্গণে পালা করে রাখতে হয়।

মাড়াই-ঝাড়াই ও বীজ শুষ্ককরণ : তিলগাছ উপরোক্ত নিয়মে ৬/৭ দিন পালায় [illegible] রাখার পর পালা ভাঙ্গা হয় এবং গাছগুলি রৌদ্রে ছড়ায়ে দিতে হয়। রাত্রিবেলায় আবার [illegible] পালায় জমা করতে হয়। পরদিন আবার গাছে রৌদ্রে দেওয়া হয়। এইভাবে তিন চার দিন রৌদ্রে শুকানোর পর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শুটিগুলি ফেটে বীজ বের হচ্ছে। এই সময় গাছগুলিতে লাঠির আঘাত দিলেই সমস্ত বীজ খোসা হতে বের হয়ে আসবে।

চালনীর সাহায্যে খোসা ও গাছের পাতা হতে বীজ সহজেই আলাদা করে [illegible] কিছু কিছু মাটির টুকরা বীজের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। সেইগুলি চালনী ও কুলার [illegible] পরিষ্কার করে নেয়া যায়। পর পর কয়েক দিন রৌদ্রে দিলেই বীজ শুকিয়ে যায়। [illegible] [illegible] ঝাড়াই-মাড়াই ও শুকানো বেশ অসুবিধাজনক। কারণ, বৃষ্টি-বাদলের [illegible] [illegible] নেই। রবি মৌসুমে এমন কোনো অসুবিধা নেই।

ফলন : বাংলাদেশে প্রতি একরে তিলের গড় ফলন ৬ মণের অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে [illegible] কেজির কিছু উপরে। তবে উত্তমরূপে চাষাবাদ করলে একরে ১০/১২ মণ অর্থাৎ হেক্টরে [illegible] কেজির মতো ফলন হতে পারে।

তিলের ব্যবহার

তৈলের জন্যই তিল বাংলাদেশে প্রধানত ব্যবহৃত হয়। ভুজ্য ও মাথায় দেওয়া— এই দুইভাবেই তিলের তৈল ব্যবহার করা হয়। এই তৈল মাথা ঠাণ্ডা রাখে বলে কবিরাজের

মত; সুগন্ধিযুক্ত ফুলের পাপড়ি তিলের তৈলে ডুবিয়ে রাখলেই ফুলের গন্ধ তৈলে চলে যায়। এইভাবে সহজেই তিলের তৈল সুগন্ধিযুক্ত করা হয়। সাবান প্রস্তুতের কাজেও এই তৈল ব্যবহার করা যায়।

এদেশে তিল ভেজেও মোয়া তৈরি করেও খাওয়া হয়। পিঠা এবং বিস্কুট তৈরিতেও তিল ব্যবহার করা হয়।

তিলের খৈল গরু-বাছুরকে খাওয়ানো যায়। চিনি সহযোগে মানুষের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। দুধাল গাভীর জন্য তিলের খৈল খুব উপকারী।

তিসি (Flax)

তিসি এমনই একটি ফসল যা হতে তৈল ও আঁশ দুইই পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশে যা কিছু তিসি চাষ করা হয় তা হতে প্রধানত তৈলই প্রস্তুত করা হয়। তিসির আঁশ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী নয় বলেই হয়ত সেই উদ্দেশ্যে তিসির আবাদ করা হয় না।

বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে তিসি 'মইসনা' নামে পরিচিত। এক হিসাবে দেখা যায় ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশে মোট ৭৩৬০০ হেক্টর জমিতে তিসির চাষ হয় এবং তা হতে উৎপন্ন হয় ৪০০০০ মে. টন তিসি বীজ।[১৩] কুষ্টিয়া, যশোহর, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে বেশি পরিমাণে তিসির চাষ হয়।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

ফসল হিসেবে তিসির ইতিহাস অতি প্রাচীন, তবে ইহার উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিত নন। কেউ কেউ অনুমান করেন দক্ষিণ এশিয়াতেই প্রথম তিসির চাষ হতে দেখা যায়; আবার কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে তিসি আফগানিস্তান হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়ায়ে পড়ে।[৮] ভারতে প্রচুর তিসি উৎপন্ন হয়। তৎপর নাম করা যায় আর্জেন্টিনার। রাশিয়াতে তিসি আঁশ ও বীজ এই দুই উদ্দেশ্যেই জন্মান হয়। আয়ার্লান্ডে ও বেলজিয়ামে তিসি কেবল আঁশের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন করা হয়।

মাটি ও জলবায়ু

ভারি অর্থাৎ এঁটেল জাতীয় মাটি তিসি চাষের জন্য সব চাইতে উপযোগী তাই দেখা যায় ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে (ভারি মাটি) তিসি খুব ভালো জন্মে। হাল্কা মাটিতে তিসি মোটেই ভালো হয় না। তবে মাঝারি ধরনের, যেমন পলি-দোয়াশ ও এঁটেল-দোয়াশ মাটিতে তিসির চাষ করা যায়।

নাতিশীতোষ্ণ ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তিসি ভালো জন্মে। উৎকৃষ্ট মানের আঁশ উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে ঠাণ্ডা পরিবেশ প্রয়োজন। তবে অত্যধিক ঠাণ্ডায় (১০-১৫ সে.) তিসি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অধিক বৃষ্টিপাত তিসির জন্য মোটেই ভাল নয়; গড় বৃষ্টিপাত ১৮ হতে ২০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৪৫৭-৫০৮ মি: মি: হলেই চলে। বাংলাদেশে যে মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয় না অর্থাৎ রবি মৌসুমে জমিতে সঞ্চিত রসেই ফসলটি জন্মিতে পারে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়

তিসি বৈজ্ঞানিক নাম Linum usitatissimum L. ইহা বর্ষজীবী খর্বাকৃতির উদ্ভিদ ; উচ্চতায় ৪৬ সে: মি: হতে ১.২৫ মিটার পর্যন্ত হয়। ঘন করে বপন করলে গাছের নিচে বা মাঝখানে কোনো ডালপালা বাহির হয় না কেবল আগার দিকে ডালপালা গজায় যা ঝাড়ুর মতো দেখায়। গাছের ছোট নীল, নীলাভ বেগুনি অথবা সাদা রংয়ের ফুল ধরে ; ডালার আগায় ফুল ধরে এক সুদৃশ্যের সৃষ্টি করে। ফল এক রকম কেপসুল (Capsule) ; তিসের মতো কেটে বীজ বের হয়ে আসে। প্রতিটি কেপসুলের ৪০-৫০টি ছোট ছোট চেপ্টা ডিম্বাকৃতির বীজ থাকে। বীজগুলি ধরলে সাবান বা তেল ধরার মতো অনুভূতি হয়।

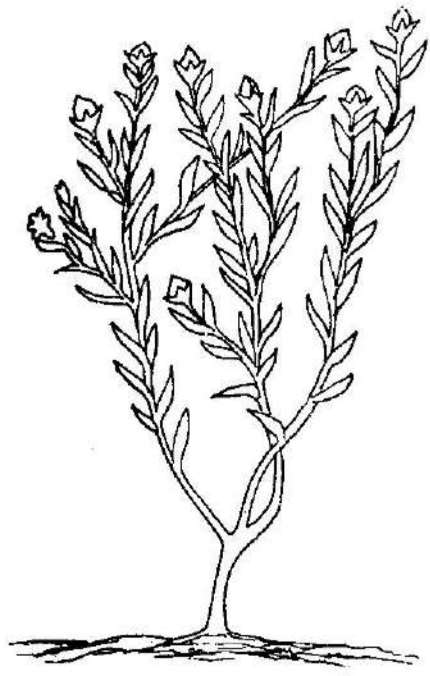

চিত্র ৪.৩ তিসি গাছ

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : তিসি যেহেতু ছোট দানাদার শস্য, সেজন্য সরিষা ও তিলের মতো জমি খুব পাইট করে চাষ করতে হবে। পাঁচ ছয়টি আড়াআড়ি চাষ ও দুই তিনটি মই দিলেই জমি প্রস্তুতের কাজ হয়ে যায়। তিসির জমিতে ঢেলা উঠার সম্ভাবনা থাকে। সেগুলি মগুরের সাহায্যে চূর্ণ করে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ : সাধারণ চাষীরা তিসির ক্ষেতে সার প্রয়োগের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করে না। তবে ফসলটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ –এই তিনটি সার প্রয়োগ করাই প্রয়োজন এবং তাতে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রতি হেক্টরে ৭৫ কেজি ইউরিয়া, ১২০ কেজি টি.এস. পি এবং ৪৬ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করা যেতে পারে।[২]

জমি শেষবারের মতো চাষ মই দেওয়ার আগে অর্ধেক ইউরিয়া এবং টি. এস. পি ও মিউরেট অব পটাশ সারের সমস্তটাই জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া গাছের বয়স যখন ২০–৩০ দিন হয় তখন উপরি–প্রয়োগ করা ভালো।

বীজ বপন : কার্তিক–অগ্রহায়ণ মাসে তিসি বপন করার উপযুক্ত সময়। তবে আশ্বিনের মাঝামাঝি সময়টাই সর্বোত্তম। চাষীরা সাধারণত ছিটিয়ে বীজ বপন করেন, কিন্তু সারি করে বীজ বপন করাই বিজ্ঞানসম্মত। প্রতি সারির মধ্যে ৩০ সে: মি: ও সারিতে চারার মধ্যে ১৫ সে: মি: ফাক রাখা ভালো। ছিটিয়ে বপন করলে একর প্রতি ৬/৭ সের অর্থাৎ হেকটর প্রতি ১৫–১৭ কেজি এবং সারিতে বপন করলে প্রতি ১৪–১৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।[৩]

তিসি সরিষার সঙ্গে মিশ্র ফসল হিসেবে কখনো কখনো চাষ করা হয়। সারিতে অন্যান্য ফসল, যেমন গমের সঙ্গে ইহা চাষ করা যেতে পারে।

পরবর্তী সময়ে পরিচর্যা : তিসি আগাছার সঙ্গে মোটেই প্রতিযোগিতা করতে পারে না। সেইজন্য তিসি ক্ষেতে আগাছা সময়মতো পরিষ্কার করা খুবই বাঞ্ছনীয়। সারিতে বপন করা হলে গাছের গোড়ায় কিছু কিছু মাটি টেনে দেওয়া ভালো।

আগাছা পরিষ্কার করার পর পরই উপরি–প্রয়োগের মাধ্যমে অবশিষ্ট ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। হঠাৎ করে বৃষ্টিতে অথবা অধিক সেচের কারণে জমির উপর পানি জমে গেলে তা তৎক্ষণাৎ নিষ্কাশিত করে দিতে হবে।

তিসি ক্ষেতে রোগ–বালাই ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ তেমন কিছু হয় না। তবে কোনো কোনো সময় জাবপোকার আক্রমণ হতে পারে। সেইক্ষেত্রে হেক্টরের জন্য ৫.৭৬ গ্রাম মেলাথিয়ান ৫৫০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করলে পোকা দমন হয়ে যায়।

ফসল কাটা : তিসি ফাল্গুন–চৈত্র মাসে পাকে। পাকলে গাছ ও ফল সোনালি বা কিছুটা তামাটে রং ধারণ করে। ফল ভালো করে পাকার পরই গাছ কাটা বা উপড়ানো উচিত। কারণ, ফল কাঁচা থাকলে বীজ অপুষ্ট হয়ে যায়। তাতে বীজের ওজন কম হয় ও তৈলের ভাগও কম হয়। আবার বীজ ক্ষেতে পেকে গেলে বিপদের সম্ভাবনাও থাকে ; ফল বা কেপসুল তখন একটু চাপ খেলেই ফেটে যায় এবং বীজ বের হয়ে পড়ে সুতরাং উভয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে যখন দেখা যায় ফলগুলি পেকে ফাটার উপক্রম হয়েছে তখন ফসল কাটা উচিত। ফসল কাটা বা উপড়িয়ে লওয়ার পর সেইগুলি ছোট ছোট আঁটি বেঁধে ফসল বাড়ি বা আঙ্গিনায় স্তূপ করে রাখা যায়।

মাড়াই–ঝাড়াই : কয়েকদিন রৌদ্রে দিয়ে গাছ ভালোভাবে শুকাবার পর হাত লাঠির সাহায্যে আস্তে আস্তে আঘাত করলেই কেপসুল বা ফল ফেটে বীজ বের হয়ে আসে। তখন গাছগুলি ঝাড়া দিয়ে বীজ হতে আলাদা করে ফেলা যায়। তৎপর ডাটা খোসাসহ বীজ কুলা–চালনী প্রভৃতির সাহায্যে পরিষ্কার করে লওয়া যায়।

ফলন : সাধারণভাবে তিসির ফলন প্রতি একরে ৫/৬ মণ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ৪৫০–৫০০ কুইন্টাল। তবে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ৮–৯ মণ অর্থাৎ হেক্টরে ৭০০–৮০০ কুইন্টাল ফলন অনায়াসেই হতে পারে।

তিসির ব্যবহার

তিসির বীজে শতকরা ৩০–৩৮ ভাগ তৈল থাকে। তৈল ভোজ্য নহে, নানা শিল্পকাজে ব্যবহৃত হয়। ঘানিতে তিসি হতে শতকরা ২৫ ভাগ তৈল আহরণ করা যায়। তিসির খৈলে ৫–১৩ ভাগ তৈল থেকে যায়। তিসির বীজ ও খৈলে তৈলসহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ কি মাত্রায় থাকে তাহা ১৭ নং সারণিতে দেখানো হলো।[১০]

তালিকা ১৪

সারণি ১৭ : তিসির ও ইহার খৈলের বিভিন্ন উপাদান

উপাদান	তিসি	খৈল
পানি	৬.৬%	১১.৫%
প্রোটিন	২০.৩%	২৮.৫%
তৈল	৩৮%	১০%
কার্বোহাইড্রেড	২৯%	৩১.৩%
ছাই	২.৪%	৮%
ফাইবার	৪.৮%	১১%

চীনাবাদাম (Ground nut)

বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ তৈলজাতীয় ফসলের মধ্যে চীনাবাদামও একটি। তবে বাংলাদেশে যে পরিমাণ চীনাবাদাম উৎপন্ন হয় তার এক একটি বিরাট অংশ ভেজে সরাসরি খাওয়া হয়। ভোজ্য তৈল হিসাবে সরিষার তৈলের মতো চীনাবাদামের তৈল এদেশে তত সমাদর লাভ করতে পারে নাই। কেউ কেউ অনুমান করেন চীনদেশ হতে প্রথম পাক–ভারত–বাংলা উপমহাদেশে চীনাবাদাম আনীত হয় বলে ইহার নাম হচ্ছে চীনাবাদাম।

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মাটি চীনাবাদাম চাষের জন্য বেশ উপযোগী। তবুও নানা কারণে ব্যাপকভাবে ইহার চাষ হচ্ছে না। অধুনা এদেশে ফসলটির চাষ বৃদ্ধির জন্য গভীরভাবে চিন্তা করা হচ্ছে।

দেশে ১৯৯৩–৯৪ সালে ৩৫২০০ হেক্টর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হয় তাতে যে পরিমাণ জমি হতে ৪১০০০ টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। আশার কথা এই আশির দশকের চেয়ে নব্বই দশকে ফসলটির উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

অনেকের মতে চীনাবাদাম দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশের আদি শস্য। তবে পশ্চিম-আফ্রিকা হতেই ফসলটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পর্তুগীজ নাবিকদের ভূমিকা এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য।

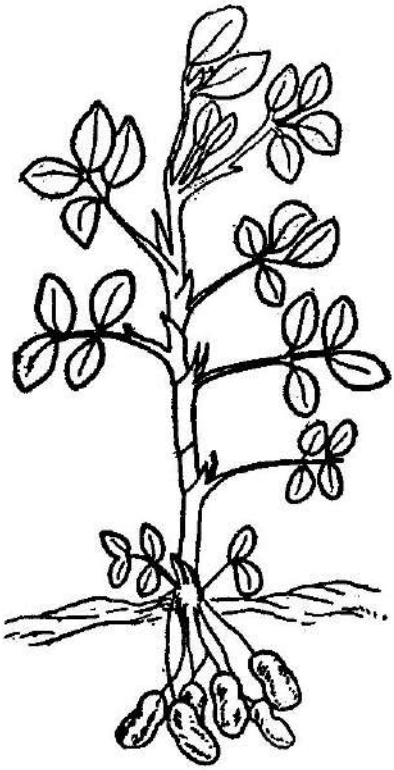

চিত্র : ৪.৪ চীনাবাদাম গাছ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে চীনাবাদামের চাষ হয়। পশ্চিম আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চল ছাড়াও পূর্ব আফ্রিকার কিয়দংশ ও উত্তর আফ্রিকার মোজাম্বিকে প্রচুর চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। ভারত, চীন, জাপান, বার্মা ও অস্ট্রেলিয়ার অনেক অংশ জুড়ে চীনাবাদামের চাষ হয়।

বাংলাদেশে কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, ঢাকা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়।

চীনাবাদামের মাটি মানেই হাল্কা বেলে মাটি। বেলে-দোঁয়াশ ও পলি-দোঁয়াশ মাটিতেও চীনাবাদাম ভালো জন্মে। আজকাল অবশ্য পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে নিষ্কাশনযুক্ত ভারী কাল মৃত্তিকাতেও চীনাবাদাম জন্মান হচ্ছে। শিশু চীনাবাদামের সুচালো আগা যা সহজেই মাটি ভেদ করে নিচে যেতে পারে সেইজন্য মাটি বেশ হাল্কা ও নরম হওয়া চাই।

জলবায়ু

চীনাবাদাম শস্যের বৃদ্ধির সময় মাঝারি বৃষ্টিপাত, প্রচুর সূর্য কিরণ ও তুলনামূলকভাবে অধিক তাপমাত্রা বিশেষভাবে উপযোগী। যে অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০৭০–১১৪০ মি: মি: এর মধ্যে থাকে সেখানে খুব ভালো চীনাবাদাম জন্মে। তবে অধিক বৃষ্টিপাত, যেমন ৫০–৬০ ইঞ্চি অর্থাৎ ১২৭০–১৫২০ মি: মি: বৃষ্টিও চীনাবাদাম সহ্য করতে পারে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

চীনাবাদাম শিম্বী-পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ এবং ইহার বৈজ্ঞানিক নাম এরাচিস হাইপোজিয়া (Arachis hypogea)। ইহা বর্ষজীবী খর্বাকৃতির মাটি ঢেকে রাখা ঘন সবুজ রংয়ের এক প্রকার শস্য। প্রত্যেক গাছ অনেক ডালপালা সম্বলিত ঘন পল্লবে ঢাকা (চিত্র : ৪.৪)। কোনো জাতের গাছ খাড়া ঝুম ধরনের এবং অপর জাতের গাছ লতানো। গাছের গোড়ার দিকে হলুদ রংয়ের ছোট ছোট ফুল জন্মে আর সেই ফুল হতে উৎপন্ন শিশু চীনাবাদাম মাটি ভেদ করে নিচে যেয়ে পূর্ণ বাদামরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দেশে নানারকম স্থানীয় জাতের চীনাবাদাম দেখা যায়। এগুলির মধ্যে কতকগুলি আগুল, কতকগুলি নাবী। তবে বাংলাদেশে কৃষি বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত জাতগুলি হচ্ছে ১. ঢাকা ১ (মাইজচর বাদাম) এবং ডিজি–২ (বাসন্তী বাদাম), জিংগা বাদাম ও ত্রিদানা ৪

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : চীনাবাদামের মাটি বেশ হাল্কা বলে বেশি চাষের প্রয়োজন হয় না। গোটা তিনেক চাষ দিয়ে মই দিলে মাটি ভেংগে ঝুরঝুরা হয়ে যায়। তবে প্রয়োজনবোধে ৪/৫ টি চাষও দিতে পারে।

সার প্রয়োগ : চীনাবাদামের চাষ শিম্বীজাতীয় গাছ বলে নিজেই নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটাতে পারে। তদুপরি নদীর অববাহিকা বা নিম্নাঞ্চলে যেখানে রবি মৌসুমে চীনাবাদামের চাষ হয় সেইসব মাটি বেশ উর্বর। কাজেই এমতাবস্থায় চীনাবাদাম চাষে সার প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

খরিপ মৌসুমে চীনাবাদাম বেশ উঁচু জমিতে চাষ করা হয়। এ রকম জমি স্বভাবতই তত উর্বর নয়। রবি মৌসুমে অপেক্ষাকৃত কিছু কিছু উঁচু জমিতেও চীনাবাদামের চাষ করা হয়। এইরূপ জমিতেও উদ্ভিদের খাদ্যোপাদানের অভাব থাকতে পারে। এইসব মৃত্তিকায় চীনাবাদামের চাষ করতে গেলে সার ব্যবহার করা আবশ্যকীয়। পরীক্ষা–নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে নিম্নোক্ত সার নিম্নোক্ত হারে ব্যবহার করলে চীনাবাদাম ভালো ফলন দেয় :

সারণি ১. ৮ : চীনাবাদাম চাষে সার প্রয়োগের পরিমাণ

সারের নাম	প্রতি হেক্টর (কেজি)	প্রতি একরে (কেজি)
ইউরিয়া	২৫	১০
টি এস পি	১৬০	৬৪

এম পি	৮৫	৩৪
জিপসাম	১৭০	৬৮
জিঙ্ক অক্সাইড	৫	২
বোরাক্স	৪	১০

উৎস : চীনাবাদাম ফসলের চাষ —তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বাং কৃঃ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৪

অর্ধেক ইউরিয়া ও জিপসাম এবং অন্যান্য সকল সারের সবটুকু জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে দিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও জিপসাম গাছে কার্যকরী ফুল ধরার সাথে সাথে অর্থাৎ বীজ বপনের ৪০–৪৫ দিন পর পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে সময় যেন মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে রস বজায় থাকে। রসের অভাব থাকলে জমিতে সেচ দিয়ে জো আসলে সার পার্শ্ব প্রয়োগ করে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

বীজ বপনের মৌসুম : চীনাবাদাম রবি ও খরিপ এই দুই মৌসুমে চাষ করা হলেও রবি মৌসুমের ফসলই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই মৌসুমে সর্বাধিক এলাকা জুড়ে ফসল করা হয় এবং সে ফসলই গঞ্জে–বাজারে দেখা যায়। ফসলের হেক্টর প্রতি উৎপাদন এই সময় বেশি। খরিপ মৌসুমে চীনাবাদাম চাষ করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেই মৌসুমে চীনাবাদাম বীজ হিসেবে ব্যবহার করা। দেখা গিয়েছে এক রবি মৌসুমে উৎপন্ন চীনাবাদাম পরবর্তী রবি মৌসুমে বীজ হিসেবে ব্যবহার করলে অধিকাংশ বীজ গজাতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে খরিপ খন্দের উৎপন্ন চীনাবাদাম পর পরই রবি খন্দে বপন করলে সেগুলি সার্থকভাবে গজায়। চীনাবাদাম বীজের এইরূপ বৈশিষ্ট্যের কারণ এই যে এই শস্য বীজের জীবনিশক্তি তথা অঙ্কুরোদ্গমক্ষমতা স্বল্পক্ষণস্থায়ী এক রবি মৌসুমে বীজ ঘরে রেখে প্রায় ৮–৯ মাস পর অন্য রবি মৌসুমে বপন করা হয় বলে সেই সময়ের মধ্যে অনেক বীজের অঙ্কুরোদগমক্ষমতা লোপ পায়, অন্যদিকে খরিফ মৌসুমের বীজ শ্রাবণ–ভাদ্র মাসে ক্ষেত হতে উঠিয়ে কার্তিক–অগ্রহায়ণ অর্থাৎ রবি মৌসুমে বপন করলে —এই তিন চার মাস সময়ের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের লোপ পায় না, ফলে মাঠে বীজ আশানুরূপভাবে গজায়।

খরিপ মৌসুমে খুব সীমিত পরিমাণ জমিতে চীনাবাদামের চারা হয় আর তা হতে উৎপাদিত ফসল সবটাই বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এইজন্য বাজারে এই মৌসুমের বাদাম খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়। কোনোক্রমে খরিপ মৌসুমের বাদামচাষ ব্যর্থ হলে বীজ–বাদামের অভাব দেখা দেয়, ফলে বাজারে ইহার দাম তিন চার গুণ বৃদ্ধি পায়। দেশে বাদামচাষ বৃদ্ধি করার পক্ষে ইহা এক বিরাট অন্তরায়।

বীজ বপন : জাতভেদে চীনাবাদামের বীজ বপন করার সময়ের কিছুটা তারতম্য হয়। ঢাকা–১ অর্থাৎ মাইজচরবাদামের বীজ রবি মৌসুমে বপন করতে হয়—কার্তিক মাসে এবং খরিফ মৌসুমে বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাসে। অন্যদিকে ডিজি–২ অর্থাৎ বাসন্তী বাদামের বীজ খরিফ মৌসুমে বপন করতে হয় ফাল্গুন–চৈত্র মাসে, তবে রবি মৌসুমে একই সময়ে অর্থাৎ কার্তিক মাসেই বীজ বপন করতে হয়।

বপনের আগে বাদামের খোসা হতে বীজ ছাড়িয়ে নিতে হয়। এই খোসা এবং বীজের অনুপাত সাধারণত ৩ : ২ অর্থাৎ ৩ কেজি খোসাসহ চীনাবাদাম হতে ২ কেজি বীজ পাওয়া যায়। খোসা ছাড়াবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বীজের উপরের লালচে পর্দাটা উঠে না যায়। খোসা ছাড়ানো বাদামের বীজ মাইজচর জাতের বেলায় প্রতি হেকটরে বপন করতে হয় ৯২-৯৫ কেজি এবং বাসন্তী জাতের ক্ষেত্রে ১০৩-১০৮ কেজি। সারি বা লাইন করে চীনাবাদামের বীজ বপন করতে হয়। এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব হবে ১২ই : বা ৩০ সি: মি: এবং সারিতে এক বীজ হতে অপর বীজের দূরত্ব হবে ৬ ই : অর্থাৎ ১৫ সে: মি: শুধুমাত্র ত্রিদানা জাতের বেলায় সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সে: মি: এবং সারিতে গাছের দূরত্ব হবে ১০ সে: মি:। হাল্কা মাটিতে বীজ ২.৫ সে: মি: — ৪০.০০ সে: মি: গভীরতে বপন করতে হবে।৪

আগাছা পরিষ্কার করা ও গোড়ায় মাটি দেওয়া : দুই সপ্তাহের মধ্যেই চীনাবাদাম ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হয়। কোদালের সাহায্যে এই কাজটি করা যেতে পারে। কোনো কোনো অঞ্চলে গোল আলুর মতো চীনাবাদামের গাছের গোড়ায় উচু করে মাটি দেওয়া হয়, আবার কোনো কোনো এলাকায় সামান্য কিছু মাটি গোড়ায় দেওয়া হয় এবং সারির মধ্যবর্তী মাটি কুপিয়ে আলগা ঝরঝরা করে দেওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে শেষোক্ত প্রথায় গাছের গোড়ায় মাটি দিলেই চলে। গোল আলুর সারির মতো উচু করে মাটি দিয়ে শুধু পণ্ডশ্রমই করা হয়। আসল কথা এই বাদামক্ষেতের জমি গাছে ফুল ধরার আগেই কুপিয়ে নরম ঝুরঝুরা করে রাখতে হয়। ফুল আসার পর আর সেই কাজ করা যায় না, কারণ তাতে মাটিতে প্রোথিত শিশু চীনাবাদাম উঠে এসে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন : বাংলাদেশে খরিপ মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টি হয়, তাই চীনাবাদামে তখন পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টির পানি চীনাবাদাম গাছের গোড়ায় জমিলে গাছের ও বাদামের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তাই চীনাবাদাম ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হয়। রবি মৌসুমে চরাঞ্চলের মাটিতে প্রচুর রস থাকে, তাই পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। রবি মৌসুমে উচু জমির রস খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। তখন হতে ২-৩ বার পানি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন বোধে প্রথম সেচ জমিতে বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিনে এবং দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৬০-৬৫ দিনে দিতে হয়। বেশি উচু জমিতে ৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। সাধারণত প্রথম সেচ বীজ বোনার ২৫ দিনে, দ্বিতীয় সেচ বীজ বোনার ৫০ দিনে এবং তৃতীয় সেচ বীজ বোনার ৭৫ দিনে দিতে হয়।

কীটপতঙ্গ ও রোগ-বালাই দমন : চীনাবাদামে কীটপতঙ্গের আক্রমণ কম হয়। তবে উইপোকা কোনো কোনো সময় ফসল আক্রমণ করতে পারে। এইরূপ আক্রমণ দেখা গেলে হেপ্টাক্লোর নামক ঔষধের গুড়ো গাছের গোড়ার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে উইপোকা দমন হয়ে যায়। ইঁদুর চারা গাছে ও কচি বাদাম খেয়ে ক্ষতি করতে পারে। জমিতে পানি সেচ করে ইঁদুরের আক্রমণে বাধা দেওয়া যেতে পারে, তাতে করে উইপোকার আক্রমণও কমে যাবে। কখনো কখনো কাক বপন করা চীনাবাদাম এবং গাছের গোড়ায় উৎপন্ন চীনাবাদাম উঠিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে। এমতাবস্থায় পাহারার সাহায্যে কাক তাড়িয়ে ফসল রক্ষা করতে হয়।

চীনাবাদাম রোগের আক্রমণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। টিক্কা (Tikka) চীনাবাদামের একটি মারাত্মক রোগ। বীজ বপন করার প্রায় ১ মাস পর এই রোগের আক্রমণ দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্ত হলে চীনাবাদাম গাছের পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার কালো দাগ দেখা যায়। কখনো কখনো এই দাগগুলির চতুর্দিকে হলুদ রংয়ের দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ক্রমান্বয়ে বড় হতে থাকে এবং অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে বড় বড় বাদামি বা কালো পচা দাগে পরিণত হয়। আক্রমণ বেশি হলে পাতার বোঁটা বা ডাটায় এই রোগ বিস্তার লাভ করে এবং আক্রান্ত পাতাগুলি অকালে মাটিতে ঝরে পড়ে এবং ফলন কমে যায়। মনে হয় যেন ক্ষেতটি পুড়ে গিয়েছে।

চীনাবাদামের ভালো ফলন পেতে হলে এই রোগ অবশ্যই দমন করতে হবে। সেজন্য প্রতি লিটার পানির ২ গ্রাম ব্যভিষ্টিন নামক ঔষধ মিশিয়ে আক্রান্ত ফসলে ছিটাতে হবে। রোগ দমন না হলে ১৫ দিন পর পর আরো ২ বার ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। আর মরিচা রোগ দেখা দিলে ক্যালিক্সিন বা টিল্ট নামক ঔষধ ১ মি : মি: ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০–১২ দিন অন্তর অন্তর ২–৩ বার ছিটাতে হবে।[৪]

খেত হতে বাদাম তোলার পর সমস্ত আবর্জনা এবং গাছের পরিত্যাক্ত অংশ পুড়িয়ে নষ্ট করলে আক্রমণ পরবর্তী ফসলে ছড়ায় না। টিক্কা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন জাত চাষ করেও এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। বাসন্তী জাতের বাদাম (ডিজি–২) এই রোগ যথেষ্ট মাত্রায় সহনশীল অর্থাৎ সহজে আক্রান্ত হয় না।[৪,৫]

চীনাবাদামে কখনো কখনো কাণ্ডপচা রোগ (stem-rot) দেখা যায়। ইসক্লোরেসিয়াম রলফসি (Sclerotium rolfsii) নামক এক প্রকার ছত্রাক এই রোগ ঘটায়। গাছ এই রোগে আক্রান্ত হলে গোড়া পচে যায় এবং গাছ আস্তে আস্তে মরে যায়। এই রোগ দেখা দেওয়ার পর পরই জমিতে পরিমাণ মতো প্লাবন সেচ দিলে রোগের প্রকোপ কমে যায়। তাহা ছাড়া বীজ ভিটাভেক্স–২০০ নামক ছত্রাক নাশক দ্বারা শোধন করে বপন, করলে এ রোগ হবার সম্ভাবনা কম থাকে। প্রতি কেজি খোসা ছাড়ানো বীজের জন্য ২.৫৩ গ্রাম ঔষধ মিশিয়ে বীজ ভালোভাবে ঝাকিয়ে নিলে শোষণের কাজ হবে।

চীনাবাদাম উঠানো : কোদালী অথবা দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে চীনাবাদাম উঠান যায়। কখন বাদাম উঠাতে হবে তা গাছের চেহারা দেখে অনেক সময় বুঝা যায় না। গাছের গোড়ায় যথেষ্ট বাদাম পেকে গেলেও তখনো গাছ সবুজ থাকতে পারে এবং নতুন ফুল ধারণ করতে পারে। কাজেই কোনো জাতের বাদাম বপনের কত দিন পর উঠাতে হবে তা আগভাগেই জেনে নিয়ে সময়মতো বাদাম উঠাতে হবে। যেমন, আগুল বাদাম ৪–৪½ মাস এবং নাবী বাদাম ৫–৬ মাস পাকে। পরিপক্ক হবার আগে বাদাম উঠালে তাতে ফলন এবং তৈল কম হবে। দেরিতে উঠালে প্রায় জাতের বাদামেই সুপ্ততা না থাকার দরুন মাটির নিচে থাকতেই অঙ্কুরিত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বাসন্তী জাতের বাদামে ৪০–৪৫ দিনের সুপ্ততা আছে বলে এইরূপভাবে বাদাম নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।[৪] চীনাবাদাম ফসলের বৈশিষ্ট্য এই যে গাছ বয়স্ক হয়ে গেলেও তাতে ফুল ও বাদাম ধরা বন্ধ হয় না। এইজন্য আশা করা যায় না যে সমস্ত বাদাম এক সঙ্গে পাকলে উঠানো যাবে। যখন উঠালে অধিক পরিমাণ পাকা বাদাম পাওয়া যাবে সেই সময় বাদাম উঠিয়ে নেয়া বাঞ্ছনীয়। যে কোনো সময় উঠালেই কিছু না কিছু

কটি বাদাম থাকবে। সেইজন্য আফশোস করার কিছু নেই। উল্লেখ্য যে, ফসল পরিপক্ক হলে বাদামের খোসার শিরাগুলি স্পষ্ট হয় এবং ভিতরে বীজগুলি রংগিন হয়।

বীজ শুকানো ও গুদামজাতকরণ : বাদাম ক্ষেত হতে উঠানোর পর গাছ হতে আলাদা করে ফেলতে হয়। বাদামের গায়ে মাটি লাগান থাকলে তা পরিষ্কার করে নিতে হয়। প্রথমে নরম আঁচে রৌদ্রে দিয়ে তৎপর চার পাঁচ দিন ভালোভাবে রৌদ্রে দিয়া উত্তমরূপে শুকিয়ে গোলাজাত করতে হয়। শুকানো বাদাম পলিথিন ব্যাগে করে ড্রামে রাখা যায়। বর্ষাকালে প্রতি মাসে এক বা দুই বার শুকিয়ে রাখলে বীজ ভালো থাকে। তা হলে এক রবি মৌসুমে বীজ পরবর্তী রবিতে বোনার সম্ভাবনা থাকে।

ফলন : চীনাবাদামের ফলন খরিপ মৌসুমের চেয়ে রবি মৌসুমে বেশি হয়। গড়ে ফলন হেক্টরে ১১.৫০ কেজি হতে পারে। তবে আধুনিক বা উফশী জাত নিয়ে উন্নত পদ্ধতি আবাদ করলে চীনাবাদামের ফলন প্রতি হেক্টরে ২০০০–২২০০ কেজি হতে পারে।[৫]

চীনাবাদামের ব্যবহার

চীনাবাদামে শতকরা ৪৮–৫০ ভাগ তৈল এবং ২৪–২৫ ভাগ আমিষ থাকে। চীনাবাদাম হতে তেল প্রস্তুত করা হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহার এক বড় অংশ সরাসরি খাওয়া হয়। বাংলাদেশেও চীনাবাদামের এক বিরাট অংশ ভেজে খাওয়া হয়। চীনাবাদাম ভেজে খাওয়ার রওয়াজ এই দেশে একটি সাধারণ ব্যাপার। ময়রার দোকানে চীনাবাদাম বিস্কুটে ব্যবহার করা হয়। শহর বা পল্লী অঞ্চলে চীনাবাদামের দানা গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে এক রকম বিস্কুট তৈয়ার করা হয়। চীনাবাদাম হতে গরুর দুধের মতো এক প্রকার দুধ তৈরি করা যায়। তবে তা গরুর দুধের মতো স্বাদযুক্ত নয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ মহাদেশের অনেক দেশে চীনাবাদাম হতে এক প্রকার মাখন তৈরি করা হয়।[১৫]

চীনাবাদামের লতা গরু–বাছুরের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চীনাবাদামের খৈল গো-খাদ্য ও সার এই দুই হিসেবেই ব্যবহার করা যায়।

তৈলশস্য

সয়াবীন (Soybean)

সয়াবীন বাংলাদেশের একটি নতুন সম্ভাবনাময় তৈলশস্য। ইহা একটি ডালশস্যও বটে। পুষ্টির দিক হতে মুগ, মশুর ছোলা ইত্যাদি কোনো ডালশস্যই ইহার সমকক্ষ তো নয়ই, বরং সেইগুলি হতে তা অনেকগুণে শ্রেয়। নিম্ন তালিকার দিকে লক্ষ্য করলেই তা প্রতীয়মান হবে।[১]

বাংলাদেশের প্রধান দুটি তৈলশস্য— সরিষা এবং চীনাবাদাম হতে সয়াবীনে তৈলের পরিমাণ কম থাকলেও আমিষের পরিমাণ যথেষ্ট। যেক্ষেত্রে সরিষা ও চীনাবাদামে যথাক্রমে ২৪–২৫% এবং ২৫–২৬% আমিষ থাকে সেক্ষেত্রে সয়াবীনে আমিষ থাকে ৪৩.২%

সারণি ১৯ : সয়াবীন ও অন্যান্য ডালের পুষ্টি উপাদানের পার্থক্য

পুষ্টি উপাদান	প্রতি ১০০ গ্রামে পুষ্টি উপাদানের পার্থক্য				
	সয়াবীন	ছোলা	মুগ	মশুর	অড়হড়
ক্যালরি	৪৩২	৩৭২	৩৪৮	৩৪৩	৩৩৫
আমিষ (গ্রাঃ)	৪৩.২	২০.৮	২৪.৫	২৫.১	২২.০
চর্বি (গ্রাঃ)	১৯.৫	৫.৬	১.২	০.৭	১.৭
খনিজ (গ্রাঃ)	৪.৬	২.৭	৩.৫	২.১	৩.৫
ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাঃ)	৬৯০	৩৩১	৪০৫	২৯২	৩০৪
ফসফরাস (মিঃ গ্রাঃ)	২৪০	৫৬	৭৫	৬৯	৭৫
লৌহ (মিঃ গ্রাঃ)	১১.৫	৯.১	৮.৫	৪.৮	৫.৮
কেরোটিন (মাইঃ গ্রাঃ)	৪২৬	১.৯	৯৪	২৭০	১৩২
রাই ফেক্লোভিন (মিঃ গ্রাঃ)	০.৩৯	০.১৮	০.২৭	০.২০	০.১৯
নিয়াসিন (মিঃ গ্রাঃ)	৩.২	২.৪	২.১	২.৬	২.৯

সয়াবীন পৃথিবীর বহুসংখ্যক দেশে চাষ না হলেও ইহা একটি অন্যতম প্রাচীন শস্য। খ্রিস্টপূর্ব ২৮৩৮ অব্দে জনৈক চীন সম্রাট কর্তৃক উপকারী গাছ-গাছড়া সম্বন্ধীয় লেখা একখানি পুস্তকে সয়াবীনের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি এই শস্যটিকে উপকারী খাদ্য এবং ঔষধরূপে চিহ্নিত করেন।

বাংলাদেশের লোক যে অপুষ্টিতে ভুগছে সে কথা বিশেষ করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সয়াবীনে প্রচুর পরিমাণ আমিষ ও শক্তির উৎস তৈল আছে বলে এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অধিবাসীদের ইহা একটি আদর্শ খাদ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (FAO) একটি পর্যবেক্ষক দল ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশে আগমন পূর্বক সমীক্ষা শেষে অনুমোদন করেন যে বাংলাদেশে সয়াবীনের চাষ করে ইহার মাধ্যমে যে দেশের অধিবাসীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন।[১৩]

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সয়াবীনের চাষ প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে গত ৮-১০ বৎসর যাবৎ কতকগুলি গবেষণা সংস্থা, যেমন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আণবিক কৃষি ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল এই দেশে সয়াবীনের উৎপাদন উন্নয়ন এবং সয়াবীনজাত খাদ্যবস্তু প্রস্তুত ও ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এম. সি. সি (M. C.C) নামে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও সয়াবীন চাষ সম্বন্ধে নোয়াখালীতে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত আছে। এই বিভিন্ন সংস্থার গবেষক ও কর্মীদের মতো এই যে বাংলাদেশের মাটি এবং আবহাওয়া সয়াবীন চাষের অনুকূলে।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

সয়াবীনের উৎপত্তি স্থান নিয়ে মতভেদ আছে। তবে কেউ কেউ মনে করেন ইহার আদি উৎপত্তিস্থান পূর্ব-এশিয়া তথা চীনদেশ। সয়াবীনের একটি বন্যজাত গ্লাইসিন ইউসুরিয়েনসিস (glycine ussuriensis) হতে আবাদযোগ্য সয়াবীনের চাষ হয় প্রথম চীনদেশে খ্রিস্টপূর্ব প্রায়

১৩৩৩ অব্দে। ইউরোপ মহাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীতে সয়াবীনের প্রচলন হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া র দিকে সয়াবীনের চাষ শুরু হয়। আজ সে দেশে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। ১৯৬০-৬৪ সালের মধ্যে গড়ে প্রতি বৎসর সে দেশে ১১৪৮০৯৭০ হেক্টর জমিতে সয়াবীনের চাষ হয়।[১৫]

উপরোক্ত দেশ চীন ও যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর আর যে যে দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে সয়াবীনের চাষ হয় সে দেশগুলি হচ্ছে জাপান, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কানাডা।

মাটি ও জলবায়ু

প্রায় সব রকম মাটিতেই সয়াবীনের চাষ হতে পারে, তবে দোঁ-আঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটিই সবচাইতে ভালো। মাটি সুনিষ্কাশনযুক্ত ও উর্বর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের আবহাওয়া সয়াবীন চাষের উপযোগী। ফসল জন্মানোর প্রথম তিন মাসে যথেষ্ট বৃষ্টিপাতসহ উষ্ণ আবহাওয়া বিরাজমান থাকা প্রয়োজন। গাছে বীজ পাকা ও ফসল তোলার সময় ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিহীন পরিবেশ থাকা বাঞ্ছনীয়। উষ্ণতার মাত্রা ২৪° সে. হতে ২৫° সে. পর্যন্ত থাকা ভালো, তা ১০° সে. এর নিচে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। বৃদ্ধিকালীন সময়ে বৃষ্টিপাত না হলে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এইজন্য বাংলাদেশে সয়াবীনের চাষ করতে গেলে খরিপ মৌসুমে কোনো সেচের দরকার হয় না আর রবি মৌসুমে অবশ্যই সেচের প্রয়োজন হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

সয়াবীন শিম্বী পরিবারভুক্ত একটি দ্বিবীজপত্রী বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম glycine max (L.) Moor. ছোট আকৃতির (৬০-৯০ সেঃ মিঃ) (গাছের চিত্র ৪.৫) কোনো কোনোটি কখনো সরল সটান থাকে, আবার কোনোটি মাটিতে লতিয়ে যায়। পাতায় লম্বা বৃন্ত হয়ে এবং ফলক তিনভাগে বিভক্ত ; পাতার গোড়ায় গাছের কাণ্ডে ছোট ছোট সাদা ও গোলাপি রংয়ের ফুল ধরে, ফল বা শুঁটি লম্বা ধরনের শুঙ্গ দ্বারা আবৃত থাকে, প্রতি শুঁটিতে ২-৫টি করে গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির বীজ থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু জাতের সয়াবীন দেখা যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ "বাংলাদেশ সমন্বিত সয়াবীন গবেষণা প্রকল্প" নামে একটি কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্বোল্লিখিত ১১টি গবেষণা সংস্থা ঐ সমস্ত বিভিন্ন জাতের সয়াবীনের বীজ নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে অধিক ফলন, পরিপক্কতার সময়, রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিচারে প্রমাণিত হয়েছে যে নিম্নোদ্ধৃত তিনটি সয়াবীনের জাত বাংলাদেশের আবহাওয়ার সব চেয়ে উপযোগী। উল্লেখ্য, এই তিনটি জাতই জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে।[১৭]

চিত্র : ৪.৫ সয়াবীনের গাছ

১. ব্রাগ (Bragg) : এই জাতের গাছের উচ্চতা মাঝারি, ফুল উজ্জ্বল সাদা রংয়ের ; মৌসুম ভেদে বেশি ১০০–১১০ দিনের মধ্যে শুঁটি পাকে। বীজ গুদামজাত অবস্থায় অপেক্ষাকৃত বেশি দিন ভালো থাকে এবং সে বীজের অঙ্কুরোদগামক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত ভালো ; রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। এই জাতের সয়াবীন বৎসরে তিন বার চাষ করা যেতে পারে, আখের সাথে অন্তর্বর্তী ফসল (Inter crop) হিসেবে চাষ করার উপযোগী। প্রতি হেক্টরে ১৩০০–১৪৫০ কেজি ফলন দেয়।

২. ডেভিস (Davis) : এই জাতের গাছ প্রথমোক্ত জাতের মতো উঁচু অর্থাৎ মাঝারি উচ্চতাবিশিষ্ট। ফুলের রং সাদা, শুঁটি ১১০–১২০ দিনে পাকে। প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা বেশি বলে ফলন অধিক —প্রতি একরে ২৯ মণ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ১৪৫০–১৫০০ কেজি পর্যন্ত ফলন হতে পারে। বীজের ক্ষমতা অঙ্কুরোদগম বেশি ; রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধক্ষমতা অনেক বেশি।

৩. সোহাগ : এই জাতের গাছ বেশ উঁচু — ৫০ থেকে ৬০ সে: মি: উঁচু ; ১০০–১১০ দিনে জীবনচক্র শেষ হয়, ফলন ১৫০০–২০০০ কেজি হতে পারে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

জমি প্রস্তুতি ও সার প্রয়োগ : চার পাঁচ বার আড়াআড়ি চাষ ও বার তিনেক মই দিয়ে জমি ভালোভাবে নরম ও ঝুরঝুরা করে চাষ করতে হবে। সয়াবীনের শিকড় বেশ নিচে যায় বলে জমি গভীরভাবে চাষ করা প্রয়োজন। খরিপ মৌসুমের জন্য জমি প্রস্তুত করতে গেলে জমি

এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি কোথায়ও জমার সুযোগ না পায়। জলাবদ্ধ জমিতে সয়াবীন গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

সয়াবীন শিম্বীজাতীয় গাছ বলে গাছেও জমিতে নাইট্রোজেনের যোগ সাধন করতে পারে। যা তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। সেইহেতু সয়াবীন চাষে সাধারণত নাইট্রোজেন সার তথা ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয় না। তবে জমি অনুর্বর হলে একর প্রতি ১০–১৫ সের অর্থাৎ হেকটর প্রতি ২৩–৩৫ কেজি ইউরিয়া দুইবারে জমিতে প্রয়োগ করতে হয়, অন্য সারের মধ্যে টি. এস. পি হেকটর প্রতি ১৫০–১৭৫ কেজি এবং মিউরেট অব পটাশ ১০০–১২০ কেজি এবং ৮০–১১৫ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করতে হয়।[৫] এই সবগুলো একত্রে মিশ্রিত করে বপনকৃত বীজের দুই সারির মাঝে লাঙ্গলের ভেলীর মধ্যে প্রয়োগ করে ঢেকে দিলে ভালো কাজ দেয়।

বীজ বপন : বৎসরে তিন সময় সয়াবীনের বীজ বপন করা চলে। শীত বা রবি মৌসুমে পৌষ মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত বপন করার একটি সময় ; খরিপ বা বর্ষা মৌসুমে ১লা শ্রাবণ হতে ১৫ শ্রাবণ আর একটি সময় এবং শরৎকালে বা শেষ খরিপ মৌসুমে কার্তিক মাসের প্রথম পক্ষে বপন করার অপর আর একটি সময়। তবে কেউ কেউ বলেন বাংলাদেশে সয়াবীনের বীজ বপন করার আদর্শ সময় হলো খরিপের শেষ মৌসুম।

সয়াবীনের বীজ সারি বা লাইন করে লাগাতে হয়। রবি ও শেষ খরিপ মৌসুমে দুই সারির মধ্যে দূরত্ব রাখতে হবে। ৮–১২ ই: অর্থাৎ ২৩–৩০ সে: মি: এবং খরিপ মৌসুমে ১৮ই : অর্থাৎ ৪৫ সে: মি:। দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে সারি করে তার মধ্যে ৫ সে: মি: পর পর ও ৪ সে: মি: গভীরতায় বীজ বপন করতে হবে। বপনের জন্য হেক্টর প্রতি ৬০–৮০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হয়।

বপনের জন্য শোধিত বীজ ব্যবহার করা ভালো। এর আগে বীজে ব্যাকটেরিয়ার সাজ (bacteial inoculum) লাগালে আরো ভালো। ইহাতে গাছের শিকড়ে অর্বুদ (nodules) সহজে সৃষ্টি হবে যার ফলে নাইট্রোজেন যোগ সাধনের কাজ সহজতর হবে। এই সমস্ত ইনকুলাম আমাদের দেশে আগে পাওয়া না গেলেও আজকাল তা পাওয়া যায়। প্রতি কেজি বীজের জন্য নাইট্রিজিন, ক্যাপটান, এবাটান ইত্যাদির যে কোনো একটি ইনকুলামের ১২ গ্রাম প্রয়োজন। সয়াবীনের বীজ প্রথমে গুড়ের পানিতে সিক্ত করে নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে এক কেজি পানিতে ২৫০ গ্রাম গুড় ব্যবহার করলেই চলে। তৎপর বীজ পরিমাণ মতো ইনকুলাম দ্বারা মাখিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে নেয়ার পর পরই বপন করতে হবে।[১১] যে জমিতে একবার ইনকুলাম মিশ্রিত বীজ ব্যবহার করা হবে পরবর্তীকালে সেই জমিতে বপনের জন্য কয়েক বৎসরের মধ্যে বীজ পুনরায় তা ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না।

আগাছা দমন : সয়াবীন ডালজাতীয় শস্য হলেও আগাছার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। সেইজন্য যথাসম্ভব আগভাগেই সয়াবীন ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। বীজ বপনের সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করে দেওয়া ভালো, কারণ প্রায় ৪ সপ্তাহের মধ্যে সারা ক্ষেত গাছের শাখা প্রশাখায় ছেয়ে যায় যখন আগাছা পরিষ্কারের কাজে ভয়ানক অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

সেচ প্রয়োগ : বলা অনাবশ্যক যে খরিপ মৌসুমের ফসলে কোনো সেচের প্রয়োজন হয় না। বরং সেই সময় ক্ষেতে পানি জমে গেলে তা নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে। রবি মৌসুমের ফসলে অবশ্যই সেচ দিতে হয়, দুই বার সেচ দিলেই চলে— প্রথমবার বীজ বপনের ২৫–৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয়বার গাছে ফুল ধরার পর। শরৎকালীন ফসলেও সেচ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, তবে দুইটি সেচের বদলে একটি সেচ দিলেই চলতে পারে।

রোগ ও পোকা দমন : সয়াবীনে রোগ ও পোকার আক্রমণ তত প্রকট নয়। তবে রোগের চাইতে পোকার আক্রমণই বেশি হয়।

ক. বিছা পোকা : খরিপ মৌসুমের ফসলেই কখনো কখনো বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। পোকাগুলি গাছের পাতা, ডগা প্রভৃতি সবুজ অংশ খেয়ে সাবাড় করে দেয়। প্রতি একরে তিন পোয়া সেভিন অথবা ½ সের ম্যালাথিয়ন প্রতি ১২½ মণ পানির সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে সপ্তাহে দুইবার প্রয়োগ করলে পোকা দমন হয়ে যায়।

খ. জাবপোকা : সরিষার জাবপোকা সয়াবীনের কচি পাতা ও ডগার রস চুষে খেয়ে গাছ দুর্বল করে দিতে পারে। ইহা ছাড়া জাবপোকা ভাইরাস রোগ ছড়ায়। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত ঔষধ অর্থাৎ ম্যালাথিয়ন বা সেভিন উল্লিখিত নিয়মে প্রয়োগ করলে জাবপোকা সহজেই ধ্বংস হয়ে যায়।

রোগের মধ্যে ইয়েলো মোজাইক (Yellow mosaic) প্রায়শই দেখা যায়। কখনো কখনো পাতাপচা রোগও দৃষ্ট হয়। ইয়েলো মোজাইকের আক্রমণে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে গাছের বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যায় এবং তাতে ফুল ও শুঁটি কম ধরে। জাবপোকা এই রোগ ছড়ায় বলে ইহার আক্রমণ আগে বন্ধ করতে হবে। দুই চারিটি গাছে প্রথম আক্রমণ দেখা দিলেই সেইগুলি ঠিক শিকড় সমেত উঠিয়ে দূরে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ডাইথেন-এম-৪৫ অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড ২–৩ তোলা ১২½ মণ পানিতে মিশিয়ে প্রতি সপ্তাহে দুইবার প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ফসল কাটা : সয়াবীনের শুঁটি গাছে ভালোভাবে পেকে উঠলে গাছ কাস্তের সাহায্যে গোড়া কেটে উঠিয়ে নিতে হবে। শুঁটি পাকলে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়, অধিকাংশ পাতা ঝরে পড়ে এবং শুঁটি বাদামি রং ধারণ করে। শুঁটি ভালোভাবে না পাকলে গাছ তোলা উচিত নয়।

মাড়াই-ঝাড়াই ও বীজ শুষ্ককরণ : গাছ ভালোভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে পাতলা করে ছড়ান অবস্থায় হাতলাঠি দ্বারা আস্তে আস্তে আঘাত করলে শুঁটির আবরণ ফেটে বীজ বের হয়ে আসে।[৬] ফসল বেশি হলে গরুর পায়ের নিচে মাড়াইতে হয়। প্রথমে হাত দ্বারা ঝাঁকিয়ে বীজ হতে গাছের টুকরা আলাদা করে ফেলে তৎপর কুলা চালনীর সাহায্যে বীজ পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। তৎপর কয়েকবার রৌদ্রে দিয়ে নাড়াচাড়া করলে বীজ শুকানোর কাজ হয়ে যায়। মুখবন্ধ টিনে বা পলিথিন ব্যাগে শুকনা জায়গায় বীজ গুদামজাত করতে হয়।

সয়াবীনের বীজ সহজেই জীবনশক্তি হারিয়ে ফেলে। সেজন্য খুব সাবধানে বীজ শুকাতে ও গুদামজাত করতে হয়। গুদামজাত বীজ এক মাস পর পর পুনরায় রৌদ্রে দিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় বীজে যেন কখনো ছাতা না পড়ে। কোনোক্রমে বীজে ছাতা দেখা দিলে ৫৮° সেঃ তাপমাত্রায় ১০ মিনিটকাল গরম করে শোধন করে নিতে হবে।[৮]

ফলন : পরীক্ষাধীন জমিতে সয়াবীনের ফলন হেক্টর প্রতি ১৮০০–২৬০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। চাষীদের জমিতে গড়পড়তা ফলন হতে পারে ১৩০০ কেজি। উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে গড় ফলন ২০০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।[৫]

সয়াবীনের ব্যবহার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সয়াবীনের ব্যবহার বহুবিধ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানত ইহা হতে তৈল প্রস্তুত করা হলেও বাংলাদেশে তা বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে না, কারণ দেশী ঘানিতে সরিষা বা তিল হতে তৈল বের করা হয় সেই ঘানিতে সয়াবীন বীজ হতে তৈল বের করা সম্ভব হয় না। বস্তুত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহা হতে তৈল বের করা হয় যা বেশ খরচ সাপেক্ষ।

সয়াবীনের কাঁচা শুঁটি হতে বীজ বের করে মটরশুঁটির মতো সব্জী হিসেবে খাওয়া যায়। পোলাও, সিঙ্গারা ও তরকারিতেও ব্যবহার করা যায়। পরিপক্ক সয়াবীন দ্বারা অনেক রকম খাবার প্রস্তুত করা যায়, যেমন—সয়াখিচুড়ী সয়াতরকারি, সয়াডাল, সয়াবড়ি, সয়াচাটনি সয়াবড়াম সয়াবাদাম, সয়াপাপড়, সয়াসেমাই, সয়াপরোটা, সয়ারুটি, সয়াচাপাতি, সয়াপিঠা, সয়াপায়েশ এবং সয়াবিস্কুট। চীনাবাদামের ন্যায় সয়াবীনের বীজ হতে গরুর দুধের মতো দুধ প্রস্তুত করা যায় এবং সেই হতে দৈও বসান যায়। এই দুধ গরুর হতে খুব একটা নিকৃষ্ট নয়, তদপুরি কোনো কোনো উপাদান গরুর দুধ হতে বেশি।[৮]

এছাড়া শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতের কাঁচামাল হিসেবে সয়াবীনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সয়াবীন হতে শতাধিক শিল্পদ্রব্য, যেমন—সাবান, রং বার্নিশ, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

গরুবাছুর ও হাঁসমুরগির খাদ্য হিসেবেও সয়াবীন খুব উৎকৃষ্ট। সয়াবীনের গাছ ও খৈল উভয়ই গরু-মহিষের পুষ্টিসাধন করে সেগুলিকে সুস্থ ও সবল রাখে। সয়াবীন হাঁস-মুরগির জন্যও এইরূপ উপকার সাধন করে থাকে।

গর্জন তিল (Niger)

গর্জন তিল বাংলাদেশে গুটি তিল নামেও পরিচিত। ইহার তৈল খুব উন্নত মানের হলেও ইহা বাংলাদেশের একটি অপ্রধান তৈলশস্য। দেশে কি পরিমাণ জমিতে ইহার চাষ হয় তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। কুমিল্লা জেলার পশ্চিমাঞ্চলে বাঞ্ছারামপুর, মুরাদনগর, নবীনগর ও অন্যান্য উপজেলায় ইহার চাষ হয়। তাছাড়া মাগুড়া এবং জামালপুর জেলায়ও ইহার কিছু কিছু চাষ হতে দেখা যায়।

মাটি ও জলবায়ু

ঈষৎ লাল ও বাদামি রংয়ের দোআঁশ মাটি গর্জন তিল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী, তবে বেলে ও কাঁকড় যুক্ত মাটি ছাড়া আর যে কোনো মাটিতে ইহার চাষ করা যায়।[১০] ঠাণ্ডাযুক্ত পরিবেশ এই ফসলটির জন্য উপকারী। তাই আমাদের দেশে রবি মৌসুমে ইহার চাষ করা হয়। ফসল জন্মানোর প্রথমার্ধে পৌষ–মাঘ মাসে কম অর্থাৎ ১৫–২০° সে. তাপমাত্রায় ইহার

বীজ বপন করতে হয় আর ফসল বৃদ্ধির শেষার্ধে ফাল্গুন–চৈত্র মাসে অধিক অর্থাৎ ২০–৩০° সে. তাপমাত্রায় ১২৫–১৩০ দিন পর ইহা কাটা হয়। জমিতে রস থাকলে বৃষ্টিপাত বা সেচের কোনো প্রয়োজন হয় না। দেখা গিয়েছে বর্ষাকালেও গর্জন তিলের গাছ জন্মে। গাছগুলি বেশ বড়ও হয়, মাটির উপড়ে গাছের গোড়ায় সাদা রংয়ের যথেষ্ট শিকড় জন্মে, কিন্তু তাতে কোনো ফুল বা বীজ জন্মে না।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়

গর্জন তিল Compositac পরিবাভুক্ত, একটি বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Guizatia abyssinica Cass গাছগুলি রবি মৌসুমে $2\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}$ ফু: অর্থাৎ ৭৫–১০৫ সে: মি: উঁচু হয়। গাছের কাণ্ড সাধারণত সবুজ ও বেগুনি রংয়ের হয়, কাণ্ড ও পাতা লোমশ হওয়ায় হাতে ধরলে খসখসে লাগে, তবে উভয়ই নরম। প্রায় ৭ সে:মি: লম্বা দাতকাটা পাতাগুলি বোটাযুক্ত ; ফুলগুলি উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের দেখতে কিছুটা সূর্যমুখী ফুলের মতো, তবে আকারে বেশ ছোট। একটি গাছে ৪০–৫০টি ফুল ধরে এবং এক একটি ফুল হতে ৫০–৬০টি বীজ উৎপন্ন হয়। বীজগুলি সূচাকৃতির – $1\frac{1}{8}$ সে: মি: মতো লম্বা, পাতলা ও বেশ মসৃণ। প্রতি ১০০০টি বীজের ওজন ৩–৩.৫ গ্রাম।

বাংলাদেশে গর্জন তিলের একটি অনুমোদিত জাত রয়েছে। জাতীয় বীজ বোর্ড শোভা নামের এ জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র আবাদ করার জন্য রায় দিয়েছে।[১৭]

চাষাবাদ প্রণালি

তিন চারটি চাষ ও গোটা ছয়েক মই দিয়ে জমি বীজ বপনের জন্য প্রস্তুত করা যায়। গর্জন তিলের চাষে সাধারণত কোনো সার প্রয়োগ করা হয় না, তবে সার দিলে ফলন ভালো পাওয়া যায়। সার নিম্নোক্ত হারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে :

সারের নাম	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া	৩৩ সের	৭৫ কেজি
টি. এস. পি	৫২ সের	১২০ কেজি
এম. পি	২০ সের	৫০ কেজি

কার্তিক–অগ্রহায়ণ মাসে ছিটিয়ে বীজ বপন করতে হয়। তবে আমন ধান কাটার পর পৌষ মাসেও বীজ বপন করা যায়। প্রতি হেক্টর ৭–৮ কেজি বীজ বপন করতে হয়। বীজ গজাবার পর সময়মতো একবার আগাছা পরিষ্কার করে দিলেই চলে। সাধারণত জমিতে সেচ দেবার কোনো প্রয়োজন হয় না। তবে মাটিতে রসের অভাব অনুভূত হলে একটি সেচ প্রয়োগ করলে ভালো হয়। এই ফসলে রোগ-পোকার আক্রমণ হয় না, কাজেই কীটনাশক বা রোগনাশক কোনো কিছু প্রয়োগের কথা উঠে না।

বপনের তিন মাস পর গাছে ফুল ধরে, আর ৫–৬ সপ্তাহ পর ফসল পরিপক্বতা লাভ করে। কাস্তের সাহায্যে গাছের গোড়া কেটে নিতে হয়। তৎপর গাছগুলি বোঝা বেঁধে বাড়ির

আঙ্গিনায় নিয়া স্তূপ করে রাখতে হয়। শুষ্ক গাছ উঠানে ছড়ায়ে দিয়ে সেইগুলির উপর লাঠির সাহায্যে মৃদু আঘাত করলেই খোসা হতে বীজ সহজেই বের হয়ে আসে। কুলা চালনীর সাহায্যে বীজ তখন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে হয়।

গুজি বীজের একর প্রতি ফলন ১১-১৪ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ১১০০-১২০০ কেজি। বীজে শতকরা ৩৮ ভাগ তৈল থাকে। সরিষা বীজের মতো গুজির বীজ ঘানিতে সহজেই ভেঙ্গেই তৈল পাওয়া যায়।

গুজির খৈল গো-মহিষের খুব উপাদেয় খাদ্য। ইহাতে শতকরা ৪½ ভাগ প্রোটিন থাকে। ইহার খৈল খাওয়ালে গরু-মহিষ অধিক পরিমাণে পানি খেতে অভ্যস্থ হয় যার ফলে ইহারা অধিক পরিমাণ দুধ দেয়।[১০]

কুসুমফুল (Safflower)

কুসুমফুল একটি উৎকৃষ্ট মানের তৈলশস্য। ইহার ফুলগুলি দেখতে বেশ সুন্দর। আগের দিনে এই ফুল হতে এক প্রকার রং প্রস্তুত করে সুতা এবং পশম রং করা হতো।[১০] ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু এক সময় বহুল পরিমাণে কৃত্রিম রং প্রস্তুত হওয়ার পর হতে কুসুমফুলের এই ব্যবহার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তাই আজকের দিনে কুসুমফুল আর রং প্রস্তুতের জন্য চাষ করা হয় না ; কেবল মাত্র তৈল প্রস্তুতের জন্য যা কিছু হয়।

কুসুমফুল বাংলাদেশে একটি অপ্রধান তৈলশস্য। কিন্তু কতকগুলো বিশেষ গুণের জন্য এদেশে ইহার চাষ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে। ইহা অনুর্বর ও অল্প রসযুক্ত মাটিতে চাষ করা চলে, সার ব্যবহারেরও বেশি প্রয়োজন হয় না। গাছের পাতা কাটাযুক্ত বলে এই ফসল গরুছাগলে খেতে পারে না পোকা-মাকড় দ্বারাও আক্রান্ত হয় না। ক্ষেতের চারদিকে বপন করলে কণ্টকের ভয়ে গরু-বাছুর সেই ক্ষেতের ভিতর প্রবেশ করে না। ফলে ভিতরের ফসল রক্ষা পায়। অধিকন্তু কুসুমের তৈল খুব উন্নতমানের, এমনকি সয়াবীনের চাইতেও তা শ্রেয়।

মাটি ও জলবায়ু

আগেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে কুসুমফুলের চাযের জন্য তেমন কোনো উর্বর মাটির প্রয়োজন হয় না, ভৌত গুণাগুণের বিচারে দোঁয়াশ হতে বেলে-দোঁয়াশ মাটি হলেই চলে। ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া কুসুমফুলের চাষের অনুকূলে। তাই বাংলাদেশে রবি মৌসুমে ইহার চাষ হয়। তাপমাত্রা ১৫°-২০° সে. বজায় থাকলেই যথেষ্ট। অধিক বৃষ্টিপাত কুসুমফুলের জন্য মোটেই উপযোগী নয়, বরং খড়া পরিবেশই ভালো।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়

কুসুমফুল Campositae পরিবারভুক্ত একটি বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Carthamus tinctarium গাছ ২-৪ ফু: অর্থাৎ ৬০-১২০ সে: মি: লম্বা হয়, সাধারণত ৬০-

১০টি শাখা এবং অনেকগুলি প্রশাখা বের হয়। প্রত্যেকটির প্রশাখার মাথায় একটি করে ফুল ধরে ও ফুলগুলি সুদৃশ্য লালচে কমলা রংয়ের। বীজের রং সাদা, অন্যান্য তৈলবীজের চেয়ে হালকা ; প্রতি ১০০০টি বীজের ওজন মাত্র ৩.৫ গ্রাম।

বাংলাদেশে কুসুমের আজ পর্যন্তও কোনো অনুমোদিত জাত নেই। তবে বারীতে (BARI) কতকগুলি দেশী ও বিদেশী জাত নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে ডেফ-১ (উন্নত কুসুম) জাতটি অধিক ফলন দেয়। তাছাড়া এস-৪০০ (S-400) জাতটিও ভালো। ইহার ফলন অধিক না হলেও তাতে তৈলের পরিমাণ বেশি থাকে।

চাষাবাদ প্রণালি

এককভাবে চাষ করা হলে ৩-৪ বার চাষ মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করতে হয়। অন্য ফসলের সাথে ক্ষেতের চারিদিকের কিনারা বরাবর চাষ করা হলে জমি আর আলাদাভাবে চাষ করার প্রয়োজন হয় না। সার অল্প পরিমাণ ব্যবহার করলেই চলে। তৎপর বীজ বপন করতে হয়, কার্তিক মাস বীজ বপনের উৎকৃষ্ট সময়। বীজ বপনের হার প্রতি একরে ৯-১০ সের অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ২৪-২৫ কেজি।[৩]

জমিতে চারা গজাবার ৮-১০ দিন পর ১৫ দিন অন্তর অন্তর দুবার আঁচড়া দিলে ভালো হয়। তাতে জমিতে যা কিছু আগাছা জন্মে তা উঠে যায় এবং মাটি নাড়াচাড়ার দরুন ফসল সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষবার জমিতে আঁচড়া দিবার সপ্তাহ খানেক পর গাছের আগা কেটে দিতে হয়। তাতে গাছে যথেষ্ট ডালপালা বের হয় যার অর্থ গাছে অধিক সংখ্যক ফুল ধরে অধিক পরিমাণ বীজ উৎপাদনের সহায়ক হওয়া।[১০]

কুসুম প্রায় ৪ মাসের মধ্যে পরিপক্ক হওয়ার পর হাতে টেনে গাছ উঠিয়ে নিতে হয়। গাছ দুই তিন দিন গাদা করে রাখার পর শুকিয়ে উঠলে সেগুলি হাত লাঠি দ্বারা পিটিয়ে নিতে হয়। তাতে খোসা হতে বীজ সহজেই বের হয়ে আসে। তৎপর কুলা চালনীর সাহায্যে বীজ পরিষ্কার করে নিতে হয়। কুসুমের গাছে কাটা থাকে বলে মাড়াই-ঝাড়াইয়ের কাজ কিছুটা কষ্টকর হয়।

কয়েক দিন রৌদ্রে দিয়ে বীজ নাড়াচাড়া করলেই শুষ্ক হয়ে যায়। তৎপর বীজ পলিথিন ব্যাগ অথবা ঢাকনাযুক্ত কেরোসিন টিনে রেখে সংরক্ষণ করা যায়। কুসুমবীজের ফলন প্রতি হেক্টরে ১৩০০-১৫০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

ব্যবহার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কুসুমের তৈল ভোজ্য তৈল হিসেবে খুবই ভালো। কিন্তু বীজ হতে ঘানির সাহায্যে তৈল বের করা সম্ভব হয় না। এক্সপেলারের সাহায্যে কিছু পরিমাণ নিষ্কাশন করা যায় মাত্র। যেক্ষেত্রে বীজে শতকরা ৪০ ভাগ তৈল থাকে সেক্ষেত্রে এই পন্থায় শতকরা মাত্র ১৫-২০ ভাগে তৈল নিষ্কাশন করা যায়।

কুসুমের তৈল দ্বারা এক ধরনের প্লাস্টিক তৈরি করা হয়।[১১] বীজ সরাসরি ভেজে খাওয়া যায়। মুরগির খাদ্য হিসেবেও ইহা অত্যন্ত উপযোগী। বীজের খৈল গো-মহিষের একটি উত্তম

[illegible] হতে পারে। অন্যান্য তৈলবীজের খৈলের তুলনায় [illegible] থাকে।

[illegible]

[illegible] পরিচিত। তিসির তৈলের মতো ভেরেণ্ডা তৈলও [illegible] অন্যান্য তৈলশস্য যেমন— সরিষা, তিল এবং [illegible] বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ইহা চাষ সীমাবদ্ধ [illegible] হয় না। সামান্য কিছু বাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে [illegible] হয়। তাই ভেরেণ্ডা বাংলাদেশের খুবই [illegible] প্রতি বৎসরে গড়ে মাত্র ১০০০ একরে ভেরেণ্ডার [illegible] সাল পর্যন্ত ভেরেণ্ডা চাষের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি [illegible] একর অর্থাৎ ৪৩৭ হেকটর জমিতে ভেরেণ্ডার চাষ হয়। [illegible] এবং টাঙ্গাইল জেলায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভেরেণ্ডা জন্মে।

[illegible]

[illegible] রকম মাটিতে জন্মাতে পারলেও গভীর বেলে-দোআঁশ [illegible] ভালো। মাটি ভালো নিষ্কাশনযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। [illegible] মাটিতে ভেরেণ্ডা খুব ভালো জন্মাতে দেখা যায়। [illegible] ২১–৩০° সে: এবং বৃষ্টিপাত ৫০–৬০ ইঃ অর্থাৎ [illegible]

[illegible] পরিচয়

[illegible] জাতীয় উদ্ভিদ (shrubs)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Ricinus [illegible] Euphorbiaceae পরিবারভুক্ত। জাতভেদে ইহা ৩–৬ ফুট অর্থাৎ [illegible] ১৪০–৩০০ সে: মি: উঁচু হয়। গাছের পরস্পর দূরত্ব এবং [illegible] এবং শাখা প্রশাখা সংখ্যা নির্ভর করে। সাধারণত স্থানীয় জাতে ৪–[illegible] প্রশাখা হয়। গাছের কাণ্ড গাইটযুক্ত, কখনো সবুজ এবং কখনো বেগুনি; [illegible] ভিতরে ফাঁপা। গাছের পাতা বেশ বড়, গভীরভাবে খাঁজকাটা, ছাতার মতো (palmate) [illegible] গাঢ় সবুজ রংয়ের। একই গাছে পুং ও স্ত্রী ফুল জন্মে। ফলগুলি বেশ বড় ও গোলাকার [illegible] এবং একত্রে থোকা বেঁধে থাকে। ফল পাকলে খোসা ফেটে বীজ মাটিতে পড়ে যায়। একটি ফলে সাধারণত তিনটি বীজ থাকে, কদাচিৎ দুইটি চারটি বীজ হতে পারে। ভেরেণ্ডার বীজ বেশ বড়, কালো ও খয়েরী রংয়ের সমন্বয়ে বিচিত্র পাথরের মতো।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : ভেরেণ্ডা সাধারণত অন্যান্য মাঠের ফসলের (field crops) মতো চাষ করা হয় না বলে জমি সেগুলির মতো ধারাবাহিকভাবে চাষ করা হয় না। বাড়ির ভিটায় সবজি কিংবা ফলের সাথে কিনারা শস্য (border crop) হিসেবে চাষ করা হয় বলে জমি কোদাল

দিয়ে কুপায়ে প্রস্তুত করা হয়। যখন অন্যান্য শস্যের মতো খেতখামারে চাষ করা হয় তখন ২-৩ টি চাষ মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করা চলে। বর্ষাকালে মাটি নরম থাকে বলে এবং ভেরেণ্ডার শিকড় বেশ লম্বা থাকার দরুন জমি স্বল্প চাষেই চলে যায়।

বীজ বপন : উপরোক্ত উপায়ে তৈরি করা জমিতে সারি করে বীজ বপন করতে হয়। স্থানীয় জাতের জন্য সারি হতে সারির দূরত্ব ২-২.৫ ফু: অর্থাৎ ৭০-৮০ সে: মি: এবং উন্নত জাতের জন্য ১-২ ফু: অর্থাৎ ৩০-৪০ সে: মি: প্রতি সারিতে বীজ হতে বীজের দূরত্ব যথাক্রমে ৩০-৩৫ সে: মি: এবং ২৫-৩০ সে: মি:।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে বীজ বপন করতে হয়। জমিতে রস না থাকলে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে মাটি সিক্ত হওয়ার পর বীজ বপন করা ভালো। ভেরেণ্ডা বীজ ৭-৯ দিনে অঙ্কুরিত হয়। বপনের আগে বীজ দুই এক ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুরোদগম ভালো হয়। স্থানীয় জাতের জন্য প্রতি একরে ৮-৮½ সের অর্থাৎ প্রতি হেক্টরের জন্য ২০-২১ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। উন্নত জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ২৫-২৬ কেজি বীজ বপন করতে হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা : ভেরেণ্ডা শক্তিশালী গাছ Vigorus plant এবং সাধারণত কিনারা শস্য (border crop) হিসেবে জন্মানো হয় বলে তাতে আগাছার কোনো সমস্যা হয় না ; কীটপতঙ্গ ও রোগের আক্রমণ তেমন প্রকট না হলেও কোনো কোনো সময় ভেরেণ্ডার পাতা খাওয়া সেমিলুপারের (leaf eating semi looper) আক্রমণ খুব ক্ষতিজনক হতে পারে।[১০] এই পোকার প্রজাপতি গাছের পাতার নিচে ৫-৬টি করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বের হবার পর সেগুলি রাক্ষসের ন্যায় পাতা খেতে থাকে। তাতে ফসলের ভীষণ ক্ষতি হয়। লক্ষ্য রাখলে পাতার নিচে ডিম দেখা যায়, দেখা মাত্র ডিমগুলি আঙ্গুলের চাপে নষ্ট করে দেওয়া যায়। এই পোকার কীড়া পাখিরা খেতে পছন্দ করে, তবে কীড়া বড় না হলে পাখিদের নজরে পড়েনা বলে পাখির সাহায্যে এই পোকার আক্রমণ দমনে রাখা সহজ হয় না। লেড আরসেনাইট (lead arsenite) অথবা পেরিস গ্রিন (paris green) দিয়ে গাছে সিঞ্চন করলে পোকা দমন করা যায়, তবে তাহা ব্যয়সাপেক্ষ। সেজন্য মাঠে শস্যের কিছু দানা ছিটিয়ে দিলে পাখিরা সহজেই আসবে এবং পোকার ছোট কীড়া খেয়ে ফেলবে। এইভাবেই এই পোকার আক্রমণ মোকাবেলা করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : স্থানীয় জাতের বেলায় বীজ বপনের ২৮০-৩০০ দিন পর মাঘ-ফাল্গুন ফল পরিপক্ব হয় আর উন্নত জাতের বেলায় তা ১৮০-২০০ দিনে কার্তিক মাসের মধ্যে পরিপক্বতা লাভ করে। যেহেতু ফল বেশি পুষ্ট হলে ফেটে বীজ বের হয়ে মাটিতে পড়ে যায় সেহেতু ফল তত না পাকার আগেই গাছে হতে সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। ভেরেণ্ডা বীজের ফলন অন্যান্য তৈলশস্যের তুলনায় বেশ কম। প্রতি হেক্টরে ৬৫০-৭৫০ কেজি হতে পারে।

ব্যবহার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ভেরেণ্ডার তৈল ভোজ্য নয়। আগের দিনে এই তৈল দিয়ে গ্রাম-বাংলায় বাতি জ্বালানো হতো। অধুনা রেড়ীর তৈল বিভিন্ন শিল্পকার্যে এবং ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যে, উঁচুমানের সাবান তৈরিতে মিল-কারখানায় যন্ত্রপাতি তৈলাক্তকরণ ও সংরক্ষণে এবং কৃত্রিম চামড়া তৈরিতে ভেরেণ্ডার তৈল ব্যবহার করা হয়। নিম্নতাপে এই তৈল

তরল থাকে এবং উষ্ণ তাপে ইহার অবয়ব (viscosity) অপরিবর্তিত থাকে বলে তা উড়োজাহাজের ইঞ্জিনে বিশেষ পিচ্ছিল তৈল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১০] জোলাপ নেয়ার জন্য ভেরেণ্ডার তৈল ঔষধ হিসেবে রোগীকে খাওয়ানো হয়। ভেরেণ্ডার গাছ বড় আকৃতির বলে বীজ সংগ্রহের পর তা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া সারি দিয়ে লাগিয়ে বাড়ির বেড়া তৈরিতে তা ব্যবহৃত হতে পারে।

সূর্যমুখী (Sunflower)

সূর্যমুখী বিশ্বের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী তৈলশস্য। পৃথিবীর অনেক দেশেই ইহার চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ইদানিং ইহার কিছু কিছু চাষ হচ্ছে। অবশ্য কেবল মাত্র নোয়াখালী জেলাতেই এইরূপ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে বিশেষ করে আমন ধান কাটার পর পরই ইহার চাষ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। রাজশাহী জেলায় ইদানিং এইভাবে সূর্যমুখীর কিছু কিছু চাষ করা হচ্ছে।

খাদ্যমানের দিক হতে ইহার তৈল অনেক উন্নত। নানা রকম রান্নার কাজে এবং ডালডা তৈয়ার করতে সূর্যমুখীর তৈল ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে ভাজি রান্নায় এই তৈল বিশেষ উপযোগী। তাছাড়া চীনাবাদামের মতো সূর্যমুখীর বীজ ভেজেও খাওয়া যায়। ইহার বীজে শতকরা ৪০-৪৪ ভাগ তৈল রয়েছে। স্থানীয় ঘানিতে ভেঙ্গে শতকরা ২৫ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। কিন্তু এক্সপেলারে ভাঙ্গলে প্রায় ৪০ ভাগ তৈল পাওয়া যেতে পারে। তৈলের রং প্রায় সরিষার তৈলের মতো। ইহাতে ক্ষতিজনক ইরোসিক এসিড (Eurosic acid) নেই। বরং শরীরের উপকারী লিনোলিক (Lenolic acid) বেশি পরিমাণে আছে। সুতরাং ইহার তৈল সরিষার তৈলের চাইতে গুণগতভাবে অনেক ভালো। খরিপ ও রবি উভয় খন্দে অর্থাৎ বছরের যে কোনো সময়ে ইহার চাষ করা চলে। কাজেই দেশের তৈল ঘাটতি পূরণ করতে সূর্যমুখীর চাষ যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

মাটি ও জলবায়ু

সাধারণত দোঁয়াশ এবং বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে সূর্যমুখীর চাষ ভালো হয়ে থাকে। পানি জমে থাকে না এমন উঁচুজমি প্রয়োজন। শীত বা গ্রীষ্মে তাপের তারতম্যের জন্য সূর্যমুখী চাষের কোনো অসুবিধা হয় না। তাই এই ফসল সারা বৎসর চাষ করা যায়। কেবল অতি বৃষ্টির সময় বীজ বপন করতে একটু অসুবিধা হয়। তাছাড়া ক্ষেতে পানি জমে না থাকলে বৃষ্টির জন্য কোনো অসুবিধা হয় না। রবি মৌসুমে চাষ হয় বলে জমিতে পানি জমে থাকার সম্ভাবনা খুব কম।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়

সূর্যমুখী ডালপালাবিহীন নরম দণ্ডাকার কাণ্ডবিশিষ্ট বৃহদাকার এক প্রকার বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। Compositae পরিবারভুক্ত এই উদ্ভিদটির বৈজ্ঞানিক নাম Helianthus annus বৃহৎ পত্রযুক্ত গাছের আগায় অনেকগুলি ছোট ছোট ফুল মিলে থালার ন্যায় একটি সুদৃশ্য ফুলের সৃষ্টি করে। ইহাতে সময়ান্তরে মৌচাকের ন্যায় কুঠুরিযুক্ত স্থানে অনেক বীজ ধরে।

জাত

বারির (BARI) তৈলবীজ প্রকল্পে বহুদিন ধরে ইহার উপর গবেষণা চালানোর পর সম্প্রতি একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা কিছু দিন আগে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে। ইহা পোলান্ডের 'এলকোর্লাস্কি' নামক জাত হতে উদ্ভূত। এই জাতটি ১৯৭৫ সালে এই দেশে আনয়ন করা হয়। পরে অন্যান্য স্থানীয় জাতের সাথে প্রাকৃতিক শঙ্করায়ণের পর বাছাই করে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ইহার নাম দেওয়া হয়েছে ডি. এস-১ (কিরণী)। ইহা অন্যান্য জাতের চাইতে অপেক্ষাকৃত খাট। তাই ঝড়-বৃষ্টিতে সহজে হেলিয়া পড়েনা। সঠিকভাবে ইহার চাষ করে একর প্রতি ১৫–১৬ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ১৪০০–১৫০০ কেজি ফলন পাওয়া গিয়েছে।[৬]

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : জমি ৩–৪ বার চাষ ও বার দুয়েক মই দিয়ে নরম ঝুরঝুরে করে প্রস্তুত করতে হবে যাতে জমিতে বড় ঢেলা না থাকে। সূর্যমুখীর শিকড় বেশ লম্বা হয়ে মাটির নিচে যায় বলে জমি বেশ গভীরভাবে চাষ করতে হয়।

সার প্রয়োগ : সার ব্যবহার করলে সূর্যমুখীর ফলন অনেক বেশি পাওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা চালিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে কি কি সার কি পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নেতে ২০ নং সারণিতে সে সব সারের প্রয়োগ মাত্রা দেখানো হলো।[৫]

সারণি ২০ : সূর্যমুখীর চাষে সার ব্যবহারের পরিমাণ

সারের নাম	কেজি/ হেক্টর	কেজি একরে
ইউরিয়া	১৮০–২০০	৭০–৮০
টি এস পি	১৫০–২০০	৬০–৮০
এম পি	১২০–১৫০	৫০–৬০
জিপসাম	১২০–১৭০	৫০–৭০
জিংক সালফেট	৮–১০	৩–৪
বরিক এসিড	১০–১২	৪–৫
ম্যাগনেশিয়াম সালফেট*	৮০–১০০	৩০–৪০

উৎস : সূর্যমুখীর চাষ তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৪

* শুধুমাত্র রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও জয়পুরহাট, নওগাঁ ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের প্রয়োজন হয়।

ইউরিয়া সারের অর্ধেক এবং বাকি সব সার শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে দিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সমান দুভাগ করে প্রথম ভাগ চারা গজানোর ২০–২৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় ভাগ ৪০–৪৫ দিন বা ফুল ফোটার পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে

বীজ বপন : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সূর্যমুখী বছরের প্রায় সব সময় বপন করা যায়। তবে আমাদের দেশে প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় অর্থাৎ শ্রাবণ–ভাদ্র মাসে ইহার চাষ না করাই ভালো, কারণ তাতে ফলন ভালো পাওয়া যাবে না। সাধারণত রবি মৌসুমে কার্তিক মাসে বপন করলে ইহার ভালো ফলন পাওয়া যায়। জমিতে রস থাকলে আমন ধান কাটার পরেও ইহার চাষ করা যেতে পারে। খরিপ মৌসুমে বৈশাখ মাসে ইহার চাষ করা হয়।

বীজ সামঞ্জস্যত সারিতে বপন করা হয়। এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব হবে ৪৫–৫০ সেঃ মিঃ এবং প্রতি সারিতে বীজ বা চারাগাছের দূরত্ব হবে ২০–২২ সেঃ মিঃ। খাটো জাতের বেলায় সারিতে বপনের ব্যবধান ২০ সেঃ মিঃ হলেও চলে। বপনের জন্য হেক্টর প্রতি ৮–১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। এই বীজ অন্যান্য তৈলবীজের তুলনায় হাল্কা, সুতরাং আকারে বড় হলেও এক একরের জন্য ৫–৬ সের অর্থাৎ এক হেক্টরের জন্য ১২–১৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সূর্যমুখী বীজের অঙ্কুরোদ্গমক্ষমতা বেশি দিন টিকে থাকে না বলে বপনের আগে বীজ পরীক্ষা করে দেখা দরকার। অঙ্কুরোদ্গমক্ষমতা বেশি দিন বজায় রাখার জন্য ২/৩ মাস পর পর বীজ শুকিয়ে ইহার অভ্যন্তরীণ রসের পরিমাণ (Moisture content) কমিয়ে রাখা দরকার।

আগাছা দমন ও অন্যান্য পরিচর্যা : সূর্যমুখীর জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সেচ দেওয়ার পর জো আসার সাথে সাথে সারির মাঝের মাটি কোদাল দিয়ে ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে গাছের গোড়ায় শিকড়ে যেন আঘাত না লাগে। এই সময় গাছের গোড়ায় অল্প মাটি তুলে দিলে ভালো হয়।

খরিপ মৌসুমে সূর্যমুখীতে কোনো সেচের দরকার হয় না, কিন্তু রবি মৌসুমে প্রয়োজন অনুসারে ২ বার সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। শীতকালীন ফসলে সেচের পর ইউরিয়া সার গাছের সারির মাটিতে পার্শ্ব প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সূর্যমুখীতে রোগ এবং আক্রমণ খুব কম হয়। তবে কোনো কোনো সময় বিছা পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে। এই পোকা দ্বারা গাছ আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে পোকার শুককীটগুলি হাতে বেছে ফেলা ভালো। নতুবা কীটগুলি বড় হয়ে গেলে ঔষধ ছিটিয়ে তাহা দমন করা কঠিন হয়। এই পোকার আক্রমণে ডায়াজিনন ৫০ ই. সি. একর প্রতি ১২ আউন্স ৫০ গ্যালন পানিতে মিশিয়ে ছিটানো যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করতে হবে। গাছে বীজ পাকার সময় টিয়া পাখি বীজগুলি খেতে শুরু করে। খুব সকালে ও সন্ধ্যার পূর্বে টিয়া পাখির এই উপদ্রব বেশি দেখা যায়। ঠিক সময় পাহারা দিয়ে টিয়া পাখির হাত হতে ফসল রক্ষা করতে হয়।

ফসল কাটা, বীজ সংগ্রহ ও গুদামজাতকরণ : সূর্যমুখী কাটার সময় হলে গাছগুলির পাতা হলুদ রং ধারণ করে এবং বড় মাথাধারী গাছগুলি নুয়ে পড়ে। ইহা ছাড়া বীজগুলি কালো রং ধারণ করে এবং সেইগুলি পুষ্ট হয়। মৌসুম এবং জাত অনুসারে ফসল পাকতে প্রায় ৯০–১১০ দিন সময় লাগে। এই সময় গাছের আগা হতে মাথাগুলি কেটে নানা অর্থাৎ বীজ ছড়িয়ে নিয়ে সেইগুলি রোদে ভালো করে শুকিয়ে কেরাসিনের টিন, ড্রাম, বা মাটির মটকা ইত্যাদিতে গুদামজাত করতে হয়। অবশ্য মাঝে মাঝে আবার বীজগুলি রোদে শুকাতে হয়। ইহাতে বীজের অঙ্কুরোদ্গমক্ষমতা অনেক দিন পর্যন্ত বজায় থাকে।

ফলন : উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে একর প্রতি ১৫–১৬ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ১৫০০–১৬০০ কেজি বীজ উৎপন্ন হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র), জয়দেবপুর, গাজীপুর : সরিষা ফসলের চাষ, ১৯৯৪।

২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র), জয়দেবপুর, গাজীপুর : তিল ফসলের চাষ, ১৯৯৪।

৩. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র), জয়দেবপুর, গাজীপুর : তিসি, গর্জনতিল ও কুসুম ফুল ফসলের চাষ, ১৯৯৫।

৪. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র), জয়দেবপুর, গাজীপুর : চীনাবাদাম ফসলের চাষ, ১৯৯৫।

৫. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র), জয়দেবপুর, গাজীপুর : সয়াবীন ফসলের চাষ, ১৯৯৫।

৬. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র), জয়দেবপুর, গাজীপুর : সূর্যমুখীর চাষ, ১৯৯৬।

৭. মিয়া, ক ও আলম শঃ তেলবীজ হিসাবে সূর্যমুখী। কৃষিকথা, অগ্রহায়ণ, ১৩৯০। কৃষিতথ্য কেন্দ্র। খামারবাড়ি, শেরে–বাংলা নগর, ঢাকা।

৮. মোহাম্মদ, আঃ সয়াবীন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। ১নং এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা।

৯. রমিজউদ্দীন, আঃ তিসির চাষ। কৃষিকথা, ভাদ্র, ১৩৮৪। কৃষিতথ্য কেন্দ্র, খামারবাড়ি, শেরে–বাংলা নগর, ঢাকা।

১০. Aiyar, A. K. Y. N : Filed Crops of India, 1947. Bangalore. Printed by the Suptd at the Govt. Press. pp. 147-215.

১১. Ibid, pp. 689-91.

১২. Ibid, pp. 920-22.

১৩. B. B. S : The Yearbook of statistics, 1995.

১৪. Hill, A. F. Economic Botany 1979. Tata Mcgraw-Hill Publication Co. Ltd. New Delhi. pp. 178-79.

১৫. Martin, J. H. and Leonard, W. H. : Principles of Field of Crop Production, 1967. The Macmillan Co. Ltd. N. Y. p. 643.

১৬. Nafziger, E. D. : Soybeans in Bangladesh. ADAB NEWS, 1978. Vol. V No. 10.

১৭. Seed Certification Agency, Gazipur : Approved Crop varities 1995.

পঞ্চম অধ্যায়
সবজি জাতীয় শস্য
VEGETABLES

যে সমস্ত শস্যের ফল, মূল, কাণ্ড ও পাতা সাধারণত রান্না করে তরকারি বা শাক হিসেবে অথবা কাঁচা অবস্থায় সালাদ হিসেবে খাওয়া হয় সেগুলিকে সবজি বলে। সবজি মানুষের খাদ্য তালিকায় একটি অপরিহার্য খাদ্যবস্তু। ইহাতে শর্করা ও আমিষ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার খনিজ (ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ প্রভৃতি) ও ভিটামিন (এ, বি, সি) থাকে। নিয়মিত সবজি ভক্ষণ করলে পেটের কোনো গোলমাল থাকে না অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হয়।

বাংলাদেশে প্রধানত দুই প্রকার সবজি দেখা যায় —১. দেশী এবং ২. বিদেশী বা বিলাতি সবজি। দেশী সবজিগুলি Cucurbitaceae, Cruciferae, Leguminosae, Malvaceae প্রভৃতি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখযোগ্য দেশী সবজিগুলি হচ্ছে লাউ, কুমড়া, করল্লা, উচ্ছে, শশা, ঝিংগা, চিচিঙ্গা, মূলা, ডাটা, সীম, বেগুন, ঢেড়শ, পুঁই পালং ইত্যাদি। গোল আলু প্রকৃতিগতভাবে সবজি না হলেও বাংলাদেশে ইহা শুধু সবজি হিসেবেই পরিগণিত নয়, এবং দেশের সর্বপ্রধান সবজি। মিষ্টি আলুও এক ধরনের সবজি। বিলাতি সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, ওলকপি, শালগম, গাজর, সুগারবীট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অধিকাংশ Cruciferae পরিবারের অন্তর্গত।

গোল আলু ও মিষ্টি আলু ব্যতিরেকে দেশী সবজিগুলি প্রধানত খরিপ মৌসুমে এবং বিলাতি সবজিগুলি রবি মৌসুমে জন্মে। তবে বাঁধাকপি ও টমেটো খরিপ খন্দেও কিছু কিছু জন্মানো যায়। উল্লেখ্য যে দেশী সবজির চাইতে বিলাতি সবজি চাষে তুলনামূলকভাবে অধিক পরিশ্রম ও খরচ করতে হয়। নীতিগত কারণে সবজির মধ্যে শুধু গোল আলু ও মিষ্টি আলু চাষের কথাই এই পুস্তকে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

গোল আলু

সারা পৃথিবীতে উৎপাদিত আলুর $\frac{৩}{৪}$ অংশেরও অধিক জন্মিতে দেখা যায় শীতপ্রধান দেশে। এইসব দেশে প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে গমের পরেই হচ্ছে আলুর স্থান। ইউরোপ, আমেরিকার বহুদেশে রুটির পরিবর্তে কিংবা রুটির পরিপূরক হিসেবে আলু ভক্ষিত হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলু ভক্ষণকারী দেশ হচ্ছে পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, পেরু, চিলি, ইকুয়েডর, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যে, আয়ারল্যান্ড, ক্যানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া ও মেক্সিকো।

বাংলাদেশে গোল আলু একটি সুপরিচিত ফসল, তবে একটি প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে নয়, দেশের সর্বপ্রধান সবজি ফসল হিসেবে। শীতকালীন অন্যান্য সবজির গড়-পড়তা বাৎসরিক উৎপাদন ৫ লক্ষ টনের মতো, আর গোল আলুর গড়-পড়তা উৎপাদন ৮ লক্ষ টনের বেশি। অন্যদিকে গ্রীষ্মকালীন সবজির বাৎসরিক মোট উৎপাদন ২½ লক্ষ টনের মতো। অর্থাৎ আলুর উৎপাদন অন্যান্য শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজিগুলির মোট উৎপাদন অপেক্ষাও বেশি। গোল আলুর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সবজি হিসেবে সারা বৎসরই পাওয়া যায়। অবশ্য হিমাগারের (Cold storage) কল্যাণেই ইহা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে গোল আলুর চাষ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও তা আশানুরূপ নয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে মাত্র ৭৪০০০ একর অর্থাৎ ২৯৯৪৭ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছিল। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫০,০০০ একরে অর্থাৎ ৬০৭০৩ হেক্টরে উন্নীত হয় আর উৎপাদিত হয় ৪,৮৬,০০০ টন আলু। উৎপাদন ১৯৭৩-৭৪ সালে এসে দাঁড়ায় ৭,১৯,০০০ টনে। ১৯৭৭-৭৮ সালে ২,২২,০০০ একর অর্থাৎ ৮৯৮৭৯ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয় আর উৎপাদিত হয় ৮,৪৯,০০০ টন আলু। এলাকা ও ১৯৯৩-৯৪ সালে এসে দাঁড়ায় ১,৩২,৬০০ হেক্টরে এবং ১৪৩৮০০০ মে. টন।[১৩]

গোল আলুর এলাকা বলতে আগের দিনে রংপুর জেলাকেই বুঝাত। আজকাল সেই কথা আর ঠিক নয়। বর্তমানে দেশে সব চাইতে বেশি আলু উৎপন্ন হয় ঢাকা [illegible] আশ্চর্যের বিষয় এই যে একমাত্র ঢাকা জেলাতেই [illegible] বেশি আলু উৎপাদিত হয়। বগুড়া, দিনাজপুর, কুমিল্লা, [illegible] উৎপন্ন হয়। ফলনের দিক হতে অগ্রবর্তী জেলাগুলি [illegible] নোয়াখালী, ফরিদপুর, খুলনা ও কুমিল্লা।[১]

সারণি ২২ : বাংলাদেশে জেলাভিত্তিক [illegible] আলুর জমির [illegible]

জেলা	আবাদি জমির পরিমাণ (হেক্টরে)	উৎপাদনের পরিমাণ [illegible]
	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (মে. টন)
ঢাকা	১২০০	১৪৪০০
নারায়ণগঞ্জ	২৫০০	৩০০০০
নরসিংদি	১৮০০	২১৬০০
গাজীপুর	৫০০	৬০০০
মানিকগঞ্জ	২৫০০	৩০০০০
মুন্সীগঞ্জ	২৫০০	৩০০০০০
টাঙ্গাইল	৪০০০	৪৮০০০
ময়মনসিংহ	৩৫০০	৪১০০০
জামালপুর	৩০০০	৩৬০০০

শেরপুর	১২০০	১৪৪০০
নেত্রকোণা	১৭০০	২০৪০০
কিশোরগঞ্জ	৩০০০	৩৬০০০
কুমিল্লা	১৫০০০	১৮০০০০
বি, বাড়িয়া	২৫০০	৩০০০০
চাঁদপুর	৬০০০	৭২০০০
সিলেট	১৫০০	১৮০০০
মৌ:বাজার	২৫০০	৩০০০০
হবিগঞ্জ	২৪০০	২৮৮০০
সুনামগঞ্জ	২০০০	২৪০০০
চট্টগ্রাম	২৪০০	২৮৮০০
কক্সবাজার	৬০০	৭২০০
নোয়াখালী	৫০০	৬০০০
ফেনী	৫০০	৬০০০
লক্ষ্মীপুর	৪০০	৪৮০০
রাঙ্গামাটি	২০০	২৪০০
খাগড়াছড়ি	২০০	২৪০০
বান্দরবান	৫০০	৬০০০
বরিশাল	৪০০	৪৮০০
পিরোজপুর	৫০০	৬০০০
ঝালকাঠি	১৫০	১৮০০
ভোলা	৫০০	৬০০০
পটুয়াখালী	১০০	১২০০
বরগুনা	২০০	২৪০০
রাজবাড়ি	২০০	২৪০০
ফরিদপুর	৩০০	৩৬০০
গোপালগঞ্জ	১০০	১২০০
শরিয়তপুর	২০০	২৪০০
মাদারীপুর	৩০০	৩৬০০
রাজশাহী	১২০০০	১৪৪০০০

নওগাঁ	৭০০০	৮৪০০০
নাটোর	১৫০০	১৮০০০
চা. নবাবগঞ্জ	১৫০০	১৮০০০
বগুড়া	১২১৫০	১৪৫৮০০
জয়পুরহাট	৯০০০	১০৮০০০
পাবনা	২২০০	২৬৪০০
সিরাজগঞ্জ	৩৫০০	৪২০০০
যশোর	৪০০০	৪৮০০০
নড়াইল	১০০	১২০০
ঝিনাইদহ	১৩০০	১৫৬০০
কুষ্টিয়া	১৫০০	১৮০০০
মেহেরপুর	১৩০০	১৫৬০০
চুয়াডাঙ্গা	৯০০	১০৮০০
খুলনা	৫০০	৬০০০
সাতক্ষীরা	৩০০০	৩৬০০০
বাগেরহাট	৪০০	৪৮০০
রংপুর	১৫০০০	১৮০০০০
গাইবান্ধা	৩৫০০	৪২০০০
কুড়িগ্রাম	২০০০	২৪০০০
লালমনিরহাট	২০০০	২৪০০০
নীলফামারী	৭০০০	৮৪০০০
দিনাজপুর	১১০০০	১৩২০০০
পঞ্চগড়	২৫০০	৩০০০০
ঠাকুরগাঁও	৫০০০	৬০০০০

উৎস : খাদ্যশস্য উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ১৯৯৫–৯৬

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

অনেকের মতে গোল আলুর আদিনিবাস দক্ষিণ আমেরিকা তথা পেরু অথবা বলিভিয়া দেশে।[২,৬] আজও সে দেশে দুটিতে দুই চাবিটি বন্য আলুর জাত দেখা যায়। আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেনীয় আবিষ্কারকদের দ্বারা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে আলু ইউরোপ মহাদেশে নীত হয়, আর ইংল্যান্ড হতে যুক্তরাষ্ট্রে আলু পৌঁছে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। পাক–ভারত–বাংলা উপমহাদেশে পর্তুগিজদের দ্বারা আলুর প্রবর্তন হয়। বর্তমান বিশ্বে

গোল আলু উৎপাদনের দিক হতে সোভিয়েট রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালি, গ্রেট ব্রিটেন, রুমানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত প্রসিদ্ধ।[১]

মাটি

দোয়াশ ও বেলে-দোয়াশ মাটি আলুর জন্য সব চাইতে উপযোগী। এটেল-দোয়াশ মাটিতেও আলুর চাষ করা যায়, তবে এই রকম মাটিতে আলু খুব একটা ভালো হয় না। আলুর মাটি জৈবপদার্থযুক্ত, গভীর ও কিছুটা অম্লাত্মক হওয়া চাই। PH ৫.৫-৬.০-এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা হলে আলুর ক্ষতিকর একটি রোগ স্কেবিস' (Scabies) হতে পারে না।

জলবায়ু

আলু নিতান্তই শীতপ্রধান অঞ্চলের ফসল। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও আলু ভালো জন্মে। তবে নব-নিরক্ষীয় অঞ্চলের শীতকালীন মৌসুমে যেমন আমাদের দেশে আলুর চাষ করা চলে। ১৬-২১° সে. তাপমাত্রা আলুর জন্য আদর্শস্থানীয়, তবে গাছ বৃদ্ধির প্রথম দিকে অধিক তাপ ও শেষ দিকে অর্থাৎ কন্দ (Tuber) ধরাকালীন সময়ে কম তাপ থাকা বাঞ্ছনীয়। অল্প পরিমাণ বরফ পড়াও আলু সহ্য করতে পারে, তবে অধিক শৈত্যে (-২° হতে ৩° সে.) কন্দের বৃদ্ধি স্থগিত ও কোষের গঠন নষ্ট হয়ে যায়।[৯]

মৌসুমে মাঝারি বৃষ্টিপাত -৩০ ই: অর্থাৎ ৭৬২ মি: মি: আলুর জন্য উপযোগী। অধিক বৃষ্টিপাতে আলু মোটেই ভালো হয় না ; গাছের বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যায়, রোগ, ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ সহজতর হয়। তবে পার্বত্য এলাকায় (১৮৬০-২১৭০ মিটার) অধিক বৃষ্টিপাত হলেও পানি দ্রুত সরে যায় ও ঠাণ্ডা পরিবেশ বিরাজমান থাকে বলে সেরূপ পরিবেশে আলুর চাষ করা যায়। তাই পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় এইরূপ পরিবেশে গ্রীষ্মকালে আলু জন্মান যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

গোল আলু Solanceae পরিবারভুক্ত একবর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Solanum tuberosum L.। গাছের সরু নরম লতানো কাণ্ড ১½ ফুট হতে ৬½ফুট অর্থাৎ ০.৪৭ মি.-২.০ মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। পত্রসমূহ যৌগিক এবং একান্তভাবে কাণ্ডের সঙ্গে সাজানো থাকে। গাছে কখনো কখনো ফুল ও ফল ধরে (চিত্র নং ৫.১) : ফল বেরীজাতীয় গোলাকার। ফলে দুটি প্রকোষ্ঠ থাকে এবং প্রতি প্রকোষ্ঠে সবুজ রংয়ের ডিম্বাকৃতি এবং হৃতপিণ্ডকৃতির বীজ জন্মে। এই বীজ দ্বারা আলুর চাষ হয় না, তবে নতুন জাত সৃষ্টির কাজে এই বীজ প্রজননবীদদের কাজে লাগে। আলু গাছের ভূনিম্নস্থ পর্বসন্ধি হতে যে সরু স্টোলন (stolon) বা শাখা বের হয় তার অগ্রভাগ স্ফীত হয়েই আলুর সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে দেশী ও বিদেশী এই দুই রকম জাতের আলুর চাষ হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে, যেমন— রংপুর ও বগুড়ায় লালপাথরী, লালশীল, শীলবিলাতী, হাগড়াই প্রভৃতি আলুর চাষ করা হয়। এই সমস্ত আলুগুলিকেই দেশী জাতের আলু নামে অভিহিত করা হয়। এইগুলি আগাম জাতের আলু। উৎপাদন হার ভালো না হলেও খেতে সুস্বাদু বাজারে বেশি দামে বিক্রি হয়। তাই চাষীদের কাছে এই জাতগুলি আজও সমাদৃত।

চিত্র : ৫.১ গোল আলু গাছ

এদেশে বিদেশী আলু বলতে প্রধানত হল্যান্ডের আলুকেই বুঝায়. গত এক দশকে সে দেশ হতে বহু উচ্চফলনশীল আলুর জাত আমদানি করে বাংলাদেশের পরিবেশে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে দেখা হয়েছে সেসব পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে আজ পর্যন্ত ১৫টি জাত দেশের বিভিন্ন জেলায় চাষ করার জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সেই জাতগুলি হলো— হিরা, মেরিন, ওরিগো, আইলসা, পেট্রোনিস, মোল্টা, ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, মনডিয়েল, কুফরী সিন্দুরী. বারী আলু-১১, বারী আলু-১৩, বারী আলু -১৪ এবং বারী আলু- ১৫।[২২]

প্রতিবেশী রাজ্য ভারত হতেও কয়েকটি উন্নত জাতের আলু আমদানি করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে কুফরী, চন্দ্রমুখী, কুফরী সিন্দুরী উল্লেখযোগ্য।

আলুর জাতের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাদের ফলন ক্ষমতা কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না অর্থাৎ কোনো একটি জাত যত উচ্চফলনশীলই হউক না কেন তা কয়েক বৎসরের মধ্যে অধঃপতিত (degeneration) হয়ে যায় যেমন— বিনজে, ডিজিয়ারী যে যে জাতগুলি কয়েক বৎসর আগে উচ্চফলনশীল ছিল সেগুলি এখন এমন অধঃপতিত হয়ে গিয়েছে যে সেগুলিকে

অনুমোদিত জাতের তালিকা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে। নতুন নতুন আলুর জাত উদ্ভাবন ও সর্বোপরি আলুচাষের উন্নতিকল্পে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে একটি আলু গবেষণা কেন্দ্র (Potato Research Centre) জয়দেবপুরে স্থাপন করা হয়েছে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

জমি প্রস্তুতি : আশ্বিন মাস হতে আলুর জমি প্রস্তুতের কাজে হাত দিতে হয়। জমির প্রকৃতিভেদে ৫/৬টি চাষ ও বার কয়েক মই দিয়ে ভালোভাবে পাইট করে চাষ করতে হয়। আলুর জমি গভীরভাবে চাষ করা উচিত। সুখের বিষয় কোনো কোনো অঞ্চলে যেমন, ঢাকার মুন্সীগঞ্জ ও কুমিল্লার সদর মহুকুমার চাষীগণ কোদাল ও লাঙ্গলের সাহায্যেই জমি গভীরভাবে চাষ করেন। জমি শুধু গভীরভাবে চাষ করলেই হয় না, মাটি যাতে মোলায়েম ও ঝুরঝুরা করে প্রস্তুত করা হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। ঢেলাযুক্ত ও আঁটসাট জমিতে আলু বৃদ্ধি পেতে পারে না।

সার প্রয়োগ : উচ্চ ফলনশীল তথা আধুনিক জাতের গোল আলু চাষে যথেষ্ট পরিমাণ সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। মাটির উর্বরা শক্তি ও ইপ্সিত ফলন মাত্রার উপর নির্ভর করে সার প্রয়োগের পরিমাণ ভিন্নতর হয়।

নিম্নের–২৩ নং সারণিতে তা দেখানো হলো।

সারণি ২৩ : গোল আলুর চাষে সারের প্রয়োগ মাত্রা (কেজি/হেক্টর)ফলন মাত্রা (প্রতি হেক্টরে)

সারের নাম	উচ্চ (৩০–৩৫ টন) জমির উর্বরা শক্তি			মধ্যম (২০–২১ টন) জমির উর্বরা শক্তি			নিম্ন (১০–১৯ টন) জমির উর্বরা শক্তি		
	কম	মধ্যম	বেশি	কম	মধ্যম	বেশি	কম	মধ্যম	বেশি
ইউরিয়া	৩৩৩	২৬৬	২২২	২৬৬	২২২	১৭৮	২২২	১৭৮	১৩৩
টিএসপি	১৩০	১১০	৯০	১১০	৯০	৬৫	৯০	৬৫	৪৫
এম পি	২৫০	২০০	১৬৭	২০০	১৬৭	১৩৩	১৬৭	১৩৩	১০০
জিপসাম	১১০	৫৫	—	১১০	—	—	—	—	—
জিঙ্ক সালফেট	২২	১১	—	২২	—	—	—	—	—

উৎস : আলু গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫

কম থেকে মধ্যম উর্বরাশক্তি বিশিষ্ট মাটিতে বীজ উৎপাদনের জন্য হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ২৪০ কেজি, টি এস পি ১৮৫ কেজি, এম পি ২৭৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। মাটি বেশি উর্বর হলে উল্লিখিত ইউরিয়া সার ১৫ শতাংশ কম ব্যবহার করতে হবে, অন্যান্য সারের বেলায় কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। মাটিতে বোরণের অভাব হলে হেক্টর প্রতি ১০–১৫ কেজি বরিক এসিড অথবা সোডিয়াম মেটা–বোরেট ব্যবহার করতে হবে।

[illegible] টি এস পি, এম পি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং [illegible] প্রয়োগ করে ৫ সেঃ মিঃ মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া [illegible] দিন পর সারির পাশের মাটিতে দিয়ে ভালোভাবে [illegible] হয়। [illegible] রসে থাকতে হবে।

বীজ বপন: [illegible] আলুর টিউবার (tuber) অর্থাৎ কন্দ ব্যবহার করা হয়। [illegible] অঙ্কুরিত বীজ ব্যবহার করা হয়। বীজ প্রত্যায়িত হলে বপনের [illegible] অবস্থা লওয়ার প্রয়োজন হয় না। অন্যথায় বীজ শোধন করে লওয়া [illegible] শোধনের জন্য 'মারকিউরিক ক্লোরাইড' (mercuric chloride), [illegible] Formaldehyde), অথবা 'ইয়েলো অক্সাইড অব মার্কারি' (yellow oxide [illegible]) ব্যবহার করা যায়।

[illegible] মাঝামাঝি হতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি পর্যন্ত আলু লাগানো যেতে পারে। তবে [illegible] করতে হলে ভাদ্র মাসের শেষে বীজ বপন করতে হবে। আলু বীজ সারিতে [illegible] করতে হয়। এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব ৬০ সেঃ মিঃ রাখতে হবে, এবং সারিতে এক বীজ হতে অন্য বীজের দূরত্ব হবে ২৩–৩৮ সেঃ মিঃ। বীজ আস্ত বপন করাই ভালো, তবে আকারে বেশি বড় হলে কেটে দুইভাগ করে লাগান যায়। যে বীজের ব্যাস ২ হতে ৩ সেঃ মিঃ সেই বীজই বপনের জন্য উত্তম এবং সেইগুলি বপন করার সময় কাটার প্রয়োজন হয় না। আর যে বীজের ব্যাস ৩ সেঃ মিঃ হতে বড় সেগুলি কেটে লাগান যেতে পারে। কেটে বপন করলে বীজের পরিমাণ কম লাগে অর্থাৎ আস্ত বীজ ব্যবহার করলে যদি এক হেক্টরে ১৫০০ কেজি লাগে সেক্ষেত্রে কর্তিত বীজ ব্যবহার করলে ইহার অর্ধেক অর্থাৎ ৭৫০ কেজি বীজ লাগবে। তবে কাটা বীজ ব্যবহার করতে গেলে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেমন–১. বীজ কাটার সময় ধারালো ছুরির দ্বারা লম্বালম্বি কাটিতে হবে, ৩. বীজের কাটা দিকটায় পরিষ্কার ঠাণ্ডা ছাই লাগিয়ে দিতে হবে। এই সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করলে বীজ পচে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা কম থাকবে। কাটা বীজ আলুকে 'কিউরিং' (curing) করে নিলেও উপকার পাওয়া যায়। কিউরিংয়ের জন্য কর্তিত বীজ আলুকে ৬০°–৭০° ফাঃ অর্থাৎ ১৬°–২১° সেঃ তাপমাত্রা ও ৮৫–৯০% আর্দ্রতায় সপ্তাহ খানেক রাখলে বীজের কর্তিত তলে একটি আত্মরক্ষাকারী স্তর সৃষ্টি হয় যা বীজের মধ্যে রোগজীবাণুর প্রবেশ অনেকাংশে রোধ করতে পারে। তবে এইভাবে 'কিউরিং' করা সাধারণ চাষীদের পক্ষে সম্ভব না হলেও বীজ আলুকে পাতলা স্তরে মেঝেতে ছড়িয়ে ভিজা চট দ্বারা কয়েকদিন ঢেকে রাখলে সুফল পাওয়া যাবে।

সারিতে দুই পদ্ধতিতে বীজ বপন করা যায়। প্রথম পদ্ধতিতে প্রতি সারি বরাবর ৫–৭ সেঃ মিঃ মাটি সরিয়ে নিয়ে নালা প্রস্তুত করা হয়, তৎপর সেই নালাতে নির্দিষ্ট দূরত্বে বীজ বপন করে মাটি দ্বারা বীজ ঢেকে দেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সারির মাটি না খুঁড়ে অর্থাৎ নালা না করে সারির দাগ বরাবর বীজ নির্দিষ্ট ব্যবধানে বপন করার পর দুই সারির মধ্যবর্তী জায়গা হতে মাটি টেনে উঁচু করে বীজ ঢেকে দেওয়া হয়। শেষোক্ত পদ্ধতিটিই বিজ্ঞানসম্মত, কেননা ইহাতে জমির রস অধিক দিন বজায় থাকে আর সারির মাটি আলগা থাকে বলে আলুর কন্দ বৃদ্ধিতে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না; অপর দিকে প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে নালার মাটি চাপ খাওয়া থাকে বলে স্কন্দের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে কন্দ অর্থাৎ আলুর আকার ছোট থেকে যায়।

বপনের জন্য প্রতি হেক্টরে সাধারণত ১৫০০–২০০০ কেজি বীজ লাগে। তবে বীজ আকারে বড় হলে কিছু বেশি এবং ছোট হলে কিছু কম লাগে।

গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া : জমিতে আলুর গাছ যখন ৫–৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ১২–১৫ সে: মি: বড় হয় তখন দুই সারির মাঝখানের মাটি হাল্কাভাবে কুপিয়ে নরম ঝুরঝুরা করে নিতে হয়। বলা অনাবশ্যক এই সময় জমির আগাছা নিধনের কাজও হয়ে যায়। তৎপর নরম ঝুরঝুরা মাটি কোদালি দ্বারা টেনে সারিতে গাছের দুই দিকে দেওয়া হয়। ইহার তিন সপ্তাহ পর গাছের গোড়ায় আবার মাটি দিতে হয়। গাছের বৃদ্ধি বেশি হলে আর একবার অর্থাৎ তৃতীয় বারের মতো মাটি দেওয়া হয়। গাছের গোড়ায় এইভাবে মাটি দিলে গাছের স্টোলনগুলি টিউবার অর্থাৎ আলুতে পরিণত হবার সুযোগ পায়। আর মাটি ঠিকমতো দেওয়া না হলে বর্ধিষ্ণু আলু মাটির বাইরে এসে সবুজ রং ধারণ করে। এই রকম আলু খাবার অনপোযোগী এবং কখনো কখনো তা বিষাক্তও হতে পারে।

সেচ প্রয়োগ : এদেশে অনেক চাষীই বিশেষ করে যারা দেশী আলুর চাষ করেন তারা আলুর জমিতে সেচের পানি ব্যবহার করতে চান না। কিন্তু অধিক ফলনশীল আলুর জাতে অধিক সার ব্যবহার করলে আলুর জমিতে পরিমাণমতো পানি ব্যবহার করা আবশ্যক। আলুর জমিতে সেচ দেওয়া বেশ সুবিধাজনক। সারিতে গাছের গোড়ায় মাটি উঁচু করে দেওয়ার ফলে যে জুলি বা নালার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে দিলেই সারা ক্ষেত পানিতে সিক্ত হয়ে যায়। আলুর জমি সব সময় রসযুক্ত থাকবে সেই বিবেচনায় আলু ক্ষেতে নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। মাটির প্রকার ভেদের উপর নির্ভর করে ২/৩ বার সেচ দিলেই চলবে। অধিক সেচে কোনো লাভ নেই, তাতে বরং উপকারের চাইতে অপকারই হবে। —এই অবস্থায় গাছে ছোট ছোট নিম্নমানের আলু ধরবে। আবার অনিয়মিত পানি ব্যবহার করলে গুটিযুক্ত (knobby) ও ফাঁপা ধরনের (hollow heart) আলু জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকে। আলু উঠানোর দুই সপ্তাহ পূর্ব হতে সেচ বন্ধ করে দিতে হবে। ইহাতে আলুর পূর্ণতা প্রাপ্তি হবে।

রোগবালাই ও কীটপতঙ্গ দমন : এদেশে আলুর প্রধান ও মারাত্মক শত্রু 'আলুর নাবী ধসা রোগ' (Late blight of potato)। এই রোগ এত ভয়াবহ যে তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলে ফলন একেবারে হয় না বললেই চলে। আলু উৎপাদনকারী পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই রোগ কোনো কোনো বৎসর ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে আয়ারল্যান্ডে এই মড়ক মারাত্মকভাবে দেখা দেওয়ায় সেই বৎসর আলুর ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়, ফলে সেইবার আয়ারল্যান্ডে চরম দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়।

রোগাক্রান্ত বীজ ব্যবহারের ফলে এই রোগ দেখা দেয়। এক আক্রান্ত ক্ষেত হতে অন্য সুস্থ ক্ষেতে রোগ সহজেই ছড়ায়ে পড়ে। আক্রমণের প্রারম্ভে পাতার প্রান্তে ও ডগায় কালো অথবা বাদামি রংয়ের পচা বড় বড় দাগ দেখা দেয়। এক পাতা হতে অন্য পাতায় রোগ দ্রুত ছড়ায়ে পড়ে এবং অনুকূল পরিবেশে অর্থাৎ মেঘলা ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় সমগ্র ক্ষেতে অল্প সময়ের মধ্যে রোগ বিস্তার লাভ করে। পাতা ও ডাটা পচে সম্পূর্ণ গাছ দুই চারদিনের মধ্যেই মারা যায়, অবশেষে ইহা মাটির নিচে আলুকে আক্রমণ করে তা পচিয়ে ফেলে।

এই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে নীরোগ বীজ ব্যবহার করতে হবে, রোগ প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে ও পর্যায়ক্রমে জমিতে আলুর চাষ করতে হবে। ইহা ছাড়া বাড়ন্ত গাছে ১৫ দিন অন্তর অন্তর 'কপার অক্সিক্লোরাইড' (copper oxychloride) অথবা 'পেরেনক্স' (parenox) নামক ঔষধ হেক্টরে প্রতি ১.৩ কেজি ৪৫৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩–৪ বার প্রয়োগ করলে গাছে এই রোগ দেখা দিবে না। এই ঔষধ দুইটির কোনোটিও পাওয়া না গেলে 'বোর্দো মিক্‌চার' (bardeaux mixture) উক্ত নিয়মে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

'আলুর পাতার দাগ রোগ' (early blight of potato) আলু ফসলে কখনো কখনো দেখা যায়, তবে প্রথমোক্ত রোগটির মতো ইহা তত মারাত্মক নয়। সাধারণত দুর্বল গাছে এই রোগের আক্রমণ হয়। মাটি অতিরিক্ত ভিজা থাকলেও এই রোগ দেখা দেয়। আক্রান্ত গাছের পাতার স্থানে ছোট গাঢ় হলুদ রংয়ের দাগ পড়ে, ক্রমে ক্রমে এই দাগ বড় হতে থাকে এবং আক্রান্ত পাতা ঝরে যায়। আলুর নাবী ধসা রোগ প্রতিকারের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে এই রোগটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। আলুর গাছগুলি যাতে দুর্বল না হয়ে সবল হয় এবং জমিতে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব না থাকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা ভালো।

কয়েক রকম ছত্রাকের আক্রমণে আলুতে 'কিউজেরিয়াম রোগ' (fusarium tuber rots) দেখা দেয়। এদেশে প্রায়শই এই রোগ দেখা যায়। ইহার আক্রমণে আলুতে পচন দেখা দেয়। আলু উঠাবার সময় যাতে কোনো রকম আঘাতে তাহা থেতলিয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাটা আলু বপন করবার আগে তা শোধন করে নিলে এই রোগের হাত হতে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশে আলু রোগের চেয়ে পোকার আক্রমণে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের মধ্যে আলু ভক্ষণকারী পিপড়া, কাটুই পোকা ও জাবপোকার নাম করা যেতে পারে।

বাদামি বা কিছুটা লাল রংয়ের এই পিপড়া আলু ক্ষেতের মাটিতেই দলবদ্ধভাবে বাস করে। গাছের গোড়ায় যখন আলু ধরতে শুরু করে তখন হতেই পিপড়াগুলি কচি আলু ছিদ্র করে খেতে শুরু করে। আলুগুলি ছিদ্র করে এমন ঝাঝরা করে দেয় যে তা আর বৃদ্ধি পায় না এবং সেগুলি খাওয়ারও উপযুক্ত থাকে না। সেচের বা বৃষ্টির পানির সংস্পর্শে আসলে সেগুলি মাটির নিচেই পচে যায়। প্রতিকারের জন্য 'ডাইএলড্রিন–৫০ ই. সি' (Dieldrin 50 E.C) ২৮০ গ্রা: হিসাবে প্রতি হেক্টরে ছিটায়ে দিলে এই পিপড়ার আক্রমণ দমন করা যেতে পারে। ইহা না পাওয়া গেলে বাইড্রিন (Bidrin) অথবা 'ডাইমেক্রন–১০০' (Dimecron-100) ১২ ১৫০ গ্রাম: পরিমাণ ৪৫৫ লিটার পানিতে প্রতি হেক্টরের জন্য ছিটায়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

এক প্রকার মথের শুককীট যা কাটুই পোকা নামে পরিচিত তা গাছের কাণ্ড ও পাতা খেয়ে ফেলে, আবার কখনো কখনো আলুর কন্দও খেয়ে ফেলে। পোকাগুলি দিনের বেলায় মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রিবেলা বের হয়ে গাছের গোড়া কেটে দেয়। প্রতিকারের জন্য গাছের গোড়ার মাটি নেড়ে-চেরে পোকা বের করে মারা যায়, ক্ষেতে বিষটোপ দিয়ে

পোকা নিধন করা যায়, ক্ষেতে পানি সেচের সময় প্রতি ১০–১২ পাইন্ট কেরোসিন মিশিয়ে পোকা মারা যায়। এছাড়া জমিতে আলু বীজ বপন করার ১৫ দিন আগে প্রতি হেক্টরের জন্য ৪.৫ কেজি ক্লোরডেন–৭৫ ইসি (chlorden-75. EC) অথবা 'হেপ্টাক্লোর–৪০' (heptachlor-40 W.P) ক্ষেতে ছিটায়ে দিলে কাটুই পোকা দমন করা যায়।

আলু উত্তোলন : যখন দেখা যায় আলুগাছগুলি হলুদ হয়ে মরে যাচ্ছে তখনই বুঝতে হবে আলু তোলার উপযুক্ত সময় হয়েছে ক্ষেতে বীজ লাগাবার ৩–৪ মাসের মধ্যেই এই সময় হয়।

এদেশে আলুর সারিতে লাঙ্গল চালায়ে অথবা কোদালের সাহায্যে আলু তোলা হয়। এই প্রকারে বিশেষ করে কোদালের সাহায্যে তোলার সময় অসাবধান হলে বেশ কিছু কেটে বা থেতলিয়ে যেতে পারে। কাটা ও থেতলানো আলু সহজেই পচে যায় ও বীজের জন্য ব্যবহারের অনপোযোগী হয়ে পড়ে।

পশ্চিমা উন্নত দেশে আলু যান্ত্রিক উপায়ে উত্তোলন করা হয়। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জমির আলু উঠানো যায়, অধিকন্তু আলুও তত নষ্ট হয় না। জমি হতে তোলার পরপরই আলু সেখান হতে সরিয়ে ফেলা উচিত, কারণ রোদ্রের তাপে আলুর ক্ষতি হয়। অনেক সময় চাষীভাইরা আলু তোলার পর সেইগুলি আলুগাছ দ্বারা ঢেকে রাখেন, সেইরূপ করা অনুচিত, কারণ এমতাবস্থায় আলুতে সুতলী পোকা ও নানা রোগের আক্রমণ হতে পারে।

খামার বাড়িতে আলু নেওয়ার পর সেগুলি খোলা ছায়াযুক্ত স্থানে ছড়িয়ে দিতে হয়। দুই একদিন পর আলু সামান্য নাড়াচাড়া করলেই আলুতে লেগে থাকা ধূলামাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অতঃপর ছোট–বড় হিসেবে আলু বাছাই করে নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে গুদামজাত করা সুবিবেচনার কাজ হবে।

আলু সংরক্ষণ

আলু অন্যান্য সবজি, যেমন— বেগুন, ডাঁটা, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদির মতো দ্রুত পচনশীল না হলেও একটি পচনশীল সবজি হিসেবেই বিবেচিত। তাই দেখা যায়, জমি হতে উঠাবার পর কয়েক মাস অর্থাৎ তিন চার মাসের মধ্যেই আলু খুব বেশি পরিমাণে বিক্রি হয়ে যায়। ইহাতে একদিকে যেমন আলুর দাম পড়ে যাওয়ায় চাষীরা ন্যায্য মূল্য পায় না, অন্যদিকে বৎসরের বাকি সময়ে আলু দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ফলে দাম বেড়ে যায় যদিও মানগত বিচারে এইসব আলু নিকৃষ্ট। আর বাড়তি মূল্যের ভাগ চাষীরা পায় না, পায় ব্যবসায়ীরা।

উপর্যুক্ত কারণে আলু ভালোভাবে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে যাতে আলু পচে নষ্ট হতে না পারে। তবে এই মুহূর্তে উল্লেখ করা প্রয়োজন গুদামজাত অবস্থায় আলু কি কি কারণে পচে যায় বা নিকৃষ্ট মানের হয়ে পড়ে। নানা প্রকার রোগের আক্রমণের এবং গুদামজাত অবস্থায় তাপের আধিক্যের দরুন আলু নষ্ট হয়ে বা পচে যায়। বিভিন্ন রোগসমূহের মধ্যে ছত্রাক (Fungii) এবং ব্যাক্টেরিয়া (bacteria) ঘটিত রোগ প্রধান। ছত্রকের আক্রমণে যে সমস্ত রোগ হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ব্লাইট রোগ' (Blight), গোলাপি পচা রোগ (Pink rot), গ্যাংগ্রিন (gangrine) আর ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ হচ্ছে কোমল পচা রোগ

(soft rot), বাদামি পচা রোগ (brown rot) এবং 'রিংরট' (ring rot)। ফিউজেরিয়াম ঘটিত রোগের মধ্যে শুকনা পচা রোগ (dry rot) অত্যন্ত মারাত্মক। গুদামজাত অবস্থায় তাপমাত্রা বেশি হলে আলুর পচনক্রিয়া দ্রুত হয় আর ধীরে ধীরে জলীয় অংশ চলে যাওয়ায় আলু শুকায়ে এবড়োথেবড়ো হয়ে যায় এবং তৎসঙ্গে আলুতে অকালে চারা দেখা দেয়। ইহাতে সেই আলু খাবারের উপযোগী থাকে না এবং বপনের জন্যও অনোপযোগী হইয়া পড়ে কারণ আলু লাগাবার মৌসুমের সময় চারা এত লম্বা হয়ে পড়ে যে সেগুলি আর কোনো কাজে আসে না এবং সেইরূপ বীজ হতে গাছ বলবান হয় না।

উপর্যুক্ত দুটি কারণে অর্থাৎ পচার হাত ও শুকিয়ে যাওয়া এবং অকালে অঙ্কুরোদ্গমের হাত হতে রক্ষা করতে হলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলু সংরক্ষণ করা উচিত। অর্থাৎ বীজ আলু ও খাবার আলু —এই দুটিকেই উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

নাতিশীতোষ্ণ এবং শীতপ্রধান দেশে আলু সংরক্ষণের জন্য তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। কারণ আলু উত্তোলনের পরপরই আরো বেশি ঠাণ্ডা পড়ে। সেই পরিবেশে আলু খামার প্রাঙ্গণে অথবা ঘরে স্তূপীকৃত করে রেখে দিলে আলু ভালো অবস্থায় থেকে যায়। ঐ সমস্ত অঞ্চলে মাটির নিচে গর্ত করে ও তাতে আলু রেখে খড়কুটা ও মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এক যুগ আগেও উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ আলু এইভাবে সংরক্ষণ করা হতো। তবে এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আলু অক্সিজেনের অভাব, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য, অধিক তাপ সৃষ্টি প্রভৃতি কারণে কোনো কোনো সময় বেশি পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়।

এইজন্য আজকাল আলু ঘরের ভিতরে রেখে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত ঘরে পাটাতনের উপর আলু স্তূপীকৃত করে না রেখে হাল্কা স্তরে স্তরে রাখা হয় যাতে আলুর গাদার ভিতরে সহজেই বায়ু চলাচল করতে পারে ও উত্তাপের সৃষ্টি না হয়। তদুপরি সংরক্ষিত ঘরে বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত করা হয় এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। খাবার আলুর জন্য বেশি তাপমাত্রা অর্থাৎ ১০° সে: ও তদূর্ধ্বে এবং বীজ আলুর জন্য কম তাপমাত্রা অর্থাৎ ২-৪° সে. পরিবেশন করা হয়। ইহাতে খাবার আলুতে মিষ্টতার মাত্রা কমে যায় এবং বীজ আলু রোগ ও পচার হাত হতে রক্ষা পায়।

পশ্চিমা দেশের মতো আমাদের দেশে সাধারণভাবে আলু সংরক্ষণ করার কাজ খুবই কঠিন। আলু মাঠ হতে উত্তোলনের স্বল্পদিনের মধ্যেই গ্রীষ্মকাল চলে আসে, তৎপর আসে বর্ষাকাল। একদিকে গরম অন্যদিকে অধিক আর্দ্রতার প্রভাবে আলু সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে ও পচে যায় ; আবার পচার হাত হতে রক্ষা পেলেও আলু দিনে দিনে শুষ্ক হয়ে পড়ে এবং সুপ্ততা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে অকালে চারা দেখা দেয়; ইহার জন্য তখন সেই আলু আর খাবার উপযোগী থাকে না, অন্যদিকে মাঠে বপনের অনেক আগেই চারা গজিয়ে যাওয়ার ফলে সেই আলু বীজ হিসেবেও ভালো বলে গণ্য হয় না। তবে নিম্নবর্ণিত সাধারণ নিয়মে আলু সংরক্ষণ করলে অনেকটা সুফল পাওয়া যায়।

সাধারণ নিয়মে আলু সংরক্ষণ : এমন একটি ছনের ঘর তৈরি করতে হবে যার ভিতরে সহজেই বাতাস চলাচল করতে পারে। টিনের ঘর সহজেই উত্তপ্ত হয়ে যায় বলে ছনের ঘর অধিকতর উপযোগী। ঘরে দুই এক হাত অন্তর একটির উপর একটি করে মাচান তৈরি করতে হবে। তৎপর প্রতিটি মাচানের উপর চাটাই বিছিয়ে দিয়ে তার উপর মাটির

প্রলেপ লাগাতে হবে। প্রলেপ শুকায়ে গেলে তার উপর আলু গাদা করে ছড়ায়ে দিতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যে প্রতিটি গাদার উচ্চতা যেন ১৫ হতে ২২ সেঃ মিটারের বেশি না হয়। এইবার প্রতিটি গাদা যথোপযুক্ত পরিমাণ বালি দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে। প্রতি মাচানে যত মণ আলু থাকবে তার দ্বিগুণ পরিমাণ বালি ব্যবহার করলেই চলবে। বালির সঙ্গে 'এগ্রোসাইড–৩' অথবা 'গ্যামাক্সিন' নামক কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

এইভাবে আলু মাচানে গাদায় গাদায় সংরক্ষণ করার পর মাঝে মাঝে সেইগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি দু'চারটি করে পচা ও কীটদ্রষ্ট আলু দেখা যায় সেগুলি শীঘ্র শীঘ্র ফেলে দিতে হবে। অন্যথায় সমস্ত আলুই অচিরে পচে ও কীটের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যাবে।

উপযুক্ত নিয়মে রক্ষিত আলু ৩/৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। অধিক দিনের জন্য সংরক্ষণ করিতে হলে আধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থাৎ হিমাগারে (cold storage) আলু সংরক্ষণ করিতে হবে।

হিমাগারে আলু সংরক্ষণ : গোল আলু সংরক্ষণের ইহা একটি আধুনিক ও সার্থক ব্যবস্থাপনা। ইহার বদৌলতে খাবার ও বীজ–এই দুই শ্রেণির আলুই দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ করা যায়।

হিমাগার বা 'কোল্ড স্টোরেজ' ইস্টক নির্মিত একটি দালান ঘর যাতে শীতলতা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই জন্য এই ঘরটি এমনভাবে তৈয়ার করা হয় যাতে ইহার দেওয়াল ও ছাদে কোথায়ও কোনো ফাঁক না থাকে ; কেবলমাত্র এমন নিয়ন্ত্রিত ফাঁক থাকে যার মাধ্যমে ভিতরের গরম আবহাওয়া শোষক পাখার সাহায্যে বের করে দেওয়া যায়।

হিমাগারের তাপমাত্রা বীজ আলুর বেলায় ৩৮–৪০° ফাঃ (৩.৩–৪.৪° সে.) এবং খাবার আলুর জন্য ৫৫–৬০° ফাঃ (১২.৭–১৫.৫ সে.) হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর হিমাগারের অভ্যন্তরে বাতাসের আর্দ্রতা ৮০–৯০% হবে।[৩,৫]

আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগারকে কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি কক্ষে উপর্যুপরি কয়েকটি মাচান (বাঁশের অথবা কাঠের) তৈরি করা হয় যাতে অধিক আলু গুদামজাত করা যায়। মাচানে আলু গাদা করে অথবা বাস্তায় ভর্তি করে রাখা যায়। আলু গাদা করে রাখলে গাদার উচ্চতা কখনো যেন তিন মিটারের বেশি না হয়। আর আলু বস্তায় রাখলে বস্তা মাচানে খাড়া করে রাখতে হবে এবং বস্তা এমনভাবে পাতলা করে রাখতে হবে যাতে বস্তার ভিতরে অনায়াসে বায়ু চলাচল করতে পারে।

আলু হিমাগারে প্রবেশ ও বাহির করাবার সময় একটি নিয়ম পালন করা বাঞ্ছনীয়। প্রবেশের পূর্বে আলুকে ১৬–১৮° সে. তাপমাত্রায় ৪৮–৭২ ঘণ্টার জন্য 'প্রিকুলিং' (Pre-coolding) এবং বাহিরে আনার পূর্বে 'প্রিহিটিং' (preheating) করতে হবে। ইহাতে দুই অবস্থাতেই অর্থাৎ হিমাগারের ঠাণ্ডা ও বাহিরের গরম পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য আলু সহনশীল হয়ে উঠে এবং তাতে করে আলু নষ্ট হওয়ার হাতে হতে রক্ষা পায়।

খাবার আলুর বেলায় আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যে হিমাগারের তাপমাত্রা যেন ৪–৫ সে. এর নিচে নেমে না আসে, কারণ নিম্ন তাপমাত্রায় আলুর স্টার্চ বিয়োজিত হয়ে শ্বেতসারে পরিণত হওয়ার ফলে আলু মিষ্টি হয়ে যায়। এইরূপ আলু আর তখন খাওয়ার উপযোগী থাকে

না। আবার উচ্চ তাপমাত্রায় আলুতে সহজেই কুঁড়ি জন্মায়ে যায় যে কথা প্রারম্ভেই উল্লে করা হয়েছে। ইহাতেও সহজেই আলু খাবার অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি উপযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করলে আলুতে আর কুঁড়ি জন্মাতে পারে না। কুঁ প্রতিরোধকারী রাসায়নিকগুলি হচ্ছে CIPC, IPPC, TCNB এবং MENA. আলু জমি হ উঠাবার পুর্বে গাছের পাতায় ম্যালিক হাইড্রাজাইড (MH) নামক একটি রাসায়নিক প্রয়ে করলে সেইরূপ আলুতে মিহাগারে সংরক্ষণ কালে কুঁড়ি খুবই কম জন্মাতে দেখা যা আহমদ ও সতীর্থরা।[৮] MH এবং CIPC সহযোগে আলুর সংরক্ষণের উপর একটি পরী পরিচালনা করেন। তারা দেখতে পেয়েছেন যে 3000 PPM MH প্রয়োগে আলুতে খ কম চারা গজায়, অন্যদিকে 2000 PPM MH এবং ৯০ দিন পর CIPC প্রয়োগ কর আলু আরো দীর্ঘদিনের জন্য ভালো অর্থাৎ কুঁড়িবিহীন অবস্থায় থাকে।

আলু সাধারণ অথবা হিমাগারে যেভাবেই সংরক্ষণ করা হউক না কেন ইহার কতক পূর্বশর্ত পালন করলে সংরক্ষণে অধিকতর সুফল লাভ করা যায়। এই পূর্বশর্তগুলি হলো

১. রোগাক্রান্ত ক্ষেতের আলু সংরক্ষণ করতে নাই, কারণ সেই ক্ষেতের আলুর মাধ গুদামজাত আলু সংক্রামিত হয়ে কিছুদিনের মধ্যে পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

২. কচি আলু সংরক্ষণের অনপোযোগী, কাজেই আলু জমিতে ভালোভাবে পুষ্ট ও ভ হবার পর উঠিয়ে সংরক্ষণ করা বিধেয়। ভাত্তি আলু হতে রস তত শীঘ্র কমে না, ফলে দীর্ঘদিন ভালো অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে।

৩. জমি হতে আলু তোলার পর সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র সরায়ে নিয়ে সেগুলি ৭/৮ ছায়ায় ছড়ায়ে রাখা ভালো। ইহাতে সুতলী পোকার ডিম পাড়া হতে রক্ষা পায় সংরক্ষণকালীন সময়ে আলু তত শীঘ্র জলীয় অংশ হারায় না। অধিকন্তু আলুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আলু পচে যাওয়ার হাত হতে রক্ষা পায়।

৪. কাটা, ছাল উঠা, কীটদ্রষ্ট ও রোগাক্রান্ত আলু বেছে বের করে নিয়ে বাকি ভ আলু সংরক্ষণ করতে হবে। তা হলে সঙ্গত কারণেই আলু দীর্ঘদিন ভালো অবস্থায় সংর থাকবে।

হিমাগারে আলু দীর্ঘদিন সার্থকভাবে রাখা গেলেও বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত খুব সামান্য অংশই এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। তার প্রধান প্রয়োজনের তুলনায় হিমাগারের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। যেখানে দেশে প্রতি বৎসর আলু উৎপাদন আট লক্ষ টনের বেশি সেক্ষেত্রে দেশের সর্বমোট ৮৬টি হিমাগারে সংরক্ষণ যায় মাত্র ৯০ হাজার টন অর্থাৎ মোটামোটি বলা যায় উৎপাদনের $\frac{১}{১০}$ ভাগ মাত্র। ব প্রয়োজন মতো আলু সংরক্ষণ করতে হলে দেশে আরো অনেক সংখ্যক হিমাগার স্থাপ আশু কর্তব্য।

আলুর ব্যবহার

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে আলু আমাদের দেশে সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়— মাংস এই দুইয়ের সঙ্গে তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়। শুধু আলু ভেজে ও ভর্তা কর সংযোগে খাওয়ার রীতিও এদেশে রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা দেশ, যেমন—গ্রেটব্রিটেন, হল্যান্ড, পোল্যান্ড, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা আলুকে আমাদের

মতো প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করে থাকে। এইজন্য সেই দেশসমূহে আলুকে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত অর্থাৎ রান্নাবান্না করে ভক্ষণ করা হয় ; 'ফ্রেন্সফ্রাই' (french fry), 'পটেটো চিপস' (Potato chips), 'মেশড় পটেটো' (meshed patato), প্যাটিস (pattis) ইত্যাদি সেই সব খাদ্যে অন্যতম। অধিকন্তু আলু হতে ময়দা প্রস্তুত করে তা দ্বারা রুটি, বিস্কুটও তৈরি করা হয়।

তীব্র খাদ্য সঙ্কটের মুখে আলু আমাদের দেশেও একটি প্রধান খাদ্যরূপে গৃহীত হতে পারে। আলু চাউলের চাইতে নিকৃষ্ট নয় বরং কোনো কোনো দিক হতে শ্রেয়, যেমন— যেখানে চাউলে কোনো ভিটামিন– 'এ' ও 'সি' নেই সেখানে আলুতে এই উভয় ভিটামিনই বর্তমান রয়েছে। আলুতে প্রোটিনের পরিমাণ চাউল ও গম হতে কিছু কম হলেও গুণগত দিক হতে উঁচুমানের ; একমাত্র 'হিসটিডিন' (histidi) ছাড়া এই প্রোটিনে আর সর্বরকম 'এমাইনো এসিডস' (amino acids) বর্তমান রয়েছে। শক্তির (calorie) উৎস হিসেবেও আলু চাউল এবং গম হতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে শুষ্ক পদার্থের (dry matter) পরিমাণ কম হলেও হেক্টর প্রতি উৎপাদন চাউল ও গম হতে অনেক বেশি হওয়ার ফলে এক ইউনিট (হেক্টর) জমি হতে অধিক পরিমাণে কেলরি বা শক্তি উৎপন্ন হয় (তালিকা–২০)।[৬]

সারণি–ক : চাউল গম প্রভৃতি দানাশস্যের সঙ্গে তুলনামূলক হারে গোল আলু হতে শুষ্ক পদার্থ ও শক্তি (Calorie) উৎপাদন

খাদ্য শস্য	প্রতি হেক্টরে উৎপাদন (টনে)	শুষ্ক পদার্থের শতকরা হার	প্রতি হেক্টরে শুষ্ক পদার্থ (টনে)	প্রতি ১০০ গ্রামে ক্যালরি	প্রতি হেক্টরে শক্তি (লক্ষ ক্যালরিতে)
আলু	১৩.৩৯	২৫.৩	৩.৩৯	৯৭	১২.৯৮
গম	১.৬০	৮৭.২	১.৪০	৩৪৬	৫.৫৩
চাউল	১.৫৬	৮৬.৩	২.৩৮	৩৪৫	৫.৪৫
ভূট্টা	২.৫২	৮৫.১	২.১৪	৩৪২	৮.৫৮
বালি	১.৯২	৮৭.৫	১.৬৭	৩৩৬	৬.৪৫

সুতরাং খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে আলুকে আমাদের একটি প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। ভাতের পরিবর্তে আলুকে সিদ্ধ করে ভেজে, ভর্তা করে, বড় বড় কুচি করে ভেজে সেকে প্রভৃতি নানাভাবে মাছ ও মাংস সহযোগে ভক্ষণ করা যেতে পারে। আহমদের এক বর্ণনায় দেখা যায় আলু দ্বারা ৬৯ রকমের খাদ্য প্রস্তুত করে পরিবেশন করা যায়।

মিষ্টি আলু

নদীমাতৃক বাংলাদেশের চর অঞ্চলের অতি পরিচিত একটি ফসল মিষ্টি আলু। এদেশে ইহা গরিবের খাদ্যশস্য নামে আখ্যায়িত। আজকাল দেশের চরম খাদ্যসঙ্কটের মুখে এমন আখ্যা অনেকটা উড়ে গিয়ে থাকলেও এদেশে মিষ্টি আলু খাদ্যবস্তু হিসেবে বিশেষ করে শহরবাসীদের কাছ হতে এখন পর্যন্তও তেমন কোনো সমাদর পায় নাই। অথচ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতো এমন একটি ধনী ও উন্নত দেশেও ইহা যথেষ্ট সমাদরে ধনী ও নির্ধন সবার খাবার টেবিলে পরিবেশন করা হয়। ইহার কারণ তাহারা মিষ্টি আলুর গুণের জন্য ইহাকে

উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দিতে শিখেছে। বিজ্ঞানীরা[১] বলেন অল্প খরচে ইহার মাধ্যমে মানবদেহে শক্তি, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি ও ভিটামিন-বি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে, যেমন—গণচীন, পাপুয়া নিউগিনিয়ে মিষ্টি আলু প্রধান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৩-৯৪ সালে ৪৪৪০০ আলু।[১২] হেক্টর জমিতে মিষ্টি আলুর চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় ৪২৪০০০ টন গোল আলুর মতো একর প্রতি উৎপাদন অন্যান্য ফসলের চাইতে যথেষ্ট হলেও নদ-নদীর অববাহিকার নিচু এলাকার বেলে মাটি ছাড়া আর কোনো জমিতে ইহার চাষ করা হয় না। অধিক লাভজনক অন্যান্য রবি ফসলের অন্য কোনোটির চাষ করা সম্ভব না হলেই তেমন জমিতে কেবল মিষ্টি আলুর চাষ করার কথা চিন্তা করা হয়। তাই মিষ্টি আলুর আবাদ এদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

এডমন্ড ও এমারমেনের[১১] মতে মিষ্টি আলুর উৎপত্তিস্থল দুটি —একটি নিরক্ষীয় আমেরিকা (পেরু) এবং অপরটি নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহসাগরীয় দ্বীপাঞ্চল (উত্তর নিউজিল্যান্ড)। কিন্তু মার্টিন ও নিওনার্ড[১৩] মতো পোষণ করে যে মিষ্টি আলু মেক্সিকো অথবা দক্ষিণ আমেরিকায় উৎপত্তি লাভ করে এবং সেখান হতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে চীন ও এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব হতে মিষ্টি আলুর চাষবাদ শুরু হয়।

নিরক্ষীয় ও অব-নিরক্ষীয় অঞ্চলের অনেক দেশেই আজকাল মিষ্টি আলু জন্মিতে দেখা যায়। তবে মিষ্টি আলু উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য দেশ হচ্ছে জাপান, প্রজাতন্ত্রী চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ব্রাজিল ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

মাটি ও জলবায়ু

অতি সহজভাবেই বলা যায় বেলে মাটিই মিষ্টি আলুর জন্য সবচাইতে উপযুক্ত মাটি। তবে বেলে মাটির তলদেশে এঁদেল মাটির একটি স্তর থাকলে ভালো হয়। বেলে-দোয়াশ ও পলি-দোয়াশ মাটিতেও মিষ্টি আলু ভালো জন্মে। ভারি মাটি মিষ্টি আলুর জন্য মোটেই ভালো নয়, ইহাতে আলুর বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং আলু তোলা অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাপেক্ষ হয়। অধিক উর্বর মাটিও মিষ্টি আলু চাষের জন্য ভালো নয়, কারণ তাতে কেবল গাছের বৃদ্ধি হয়, আলু তেমন কিছু ধরে না। মাঝারি ধরনের উষ্ণ আবহাওয়া মিষ্টি আলুর জন্য প্রয়োজনীয়। মৌসুমে গড় তাপমাত্রা ২৬.৫° সে. আদর্শস্থানীয়। সামান্য তুষারপাতও ফসলটির জন্য ক্ষতিজনক ; বৃষ্টিপাত ৩৫-৪০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৮৯০-১০২০ মি: হলেই চলে। ইহার কম হলে সেচের পানি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে খরিপ মৌসুমে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় বলে নদ-নদীর অববাহিকার নিম্নাঞ্চলের মাটিতে যথেষ্ট রস থাকে, তাতেই বৃষ্টিহীন রবি মৌসুমে বিনা সেচেই মিষ্টি চাষ করা চলে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

মিষ্টি আলু Convolvulaceae পরিবারের অন্তর্গত একটি লতাজাতীয় উদ্ভিদ। এটিকে এক বর্ষজীবী উদ্ভিদ হিসেবে গণ্য করা হলেও ইহা বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ হিসেবে জন্মাতে পারে। গাছের লতা ১ মিটার হতে ৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়, কিন্তু এডমন্ড ও এমারমেনের[১১] মতে

লতা ২ ফুট (৬০ সেঃ মিঃ হতে ২০ ফুটেরও (৬.৫ মিটার) অধিক হয়। লতার রং সবুজ, লালচে, অথবা বেগুনি রংয়ের হয়। লম্বা বোটাযুক্ত পাতা কোনো জাতে ত্রিকোণকার ও কোনো জাতে হৃদপিণ্ডকার হয়। গাছে কখনো কখনো কলমিলতার ফুলের মতো ফানেলাকৃতির সাদা বা বেগুনি রংয়ের ফুল ধরে (চিত্র নং ৫.১)। ফল কেপসুলজাতীয় এবং তাতে ছোট ছোট বীজ জন্মে। বীজ হতে গাছ জন্মাইলেও তাহা আবাদের জন্য ব্যবহৃত হয় না। উদ্ভিদ প্রজননবীদেরা নতুন নতুন জাত সৃষ্টির জন্য বীজ ব্যবহার করে থাকে। আবাদের জন্য কেবল লতাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গাছের কিছু কিছু শিকড় স্ফীত হয়ে আলুর সৃষ্টি করে। গোল আলু যেমন পরিবর্তিত কাণ্ড, মিষ্টি আলু তেমনি পরিবর্তিত মূল।

আমাদের দেশে মিষ্টি আলুর জাত বলতে কিছু নেই। বহুদিন হতে এদেশের চাষীরা যে মিষ্টি আলুর চাষ করে আসছে সেগুলি গুণগত বিচারে নিকৃষ্ট মানের। যে সমস্ত জাতের আলুর মাংসল অংশ হলুদ, বেগুনি অথবা কমলা রংয়ের সেগুলিই ভালো জাত। কারণ সেগুলিতে মূল্যবান কেরোটিন (carotine) অর্থাৎ ভিটামিন–এ থাকে। আমাদের দেশে সাদা ও বেগুনি খোসাযুক্ত যে দুটি মিষ্টি আলুর চাষ হয় সে দুটিরই মাংসল অংশ সাদা অর্থাৎ সেগুলিতে কোনো ভিটামিন–এ নাই।

গত কয়েক বৎসর যাবত ভিটামিন সমৃদ্ধ কিছু কিছু আলুর জাত বিদেশ হতে এদেশে এনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

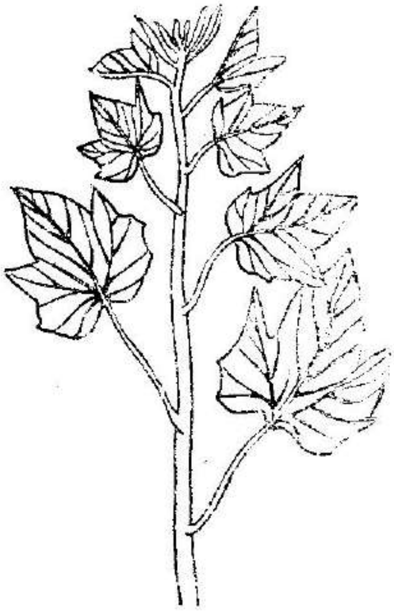

চিত্র : ৫.২ মিষ্টি আলুর লতার একাংশ

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আলু গবেষণা কেন্দ্র গবেষণা কাজের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ৫টি উন্নতমানের জাত উদ্ভাবন করেছে যা বাংলাদেশে আবাদের জন্য জাতীয় বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে।[১৬] সে জাতগুলো হলো : ১. কমলাসুন্দরী, ২. তৃপ্তি, ৩. দৌলতপুরী, ৪. বারী মিষ্টি আলু -৪ এবং বারী মিষ্টি আলু-৫।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : মিষ্টি আলুর জমি অনায়াসেই প্রস্তুত করা যায়। এই জমি খুব হাল্কা বলিয়া ২/৩ টি চাষ মই দিলেই জমি প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়ে যায়।

সার প্রয়োগ : চর এলাকার উর্বর মাটিতে প্রধানত মিষ্টি আলুর চাষ করা হয় বলে সেই রকম মাটিতে কোনো সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। তবে উঁচু এলাকায় চাষ করলে সার ব্যবহার করতে হয়। প্রতি হেক্টরে ১ টন গোবর, ১৪০ কেজি ইউরিয়া, ১০০ কেজি টি এস পি ও ১৫০ কেজি এম পি সার প্রয়োগ করলে ফলন ভালো হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হেক্টরে প্রতি ৮০–১০০ কেজি জিপসাম ও ৮–১২ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

চারা সংগ্রহ ও রোপণ : ক্ষেতে চারা লাগাবার বেশ কয়েক মাস পূর্ব হতেই উঁচু জমিতে গাদায় আলু রোপণ করতে হয়। আষাঢ়–শ্রাবণ মাসের দিকে অল্প কিছু পরিমাণ জমিতে আলু ঘন ঘন করে লাগায়ে রাখলে তা হতে প্রচুর চারা বের হয়। আস্তে আস্তে চারাগুলি লতায়ে সেই জায়গা ভরে ফেলে। বপন করার জন্য আলুর গায়ে জন্মান ছোট ছোট চারাও ব্যবহার করা যায়।

আশ্বিন–কার্তিক মাসে আলুর লতা কেটে ক্ষেতে লাগান শুরু করা যায়। তবে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহেও লতা রোপণ করা যেতে পারে। লাগাবার জন্য লতা ছোট ছোট টুকরা করে কাটা হয়। প্রতিটি টুকরা লম্বায় ১২-১৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ৩০–৪৬ সে: মি: এবং তাতে কমপক্ষে ৭টি গাইট থাকলে ভালো হয়। জমিতে লাগাবার আগে লতার টুকরা ২ দিন ছায়াযুক্ত জায়গায় ফেলে রাখা বিধেয়। লতার গোড়া ও মধ্যভাগ হতে লওয়া টুকরার চাইতে আগার টুকরা সর্বোত্তম।[৮]

চারা সারিতে রোপণ করতে হয়। প্রতি সারির মধ্যে ২–৩ ফুট অর্থাৎ ৩০–৯০ সে. মি. এবং সারিতে চারার মধ্যে ৮০–১০ ইঞ্চি অর্থাৎ ২০–২৫ সে: মি: ব্যবধান রাখতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে চারা লাগাবার সময় তা মাটির উপর ২০–২৫ সে: মি: পরিমাণ স্থানে চারা শোয়ায়ে দিয়া আগার দিকটা মাটির উপরে কৌণিকভাবে স্থাপন করতে হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা : আলুর জমিতে বেশ আগাছা জন্মাতে পারে। রোপণের সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে জমির সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। এই সময় সারির ভিতরকার মাটি আলগা করে কিছু কিছু মাটি গাছের সারিতে কিছুটা উঁচু করে দিলে ভালো হয়। গোল আলুর মতো তত উঁচু করে মাটি সারিতে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

নিচু চর এলাকার রসাল জমিতে সেচের পানি প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন হয় না। উঁচু জমিতে রসের অভাব হওয়া স্বাভাবিক। উপরন্তু এই জমিতে সার ব্যবহার করা হয় বলে সেচের প্রয়োজন আছে। একবার কি দুবার সেচ দিলেই চলবে।

রোগ–বালাই বা কীট–পতঙ্গ মিষ্টি আলুর তেমন কোনো ক্ষতি করে না। এইজন্য এক দিক হতে শঙ্কার কোনো কারণ নেই।

আলু উত্তোলন : চারা রোপণের ৪/৫ মাস পর আলু উঠাতে হয়। কোদালীর সাহায্যে কোপায়ে আলু তুলতে হয়। আলু চাষের এই সময়েই অর্থাৎ আলু তোলার প্রাক্কালেই প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। আলু উঠানোর আগে গাছের লতা কেটে সরায়ে নিলে আলু তোলার কাজ সহজতর হয়, অন্যথায় লতায় বার বার কোদালি আটকায়ে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কোদালির সাহায্যে আলু তোলার সময় অসাবধান হলে অনেক আলু কাটা যায়। এই সব কাটা আলু বাজারে কম দামে বিক্রি হয় এবং পরেও বেশি দিন টিকে থাকে না ; সহজেই পচে যায়। সুতরাং যতটা সম্ভব সাবধানে কুপিয়ে আলু তোলা উচিত।

কোদলায়ে জমি হতে আলু উঠানোর পর সেগুলি কয়েক ঘণ্টা জমিতেই শুকিয়ে তৎপর স্থানান্তরিত করতে হয়। ঝুড়ি বা বস্তায় ভরে আলুর এই স্থানান্তর করণের কাজটি সমাধা করা যায়।

ফলন : গোল আলুর মতো এমনকি তার চাইতেও অধিক হারে মিষ্টি আলুর ফলন হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১১০০০ কেজি হলেও উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ১৫০০০–২০০০০ কেজি মিষ্টি আলু উৎপন্ন হতে পারে। এম. পি. সি'র কর্মীরা[১৫] দেখায়েছেন যে উন্নত পদ্ধতিতে আধুনিক জাতের বীজ ব্যবহার করলে মিষ্টি আলুর উৎপাদন অনেক বেশি এমনকি প্রতি হেক্টরে ৪৩০০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

মিষ্টি আলু গুদামজাতকরণ

এদেশে মিষ্টি আলু ডোল, ডালি, বস্তা অথবা বাঁশের মাচাঙ্গের উপর রেখে গুদামজাত করা হয়। এই অবস্থায় দুই তিন মাস ঘরে রেখে খাওয়া যায়। তার পর হতেই আলু খাওয়ার অনপোযোগী হয়ে যেতে থাকে। প্রধান যে দোষ দেখা দেয় তা হলো আলুতে অনেক চারা গজায়ে যায়, ফলে আলুর মাংসল অংশ শুকায়ে যেতে থাকে এবং কিছু কিছু আলু পচে যায়। কোনো কোনো দেশে যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মিষ্টি আলুকে শোধন বা কিউরিং (curing) করে নেয়া হয়। শোধনের জন্য আলুকে ৪৫–৪৭কসে. উত্তাপে ও ৮৫–৯২% আর্দ্রতায় ১৪–১৭ দিনের জন্য ধরিয়া রাখা হয়। তৎপর গুদাম ঘরে ও আলু রাখার ভাণ্ডে ধোয়া দিয়ে সেই ঘরে ৩০–৩১ সে. তাপমাত্রায় ৮৫–৯০% আর্দ্রতায় আলু গুদামজাত করে রাখা হয়।[৬] এইভাবে রক্ষিত আলু অধিক দিন ভালো ও খাওয়ার উপযোগী থাকে।

মিষ্টি আলুর ব্যবহার

মিষ্টি আলু বাংলাদেশে প্রধানত সিদ্ধ করে গুড় বা চিনি সহযোগে খাওয়া যায়। এই নিমিত্ত মাঝারি সাইজের অর্থাৎ ৪–৬ ইঃ লম্বা (১০–১৫ সেঃ মি:) ও $১\frac{১}{২}$–$৩\frac{১}{২}$ ইঃ (৪.৫–৯ সেঃ মিঃ) ব্যাসযুক্ত আলু উপযোগী, কারণ এই মাপের আলু ভালোভাবে সিদ্ধ করে খাওয়া যায়। বড় আকারের আলু সমভাবে সিদ্ধ করা সম্ভব হয় না বলে এই আকারের আলু বাজারে কম ধরা হয়, অর্থাৎ চাহিদা কম থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে মিষ্টি আলু কৌটাজাত (canned) অবস্থায় পাওয়া যায়। সেইদেশে আলু শুষ্ক করে ময়দার মতো প্রস্তুত করেও ব্যবহার করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আহমদ, কা, উঃ ফুল–ফল ও শাক–সবজি, ১৯৬৯। ২য় সংস্করণ। প্রকাশনায় : আলহাজ্ব কামিছুউদ্দীন আহমদ। দাশদী, পোঃ বন্দুরহাট, কুমিল্লা। পৃ. ৪১৮–২২।

২. আহমদ, কা, উঃ ও হুসেন মো. মোঃ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষকরণ, ১৯৭৭। ১ম সংস্করণ, প্রকাশনায় : মীর তছিমুল গনি। হালিমা লজ, ৫৮ সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, ঢাকা। পৃ. ৩–২৮

৩. ওয়াজিউল্লাহ, আ. কা. মোঃ অধিক খাদ্য উৎপাদনে আলুর ভূমিকা কৃষিকথা, ভাদ্র ১৩৮৬। কৃষি কমপ্লেক্স, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

৪. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (আলু গবেষণা কেন্দ্র) : বিকল্প খাদ্যকল্পে আলু উৎপাদন ব্যবহার, ১৯৮৩.

৫. রসিদ, মোঃ মাঃ বাংলাদেশের সবজি, ১৯৭৬। প্রথম সংস্করণ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৯২–১১১।

৬. Ahmad, K. U : Potatoes for the Tropics, 1977. Ist. Edn. Publisher Mrs. Mumtaj Kamal. Bunglow No. 2. Farmgate. Dhaka. P. 3.

৭. Ahmad, K. U : and Kamal, M : Wealth from the Potato. 1980. Ist Edn. Publisher : Mrs Mumtaj Kamal. Bunglow No. 2. Farmgate, Dhaka. pp. 19-53.

৮. Ahmad K. U., Sikka, L.C and Hussain A E : Non-refrigerated storage of ware potatoes in Bangladesh, B. Jour. A. R. vol. VI (2) : 1981.

৯. Aiyar, A.K.Y.N : Field crops of India. 1947. Bangalore. Printed by the Superintendent at the Govt. press. p. 286.

১০. Bangladesh Bareau of Statistics : Statistical yearbook of Bangladesh. 1995.

১১. Edmond. J. B and Ammerson, J.R : Sweet potatoes Production. Processing and Marketing. 1971. The AVI publishing Company. INC. pp. 1-19.

১২. Ibid. pp. 264-265.

১৩. Martin, J.H and Leonard, W. H : Principles of Field Crop Production, 1967. The Macmillan Co. N. Y. pp. 881-89.

১৪. Munistry of Agriculture : Development statics of Bangladesh Agriculture. Series No. 6. Dec, 1981.

১৫. The ADAB NEWS LETTER. 1978. Vol. 7 Rd. No 11/A. Dhanmondi. R/A. Dhaka.

১৬. Seed Certification Agency. Gazipur : Approved Crop varieties, 1995.

ষষ্ঠ অধ্যায়
চিনি উৎপাদনকারী শস্য
SUGAR CROPS

চিনি বা শর্করা মানুষের জন্য একটি অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু। ইহা মানবদেহে শক্তি প্রদান করে থাকে। শরীরে সহজেই আত্মীকরণ হয়ে যায় বলে চিনি একটি অত্যন্ত কার্যকরী খাদ্য উপকরণ।

সমস্ত সবুজ উদ্ভিদই সালোক-সংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজ নিজ দেহে গ্লোকুজ চিনি (glucose) প্রস্তুত করে। কিন্তু বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে তাহাদের প্রায় সবাই সেই চিনি নিজেদের জন্য খরচ করে ফেলে। তবে এমন কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যেগুলি সেই শর্করা সুক্রোজ চিনি (sucrose) হিসেবে নিজেদের দেহের কোনো অংশে, যেমন কাণ্ডে (আখ, খেজুর, সুগার ম্যাপল, ভুট্টা, সরগম) মূলে (সুগারবীট, গাজর), ফুলে (নারিকেল, তাল) এবং ফলে সঞ্চিত রাখে। সুতরাং এই সমস্ত উদ্ভিদ হতে চিনি আহরণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাত্র আখ, খেজুর, তাল, সুগারবীট ও সুগার ম্যাপল হতেই চিনি প্রস্তুত করা যায়।

আখই বাংলাদেশের একমাত্র চিনি উৎপাদনকারী ফসল। খেজুর ও তাল হতে যে রস সংগ্রহ করা হয় তা হতে গুড় ও মিশ্রী প্রস্তুত করা হয়। চিনি বা গুড় তৈরির উদ্দেশ্যে নারিকেলের ফুলের ছড়া হতে আমাদের দেশে কোনো রস সংগ্রহ করা হয় না। সুগারবীট বাংলাদেশে জন্মিলেও তা কেবল সবজি তথা সালাদ হিসেবেই খাওয়া হয়, চিনি প্রস্তুতের জন্য তা ব্যবহার করা যায় না।

আখ

আখ বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। পাট ও তামাকের মতো আখও চাষীদের হাতে নগদ টাকা আনে। আজকাল পাট চাষের চাইতে আখ চাষ অধিক লাভজনক বলে চাষীরা পাটের চাইতে আখ চাষেই অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছেন।

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাতেই কিছু না কিছু আখের চাষ হয়, তবে জলবায়ুর প্রভাব অনুযায়ী দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে আখ চাষের জন্য উপোযোগী। তাই দেখা যায় রাজশাহী, রংপুর দিনাজপুর, যশোহর ও কুষ্টিয়া জেলায় প্রচুর আখ জন্মে। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির মধ্যে ফরিদপুর, ঢাকা ও জামালপুরেও আখের আবাদ ভালো হতে দেখা যায়।

দেশে বর্তমানে ৪.৪০ লক্ষ একর অর্থাৎ ১.৭৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় ৮৩.৬০ লক্ষ টন আখ। এর মধ্যে ২.৪০ লক্ষ একর চিনিকল এলাকায় এবং ২.০০ লক্ষ একর মিল বহির্ভূত এলাকায় বিস্তৃত। মোট উৎপাদিত আখের প্রায় ৩১ লক্ষ টন গুড় উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং তা হতে পাওয়া যায় ৩ লক্ষ টন গুড় আর ১৪ লক্ষ টন আখ বীজ হিসেবে এবং চিবিয়ে খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়ে যায়। বাকি ৩৯ লক্ষ টন আখ হতে উৎপাদিত হয় প্রায় ১.৫০ লক্ষ টন চিনি।[১]

গত ৫ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৯০–৯১ সাল হতে ১৯৯৪–৯৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর কি পরিমাণ মিল ও মিল বহির্ভূত এলাকায় আখ চাষ ও উৎপাদন হয়েছিল তার হিসাব ২৫ নং সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ২৫ : বাংলাদেশে মিল ও মিল বহির্ভূত এলাকায় আখ চাষ ও উৎপাদনের পরিমাণ।

বৎসর	জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টরে)			উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মে. টন)		
	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত এলাকা	মোট	মিল এলাকা	মিল বর্হিভূত এলাকা	মোট
১৯৯০–৯১	০.৯৬	০.৯৫	১.৯১	৪৬.৯৬	২৯.৮৬	৭৬.৮২
১৯৯১–৯২	০.৯৫	০.৯২	১.৮৭	৪৪.৯১	২৯.৫৫	৭৪.৪৬
১৯৯২–৯৩	০.৮৮	১.৯৭	১.৮৫	৪২.৪৭	৩২.৬০	৭৫.০৭
১৯৯৩–৯৪	০.৯২	০.৮৯	১.৮১	৪৫.৭৩	২৫.৩৫	৭১.১১
১৯৯৪–৯৫	০.৯৯	০.৮১	১.৮০	৫০.৩০	২৪.১৬	৭৪.৪৬

উৎস : বি. বি. এস এবং বি. এস. এফ. আই. সি, ১৯৯৫

চিনি ও গুড় উৎপাদনকারী ফসলের মধ্যে বাংলাদেশের একমাত্র উল্লেখযোগ্য শস্য। দেশের আবাদি জমির তুলনায় আখের জমির পরিমাণ নেহায়েত কম নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখের চাষ হয় আর দেশের ১৪টি চিনিকলে চিনি উৎপাদিত হয় প্রায় দেড় লক্ষ টন। তবু প্রয়োজনের তুলনায় চিনির উৎপাদন যথেষ্ট কম। এরূপ অবস্থার প্রধান কারণ আখের হেক্টর প্রতি উৎপাদন ও মিলে চিনির উৎপাদন হার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। যেক্ষেত্রে জাভার প্রতি হেক্টর জমিতে আখ উৎপন্ন হয় ৮৯ টন, হাওয়াইতে ১৬০ টন, সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় ৪২–৪৩ টন। কিউবাতে যেখানে মিলে চিনি উৎপাদনের হার ১৭–১৮% সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের হার ৭–৮%।[৮] এরূপ হতাশাব্যাঞ্জক অবস্থার নানা কারণ হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে আঁখ বিজ্ঞানসম্মত উপাদেয় এদেশে চাষবাস ও চিনিকলে মাড়াই করা হয় না। অধিক উৎপাদনশীল আখের জাতের অভাবও আর একটি অন্যতম কারণ। অন্যান্য কারণগুলি হলো উপযুক্ত সময়ের আগে বা পরে আখ কাটা, মাঠের আখ মাটিতে পড়ে ও শুকিয়ে যাওয়া, চিনিকলে পৌছাতে পৌছাতে বা গ্রহণ করতে করতে আখ শুকিয়ে যাওয়া এবং কোনো কোনো সময় কারখানার কারিগরি ভুলত্রুটি ইত্যাদি।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু আখ চাষের জন্য বেশ উপযোগী। উপর্যুক্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠে আধুনিক তথা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষবাস করলে এদেশে প্রতি হেক্টরে ১৩৫–১৩৬ টন আখ অনায়াসেই উৎপন্ন হতে পারে। একইভাবে বলা যায় চিনিকলের কার্যক্ষমতা ও দক্ষতার উন্নতি সাধন হলে দেশে চিনি উৎপাদনের যথেষ্ট অগ্রগতি হবে বিশ্বাস রাখা যায়।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

অনেকের মতে আখের উৎপত্তি হয়েছে ভারতবর্ষে। বহু পুরাতন কাল হতেই এদেশে আখ চাষ হয়ে আসছে বলে অনুমান করা হয়। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ ও পুরাণে আখের উল্লেখ দেখেই এরূপ ধারণা করা হয়।[৭,৮] আবার কেউ কেউ মনে করেন আখের উৎপত্তি হয় চীনদেশে। আখের আদি নিবাস নিউগিনি— এমন ধারণাও কাউকে করতে দেখা যায়। আর সেখান হতেই আরব বণিকেরা আখ আফ্রিকা ও স্পেনের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নিয়ে যায়।[৭]

আজ পৃথিবীর অনেক দেশেই আখের আবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। তবে আখ উৎপাদনে ভারত এখনও শীর্ষস্থানীয়। পৃথিবীর মোট আখ উৎপাদনের (৩১৮.৭ মিলিয়ন টন) $\frac{১}{৬}$ ভাগ ভারতেই উৎপন্ন হয়। ভারতসহ আখ উৎপাদনকারী উল্লেখযোগ্য এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলো হচ্ছে পাকিস্তান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ ইত্যাদি (সারণি– ২৬)

সারণি–২৬ : এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কতিপয় উল্লেখযোগ্য আখ উৎপাদনকারী দেশে ১৯৯৪ সালে শস্যটির উৎপাদন এলাকা, মোট উৎপাদন ও ফলন হার।

দেশের নাম	উৎপাদন এলাকার ('০০০' হেক্টরে)	উৎপাদন ('০০০' মে. টনে)	ফলন হার কেজি / (হেক্টরে)
ভারত	৩৫৭৮	২৩১০০০	৬৪৫৬১
গণপ্রজাতন্ত্রী চীন	১০৫৮	৬৫৬৬০	৬২০৬০
পাকিস্তান	৯৬৩	৪৪৪২৭	৪৬১৪৩
থাইল্যান্ড	৯৪৫	৩৭৫৬৯	৩৯৭৫৫
ইন্দোনেশিয়া	৪০৫	৩১৫০০	৭৭৭৭৭
ফিলিপাইন	৩৮০	২৭৮০০	৭৩১৫৭
অস্ট্রেলিয়া	৩৬১	৩২৭০০	৯০৫৮১
বাংলাদেশ	১৮১	৭১১১	৩৯৩২৯
ভিয়েৎনাম	১৫০	৬০০০	৪০০০০
ফিজি	৭৫	৩৭৫০	৫০০০০
মায়ানমার	৬৪	২৮৪৯	৪৪৫৬৪

উৎস : এফ এ ও (এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল), ব্যাংকক, থাইল্যান্ড, ১৯৯৫

Dhaka

মাটি

এঁটেল, দোঁয়াশ ও এঁটেল–দোঁয়াশ মাটিতে আখ ভালো জন্মে। গভীর পলিমাটিতেও আখ ভালো উৎপন্ন হয়। বেলে ও ইটপাটকেলযুক্ত মাটিতে আখ মোটেই ভালো হয় না। আখের জমি উঁচু ও সমতল হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিচু জমিতে যেখানে সহজেই পানি জমে যায় এবং নিঃসরণ ভালো হয় না এমন জমি আখ চাষের জন্য উপযোগী নয়।

জলবায়ু

আখের জন্য গ্রীষ্ম ও অবগ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু উপযোগী। বেশি গরম ও ঠাণ্ডা উভয়ই আখের জন্য ক্ষতিকর। বাস্তবিক পক্ষে গড়পড়তা দৈনিক ২৫°সে. তাপমাত্রা আখ চাষের জন্য সর্বোত্তম। আখের বৃদ্ধি ৩১°সে. তাপমাত্রায় থেকে যায় এবং ১১°সে. এর নিচে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৭]

মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত অর্থাৎ ১৭৮০–২০৩০ সে. মি. বৃষ্টিপাত আখের জন্য ভালো। ৬০ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৫২০ সি. মি. এর নিচে বৃষ্টি ভালো নয়। তবে সেচের সাহায্যে ৬৩০–৭৬০ মি. মি.। বৃষ্টিপাত অঞ্চলেও আখ জন্মান যায়।[৪,৯]

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

আখ Gramince পরিবারভুক্ত ঘাসজাতীয় দণ্ডাকৃতির ডালপালাহীন একবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। (চিত্র ৬.১)। গাছের পাতা কিছুটা ভুট্টার পাতার ন্যায় তবে অধিকতর শক্তি ও খাড়া, সুচালো ও কিনারা ধারযুক্ত। আখদণ্ড উচ্চতায় ১.৮৫–৩.৭২ মিটার পর্যন্ত এমন কি ৯.৩ মিটার পর্যন্ত হয়।[৭] দণ্ডের কোনোটি নরম এবং কোনোটি শক্ত, তবে সকল দণ্ডই গিটযুক্ত (nodal) ; এক গিট হতে অন্য গিটের ব্যবধান ৫.৭ এমনকি ২৫ সে: মি: এবং দণ্ডের ব্যাস ১.২৫–৭.৫০ সে: মি:। আখ দণ্ডের রং কোনোটির হাল্কা, বেগুনি, কোনোটির সবুজ ও কোনোটির হলদে–সবুজ।

অন্যান্য ঘাসজাতীয় শস্য, যেমন— ধান, গম ও ভুট্টার মতো আখের মূলও গুচ্ছ প্রকৃতির ; তা নিচের দিকে খুব একটা না থেকে পাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে আখের কিছু কিছু শিকড় ৬০ সে: মি: এমনকি ১৫২ সে: মি: পর্যন্ত নিচে যায়।[৪]

সকল জাতের আখ গাছেই ফুল হয় না, যে জাতে হয় সেগুলিতে গাছের আগায় কাশফুলের মতো সাদা ধবধবে ফুলের শীষ বের হয় ; ফুলে খুব ছোট ধরনের বীজ ধরে সেগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। এই বীজ হতে চারা হলেও সেগুলি আখের আবাদের জন্য ব্যবহার করা যায় না, তা ব্যবহার করা হয় আখ প্রজননের কাজে। আবাদের জন্য আখদণ্ডকে টুকরা টুকরা করে বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

আখের জাত

আগের দিনে ভারত থেকে আখের জাত এনে এ অঞ্চলে চাষাবাদ করা হতো। তন্মধ্যে কয়াম্বাতোর (Co variety) জাতের আখই ছিল প্রধান। তিন চার দশক আগেও Co 527 জাতের আখ এ অঞ্চলে চাষ করা হতো এবং তা ভালো ফলন দিত। তৎপর Co 1158 জাতের আখের চাষ শুরু হয়। কালক্রমে সে জাতটিরও অবনতি ঘটে। আজকাল এ জাতের আখ আর চাষ হয় না বললেই চলে।

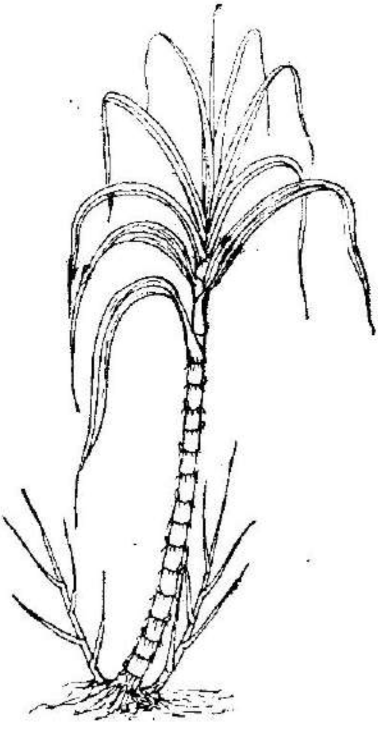

চিত্র : ৬.১ কুশীসহ আখ গাছ

তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে আখ চাষ জোরদার করার জন্য পঞ্চাশের দশকে ঈশ্বরদীতে আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। সে ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক আখের উন্নত জাত উদ্ভাবন করে। সে জাতগুলো হলো ঈশ্বরদী –১/৫৩ (ISD-1/53); ঈশ্বরদী–২/৫৪ (ISD-2/54), ঈশ্বরদী –৩/৫৪ (ISD-3/54), ঈশ্বরদী ৪/৫৪ (ISD -4/54), ঈশ্বরদী–৫/৫৫ (ISD-5/55)। ঈশ্বরদী–১০/৫৮ (ISD-10/58), ঈশ্বরদী ১০/৬০ (ISD-14/60)। এ জাতগুলোর আবাদ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলতে থাকে, কিন্তু এক সময় অর্থাৎ সত্তুরের দশকের মধ্যে প্রায় সবগুলো জাতেরই ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়, কেবল ঈশ্বরদী–১/৫৩ এবং ঈশ্বরদী –২/৫৪ মোটামুটি ভালো ফলন দিয়ে যেতে থাকে যে জন্য এ দুটি আখের আবাদ বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে আজ পর্যন্তও টিকে আছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সত্তুরের দশকের মধ্যেই ঈশ্বরদী আখ গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ঢেলে সাজান হয় এবং সেটির নাম দেওয়া হয় আখ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। আখের উন্নত জাত উদ্ভাবনের সাথে সাথে সেগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সার্থকভাবে চাষাবাদের জন্য আখের মিল জোন এলাকার মাঠ কর্মীদের, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীদের ও প্রগতিশীল আখ চাষীদের প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্বও সে ইনস্টিটিউটকে দেওয়া হয়। আশির দশক হতে শুরু করে নব্বই'র দশকের মধ্যে আজ পর্যন্ত এ ইনস্টিটিউট ১২টি উফশী তথা আধুনিক আখের জাত সৃষ্টি করে। নিম্নলিখিত এ জাতগুলো বিভিন্ন সময়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে।[১০]

জাতের নাম	বীজ বোর্ডের অনুমোদনের তারিখ
১. ঈশ্বরদী – ১৬ (ISD-16)	৩০. ৩. ১৯৮১
২. ঈশ্বরদী – ১৭ (ISD-17)	২৪. ১১. ১৯৮৪
৩. ঈশ্বরদী – ১৮ (ISD-18)	১৯. ১০. ১৯৯৮
৪. ঈশ্বরদী – ১৯ (ISD-19)	১০. ১০. ১৯৮৮
৫. ঈশ্বরদী – ২০ (ISD-20)	৪. ৯. ১৯৯০
৬. ঈশ্বরদী – ২১ (ISD-21)	৪. ৯. ১৯৯০
৭. ঈশ্বরদী – ২২ (ISD-22)	৮. ৪. ১৯৯৩
৮. ঈশ্বরদী – ২৩ (ISD-23)	৮. ৪. ১৯৯৩
৯. ঈশ্বরদী – ২৪ (ISD-24)	৮. ৪. ১৯৯৩
১০. ঈশ্বরদী – ২৫ (ISD-25)	৮. ৪. ১৯৯৩
১১. এম আর টি আই আখ – ২৬	৮. ৩. ১৯৯৫
১২. এস. আর টি আই আখ – ২৭	৮. ৩. ১৯৯৫

এ বারোটি জাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এবং পূর্বতন জাতের মধ্যে ঈশ্বরদী–১/৫৩ এবং ঈশ্বরদী–২/৫৪ এ দুটি জাতের বৈশিষ্ট্য নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ঈশ্বরদী –১/৫৩ : এটি মাঝারি সরু সরলাকৃতির ছাই সবুজ রংয়ের একটি আখের জাত ; দ্রুত বর্ধনশীল। সহজে অঙ্কুরিত হয় এবং অধিক সংখ্যায় কুশি জন্মে। দোআঁশ মাটিতে এ আখ ভালো জন্মে, তবে শুরু আবহাওয়ায় কাবু হয়ে যায়। জাতটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মাঝারি পর্যায়ের, পোকার আক্রমণ ততটা প্রতিরোধ করতে পারে না। জানুয়ারি মাস হতে আখ কাটা শুরু করা যায় ; ফলনের দিক হতে ভালো – প্রতি হেক্টরে ৭৫.০ টন, রসে চিনির পরিমাণ ১০.৩%। জাতটি নিচু এলাকায় চাষ করার উপযোগী।

ঈশ্বরদী–২/৫৪ : এটিও মাঝারি সরু আকৃতির একটি আখের জাত ; অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কুশি জন্মানোর হার বেশ ভালো। মাঝারি মৌসুমের এ আখের জাতটি এঁটেল–দোঁয়াশ মাটিতে ভালো জন্মে ; লাল পচা রোগ সহিষ্ণু কিন্তু পোকা মাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধে দুর্বল। গাছে ফুল ধরে না, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৮০.০ টন, রসে চিনির পরিমাণ ১১.৪%। লাল মৃত্তিকাঞ্চলে চাষের জন্য এটি একটি উপযোগী জাত।

ঈশ্বরদী -১৬ : এটি একটি সবুজাভ হলুদ রঙের আখ, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা মাঝারি ধরনের ও কুশির সংখ্যাও মাঝারি ; জাতটি দোআঁশ মাটিতে চাষ করার উপযোগী। জাতটি পোকা-মাকড়ের আক্রমণের দিক থেকে মাঝারি প্রতিরোধী ও লাল পচা রোগ সহিষ্ণু। এটি আগাম জাতের ও তাতে আগাম ফুল হয় ; গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৮৭.৫ টন ; রসে চিনির পরিমাণ ১০.২% জাতটি চাষীদের নিকট প্রিয়।

ঈশ্বরদী-১৮ : আখের এ জাতটি হলুদাভ সবুজ রংয়ের ; অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা মাঝারি পর্যায়ের, কুশীর সংখ্যা বেশি। নাবী জাতের এ আখটির জন্য দোআঁশ মাটি উপযোগী ; পোকা মাকড়ের আক্রমণ মাঝারি রকমের প্রতিরোধী ও লাল পচা রোগ সহিষ্ণু। জাতটির গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৮৫.০ টন ; রসে চিনির পরিমাণ ১০.০৯%। বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া অঞ্চলের চাষের জন্য এ জাতটি উপযোগী।

ঈশ্বরদী-১৯ : এ জাতের আখদণ্ডের রং সবুজাভ হলুদ ; অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ভালো ও কুশির সংখ্যা বেশি। বেলে-দোঁআশ উঁচু ও মাঝারি জমিতে চাষ করার জন্য একটি উপযোগী জাত, লাল পচা রোগ সহিষ্ণু ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ মাঝারি রকমের প্রতিরোধী। এ জাতের গড় ফলন হেক্টরে ৮২.৫ টন, রসে চিনির পরিমাণ ১০.৪৭%। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ও যশোর এলাকার জন্য একটি উপযোগী জাত।

ঈশ্বরদী-২১ : হলুদাভ সবুজ রঙের এ আখের জাতটির অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ভালো ও কুশির সংখ্যা অধিক ; এটেঁল-দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে চাষ করার উপযোগী। এটি পোকা-মাকড়ের আক্রমণের দিক থেকে মাঝারি রকমের প্রতিরোধী ও লাল পচা রোগ সহিষ্ণু। জাতটির গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ঈশ্বরদী-১৬ জাতের চেয়ে অধিক অর্থাৎ ৮৭.৫ টনের বেশি, রসে চিনির পরিমাণ- ১১.৩২%।

চাষাবাদ প্রণালি

জমির প্রস্তুতি : আখের জমি ৩/৪ বার চাষ ও বার কয়েক মই দিয়ে প্রস্তুত করতে হয়। জমি তত পাইট করে চাষ করার প্রয়োজন হয় না। পূর্ববর্তী ফসল আখ হলে সেগুলির গোড়া জমি হতে উঠিয়ে অন্যত্র ফেলে দিতে হবে। যেহেতু আখের জমিতে নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন সেজন্য সমস্ত জমিকে ৫০ ফুট অর্থাৎ ১৫.৫ মি. প্রশস্ত ও ১০০-২০০ ফুট অর্থাৎ ৩১-৬২ মি. দৈর্ঘ্য ফালিতে ভাগ করে নিলে নিষ্কাশনের জন্য নালা কাটা সুবিধাজনক হয়।

আখ চাষ : দু রকম নিয়মে আখ চাষ করা যায় ১. প্রচলিত নিয়মে আখ চাষ এবং ২. রোপা আখ চাষ।

প্রচলিত নিয়মে আখ চাষ

এ রকম নিয়মে আখ চাষের জন্য জমি দু'পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায়, যথা—

১. **সমতল বা ভাওর পদ্ধতি** (flat or furrowmethod) : এ পদ্ধতিতে ফালি ফালি জমিতে লাঙ্গল দিয়ে ৪৫.৫-৬১ সে: মি: দূরে দূরে ভাওর করা হয়। তৎপর সে ভাওরে আখের টুকরা (sett) বপন করা হয়। তবে এ পদ্ধতির বেশ কিছু দোষ রয়েছে যে-জন্য আমাদের দেশে হেক্টর প্রতি আখের ফলন কম হয়। দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে 'ভাওর' করা হয়

বলে এর গভীরতা খুব একটা হয় না এবং সব জায়গায় সমান হয় না। ফলে লাগানোর পর বীজ-আখ প্রায়ই জমির উপর ভেসে থাকতে দেখা যায়। উপরন্তু চৈত্র-বৈশাখ মাসের খরার ফলে মাটিতে রসের অভাবে অনেক সংখ্যক বীজ আখের টুকরা হতে চারা গজাতে পারে না। চারার শিকড় আবার মাটির বেশ উপরিভাগে থাকে বলে ঝড়-বৃষ্টির দাপটে আখ সহজেই লুটিয়ে পড়ে। মুড়ি আখ রাখলেও তা ভালো হয় না।

২. **নালা বা পরীক্ষা পদ্ধতি :** এ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত। এ প্রথায় ফালি জমিতে ১ মিটার দূরে দূরে নালা কাটতে হয়। ভাওর পদ্ধতিতে আখ চাষের যে সমস্ত অসুবিধা আছে নালা পদ্ধতিতে সেগুলির অনেকটাই থাকে না। জমির উপরিভাগ শুষ্ক হয়ে গেলেও নালাতে বেশ রস থাকে, ফলে বীজ হতে চারা গাজানো সহজ হয়। তদুপরি সার, পানি গাছের গোড়ায় পৌঁছানো সুবিধাজনক। প্রতিটি নালার মাপ হবে উপর বা মুখ ৩১ সে: মি: প্রশস্থ, নিচ বা তলা ২৩ সে: মি: প্রশস্ত এবং লম্বায় ৩১-৬২ মিটার (চিত্র ৬.২)।

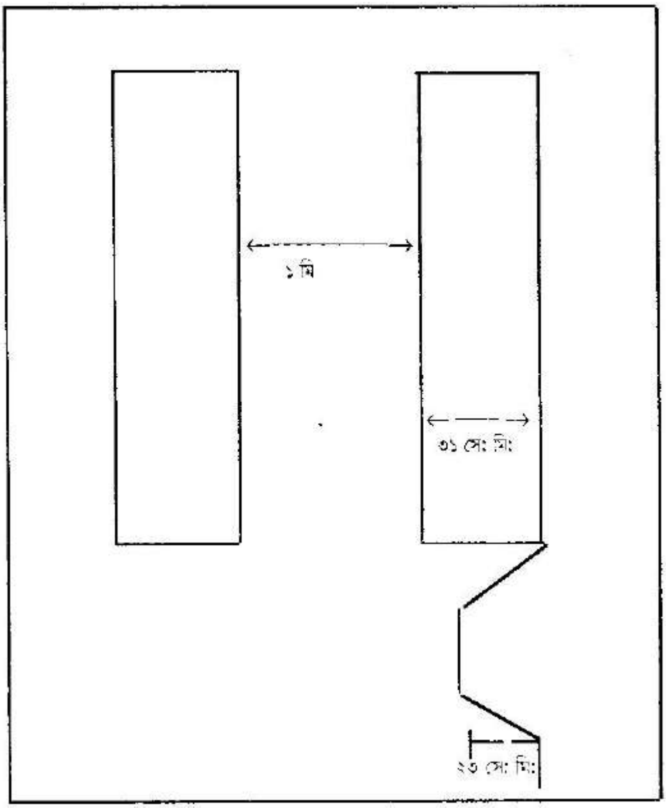

চিত্র : ৬.২ নালা বা পরীক্ষা পদ্ধতিতে আখের বীজ বপন।

নালা আস্তে আস্তে মাটি দ্বারা ভরাট হওয়ার ফলে গাছের গোড়া খুব দৃঢ়ভাবে মাটিতে আটকিয়ে থাকে, সেইহেতু ঝড়-বাতাসে আখ সহজে মাটিতে পড়ে যায় না। অধিকন্তু এই পদ্ধতিতে মুড়ী আখ ভালোভাবে জন্মানো যায়।

রোপা আখ চাষ

এ নিয়েম আখ চাষকে বলা হয় এস টি পি (STP- Spaced transplanting) যা প্রচলিত আখ চাষ পদ্ধতি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। প্রচলিত নিয়মে জমিতে সরাসরি তিন চোঁখবিশিষ্ট আখের টুকরা বপন করা হয়। রোপা আখ চাষে এক চোঁখবিশিষ্ট আখের টুকরা পলিথিন ব্যাগে অথবা দু'চোঁখবিশিষ্ট আখের টুকরা বীজতলায় লাগিয়ে চারা তৈরি করে সে চারা মূল জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করা হয়। চারা তৈরি করে সুনির্দিষ্ট দূরত্বে তা রোপণ করে অধিক সংখ্যায় মাড়াইযোগ্য আখ উৎপাদন নিশ্চিত করাই এ পদ্ধতির মূল কথা। আজকাল আখের সঙ্গে অন্যান্য ফসল—যেমন সরিষা, চীনাবাদাম, গোল আলু, মরিচ, মুগ, মটরশুটি, বিলাতি সবজি চাষের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে নালা পদ্ধতিতে কিছুটা ব্যতিক্রম অর্থাৎ পরিবর্তন সহযোগে আখ চাষ সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় এসেছে। এই রীতিতে আখ চাষ করে দুই সারির মধ্যবর্তী জমিতে যে সাথী ফসল (Inter crop) করা হয় সেগুলির যত্ন করা বেশ অসুবিধাজনক হয়। সাথী ফসলের জমিতে সেচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেচের পানি সারমিশ্রিত মাটি ধুয়ে নিয়ে নালাতে চলে যায়। ইহাতে একদিকে যেমন সাথী ফসলটির ক্ষতি হয় অপরদিকে নালাতে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মাটিতে ভরে যায় বলে আখের চারা গজান ও বৃদ্ধিতে দারুন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এইরূপ উদ্ভূত সমস্যার কথা বিবেচনা করে কেউ কেউ বলেন ভাওর পদ্ধতি ও নালা পদ্ধতিতে আখ চাষের মধ্যে একটা সমঝোতা হওয়া দরকার। এতে করে ব্যয় ও শ্রমসাপেক্ষ নালা পদ্ধতিতে আখ চাষ করার প্রতি চাষীদের উৎসাহ অনেকটা বৃদ্ধি পাবে, উপরন্তু সাথী ফসলের উৎপাদনও আশানুরূপ হবে। এই সমঝোতার আলোকে বলা যায় যে ভাওর ও নালা পদ্ধতির মাঝামাঝি একটি পদ্ধতির প্রবর্তন করা যেতে পারে। ভাওর পদ্ধতিতে যেখানে দুই সারির মধ্যে ৪৬–৬১ সে: মি: দূরত্ব রাখা হয় তাহা বৃদ্ধি করে ১–১.২৫ মিটারে উন্নীত করা যায় আর নালা পদ্ধতির জন্য যে পরীখা বা নালা খনন করা হয় তাহা তত বড় মাপের না করে প্রস্থে ও গভীরতায় আরো ছোট করে তৈরি করা যেতে পারে অর্থাৎ ভাওর পদ্ধতির ভাওরটিকে ৬ই: অর্থাৎ ১৬ সে: মি: গভীর করে প্রস্তুত করা যায়। তা হলে দুই সারির মধ্যবর্তী জমি ভালোভাবে সমতল করে সাথী ফসলের চাষ করা সুবিধাজনক হবে আর তাতে সেচের বা বৃষ্টির পানি অত সহজে মাটি ধুয়ে-মুছে আখের নালা বা ভাওর ভরাট করে ফেলবে না। প্রস্তাবিত এই নতুন পদ্ধতিতে আখের চাষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, তবে এই পদ্ধতিতে সাথী ফসলসহ আখের চাষ বাংলাদেশে সার্থক হবে বলে ধরে নেয়া যায়।

সার প্রয়োগ : আখ চাষে লাভবান হতে হলে সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন আছে। দেশের বিভিন্ন আখ প্রধান অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে সুষম সার প্রয়োগে আখের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়ে যায়। আখচাষে নিম্নরূপ সার প্রয়োগ করতে হয় :

সারণি –২৬ : আখ চাষে সার ব্যবহারের মাত্রা

মৃত্তিকা অঞ্চল	আখ উৎপাদন এলাকাসমূহ	হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ (কেজিতে)				
		ইউরিয়া	টি এস পি	এম পি	জিপসাম	জিংক সালফেট
১ পুরাতন হিমাগার এলাকার সমভূমি অঞ্চল	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা	২৮০–২৭৫	২৮০	৩৭৫	১৮৮	—
২. তিস্তা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি অঞ্চল	বৃহত্তর রংপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাংগাইল ও সিরাজগঞ্জ	২৮০–৩৭৫	১৮৮	২৮০	১৮৮	—
৩. বরেন্দ্র ও মধুপুর এলাকার লালমাটি অঞ্চল	বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর বগুড়া, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার অংশবিশেষ	২৮০–৩৭৫	২৮০	২৮০	১৮৮	—
৪. গংগা বিধৌত সমভূমি অঞ্চল	বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ	২৮০–৩৭৫	২৮০	২৮০	–	৩৫

উৎস : আখ চাষ ও গুড় উৎপাদন নির্দেশিকা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ১৯৯৬

প্রচলিত নিয়মে আখ চাষের বেলায় ইউরিয়া ও এম পি সারের অর্ধেক এবং ফসফেট জাতীয় সারের সমস্তটুকু বীজ বপনের সময় নালায় প্রয়োগ করতে হবে মিশ্রিত সার প্রয়োগের পর হাল্কা করে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট জমির তৈরির শেষ সময়ে প্রয়োগ করা বিধেয়। সারিতে গাছের গোড়ায় প্রথমবার মাটি দেবার সময় বাকি অর্ধেক এম পি এবং অর্ধেকের অর্ধেক ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হয়। গাছের গোড়ায় দ্বিতীয়বার মাটি দেবার সময় বাকি অর্ধেক ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

রোপণ আখ চাষে জিপসাম ও জিংক সালফেট জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে। সমস্ত টি এস পি ও ১/২ ভাগ এম পি সার চারা রোপণের আগে নালা মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের ১২–২৪ দিন পর চারার চারদিকে ১/৩ অংশ ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হয়। অবশিষ্ট ২/৩ অংশ ইউরিয়া ও এম পি সার সমান দুভাগে ভাগ করে দু কিস্তিতে কুশি বের হওয়াকালীন সময়ে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ নির্বাচন ও সংগ্রহ : আখের বীজ বলতে আখের ছোট ছোট টুকরাকেই বুঝায়। যে আখ ফসলে রোগ পোকার আক্রমণ ও ভিন্ন জাতের মিশ্রণ নেই। এমন ফসল হতেই বীজ সংগ্রহ করা শ্রেয়। একটি আখদণ্ডের আগার দিক হতেই বীজ সংগ্রহ করা ভালো, কারণ আগার দিকের বীজ হতেই ভালো চারা গজায়। তাই আগের দিনে চাষীরা শুধু আখের আগা হতেই একটি মাত্র চারা বা বীজ সংগ্রহ করতেন। আসলে নিচের দিকের কিছু অংশ বাদ দিয়ে সমস্ত আখটাই বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাই পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে সম্পূর্ণ আখটাই নালায় লম্বালম্বি ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

বীজের জন্য কোনো ক্ষেতের আখ নির্বাচন করার পর সেখান হতে বীজ সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি আখ ধারাল দা'র সাহায্যে টুকরা টুকরা করতে হয়। প্রতি টুকরাতে তিনটি করে চোখ (bud) থাকলেই চলে। আখকে বীজের জন্য টুকরা টুকরা করার আগে যেন বেছে ছুলে পরিস্কার না করা হয়। সরাসরি আখটি হাতে নিয়ে টুকরা টুকরা করা ভালো। তাতে বীজের চোখ রক্ষা হয়, কারণ তা পাতার নিচে ঢাকা থাকতে পারে। দূরদূরান্তে পাঠাতে গেলেও এই অবস্থায় বীজের চোখ জখম হয় না। অন্যথায় সহজেই চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

বীজ শোধন : আখের বীজ জমিতে লাগাবার আগে শোধন করা একান্ত প্রয়োজন। তাতে বীজ ছাতা (Fungii) ও অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা পেয়ে সুষ্ঠুরূপে অঙ্কুরিত হতে পারে। অন্যথায় বীজ লাল পচা (red-rot) স্মাট (Smut), রাস্ট (Rust) প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় অঙ্কুরোদগম ব্যাহত হয় এবং চারাগাছ আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

বীজ শোধনের জন্য যে যে ঔষধ পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে এরেটান–৬ ও এগালল উল্লেখযোগ্য। অর্ধসের এরেটান–৬ দুই মণ বিশ সের পরিস্কার পানিতে ভালো করে মিশিয়া দিয়ে উহাতে বীজের দুই কাটা প্রান্ত ডুবিয়ে নিতে হয়। এগালল আধসের পরিমাণ ১ মণ–১০ সের পরিস্কার পানিতে ভালো করে মিশিয়া নিতে হবে। এই মিশ্রিত পানিতে ৫ মিনিটকাল বীজ ডুবিয়ে রেখে জমিতে লাগাতে হবে। অধুনা টেকেটা বা ব্যাভিষ্টিন নামক ঔষধ দ্বারা বীজ শোধন করা হয় (২০ লিটার প্রতি ২০ গ্রাম ঔষধ)।

বীজের হার : একর প্রতি ৪০/৫০ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৩.৭৫–৪.৭৫ টন বীজ লাগে। এক নালা হতে অন্য নালার দূরত্ব ১.২৫ মি. হলে প্রতি হেক্টরে ৩০০০০ টি এবং দূরত্ব ১ মিটার হলে ৩৭৫০০টি তিন চোখবিশিষ্ট বীজ অর্থাৎ আখের টুকরা লাগবে। অবশ্য নালায় বীজ বপনের পদ্ধতি বিভিন্ন হলে বীজের হারে কিছুটা তারতম্য হবে। রোপা আখ চাষে বীজের পরিমাণ প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে অনেক কম লাগে, যেমন হেক্টরে ১.৯ টন বীজ।

বীজ বপন পদ্ধতি : কার্তিক–অগ্রহায়ণ হতে শুরু করে ফাল্গুন–চৈত্র মাস পর্যন্ত আখ বপন করা যায়। তবে প্রথমোক্ত সময়টিই শ্রেয়। নালায় বা ভাওরে কয়েক প্রকার পদ্ধতিতেই বীজ লাগান যায়। মাটির রস, বীজের অবস্থা ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে কোনো এক পদ্ধতিতে বীজ বপন করতে হয়। বীজ নিম্নবর্ণিত কয়েকটি পদ্ধতিতে বপন করা যায় :

১. **মাথায় মাথায় বপন পদ্ধতি** (end-to end planting) : এই নিয়মে একটি বীজ বা টুকরার মাথা অপর একটি টুকরার মাথার কাছাকাছি রেখে বপন করতে হয় (চিত্র : ৬.৩)

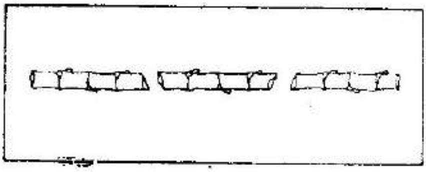

চিত্র ৬.৩ : মাথায় মাথায় আখের বীজ বপন পদ্ধতি

২. **আঁকাবাঁকা পদ্ধতি** (zigzag planting) : এই নিয়মে একটি বীজের মাথা অপর আরেকটি বীজের মাথার সঙ্গে বাঁকা অর্থাৎ কোনো পরে লাগাতে হয় (চিত্র ৬.৪)

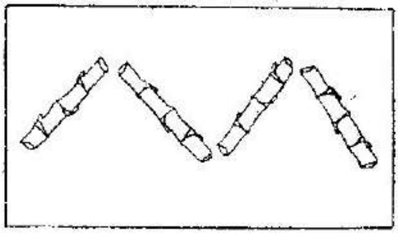

চিত্র ৬.৪ : আঁকাবাঁকা পদ্ধতিতে আখের বীজ বপন

৩. **দেড়া পদ্ধতি** (One and half planting) : এই প্রথায় দুটি টুকরা মাথায় মাথায় (১ম পদ্ধতির মতো লাগান'র পর একটি টুকরা সেই দুই মাথা বরাবর সমান্তরাল করে লাগান হয় (চিত্র ৬.৫)। অবশ্য এ প্রথায় নালায় দু সারিতে বীজ বপন করতে হয়।

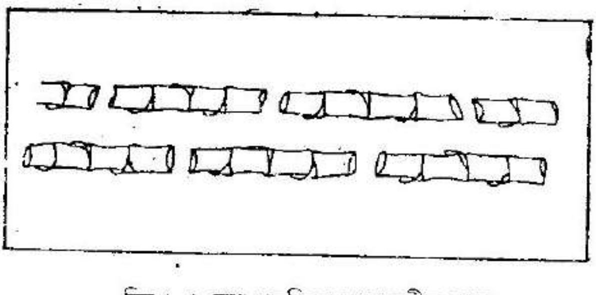

চিত্র ৬.৫ দেড়া পদ্ধতিতে আখের বীজ বপন

৪. **সমান্তরাল পদ্ধতি** (Parallel planting) : এই নিয়মে প্রথম পন্থাটির ন্যায় এক সারির স্থলে দুই সারি বীজ পাশাপাশি সমান্তরাল করে বপন করতে হয় (চিত্র ৬.৬)

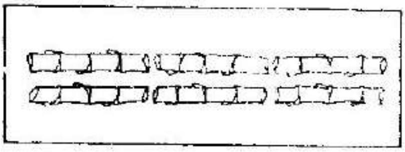

চিত্র ২.৬ সমান্তরাল পদ্ধতিতে আখের বীজ বপন

উপরে বর্ণিত যে পন্থাতেই বা পদ্ধতিতে বপন করা হোক না কেন তার প্রধান উদ্দেশ্য জমিতে যেন বীজের অঙ্কুরোদগম আশানুরূপ হয়। সেজন্য পদ্ধতিগত সুবিধা যতটুকুই থাকুক না কেন সব চাইতে বড় কথা এই যে নালার মাটিতে বীজ বপন করার পর বীজের চোখ যেন মাটি স্পর্শ করে থাকে। এইমত সঠিকভাবে বীজ লাগাবার পর ২/৩ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫–৭.৫০ সে: মি: মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে।

যদি বীজ বপনের পর দেখা যায় যে ১০/১৫ দিনের মধ্যেও অঙ্কুর বের হচ্ছে না তা হলে হাল্কা ধরনের সেচ দেওয়া ভালো।

আগাছা দমন ও মাটি আলগা করা (Weeding and mulching) : আখের জমিতে যথেষ্ট আগাছা জন্মে। সময়মতো তা নিধন করা প্রয়োজন। দুই তিনবার আগাছা পরিষ্কারের কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে। তৎসঙ্গে নালার মাটি নরম করে দিতে হয়। সেচ বা বৃষ্টির পর রৌদ্রে নালার মাটির উপরিভাগে শক্ত আবরণের সৃষ্টি হতে পারে। তাতে চারা গজানো ও তাহার বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে নিড়ানীর সাহায্যে সেই আবরণ ভেঙ্গে দিয়ে মাটি নরম করে দিতে হয়।

গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া (earthing up) : আখের গোড়ায় মাটি দেওয়া অত্যাবশ্যক। চারার উচ্চতা যখন ২–৩ ফুট অর্থাৎ ৬০–৯০ সে: মি: হয় তখনই প্রথমবারের মতো মাটি দিতে হয়। দুই সারির মাঝখানে যে মাটি জমা থাকে সেই মাটিই গোড়ায় দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। ইউরিয়া ও সরিষার খৈল প্রয়োগ করার পরেই গোড়ায় মাটি দেওয়ার কাজটি করতে হয়। আখের জমিতে সাথী ফসল থাকলে সেই ফসলটি উঠানোর পরই এই মাটি দেওয়ার কাজটি সমাধা করতে হয়। দ্বিতীয়বার গোড়ায় মাটি দিতে হয় আষাঢ়–শ্রাবণ মাসে। এই সময় শেষবারের মতো ইউরিয়া সারটুকু প্রয়োগ করতে হয়। শেষবারের মতো মাটি দেওয়ার ফলে আখের ক্ষেতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে দুই সারির মাঝখানে যেখানে মাটি উঁচু হয়েছিল সেইস্থলে নিচু নালার সৃষ্টি হয়েছে আর আখের গোড়ার জমি বেশ উঁচু হয়ে উঠেছে। বর্ষাকালীন পানি এই নালাপথে সহজেই নিষ্কাশিত হয় আর গাছের গোড়া শক্ত হওয়ার ফলে ঝড়-ঝাপটায় সহজে লুটিয়ে পড়ে না।

সেচ দেওয়া : আখ চাষীরা সাধারণত আখ ফসলে পানি সেচ করেন না। কিন্তু উত্তম ফলনের জন্য জমিতে সেচ দেওয়া অত্যাবশ্যক। আখ দীর্ঘস্থায়ী ফসল, প্রায় এক বৎসরকাল তা মাঠে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অন্তত দুটি সময়ে পানি ফসলটির জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়—প্রথমবার জমিতে বীজ বপন ও চারার প্রাথমিক বৃদ্ধিকালীন সময়ে এবং

দ্বিতীয়বার কার্তিক মাসে যখন বৃষ্টির অভাবে জমির রস দ্রুত কমতে থাকে। সুতরাং আখের ভালো ফলনের জন্য কমপক্ষে দুবার এবং প্রয়োজনবোধে ততোধিক সেচ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

রোগ ও কীট-পতঙ্গ দমন : আখে অনেক প্রকার রোগ ও পোকার আক্রমণ হয়। ভালো ফলন পেতে হলে সেই সমস্ত রোগ ও কীটপতঙ্গ সময়মতো দমন করতে হবে।

আমাদের দেশে আখের যে সমস্ত রোগ হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লালপচা রোগ (red-rot), স্মাট (Smut) এবং ধসা রোগ (wilt)। এক প্রকার ছাতার আক্রমণে আখে লালপচা রোগ দেখা দেয়। আক্রান্ত আখ লম্বালম্বি চিরিলে উহার ভিতরে লাল রং দেখা যায়। এই লাল রঙের মাঝে মাঝে আড়াআড়িভাবে সাদা দাগ দৃষ্ট হয়। আক্রমণের শেষের দিকে আখে সাদা বা মেটে রঙের ছাতা দেখা যায়। আখের ৩/৪ মাস বয়স হতে স্মাট রোগের আক্রমণ হতে পারে। আখের মাথা দিয়ে কাল বেতের মতো একটা জিনিস বাহির হয়। ফলে আখ আর বাড়তে পারে না এবং অকালে মারা যায়। ধসা রোগের আক্রমণে আখের নিচের কয়েকটি পাতা হলুদ হয়ে কয়েক দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে মারা যায়। চিরা আখের মধ্যে গিরার নিকট গাঢ় লাল রং দেখা যায়। আখ ফাপা হয়ে শুকিয়ে মারা যায়।

উপরোক্ত রোগে আখ আক্রান্ত হলে তখন সে-সমস্ত রোগ দমন করার আর কোনো উপায় থাকে না। কথায় আছে, "রোগ নিরাময় করার চাইতে প্রতিরোধ করাই ভালো চিকিৎসা।" আখের রোগের বেলায় এই কথাই খাটে। তাই লক্ষ্য রাখতে ও ব্যবস্থা নিতে হয় যাতে আখে ঐ সমস্ত রোগ প্রতিরোধ করা যায়। নিম্নোধৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উক্ত রোগসমূহ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে :

১. বপনের জন্য নীরোগ বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
২. জমিতে বপন করবার আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে।
৩. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন আখের জাত চাষ করতে হবে।
৪. দুই একটি গাছ আক্রান্ত দেখলেই তা উপড়িয়ে পুড়ে ফেলাতে হবে।
৫. আখ কাটবার পর মাঠের সমস্ত জঙ্গল ও আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
৬. রোগাক্রান্ত জমিতে মুড়ি আখের চাষ করা চলবে না।
৭. আক্রান্ত জমিতে ২/৩ বৎসরের মধ্যে আখের চাষ করা চলবে না।

প্রায় প্রতি বৎসর আখ সাদা মাজরা পোকা (top shoot borer), মাজরা পোকা (stem borer), উইপোকা (termites) ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে শতকরা ২০-৩০ ভাগ আখ পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়। সাদা মাজরা পোকার আক্রমণের ফলে আখের ডগার ২/৪টি পাতায় ঝাঝরির মতো ক্ষুদ্র ছিদ্র হয়। পরে গাছের আগার নিচের গিরা হতে পার্শ্ব শাখা বের হয়। এতে করে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মাজরা পোকার কীড়াগুলি গাছের কাণ্ডের ভিতরে ১ মিটার পর্যন্ত সুরঙ্গ করে ভিতরের নরম অংশ খেতে থাকে। কাণ্ডে জায়গায় জায়গায় ছিদ্র দেখা যায়। প্রত্যেক গিরা হতে পার্শ্ব শাখা বের হয় এবং শিকড় বের হয়ে কাণ্ডকে জালের মতো ঘিরে ফেলে। সামান্য বাতাসেই কাণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। ডায়াজিনন অথবা বাইড্রিন নামক কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করে উভয় জাতের মাজরা পোকা ধ্বংস করা যায়। লক্ষ করে ডিমের গাদাসহ গাছের পাতা উঠিয়েও আক্রমণের প্রকোপ যথেষ্ট কমানো যায়। আলোর ফাঁদের সাহায্যে ধরে ধ্বংস করলে আক্রমণের তীব্রতা কমে আসে। উইপোকা দুইভাবে আখের ক্ষতি করতে পারে। প্রথমত নালায় আখের টুকরা লাগাবার পর উইপোকা

সেগুলির অংশবিশেষ চোখসহ খেয়ে ফেলতে পারে, ফলে আর চারা গজাবার সম্ভাবনা থাকে না। দ্বিতীয়ত বর্ধিষ্ণু আখের গোড়া ক্রমান্বয়ে খেয়ে ফেলে এবং ভিতরে মাটি দিয়ে ভরে রাখে। ইহাতে আক্রান্ত গাছ আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে মারা যায়। প্রতি একরে ক্লোরডেন-৪০ নামক ঔষধ দুই সের পরিমাণ ৬$\frac{১}{৪}$ মণ পানিতে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় সিঞ্চন করলে উইপোকা ধ্বংস হয়ে যায় অথবা জমিতে চারা লাগাবার পূর্বে ভাওরের মাটিতে হেপ্টাক্লোর ৫% (প্রতি বিঘায় ৩-৫ কেজি হারে) ছিটায়ে দিলে উইপোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।[৭]

অন্যান্য পরিচর্যা : আখের জমি একটু নিচু বা অসমান হলে বর্ষার সময় ক্ষেতে পানি জমে যাবার সম্ভাবনা থাকে। নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করে বৃষ্টি অথবা সেচের অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে। নচেৎ আখের বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যাবে, নানা প্রকার রোগ দেখা দিবে এবং চিনি ও গুড়ের উৎপাদন কমে যাবে।

আখের ঝোপে অনেক দিন পর্যন্ত কুশি বের হয়। পরিপক্ক কুশির আখ কাটার সময় অল্প বয়স্ক অর্থাৎ অপরিপক্ক কুশির আখ এক সঙ্গে কেটে মাড়াই করলে তা হতে নিম্নমানের রস ও চিনি উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ২/৩ মাস পরে যে সমস্ত কুশি বের হয় সেগুলি কেটে ফেলা উচিত।

আখের গোড়ায় মাটি কম দেওয়া হয়ে থাকলে তা ঝড়-বন্যায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় গাছের পাতা দিয়ে এক সঙ্গে কয়েকটি আখ বেঁধে দিলে সেগুলির পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। মাঝে মাঝে আখ ক্ষেতে হাঁটাচলা করে দেখাতে হয় তাতে রোগে বা পোকার আক্রমণ হয়েছে কি না। হয়ে থাকলে তার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।

আখ কাটা : আখ পরিপক্ক না হলে কাটা উচিত নয়। অপরিপক্ক আখ কাটলে চিনি বা গুড় উৎপাদন কমে যায়। আখের উপরের দিকের অর্থাৎ ডগার পাতা যখন শুকাতে থাকে এবং কিছুটা ঢলে পড়ে তখন বুঝতে হবে আখ কাটার সময় হয়েছে। রিফ্রেক্টোমিটার (refractometer) নামক এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে মাঝে মাঝে আখের রসের চিনি পরীক্ষা করে নির্ধারণ করা যায় আখ পরিপক্ক হয়েছে কী-না।

বাংলাদেশে পৌষ- মাঘ মাস আখ কাটার প্রকৃষ্ট সময়। তবে জাতভেদে এর আগে ও পরে কাটা হয়। পরিপক্ক আখ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কেটে ফেলা উচিত। অন্যথায় চিনি ও গুড়ের উৎপাদন দারুণভাবে কমে যায়।

আখ কাটার পর দা বা কাস্তের সাহায্যে পাতা কাণ্ড হতে ছাড়িয়ে নিতে হয়। প্রতিটি ডগাও এই সঙ্গে কেটে নেয়া যায়। কোনো কোনো দেশে আখ কাটার আগে খেতে দণ্ডায়মান অবস্থায়ই পাতা পরিষ্কার করা হয় এবং আগা কেটে নেয়া হয়। তৎপর আখ গোড়া হতে কেটে নেয়া হয়।

ফলন : বাংলাদেশে আখের গড়পড়তা ফলন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম. প্রতি হেক্টরে মিল এলাকায় ৪৭.৩৭ টন এবং মিল বহির্ভূত এলাকার ৩২.২৭ টন। সেক্ষেত্রে কিউবা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আখের উৎপাদন ইহার ৪/৫ গুণ উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে আমাদের দেশেও আখের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। কখনো কখনো দেখা গিয়েছে প্রতি হেক্টর ৫০০০ মণ অর্থাৎ ১৮৫ টন আখ উৎপন্ন হয়।

মিলে চিনির উৎপাদনও আমাদের দেশে অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক, গড়ে মাত্র শতকরা ৭–৮ ভাগ। ভাবলে অবাক হতে হয় কিউবাতে এই রিকভারি (recovery percent) অর্থাৎ মিলে চিনির উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ।[৯]

মিল এলাকার বাইরে বাংলাদেশের নানা স্থানে আখ হতে গুড় প্রস্তুত হয়। সাধারণত ১০০ মণ আখ হতে ১০ মণ গুড় পাওয়া যায় ; অর্থাৎ আখ, গুড় ও চিনির অনুপাত ১০০ ঃ ১০ ঃ ৬।

বাংলাদেশে ক্ষেতে আখ ও মিলে চিনির উৎপাদন কেন এত কম এই নিয়ে অনেক চিন্তা–ভাবনা করা হয়েছে। যে সকল কারণ ইহার জন্য দায়ী তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল আখের জাতের অভাব, সাধারণভাবে আখের চাষ এবং মিলে আখ পৌছানোর আগে ও পরে তা বেশি পরিমাণে শুকিয়ে যাওয়া। কোনো দেশেই কোনো একটি ভালো জাতের আখ অনেক দিন পর্যন্ত টিকে থাকে না। তাই আখ জাত চাযে উন্নত ও সতর্ক দেশ কয়েক বৎসর পর পর নতুন দুই চারিটি অধিক উৎপাদনক্ষম আখের চাষীদের কাছে উপস্থিত রাখেন। আমাদের দেশে ঈশ্বরদীতে অবস্থিত আখ গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছে, তবে তাহাদের এই মহতী প্রচেষ্টা আরো জোরদার হওয়া উচিত। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে আখ উৎপাদনের হার অন্যান্য উন্নত দেশের উৎপাদন হারের সমকক্ষ হবে না। তার প্রধান কারণ আমাদের দেশে ঐ সমস্ত দেশের তুলনায় অল্প সময় অর্থাৎ ৮–১০ মাসের মধ্যে আখ কাটা হয় যেক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মতো অঞ্চলে ২ বৎসর কাল পর্যন্তও আখ মাঠে জন্মানোর পর কাটা হয়।[৬,৭] তবে আসল কথা এই উন্নত জাত উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে ও মিল কর্তৃপক্ষ আখ সতেজ অবস্থায় চাষীদের কাছ হতে গ্রহণ করলে আমাদের দেশে ক্ষেতে আখ ও মিলে চিনির উৎপাদন নিশ্চয়ই যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

মুড়ি আখের চাষ (ratooning in sugarcane) : আখ কাটার পর গোড়া হতে নতুন চারা বা কুশি বের হওয়ায় পুনরায় যে ফসল পাওয়া যায় তাকে মুড়ি আখ (ratoon) বলে মুড়ি আখ এইভাবে পর পর কয়েকবার হতে পারে। তবে বার দুয়েকের পর আর মুড়ি আখের চাষ না করাই ভালো, কারণ তাতে লাভ এমন কিছু হয় না বরং জমিতে আগাছা, কীটপতঙ্গ ও রোগজীবাণুতে ভরে যায়। পরবর্তী নতুন আখ ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ফসলের জন্য এই অবস্থা খুব শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম মুড়ি আখের চাষ নিঃসন্দেহে লাভজনক, কারণ ইহাতে তেমন কিছু খরচ নেই। অথচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফসলটি প্রায় প্রধান ফসলের মতো হয়। মুড়ি আখ চাষে বীজ বপন ও বীজের কোনো খরচ নেই। এমনকি দুই একটি সেচও কম লাগে এবং সারও কম পরিমাণে ব্যবহার করলে চলে।

প্রধান ফসল কাটার পর মরা ও শুকনা পাতা এবং অন্যান্য আবর্জনা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হয়। ইহাতে জঙ্গল পরিষ্কার হয়, কীটপতঙ্গ ও রোগজীবাণু মারা যায় এবং জমিতে পটাশ সারের সৃষ্টি হয়। তৎপর এক পশলা বৃষ্টি অথবা একটি হাল্কা সেচের পর মুথা আখের গোড়া ও দুই সারির মধ্যবর্তী জমি কুপিয়ে আলগা করে দিতে হয়। লাঙ্গলের সাহায্যেও দুই সারির মধ্যবর্তী জমি চাষ করে দেওয়া হয়। এই সময় জমিতে প্রতি একরে

১০০ মণ অর্থাৎ হেক্টরে ৯-১০ টন গোবর প্রয়োগ করতে হবে। আখের চারা যখন ১½ হতে ২ ফুট অর্থাৎ ৪৫-৬০ সে: মি: উঁচু হয় তখন প্রতি হেক্টরে ৫০০ কেজি সরিষার খৈল গোড়ায় দিলে ভালো হয়। গাছ যখন ১ মিটারের মতো উঁচু হয় তখন হেক্টর প্রতি ১০৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগের পর গাছের গোড়ার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। খরার সময় প্রতি মাসে অন্তত একবার করে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য যত্নাদি প্রথম আখ ফসলটির মতো করতে হবে, বিশেষ করে কীটপতঙ্গ ও রোগ নিরোধ করার দিকে খুব সতর্ক থাকতে হবে কারণ মুড়ি আখে এই দুইটি বালাই'র প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে।

প্রথম মুড়ি আখের ফসলটি আশানুরূপ হলে দ্বিতীয়বার তা করা যেতে পারে। কিন্তু তার পর আর নয়, কেননা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মুড়ি আখ চাষে বিপদের সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে।

খেজুর ও তাল

বাংলাদেশে শর্করা বা চিনি উৎপাদনকারী শস্যের মধ্যে আখের পরেই খেজুরের স্থান। তৎপর আসে তালের কথা, তবে ইহা হতে যেসব পাওয়া যায় তার প্রায় সবটাই 'তাড়ি' নামে দেশীয় এক প্রকার নেশাকর পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কেবল সামান্য কিছু পরিমাণ রস দ্বারা চিনি তথা তালমিশ্রী প্রস্তুত করা হয়।

আমাদের দেশের খেজুর গাছ প্রকৃতপক্ষে বন্য জাতের। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Phoenix sylvestris : Palmaceae পরিবারভুক্ত একটি দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ। উল্লেখ্য যে প্রকৃত খেজুর জন্মে মরুভূমির বিভিন্ন দেশে, যেমন–ইরাক, সাউদী আরব, সিরিয়া, লিবিয়া ইত্যাদিতে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গ রাজ্যেও ভালো জাতের খেজুর জন্মে। তবে আমাদের দেশের খেজুর গাছে ভক্ষণপোযোগী সুমিষ্ট খেজুর ফল না ধরলেও সেই গাছ হতে যথেষ্ট পরিমাণে সুমিষ্ট রস উৎপন্ন হয় আর তা থেকে যে গুড় প্রস্তুত হয় তা খুবই জনপ্রিয়। স্বাদে ও গন্ধে আখের গুড়ের চেয়ে তাহা অত্যন্ত উচ্চস্থানীয়। পৃথিবীতে আর একটি দেশ ভারতবর্ষ, যেখানে এই জাতের খেজুর গাছ জন্মে। জানা গিয়েছে সেই দেশে ৬০০০০ হাজার একর অর্থাৎ ২৪২৯২ হেক্টর জমিতে খেজুর গাছ রয়েছে।[৩]

১৯৮১-৮২ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে ২৬৬১৫ একর অর্থাৎ ১০৭৬৭ হেকটর জমিতে খেজুর গাছ জন্মে আর তা হতে উৎপন্ন হয় ৩৭৮৬৮৮ মে. টন খেজুর রস।[২]

দেশের সর্বত্রই দুই চারিটি খেজুর গাছ দেখা গেলেও যশোহর জেলায় সব চাইতে বেশি খেজুর গাছ দেখা যায় ; মাঠ-ঘাটের দিকে তাকালেই এলোপাতাড়ি বহু গাছ চোখে পড়ে। খেজুর উৎপাদনকারী অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জেলাগুলি হলো কুষ্টিয়া, রাজশাহী, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও কুমিল্লা।

চাষাবাদ পদ্ধতি

বাংলাদেশে খেজুর নারিকেল, সুপারি প্রভৃতির ন্যায় যত্ন করে চাষ করা হয় না। ইহা মাঠের যেখানে খুশি সেখানেই জন্মাতে দেখা যায়, তবে খেতের আইলেই গাছ বেশি দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে খেজুরের বীজ আপনা হতেই যেখানে পড়ে জন্মায় সেখানেই গাছ রেখে দেওয়া

হয়। ইহাতে একদিকে যেমন খেজুর গাছ ভালো হয় না অপরদিকে তেমনি ফসলি জমিতে ধান, গম, ডাল প্রভৃতি ফসল চাষে বিঘ্ন ঘটে এবং সেগুলিরও ফলন কম হয়।

সারণি ২৭ : বাংলাদেশে ১৯৮২–৮৩ সালে খেজুরের আবাদি জমির পরিমাণ ও রস উৎপাদন

জেলার নাম	মোট জমির পরিমাণ (হেক্টরে)	মোট রস উৎপাদন (মে. টনে)
যশোহর	৪১৫৬	১৪৩২০৯
খুলনা	১৮৫০	৮১৭৮৫
ফরিদপুর	১৬২০	৩৭২১৬
বরিশাল	৯৭২	১৮৯৯৪
কুষ্টিয়া	৪৪৫	৯০৭৪
পটুয়াখালী	৩৯১	৭৮২৩
রাজশাহী	৩৯৩	২৪৩৪৫
নোয়াখালী	৩৬০	৪৮৮৮
ঢাকা	২৭৩	১৪৯৪৬
বগুড়া	১৫৮	৬০৪৯
চট্টগ্রাম	১৩৮	১০৪২৩
কুমিল্লা	১০৩	৬৯৬১
পাবনা	৮১	৪৬১১
রংপুর	৫৭	২৮০৯
দিনাজপুর	৫৩	২১২৫
টাঙ্গাইল	৩২	৮৫৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২৪	৪২৮
ময়মনসিংহ	২৪	৯২০
জামালপুর	২০	৩৯৪
কিশোরগঞ্জ	১৮	৫৪৬
সিলেট	১২	২৯৫
বাংলাদেশে	১০৭৬৭	৩৭৮৬৮৮

উৎস : কৃষিকথা –গ্রামীণ অর্থনীতিতে খেজুরের গুড়, ১৩৯০ বা

এই দেশে খেজুরের উন্নত চাষাবাদ সম্বন্ধে কোনো গবেষণামূলক কাজ হয় নি। তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে চাষ করলে ভালো খেজুর গাছ জন্মাবে এবং অন্য ফসলের উৎপাদনও ব্যহত হবে না।

১. নারিকেল, সুপারির মতো বাগান করে এককভাবে চাষ করলে লাভবান হওয়া যাবে। বড় বাগান না করে ছোট বাগান করলেই ভালো হবে। এভাবে নারিকেলের মতো চাষ করলে ১৫–২০ ফুট অর্থাৎ ৫–৬ মিটার ব্যবধানে বর্গাকার নিয়মে গাছ জন্মান যেতে পারে।

২. এই রকম এককভাবে খেজুর বাগান না করলে শুধু ক্ষেতের আইল বরাবর খেজুরের চাষ করা যেতে পারে। তবে সচরাচর দৃষ্ট অতি ঘনভাবে জন্মান গাছের মতো করে যেন গাছ লাগান না হয়, এক গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব হবে ১৫–২০ ফুট অর্থাৎ ৫–৬ মিটার। যদি লক্ষ্য করলে দেখা যায় খেতের মাঝখানে কোনো চারা স্বাভাবিকভাবে জন্মিয়েছে তা হলে উহা সমূলে উৎপাটন করে ফেলে দিতে হবে।

৩. জমির আইলে ৫–৬ মিটার দূরে গর্ত করে প্রতি গর্তে ১০–১২ সের পচা গোবর ও এক পোয়া করে টি. এস. পি এবং মিউরেট অব পটাশ এবং পরিমাণমতো মাটি দ্বারা ভর্তি করতে হবে। তৎপর এপ্রিল–জুন মাসের মধ্যে প্রতি গর্তের মাটি ভালোভাবে কুপিয়ে মিশ্রিত করে দিয়ে তাতে দুই তিনটি করে বীজ বপন করতে হবে। খেজুরের বীজ অঙ্কুরিত হতে অনেক সময় লাগে। সময়ান্তরে প্রতি গর্তে একটির বেশি চারা দেখা যায় তাহলে কেবল একটি রেখে অন্যগুলি মূলসহ উঠিয়ে ফেলে দিতে হবে।

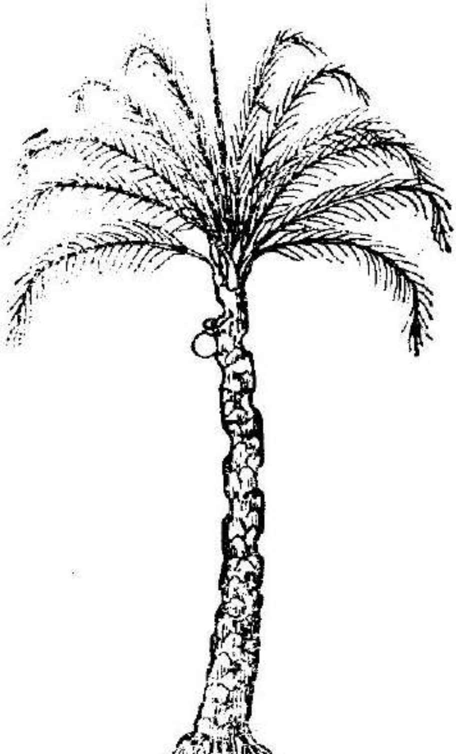

চিত্র : ৬.৭ খেজুর গাছ হতে রস সংগ্রহ

খেজুর গাছে আর কোনো যত্ন বা পরিচর্যার প্রয়োজন নেই। গাছের পাতা অত্যন্ত সূচালো বলে গবাদিপশু বা অন্য কোনো জীব তা নষ্ট করতে পারে না ; রোগবালাই বা কোনো পোকার আক্রমণও গাছে দেখা যায় না।

৪. গাছের বয়স ৫/৬ বৎসর হলে রস সংগ্রহের জন্য গাছ কাটা যায়। কোনো কোনো সময় দেখা যায় অতি ছোট অর্থাৎ ৩ বৎসর বয়সের গাছও রস সংগ্রহের জন্য কাটা হয়। এরূপ কাজ অত্যন্ত ক্ষতিজনক ; কারণ তাতে রস তেমন কিছু পাওয়া যায় না, তদুপরি ভবিষ্যতে সুস্থসবল গাছকে অত্যন্ত দুর্বল করে দেওয়া হয় এবং সেই গাছ হতে ভালো রস পাওয়ার আর আশা করা যায় না।

রসের জন্য খেজুর গাছ কাটার কাজটি বেশ কৌশল ও দক্ষতাপূর্ণ। সকল গেছুয়াই গাছ কাটায় সমান দক্ষ নয়। তাই দক্ষ গেছুয়া দ্বারা কাটান গাছ হতে ভালো রস পাওয়া যায় এবং গাছের স্বাস্থ্যও বজায় থাকে। অন্যথায় গাছ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায় এবং গাছ কয়েক বৎসরের মধ্যে মারা যেতে পারে।

একজন দক্ষ কর্মী একটি অত্যন্ত ধারাল হাসুয়ার সাহায্যে গাছের আগার দিকে কিছু ডাঁট কেটে ফেলে দিয়ে নরম অংশে একটি খাচ কাটে। এই কাজ একদিনে করা হয় না, আস্তে আস্তে ২/৩ সপ্তাহে করা হয়। শীতের আগমনে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝিতে খাচ পরিষ্কার করে কেটে নিলে একদিন দেখা যাবে রস ফোটায় ফোটায় পড়া শুরু হয়েছে। সেই সময় খাচের শেষ প্রান্তে একটি বাঁশের চুঙ্গি লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তার শেষ প্রান্তে একটি মাটির হাড়ি বিকেলের দিক ঝুলিয়ে দেওয়া হয় (চিত্র ৬.৭)।

পরের দিন খুব ভোরে রসের হাড়ি নামিয়ে আনা হয়। আবার বিকেলে হাসুয়ার সাহায্যে খাচ খুব পাতলা করে কেটে দিয়া রসের হাড়ি পুনরায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে দুই তিন দিন রস নেওয়ার পর গাছ কাটার পরবর্তী তিন চার দিনের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। তারপর আবার পূর্বের নিয়মে রস সংগ্রহ শুরু করা হয়। এভাবে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রস সংগ্রহ করা যায়। গরম পড়ে গেলে আর রস পাওয়া যায় না।

এক হেক্টরের ৩০০–৫০০টি গাছ এক মৌসুমে ১৮৭০০০–৩৭৪০০০ কেজি রস পাওয়া যেতে পারে, যার সাহায্যে ৫৬০–১২২০ কেজি গুড় প্রস্তুত হতে পারে। এই হিসাবে একটি গাছ হতে এক মৌসুমে ৭৫–১৫০ কেজি রস তথা ৯.৩–১১.২ কেজি গুড় পাওয়া যায়। কোনো কোনো সময় গাছ প্রতি আধা মণ অর্থাৎ ১৯ কেজি পর্যন্ত গুড় পাওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশে খেজুর চাষের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশে আখ হতে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তা দিয়ে কেবল বিরাট চাহিদার সামান্য অংশই মিটানো হয়ে থাকে। ইহাতে কেবল শহরের জনগণই যা কিছু চিনি পায়, গ্রামের লোকজন প্রকৃতপক্ষে চিনি পায় না বললেই চলে। আখ হতে যে গুড় উৎপন্ন হয় তাই গ্রামবাসীরা প্রধানত চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করে থাকে। দেশের আখের গুড়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে আবার চিনির উৎপাদন কমে যায়। সেজন্য দেশে গুড় উৎপাদনের উপরও অনেক সময় বিধি-নিষেধ জারি করা হয়। ইহাতে লাভ তেমন কিছু হয় না। দেশের সীমিত পরিমাণ

আখের জমি হতে চিনির উৎপাদন তেমন কিছু বৃদ্ধি করা যায় না। অদূর ভবিষ্যতে আখের জমির পরিমাণ যে বাড়ান যাবে সে সম্ভাবনাও খুব কম। কারণ দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের চাষীরা বৎসরে একই জমিতে যেখানে ২/৩ তিনটি ফসল জন্মিয়ে অধিক লাভবান হতে পারে, সেক্ষেত্রে তারা বৎসরে একটি ফসল আখ উৎপাদন করতে ইচ্ছুক হবে না।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে অধিক হারে খেজুরের গুড়ের উৎপাদন এই সমস্যার সমাধান দিতে পারবে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়। খেজুর এমনই একটি শর্করা উৎপাদনকারী শস্য যা অন্য ফসলী জমির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না এবং এক একটি গাছ খুব সামান্য জায়গাই দখল করে। তাই খেজুর গাছ খেতের আইলে, রাস্তার দুই পার্শ্বে, বসতবাটীর চারপাশের সঙ্কীর্ণ স্থানেও জন্মাতে দেখা যায়। ভালোলাদেশে এই রকম স্থানের অভাব নেই।

এক হিসাবে[২] দেখা গিয়েছে দেশে জনপথ আছে ২৫৫৪ মাইল বা ৪১০৯ মি: মি: কাঁচা রাস্তা (ইট বিছানো) আছে ১৭০০ মাইল বা ২৩৩৫ কি: মি: মিটার গেজ রেলপথ ১১৮৭ মাইল বা ১৯১০ কি: মি: এবং ব্রড গেজ রেলপথ ৬০০ মাইল বা ৯৬৬ কি: মি:। ইহা ছাড়া নিয়মিত বাঁধ আছে ৩০৭৫ মাইল বা ৪৯৪৮ মি: মি: এবং বেড়ী বাঁধ আছে ৭৭২০ মাইল বা ১২৪১ কি: মি:। ভালোলাদেশে এরূপ অব্যবহৃত জমির মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১০২৮৫৬ মাইল বা ১৬৫৪৯৫ কি: মি:। এই বিস্তীর্ণ এলাকার জমির দুই ধারে ১৫ ফুট (৪.৫৭ মি:) দূরে দূরে একটি করে খেজুর গাছ লাগালে তাতে মোট খেজুর গাছের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ (সাত) শত কোটি। এই গাছগুলির মধ্যে যদি প্রতি বৎসর দুই–তৃতীয়াংশ গাছ হতে রস পাওয়া যায় তা হলে গাছ প্রতি আধ মণ গুড় হিসেবে মোট পৌণে তিন কোটি মণ গুড় উৎপন্ন হবে আর এই পরিমাণ গুড় বিক্রি করে পাওয়া যাবে মোট ৮২৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের জমিতে যে অসংখ্য আইল রয়েছে সেকথা আমরা ভালোভাবেই জানি। প্রায়শ এই কথা বলা হয়ে থাকে যে এই অসংখ্য আইলের জন্য যে পরিমাণ ফসলী জমি নষ্ট হয়েছে তার পরিমাণ বগুড়া জেলার আয়তনে অর্থাৎ ৯ লক্ষ ৫১ হাজার একর পরিমাণ। দেশের সর্বত্র খেজুরের চাষ সম্ভবপর নয় এবং এই পরিমাণ জমির অর্ধেক ভাগে খেজুর গাছ লাগান যাবে বলে যদি ধরা যায় তা হলেও মোট খেজুর গাছের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ কোটি। অধিকন্তু বন বিভাগের এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশে ৮০০০ কোটি খেজুর গাছ লাগান যেতে পারে। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ গাছ হতেও যদি রস পাওয়া যায় তাহা হইলে বৎসরে ২৫০০ কোটি মণ গুড় উৎপাদিত হতে পারে যার বিক্রয় মূল্য দাঁড়ায় ৭৫ লক্ষ কোটি টাকা।

অতি অনাদরে অবহেলায় যে খেজুর আমাদের দেশে চাষ করা হয় তার মধ্যে যে এমনি বিরাট 'সম্ভাবনা' লুক্কায়িত আছে তাহা হয়ত অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন না। কিন্তু এখন স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়, খেজুর বাস্তবিকই একটি অনন্যসাধারণ ফসল যার মাধ্যমে দেশে এক বিরাট অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হতে পারে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সঠিক বাস্তবায়নের মধ্যেই ইহার কৃতকার্যতা নির্ভর করে। খেজুর গাছ ৪/৫ বৎসর বয়সেই রস দিতে শুরু করে বলে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেই ইহার ফল লাভ করা যায়। সুতরাং কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আওতায় সরকার দেশে খেজুর চাষে এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেন।

দেশে খেজুর চাষের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার আরো একটি বিরাট সুযোগ এই যে ফসলটির চাষে অন্যান্য ফল বা ফসলাদির তুলনায় খরচ অত্যন্ত কম, কারণ ইহার চাষে জমিতে আলাদাভাবে সার পানি কিছুই ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

প্রধান ফসল চাষে যে সার পানি ব্যবহার করা হয় তা হতে খেজুর নিজের ভাগ সংগ্রহ করে নেয়। তাই খেজুরকে কেউ কেউ 'o input crop' নামে অভিহিত করে থাকেন। ইহার চাষে যাহা প্রয়োজন তাহা হলো কেবল জমি খানিকটা খুড়ে তাতে বীজ বা চারা রোপণ করা। তৎপর আর কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন নেই। এমনকি রোগ বা কীটপতঙ্গের কথাও ভাবতে হয় না। জানামতে খেজুর গাছ এদেশে কোনো রোগ বা পোকায় আক্রান্ত হতে দেখা যায় না।

এক্ষণে উপর্যুক্ত আলোচনা হতে ইহা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে বাংলাদেশে খেজুরের চাষ বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এখন প্রয়োজন শুধু সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন। দুঃখের কথা এই যে আজ পর্যন্ত এমন একটি সম্ভাবনাময় ফসলের চাষবৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক কোনো পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয় নি। তবে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এই বিষয়ে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করছেন বলে ধরা যায়। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অর্ধশতাধিক উদ্যান খামার ও নার্সারিতে অন্যান্য ফসলের চারা উৎপাদনের সাথে সাথে খেজুরের চারাও উৎপাদন করা হচ্ছে, যাহাতে উদ্যোগী চাষীদের মধ্যে সেই চারা সহজেই বিতরণ করা যায়।

তাল

খেজুরের তুলনায় তাল গাছের সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক কম। যেখানে খেজুরের আবাদি এলাকা ১০৭৬৭ হেক্টর সেখানে তালের এলাকা মাত্র ২০২৪ হেক্টর। বাংলাদেশের মতো ভারত, শ্রীলঙ্কা ও আফ্রিকার অনেক দেশে তাল গাছ জন্মাতে দেখা যায়।

খেজুরের মতো তাল গাছও এলোপাতাড়িভাবে জন্মে। তবে খেজুরের তুলনায় তালের বীজ অনেক বড় বলে ইহা আপনা আপনি ততটা জন্মিতে পারে না। সুতরাং মাঠের এখানে-সেখানে খেজুর গাছের ন্যায় তাল গাছ দৃষ্ট হয় না ; বাড়ির ভিটার আশেপাশে ও মাঠের উঁচু স্থানে তাল গাছ দেখা যায়।

তাল গাছের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা লাগানোর অনেক দিন পর অর্থাৎ ১২/১৩ বৎসর পর ফল ধরে, সেইজন্য তাল গাছ লাগাতে অনেকেই উৎসাহ বোধ করে না। ফাল্গুন হতে বৈশাখ মাসের মধ্যে তাল গাছ পুষ্পমঞ্জুরী দেখা দেয়। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ তাল গাছের ফুলের ছড়াতে টেপিং (taping) করে রস সংগ্রহ করা হয়। ছোট ছোট হাড়ি বা মালা বেশ কয়েকটি এক সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে রস ধরা হয়। মৌসুমে প্রতিটি গাছ হতে ৫০ গ্যালন বা ১৮৯ লিটার রস পাওয়া যেতে পারে। স্ত্রী গাছের ফুলের ডাট হতেও রস আহরণ করা যায়, তবে তাতে গাছে কোনো ফল ধরে না। সেইহেতু স্ত্রী গাছে সাধারণত টেপিং করা হয় না। বাজারে কচি তাল ফলের শাঁসের বেশ চাহিদা ; পাকা তালের চাহিদাও তদ্রূপ। পাকা তালের সুমিষ্ট ঘন রসের দ্বারা চালের আটা সহযোগে তৈরি তালের পিঠা সুঘ্রাণযুক্ত ও উপাদেয়।

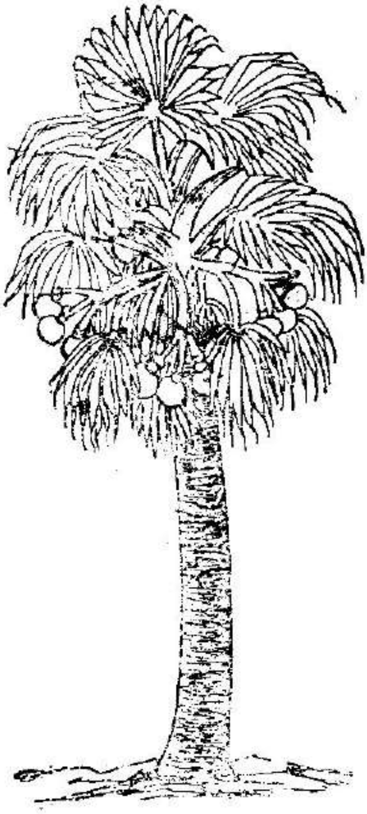

চিত্র : ৬.৮ পুরুষ তাল গাছ হতে রস সংগ্রহ

মার্চ হতে মে মাস পর্যন্ত তাল গাছের রস সংগ্রহ করা যায়। একটি তাল গাছ হতে মৌসুমে ৫–১০ মণ রস পাওয়া যায়। এই হিসেবে একটি তাল গাছের রসের ফলন একটি খেজুর গাছের রসের ফলন হতে প্রায় তিন গুণ বেশি।

অবাঞ্ছিত হলেও তালের রসের অধিকাংশ ভাগই 'তাড়ি' নামক এক প্রকার নেশাকর পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই তাড়ি পানকারীদের মধ্যে অনেকেই নেশাগ্রস্ত হয়ে মাতলামি করে। অথচ এই তালের রস হতে গুড় ও মিশ্রী উৎপাদন করা যায়। তালের গুড় খেজুরের গুড়ের মতো ভালো না হইলেও দানাবাঁধা চিনি যাহা বাজারে 'তাল মিশ্রী' নামে পরিচিত তা বেশ দামি। আয়ুর্বেদী হতে তাল মিশ্রী শিশুদের সর্দি–কাশি নিরাময়ে অতীব উপকারী।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কৃষিতথ্য সংস্থা : কৃষিকথা : আখের চাষ। কৃষি কমপ্লেক্স, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

২. কৃষিতথ্য সংস্থা : কৃষিকথা (মাঘ, ১৩৯০) : গ্রামীণ অর্থনীতিতে খেজুর গুড়। কৃষি কমপ্লেক্স, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

৩. Ahmad, K. U. : Bangladesh Agriculture and Field Crops. 1980. Publisher : Mrs. Mumtaj Kamal. Bunglow No. 2. Farmgate. Dhaka. pp. 112-35.

৪. Alim. A : An Introduction to Bangladesh Agriculture. 1978. Published by the Suptd. at the Govt. Press.127.

৫. B. B. S : The Yearbook of Statistics, 1995.

৬. Martin . J. H and Leonard, W. H. : Principles of Field Crop Production. 1967. 2nd. Edn. The Macmilan Co. N. Y. pp. 376--77.

৭. Maniruzzaman. F. M. Plant Protection in Bangladesh. 1981. Ist. Edn. Published by F. M. Fazlul Haque. Daud Kandi Comilla.

৮. Ministry of Agriculture: Development Statistics of Bangladesh Agriculture. Series No 6. Dec. 1981.

৯. Rosenfeld, A. H : Sugarcane around the World. University of Chicago Press.N. Y. pp. 16-20.

১০. Seed Certification Agency : Approved Crops Varieties.

সপ্তম অধ্যায়
মসলা জাতীয় শস্য
SPICES & CONDIMENTS

খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করার জন্য রন্ধনকার্যে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে মসলা বলা হয়। তারকারি বা ব্যঞ্জন রঙ্গীন করার জন্যও মসলা ব্যবহৃত হয়। নানারূপ আচার ও চাটনি প্রস্তুতে কোনো কোনো মসলার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কোনো কোনো মসলা, যেমন—আদা, রসুন ঔষধরূপেও ব্যবহার করা হয়।

মসলার ব্যবহার কম-বেশি সারা বিশ্বেই দেখা যায়। সুগন্ধিযুক্ত মসলা, যেমন— এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ ইত্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আগের দিনে আরব ও ইউরোপীয় বণিকেরা পালতোলা জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিত। কোনো কোনো শক্তিশালী দেশ মসলা উৎপাদনকারী দেশগুলিকে কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টাও করত।

মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, ধনিয়া, জিরা, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ প্রভৃতি মসলাজাতীয় ফসল। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সুগন্ধিযুক্ত মসলা উৎপন্ন হয়। মরিচ, রসুন, পেঁয়াজ, আদা, হলুদ সম্বন্ধেই কেবল এ পুস্তকে আলোচনা করা হবে।

মরিচ

মরিচ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে ইহা একটি অন্যতম প্রধান মসলাজাতীয় অর্থকরী ফসল। শহর-বাংলার চাইতে গ্রাম-বাংলার লোকেরাই অধিক পরিমাণে মরিচ খেয়ে থাকে। নানা রকম ব্যঞ্জন ঝাল করার জন্যই মরিচ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মরিচে 'কেপ্সেইসিন' (Capsaicin) নামক এক প্রকার উপাদানই ঝালের জন্য দায়ী। মরিচের এই ঝাল খাওয়া সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ রয়েছে। ডাক্তারী মতে বলা হয়, যারা অধিক পরিমাণে মরিচের ঝাল খেয়ে থাকে তারা নানাবিধ পেটের পীড়ায় ভুগে থাকে। আবার দেখা যায় অধিক মরিচ খেয়েও কোনো কোনো দেশের লোকের তেমন কোনো অসুবিধা হয় না, বরং উপকার হয় বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়। আয়ারের[১০] বিবরণীতে দেখা যায় ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের লোকেরা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ঝাল মরিচ খেয়ে থাকে— তাতে তাদের স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং তারা বেশ শক্তি-সামর্থ লোক। ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া মায়ানমার, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশের লোকেরাও যথেষ্ট পরিমাণে ঝাল মরিচ খেয়ে থাকে।[৬] আসলে ইহা একটি অভ্যাসের কথা, তাছাড়া অন্যান্য মসলার সঙ্গে মিশ্রণে মরিচের ঝালের ক্ষতিকর ক্রিয়ার প্রভাব অনেকটা কমে যায়। তবে মরিচ বিশ্লেষণে

দেখা গিয়েছে ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষাকারী অনেক খাদ্যোপাদন, যেমন—প্রোটিন, স্নেহ, শর্করা, খনিজ ও ভিটামিন বর্তমান রয়েছে এবং কোনো কোনোটির উপাদান, যেমন—প্রোটিন ও ভিটামিনের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় (সারণি-২৮)[৬]

সারণি-২৮ : মরিচে বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের পরিমাণ

খাদ্যোপাদানের নাম	শতকরা হার	
	কাঁচা মরিচ	শুকনা মরিচ
জলীয় অংশ	৮২.৬০	১০.০০
প্রোটিন	২.৯০	১৫.৯০
স্নেহ	০.৬০	৬.২০
শর্করা	৬.১০	৩১.৬০
আঁশজাতীয় অংশ	৬.৮০	৩০.২০
খনিজ অংশ	১.০০	৬.১০
ক্যালসিয়াম	০.০৩	০.১৬
ফস্‌ফরাস	০.০৮	০.৩৭
লৌহ	০.০০১	০.০০২৩
(ভিটামিন)	প্রতি ১০০ গ্রামে	
'সি'	১১১ মি: গ্রা:	৫০ মি: গ্রা:
'এ'	৪৫৪ ই: ইউ:	৫৭৬ ই: ইউ:
'ই'	--	২.৪০ মি: গ্রা:

উৎস : কামাল উদ্দীন, আ. স. ম, : সবজির চাষ, ১৩৭৩ বাং

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

পণ্ডিতগণ সবাই একমত যে মরিচের আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা। কেউ আরো সঠিকভাবে বলেছে মরিচ প্রথমে ব্রাজিলে উৎপত্তি লাভ করে।[৬,১০] আবার কারো কারো মতে ইহার উৎপত্তিস্থলে পেরু।[১] কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পর মরিচ প্রথমে স্পেন দেশে আনীত হয়। সেখান হতে তা আস্তে আস্তে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তৎপর আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে মরিচের চাষ বিস্তার লাভ করে।

আজকার পৃথিবীর প্রায় সব নিরক্ষীয় ও অবঃনিরক্ষীয় অঞ্চলে মরিচের চাষ হয়। তবে মরিচ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য দেশ হচ্ছে পূর্ব আফ্রিকা, জাঞ্জিবার, স্পেন, ইন্দোচীন, চীন, মায়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউজার্সি, টেক্সাস প্রভৃতি অঙ্গরাজ্য।

বাংলাদেশে প্রধানত ঝাল মরিচ উৎপন্ন হয়। মিষ্টি মরিচ কালেভদ্রে সরকারি খামারে কিছু কিছু উৎপন্ন হয় এবং শহরের লোকেরাই কেবল তা খেয়ে থাকে। মরিচ উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। তবে এদেশের মরিচ উন্নতমানের বলে বিদেশে ইহার চাহিদা আছে। তাই কোনো কোনো বৎসর মরিচ রপ্তানি করা হয়, আবার কিছু পরিমাণ আমদানিও করা হয়। এই আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে দেশে মরিচের সরবরাহের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। বাংলাদেশের ১৯৯৩-৯৪ সালে ৬৮০০০ হেক্টরে মরিচের চাষ হয় আর সে

পরিমাণ জমিতে উৎপন্ন হয় ৫৩০০০ টন মরিচ। বর্ষা ও শীত এই দুই সময়ে অধিকাংশ মরিচের চাষ করা হয়। অনেকের ধারণা দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলা, যেমন— রংপুর, বগুড়া প্রভৃতিতেই বেশি পরিমাণে মরিচ উৎপন্ন হয়, আসলে এই ধারণা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলা যেমন— বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর প্রভৃতিতে যথেষ্ট মরিচের চাষ হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশের কোনো জেলায় কি পরিমাণ মরিচের চাষ হয় তার একটি খতিয়ান সারণি-২৮-এ দেখান হলো।

মাটি ও জলবায়ু

মরিচ বেলে, দোঁয়াশ ও এঁটেল-দোঁয়াশ প্রায় সকল রকম মাটিতেই চাষ করা যায় যদি তা সুনিষ্কাশনযুক্ত হয়, তবে বেলে-দোঁয়াশ ও দোঁয়াশ মাটি সব চাইতে উপযোগী। বর্ষাতি অর্থাৎ ভাদুই মরিচের জমি এমন উঁচু হওয়া দরকার যেখানে বর্ষার পানি ক্ষেতে একটুও না জমে, কারণ মরিচ এমনই একটি ফসল যা জলবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। মাটি বেশি মাত্রায় অম্লাত্মক হলে মরিচ ভালো হয় না। এমন জমিতে মরিচ জন্মাতে চাইলে তাতে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি ২৮ : বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মরিচের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

জেলা নাম	জমির পরিমাণ (হেক্টরে)	উৎপাদন (মে: টনে)
ঢাকা	১৬০	১৭০
নারায়ণগঞ্জ	৫০০	৫৫০
নরসিংদি	৩৫০	৩৫০
গাজীপুর	২৫০	৩০০
মানিকগঞ্জ	৩২৭	১০৫০
মুন্সীগঞ্জ	১৩১৭	৪৫০০
টাঙ্গাইল	১০০০	৭০০
ময়মনসিংহ	১৫০০	৪৯৯০০
জামালপুর	--	--
শেরপুর	৫৫০	৮৫০
নেত্রকোণা	৩৫০	৪৫০
কিশোরগঞ্জ	১০০০	১৩০০
কুমিল্লা	৩২৫০	৪১০০
বি. বাড়িয়া	২০০০	২২২০
চাঁদপুর	৩১৫০	৩৩৫০
সিলেট	১৫০	১৫০

BANSDOC Library
Accession No. 17926

মৌঃবাজার	৮৫	৪৩০
হবিগঞ্জ	২০০	১৪০
সুনামগঞ্জ	৯০০	১৩৫০
চট্টগ্রাম	২২৫০	৩১৫০
কক্সবাজার	১৯৫০	২৯০০
নোয়াখালী	৩৪০০	২১৯০
ফেনী	৬৫০	৪৯০
লক্ষ্মীপুর	৫০০০	৩২৫০
রাঙ্গামাটি	৯০	১৪০
খাগড়াছড়ি	২০	৩০
বান্দরবান	১৫০	১৫০
বরিশাল	৭৭০০	১০২৫০
পিরোজপুর	১২০০	৮৫০
ঝালকাঠি	৬৫০	৯৭০
ভোলা	১১৫০০	১০৫১০
পটুয়াখালী	১৬০০০	১৫২০০
বরগুনা	১৫০০	৪৮০
রাজবাড়ি	১০৪৫	২২৭০
ফরিদপুর	৮০০	৪২৪০
গোপালগঞ্জ	৪২৫	৫৮০
শরিয়তপুর	৪৫০০	৬৭৫০
মাদারীপুর	৬৮০	১২০০
রাজশাহী	৭৯০	৭৫০
নওগাঁ	৬০০	১২৭০
নাটোর	৩৫০	৪০০
চা.নবাবগঞ্জ	২০০	৮৪০
বগুড়া	২৭৭০	৩২৫০
জয়পুরহাট	১৫০	১৫০
পাবনা	৩২৪০	৮৯৫০
সিরাজগঞ্জ	২৫০০	৩৫০০

যশোর	১৬৯৫	৪৫০০
নড়াইল	৫০০	১৪০০
মাগুরা	২০০০	৩০০০
ঝিনাইদহ	১৩৫০	১৪৩৫০
কুষ্টিয়া	৯০০	১৩৫০
মেহেরপুর	৩২৫	১৮০০
চুয়াডাঙ্গা	৬৪০	৯৫০
খুলনা	২০০	১৬০০
সাতক্ষীরা	৫৬০	১৭০০
বাগেরহাট	১০০০	১৫০০
রংপুর	৮০০	১৯০০
গাইবান্ধা	৪৫০	৪০০
কুড়িগ্রাম	৬০০	৬৭০
লালমনিরহাট	১৮৫	৩০০
নীলফামারী	৮০০	৮০০
দিনাজপুর	৮৯৬	১৩৪০
পঞ্চগড়	১০০০	৬৩০০
ঠাকুরগাঁও	৫০০	৩৮২০

উৎস : খাদ্যশস্য উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ১৯৯৪–৯৫

মরিচের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। গাছে ফুল ধরার সময় ৩৬°–৪৪°সে. তাপমাত্রা সর্বাপেক্ষা উপযোগী। তবে উষ্ণতা ও আর্দ্রতার মধ্যে এমনই একটি ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন যাহাতে গাছের প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। রশীদের[৮] এক উদ্ধৃতিতে দেখা যায় কোচরান (Cochran) লক্ষ্য করেছে যে তাপমাত্রা খুব বেশি এবং বায়ুর আর্দ্রতা কম হলে মরিচ গাছের পানি শোষণ ও প্রস্বেদনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হয় না, ফলে গাছের ফুল ও কচি ফল ঝরে পড়তে থাকে। অধিক বৃষ্টিপাত ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও ফুল ঝরে পড়ে। শুধু নিম্ন ও উচ্চ তাপমাত্রায় ফল ক্ষুদ্রাকার ও বীজহীন হতে পারে। দিন-দীর্ঘতার প্রভাবও মরিচ উৎপাদন লক্ষণীয় ; খাট দিনে মরিচের গাছ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে ফুল ধারণ করে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

মরিচ Solanaceae পরিবার ও Capsicum গণের অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্রাকার বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। ইহার কোনো জাতের গাছ এক বর্ষজীবী, আবার কোনোটি বহুবর্ষজীবী। গাছ উচ্চতায়

৩০ সে: মি: হতে ১ মিটার পর্যন্ত হতে পারে ; বর্ষাতি জাতের গাছ অধিক মাত্রায় উঁচু হয়। গাছের সরু কাণ্ড অনেক শাখা প্রশাখাযুক্ত হয় তা ক্ষুদ্রাকার অপ্রশস্ত পত্র ধারণ করে। গোড়ায় গুচ্ছমূল জন্মে এবং তা হতে শিকড় ও উপ–শিকড় নিম্ন ও পার্শ্ব এই উভয়দিকেই ৪৫ সে. মি. পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।[৮] টমেটো ও বেগুনে যে রীতিতে ফুল ধরে মরিচ গাছেও সেই রীতিতে ফুল ধরতে দেখা যায়। ইহাতে একদিকে গাছে ফুল ধরতে থাকে এবং অপরদিকে গাছে ডালপালা সৃষ্টি হয় ও বৃদ্ধি পায়। মরিচের ক্ষুদ্রাকৃতির ফুলে বেরীজাতীয় ফুল ধরে যার কোনোটি খাট, কোনোটি লম্বা অথবা কোনোটি অনেকটা গোলাকার।

মরিচে বহুসংখ্যক প্রজাতি ও উপ–প্রজাতি থাকায় ইহার শ্রেণিবিভাগের কাজটি প্রথমে অত্যন্ত জটিল হয়ে দেখা দেয়, পরে ১৯৫৩ সালে ইহার একটি মিমাংসা হয়। এই মীমাংসা অনুসারে মরিচকে ৪টি প্রজাতিতে ভাগ করা হয় এবং পরবর্তীকালে ইহার সঙ্গে আরো দুটি প্রজাতি যোগ করা হয়।[৮] পৃথিবীতে মরিচের যত জাত রয়েছে সেগুলিকে এই প্রজাতিগুলির কোনো না কোনোটির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই প্রজাতিগুলি হচ্ছে ১. Capsicum annum ২.futescens ৩. C. pendulum, ৪. ক্যাপসিকাম পিউবুসেন্স (C. pubescence), ৫. (C. chinese) এবং ৬. (candenasii)। এই প্রজাতিরগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত প্রজাতিটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জাতের সংখ্যা ও উৎপাদনের দিক হতে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রজাতি। ইহার অন্তর্গত জাতগুলির মধ্যে ঝাল ও মিষ্টি উভয় রকম মরিচই রয়েছে। আর সব জাতেই মরিচই বর্ষজীবী। আমাদের দেশের সব মরিচই এই জাতের অন্তর্গত। দ্বিতীয় প্রজাতিতে অনেক জাতের মরিচ রয়েছে ; দক্ষিণ–পূর্ব–এশিয়ায় ইহার যথেষ্ট চাষ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ট্যাবাস্কো' এবং আমাদের দেশের ধানী মরিচের জাত এই প্রজাতিতে পড়ে।

ব্যবহারের দিক হইতে আমাদের দেশের মরিচের জাতগুলিকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ১. ঝাল মরিচ ও ২. মিষ্টি মরিচ।

ঝাল মরিচ : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের দেশে যত মরিচের চাষ করা হয় সেগুলির প্রায় সবই ঝাল জাতের। এই জাতগুলি বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা সূর্যমুখী, কামরাঙ্গা, ধানী, গোল, পাটনাই ইত্যাদি। মৌসুম হিসেবে এই জাতের মরিচগুলিকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়— ১. বর্ষাতি বা ভাদুই মরিচ যেগুলি কেবল বর্ষাকালীন সময়ে জন্মে এবং রবিখন্দের মরিচ যেগুলি শুধু শীতকালীন সময়ে জন্মে।

মিষ্টি মরিচ : এই শ্রেণির অন্তর্গত জাতগুলির মরিচ মিষ্টি অর্থাৎ ঝালহীন। মরিচগুলি আকারে বড়, মাংসল ও চামড়া পুরুযুক্ত। এইগুলি পুরু করে কেটে টমেটো, মূলা, শশা প্রভৃতির সাথে সালাদ হিসেবে খাওয়া যায়। বাংলাদেশে মিষ্টি মরিচ নেই বললেই চলে। কালেভদ্রে সরকারি খামারে দুই চারটি দেখা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মরিচই মিষ্টি জাতের। সেখানকার প্রধান প্রধান জাতগুলি হচ্ছে —ক্যালিফোর্নিয়া ওয়াণ্ডার, ওয়ার্ল্ড বীটার, চাইনিজ জায়েন্ট ইত্যাদি।

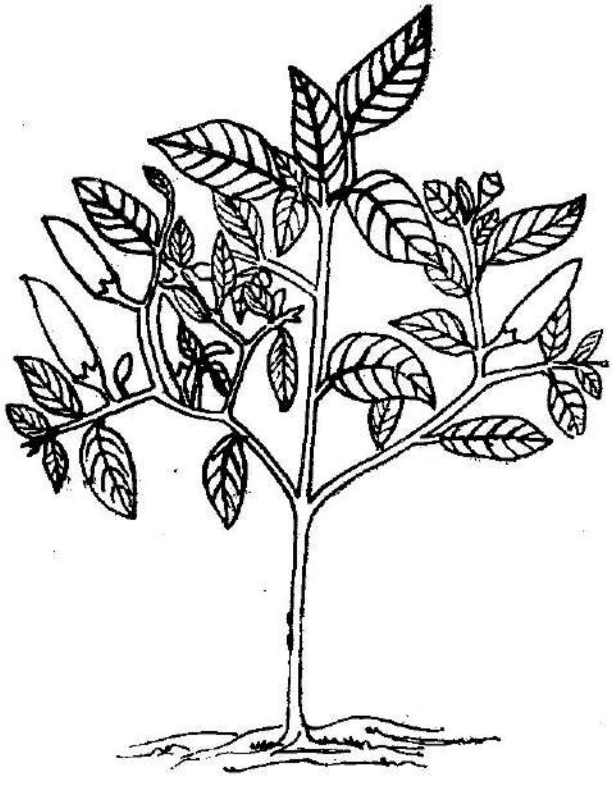

চিত্র : ৭.১ মরিচ গাছ

চাষাবাদ পদ্ধতি

মরিচের জন্য ছায়াযুক্ত ও উঁচু জমি নির্বাচন করা ভালো। বৎসরে খরিপ ও রবি—এই দুই মৌসুমেই মরিচ চাষ করা গেলেও রবি মৌসুমে চাষ করাই লাভজনক। তাই দেখা যায় আমাদের মরিচের শতকরা ৭৫ ভাগই রবি মৌসুমে চাষ করা হয়।

জমি প্রস্তুতি : ভালোভাবে চাষবাস ও মই দিয়ে পরিপাটি করে জমি প্রস্তুত করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে জমিতে যেন কোনো আগাছা না থাকে।

সার প্রয়োগ : মরিচের জমি সারবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুর্বর জমিতে মরিচ গাছ ভালো বৃদ্ধি পায় না এবং তাতে মরিচও বিশেষ ধরে না। কাজেই জমিতে নিম্নোক্ত সার উল্লিখিত হারে প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	পরিমাণ
গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	২১৭ কেজি
টি এস পি	৩৩৩ কেজি
মিউরেট অব পটাশ	২০০ কেজি
জিপসাম	১১১ কেজি
জিঙ্ক অক্সাইড	৫ কেজি

উৎস : মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৩–৯৪

উপযুক্ত সার ছাড়া লাল মৃত্তিকাঞ্চলের অম্লাত্মক জমিতে প্রতি একরে ৩–৪ মণ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ২.৭৫–৩.৬৮ কুইন্টাল চুন প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। চর অঞ্চলের পলি পড়া উর্বর মাটিতে সার ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হয় না। উঁচু জমিতে অবশ্যই এই সকল সার ব্যবহার করতে হবে। জমিতে দুই এক চাষ দেওয়ার সাথে সাথেই গোবর টি. এস. পি. ও মিউরেট অব পটাশ জমিতে ছিটিয়ে দিতে হয় এবং পরবর্তী চাষ ও মইয়ের সাহায্যে সারগুলি মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। জমিতে চারা রোপণ করার ২/৩ সপ্তাহ পর ইউরিয়া ও মিউরেট অব পটাশ ভালোভাবে একত্রে মিশ্রিত করে প্রতি দুই চারার মাঝখানে প্রয়োগ করতে হয়।

চারা জন্মান ও রোপণ করা : কোনো কোনো সময় জমিতে বীজ ছিটিয়ে বপন করেও মরিচের চাষ করা হয়। কিন্তু তা না করে বীজতলায় চারা উঠিয়ে ও তৎপর সঠিক বয়সের চারা জমিতে লাগালে ফল ভালো পাওয়া যায় এবং ইহাই বিজ্ঞানসম্মত একটি পদক্ষেপ।

জমিতে সরাসরি বপন করলে হেক্টরের জন্য ২.৩৩ কেজি এবং চারা উঠিয়ে রোপণ করলে ২৩৩–২৯০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। ১০´ × ৩´ ফুট অর্থাৎ ৩ × ১ মিটার আকারের ৮টি হাপরে এই বীজ বুনা যায়। খরিপ ফসলের জন্য মার্চ–এপ্রিল মাসে এবং রবি ফসলের জন্য অক্টোবর–নভেম্বর মাসে হাপরে বীজ বপন করা যেতে পারে। বীজ বপন করার পর খড়কুটা দিয়ে হাপরের মাটি ঢেকে রাখলে ৫/৬ দিনের মধ্যে চারা গজিয়ে যায়। মাঝে মধ্যে হাপরের মাটি বাঁশের কাঠি দিয়ে নাড়াচাড়া করলে চারার বৃদ্ধি সুষ্ঠুরূপে হয়।

চারার বয়স যখন ১½ ২ মাস হয় অর্থাৎ প্রতিটি চারাতে ৫/৬টি পাতা জন্মে তখনই সেগুলি হাপড় হতে মধ্যে উঠিয়ে পূর্ব প্রস্তুত জমিতে সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হয়। প্রতি দুই সারির মধ্যে দূরত্ব হবে ৬০–৭৬ সে: মি: এবং সারিতে এক চারা হতে অন্য চারার ব্যবধান হবে ২ ফুট অর্থাৎ ৬০ সে: মি:। মিষ্টি মরিচের গাছ ছোট হয় বলে আরো ঘন করে লাগান যেতে পারে।

পরবর্তী পরিচর্যা : সময়মতো আগাছা পরিষ্কার করা ও মাটি নরম ঝুরঝুরা করে রাখা বাঞ্ছনীয়। লক্ষ্য রাখতে হবে মরিচ ক্ষেতে কখনো যেন পানি না জমে। এরূপ সম্ভাবনা দেখা দিলে ক্ষেতের চারিদিকের নালাপথে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত করে দিতে হবে। বর্ষাতি ফসলের বেলাতেই মরিচ ক্ষেতে জলাবদ্ধতার সম্ভাবনা বেশি থাকে। রবি মৌসুমে কোনো কোনো জমিতে ইহার বিপরীত ঘটার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ জমিতে রসের অভাব দেখা দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মরিচ ক্ষেতে অবশ্যই সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে গাছের ফুল ঝরে পড়বে না এবং ফলন বেশি হবে।

মরিচ ফসলে কীটপতঙ্গের আক্রমণ তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কয়েকটি রোগের আক্রমণ কখন কখনও মারাত্মকরূপে দেখা দেয়। মরিচের মড়ক (Die back disease of chillies) এবং মরিচের পচা রোগ (soft rot of chillies) এই দুইটি অন্যতম প্রধান রোগ। সাধারণত বর্ষার শেষে ও শীতের প্রারম্ভে প্রথমোক্ত রোগটি দেখা দেয়। ইহা একটি মারাত্মক ছত্রাকঘটিত রোগ (fungal disease)। মরিচ গাছের নতুন ডগা ও ফুল প্রথমে আক্রান্ত হয়। গাছের ডগা আস্তে নুয়ে পড়ে এবং ফুল ঝরে পড়তে থাকে। পরবর্তীকালে মরিচ আক্রান্ত হয় এবং তার উপর গোল কাল দাগ পড়ে আস্তে আস্তে মরিচ শুকিয়ে ফেলে। মরিচের পচা রোগের লক্ষণগুলিও অনেকটা মড়ক রোগের মতো। আক্রান্ত গাছের ডগা নুয়ে পড়ে এবং ডালপালা আগা হতে গোড়ার দিকে মরতে শুরু করে। গাছে ফুল ধরা আরম্ভ হলেই এই রোগের আক্রমণ দেখা দেয়। ফুল আক্রমণের পর অস্তে আস্তে কচি পাতা ও ডাটা আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত গাছ মরে যায়।

এই দুটি রোগ অত্যন্ত মারাত্মক বলে রোগ দেখা দেওয়া মাত্রই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বোরদো মিক্‌চার ১৫–২০ দিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করলে অতি সহজেই রোগ দুটি দমন করা যায়।

মরিচ সংগ্রহ : ক্ষেতে চারা রোপণের ১–১½ মাসের মধ্যে গাছে ফুল ধরতে শুরু করে এবং ফুল ও ফল ধরা কয়েক মাস ব্যাপিয়া চলতে থাকে। তিন চার মাসের মধ্যে মরিচ ধরা ও পাকার কাজ শেষ হয়।

মরিচ এমনই একটি শস্য যা কাঁচা ও পাকা এই দুই অবস্থায়ই আহরণ করা যায়। বরং কোনো কোনো সময় কাঁচা মরিচ উঠিয়ে বিক্রি করাই লাভজনক বলে মনে হয়, কারণ তাতে আশানুরূপ মূল্যও পাওয়া যায় এবং ঝামেলাও অনেক কমে যায়। পাকা মরিচ পেতে হলে আরো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়, মরিচ রোদ দিয়ে শুকাতে হয়, গুদামজাত করতে হয় এবং পরবর্তী ফসলের জন্য জমি খালাস হতে দেরি হয়।

কাঁচা ও পাকা যে অবস্থায়ই মরিচ উঠান হোক না কেন তা কয়েকবার উঠাতে হয়। বাড়ি হলেই কেবল কাঁচা মরিচ উঠান উচিত ; পাকা মরিচের সম্পূর্ণ অংশ যখন পেকে লাল হয়ে উঠে তখন তা উঠাতে হয়। হাতের আঙ্গুলের সাহায্যেই মরিচ উঠান যায়।

ফলন : বাংলাদেশে মরিচের গড়–পড়তা ফলন খুব কম। তবে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে হেক্টর প্রতি ৩–৬ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে। পাকা ও শুকনা মরিচের অনুপাতে ৩½—৪ ঃ ১ অর্থাৎ ৩½ হতে ৪ মণ পাকা মরিচ হতে ১ মণ শুকনা মরিচ পাওয়া যায়।

পেঁয়াজ

পেঁয়াজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই জন্মে। ইহা অতি প্রাচীনকাল হতে চাষবাস হয়ে আসছে। পবিত্র কোরআন শরীফ ও বাইবেলে পেঁয়াজের উল্লেখ রয়েছে।[৫] মসলা ও সবজি এই দুই হিসেবেই পেঁয়াজ ব্যবহৃত হয়। পাক–ভারত বাংলা উপ-মহাদেশে মসলাজাতীয় ফসল হিসেবেই পেঁয়াজের কদর অত্যন্ত বেশি, তবে সবজি হিসেবেও ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

শ্রীলঙ্কাতে পেঁয়াজকে সর্বরোগসংহারক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই সেই দেশে এমন একটি প্রবাদ আছে যে—

'Few onions a day
Keep the doctor away'

বাংলাদেশেও অবশ্য আয়ুর্বেদীয় মতে পেঁয়াজকে নানা রোগের উপকারী বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। এই মতে বিশ্বাস করা হয় যে পেঁয়াজ জ্বর, শ্লেষ্মা, শূল প্রভৃতি রোগে উপকারক। উপরন্তু ইহা রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্ধক, বাত, পিত্ত ও কফনাশক।[৫]

পেঁয়াজ বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে ইহার বেশির ভাগই পানি (৮৭–৮৮%)। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে রয়েছে শ্বেতসার (৭–১০%), প্রোটিন (১–১.১৫%) এবং স্নেহ (৮%)। ভিটামিন–এ, বি, সি– এই তিনটিই বিদ্যমান রয়েছে প্রথমোক্ত দুটির পরিমাণ খুব অল্প এবং শেষোক্তটির পরিমাণ বেশি। আর একটি উপাদান রয়েছে Allyl propyl disulphide ($C_6H_{12}S_2$) যার জন্য পেঁয়াজ ঝাঁঝ লাগে ও চোখে পানি আসে।[৫]

রবি খন্দে বাংলাদেশের চাষীদের জন্য পেঁয়াজ একটি বিশিষ্ট অর্থকরী ফসল। অল্প আয়াসে ও খরচে পেঁয়াজের চাষ হয় বলে চাষীরা ইহার চাষে বেশ দু পয়সা আয় করেন। তবে মাঝে মধ্যে অতি বৃষ্টির দরুন পেঁয়াজের ভয়ানক ক্ষতি হয়—প্রায় ক্ষেত্রেই পেঁয়াজ পচে যায় এবং বাজারে দাম দারুণভাবে বেড়ে যায়। তখন বিদেশ হতেও পেঁয়াজ আমদানি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

গত এক দশকে বাংলাদেশে পেঁয়াজের আবাদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯৭০–৭১ সালে যে পরিমাণ জমিতে ইহার আবাদ হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে তা কমে যেতে থাকে এবং গত দুই বৎসরে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে এখনও তা আগের পর্যায়ে আসতে পারেনি।[৭,৮] নব্বই দশকে দেখা যায় ১৯৯০–৯৪ সালে দেশে ৩৪০০০ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় ১৪৫০০০ টন পেঁয়াজ।[১৩]

এরূপ অবস্থার প্রধান কারণ রবি খন্দে গম, গোল আলু প্রভৃতি ফসলের আওতায় অধিক জমি চলে যাওয়া। বাংলাদেশের প্রতি জেলাতেই কিছু না কিছু পেঁয়াজের চাষ হলেও ময়মনসিংহ, ঢাকা, রংপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনা জেলাতেই ইহার ব্যাপক চাষ হয়। আবার এলাকা হিসেবে অধিক পরিমাণে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় ময়মনসিংহ (জামালপুর সহ) জেলার গফরগাঁও, ইসলামপুর, শেরপুর হোসেনপুর, নাগরপুর ও পাকুন্দিয়া ; ঢাকা জেলার সাভার, কেরাণীগঞ্জ, রায়পুরা, হরিরামপুর ও সিঙ্গাইর এবং ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ, পাংশা, জাজিরা শিবচর ও নারিয়ায়।[১]

জেলার নাম	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদনের পরিমাণ (মে: টনে)
ঢাকা	৩৫০	৪২০০
নারায়ণগঞ্জ	২০০	২২০০
নরসিংদি	২০০	১২০০
গাজীপুর	৬০০	৬০০০
মানিকগঞ্জ	৭২১০	৬৩৪০০

মুন্সীগঞ্জ	৮১০	১১৫০০
টাঙ্গাইল	১০০০	৯২০০
ময়মনসিংহ	১৪০০	৭০০০০
জামালপুর	--	--
শেরপুর	২৫০	২৫০০
নেত্রকোণা	২২০	২২০০
কিশোরগঞ্জ	৫৫০	৫৩০০
কুমিল্লা	৪৬০	২৯৭০
বি, বাড়িয়া	৫৫০	২০৬০
চাঁদপুর	৬৮০	৪৮০০০
সিলেট	২০	৫০
মৌ:বাজার	২৫	২০০
হবিগঞ্জ	৫০	৫০০
সুনামগঞ্জ	১৭৫	১২০০
চট্টগ্রাম	--	--
কক্সবাজার	--	--
নোয়াখালী	১২৫	৫০০
ফেনী	২৫	২০০
লক্ষ্মীপুর	৭০০	৩২০০
রাঙ্গামাটি	২০	৩০০
খাগড়াছড়ি	২৫	১৫০
বান্দরবান	৭০	৫০০
বরিশাল	৩০০	১৯০০
পিরোজপুর	২৫	২০০
ঝালকাঠি	৭৫	৯০০
ভোলা	৪০০	৪০০০
পটুয়াখালী	৪৫	৪০০
বরগুনা	--	--
রাজবাড়ি	৪৩৫০	৩৫৫০০
ফরিদপুর	৭০০০	৭১৪০০
গোপালগঞ্জ	৭০০	৫৭০০
মাদারিপুর	১৯৭০	১৯৩০০

শরিয়তপুর	২৫০০	২৫০০০
রাজশাহী	৪২০০	৪৫০০০
নওগাঁ	১৮০০	১৩৩০০
নাটোর	২৬৫০	১৭৯০০
চা.নবাবগঞ্জ	৮৫০	৮৫০০
বগুড়া	১৫০০	১৫০০০
জয়পুরহাট	১৫০০	১০৫০০
পাবনা	১১০০০	৮৬০০০
সিরাজগঞ্জ	৫০০	৫০০০
যশোর	৩০৯০	২৩৪০০
নড়াইল	৯০০	১০৫০০
মাগুড়া	১৫০০	১৫০০০
ঝিনাইদহ	৬৪৫০	৭৫৫০০
কুষ্টিয়া	৪৫০০	৩৮৫০০
মেহেরপুর	৫৩৫	৪৩০০
চুয়াডাঙ্গা	১৫৫০	১৬৩০০
খুলনা	২০০	২০০০
সাতক্ষীরা	৭৪০	১১৮০০
বাগেরহাট	২০০	২০০০
রংপুর	১২০০	১৩৯০০
গাইবান্ধা	১২০০	৮৪০০
কুড়িগ্রাম	৫০০	৪৫০০
লালমনিরহাট	২০০	১৪৪০
নীলফামারী	৭২৫	৭৩০০
দিনাজপুর	২৮০০	২৮০০০
পঞ্চগড়	১৫০	৮০০
ঠাকুরগাঁও	৫০০	৪৪০০

উৎস : খাদ্যশস্য উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ১৯৯৪-৯৫

উৎপত্তি ও বিস্তার

পেঁয়াজের আদি নিবাস পশ্চিম-এশিয়ায় বলে মনে হয়।[৮] তবে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেঁয়াজের চাষ হতো বলে ইহার সঠিক হিসেব দেওয়া না গেলেও অনেকেই এক মত যে ইহা এশিয়া মহাদেশের কোনো না কোনো স্থানে প্রথম উৎপত্তি লাভ

লাভ। তৎপর তা ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে। আজকের বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মিশর ও স্পেন পেঁয়াজ উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয়।

মাটি ও জলবায়ু

দোআঁশ ও বেলে-দোয়াশ মাটি পেঁয়াজের জন্য সব চাইতে উপযোগী। এঁটেল মাটিতে পেঁয়াজের চাষ না করাই ভালো। একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক এই যে পেঁয়াজের মাটি সুনিকাশযুক্ত হওয়া অবশ্যক। ভূমির উচ্চতার দিক হতে পেঁয়াজ বেশ সহনশীল, ২০০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু জমিতেও পেঁয়াজের চাষ করা যায়।

পেঁয়াজের জন্য অধিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় না, মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতই (৫০০–[illegible] মি: মি:) যথেষ্ট। তাই আমাদের দেশের বৃষ্টিহীন রবি খন্দেও রসযুক্ত পলি ও বেলে-দোয়াশ মাটিতে বেশির ভাগ পেঁয়াজের চাষ হতে দেখা যায়। যদি হঠাৎ করে সে মৌসুমে বিশেষ করে পেঁয়াজের শেষ বৃদ্ধি পর্যায়ে ভারি বৃষ্টি হয় তা হলে পেঁয়াজ মোটেই ভালো হয় না অথবা পচে যায়। তাপমাত্রার দিক হতেও পেঁয়াজ সাধারণত ঠাণ্ডা পরিবেশে ভালো জন্মে, তবে কোনো কোনো জাতের পেঁয়াজ কিছুটা উষ্ণ পরিবেশ পছন্দ করে—তাই দেখা যায় [illegible]° সে. হতে ৪০° সে. তাপমাত্রা পেঁয়াজের জন্য সব চাইতে উপযোগী।[৮]

ছায়াযুক্ত পরিবেশে পেঁয়াজ ভালো হয় না অর্থাৎ পেঁয়াজের জন্য বাধাহীন সূর্যালোক প্রয়োজন। ক্ষেতের যে অংশ সূর্যের কিরণ কম পড়ে সেখানে গাছের পাতা ভালো জন্মাতে দেখা গেলেও কন্দ (bulb) বড় হয় না। অধিকন্তু দিন-দীর্ঘতা (photoperiodism) পেঁয়াজের শল্ককন্দের উৎপাদনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দেখা গিয়েছে প্রতিটি জাতের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন-দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

পেঁয়াজ একবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় একটি উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Allium cepa L. Liliaceae পরিবারভুক্ত। গাছের গাঢ় সবুজ রংয়ের পাতা নলাকার (tubular), অগ্রভাগ ক্রমশ সরু হয়ে ফাপা নলের মুখবন্ধ করে দিয়েছে (চিত্র ৭.২)

গাছের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে পাতার বোটা শুল্ক অর্থাৎ পাতলা আবরণে পরিণত হয় এবং একটির পর একটি সজ্জিত হয়ে শল্ককন্দ অর্থাৎ পেঁয়াজের সৃষ্টি করে। পেঁয়াজে গুচ্ছমূল জন্মে ; মূলের শিকড় বেশি গভীরতায় বা পার্শ্বদেশে যায় না—৮ হতে ১০ ইঞ্চি অর্থাৎ ২০ সে: মি: হতে ২৫ সে: মি: এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। গাছের কন্দ যখন কিছুটা বড় হয়ে উঠে সেই সময় আর নতুন পাতা বের হয়ে পুষ্পমঞ্জরীর ডাট বের হয়, সেই ডাট বা পুষ্পদণ্ড দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে গাছের সমুদয় পাতার উপরে উঠে আসে এবং তার আগায় 'আম্বেল' (Umbel) জাতীয় ফুলগুচ্ছ জন্মে। পেঁয়াজের ছোট ছোট ফুল সাদা বা নীলাভ ও ফল একটি ক্যাপসুল (Capsule) ; বীজ কাল রংয়ের, দেখতে অনেকটা কালজিরার (black cumin) মতো।

বাংলাদেশে সাধারণত দু রকম জাতের পেঁয়াজ দৃষ্ট হয় ১. দেশী বা ছোট পেঁয়াজ এবং ২. বিদেশী বা বড় পেঁয়াজ। ছোট পেঁয়াজকে ছাঁচি পেঁয়াজ নামেও অভিহিত করা হয়। এই জাতের পেঁয়াজ দেখতে লালবর্ণের ও অধিক ঝাঁজালো—দুই একটি পেঁয়াজ কাটতে গেলেই চোখে পানি এসে যায়। বড় বা বিদেশী পেঁয়াজ আকারে বড়, ঝাঁজ খুব কম, এমনকি কোনো কোনোটি মিষ্টি স্বাদযুক্ত। বর্ণের দিক হতেও পেঁয়াজ বিভিন্ন— কোনোটি লাল, কোনোটি হলুদ এবং কোনোটি সাদা। বিদেশী পেঁয়াজের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য জাত হলো 'ইয়েলো বার্মুডা', 'ক্রিস্টাল ওয়াক্স', 'এক্সেল', 'আর্লি গ্রেনো', ইত্যাদি।

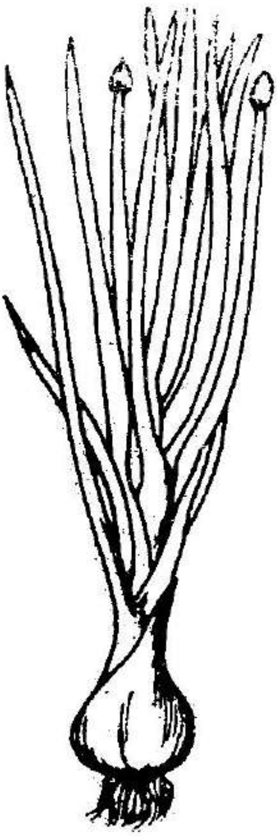

চিত্র : ৭.২ পেঁয়াজ গাছ

এই সমস্ত জাতের পেঁয়াজের মধ্যে কোনো কোনোটিই কেবল আমাদের দেশে কিছু কিছু উৎপাদিত হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা কয়েকটি বড় জাতের পেঁয়াজ উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছে। মেক্সিকো হতে আনীত বীজ হতে বাংলাদেশের জন্য উপযোগী এ নূতন জাতের পেঁয়াজ উদ্ভাবিত হয়েছে। একটি জাতের নাম 'এক্সেল' এবং অপরটির নাম ... নব উদ্ভাবিত এই দুই জাতের প্রতিটি পেঁয়াজের ওজন প্রায় আধ সের* জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ সালে অনুমোদিত জাতটির নাম বারী পেঁয়াজ।[২৬]

চাষের প্রণালি

পেঁয়াজ চাষের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বিভিন্নভাবে এটির চাষ করা যায়। প্রথমত জমিতে পেঁয়াজের প্রকৃত বীজ সরাসরি বপন করে পেঁয়াজের চাষ করা যায়, দ্বিতীয়ত এই বীজের সাহায্যে বীজ তলায় চারা জন্মিয়ে এবং সেই চারা ব্যবহার করে জমিতে রোপণ করা যায় এবং তৃতীয়ত জমিতে পেঁয়াজের গেঁড় (আস্ত পেঁয়াজ) লাগিয়ে ইহার চাষ করা যায়।

ক. বীজের সাহায্যে পেঁয়াজের চাষ : বেশি পরিমাণে না হলেও দেশের সর্বত্রই কিছু না কিছু চাষী জমিতে সরাসরি বীজ বপন করে পেঁয়াজের চাষ করে থাকেন। সাধারণত ছিটিয়ে বীজ বপন করে প্রতি হেক্টরে ২৯–৩০ গ্রাম বীজ ব্যবহার করা হয়। তৎসঙ্গে মূলা বা অন্য কোনো কোনো সবজির বীজও বপন করা হয়। পেঁয়াজের চারার বৃদ্ধি প্রথম দিকে মন্থর বলে মূলা প্রভৃতি ফসল আগে উঠে যায় এবং তৎপর পেঁয়াজ এককভাবে জন্মে থাকে। এভাবে পেঁয়াজের চাষ বিজ্ঞানসম্মত নয় ; কারণ ইহাতে আগাছা পরিষ্কারের কাজ অসুবিধাজনক হয়, অন্যান্য পরিচর্যা করা সহজতর হয় না এবং ফলন কম হয়। জমি উত্তমরূপে চাষ করে তাতে ১২–১৮ ইঞ্চ অর্থাৎ ৩০ সে: মি: হতে ৪৫ সে: মি: ব্যবধানে সারি করে বীজবপন করলে এবং অন্যান্য পরিচর্যা সময়মতো করলে উৎপাদন অনেকটা ভালো হয়।

খ. চারার সাহায্যে পেঁয়াজের চাষ : এই প্রথায় বীজ তলায় চারা উঠিয়ে একমাস হতে দেড়মাস বয়সের চারা ক্ষেতে লাগানো হয়। দেশের সমুদয় ফসলের প্রায় ৭৫ ভাগ এই নিয়মে চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমত ৩মি. × ১ মি. আকারের বীজতলা বিলাতি সবজির বীজতলার ন্যায় প্রস্তুত করা হয়। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এরূপ প্রতিটি বীজতলায় ২৯–৩০ গ্রাম বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের পর ৬ মি. মি. কম্পেস্টের একটি আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দিলে ভালো হয়। চারার বয়স দেড় মাসের মতো হলে বীজতলা হতে উঠিয়ে দিয়ে সেগুলি ক্ষেতে লাগাবার পূর্বে করে নিতে হয়। প্রতিটি চারার আগা এবং গোড়ার শিকড় কিছু পরিমাণে কেটে ফেলতে হবে। তৎপর সেগুলি সারি করে রোপণ করতে হবে—ছোট জাতের পেঁয়াজের বেলায় এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব হবে ১৫–২৩ সে: মি: এবং সারিতে এক চারা হতে অন্য চারার দূরত্ব ৮–১০ সে: মি: এবং বড় জাতের পেঁয়াজের বেলায় সারির দূরত্ব ২৩–৩০ সে: মি: এবং চারায় চারায় দূরত্ব হবে ১২–১৫ সে: মি:।

---

*. ফসল—বর্ষ-১৮, সংখ্যা-৬, ঢাকা। ১৪ আষাঢ়, ১৩৮৯ এর সৌজন্যে

গ. পেঁয়াজের গেঁড়ের সাহায্যে চাষ : আস্ত পেঁয়াজ অর্থাৎ ইহার শল্ককন্দ বা গেঁড় রোপণ করেও পেঁয়াজের চাষ করা হয়। বাংলাদেশে পেঁয়াজের আগাম ফসল এভাবেই করা হয়। জমি ভালোভাবে চাষবাস করে সারিতে সারিতে গেঁড় বপন করা হয়– এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব ১২ অর্থাৎ ৩০ সে. মি. এবং এক গেঁড় হতে অন্য গেঁড়ের দূরত্ব ৪–৫ অর্থাৎ ১০–১২ সে: মি: রাখলেই চলে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে গেঁড় যেন মাটির উপরে ভাসাভাসা করে রোপণ করা হয় অর্থাৎ গেঁড়ের মুখ যেন ১২ মি: মি: মাটির বেশি নিচে না যায়।

সারের ব্যবহার : যে পদ্ধতিতেই পেঁয়াজের চাষ করা হোক না কেন জমিতে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র চর অঞ্চলের পলিপড়া মাটিতে সার ব্যবহার না করলেও চলে। নিম্নহারে সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

	হেক্টর প্রতি
গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	২৬০ কেজি
টি. এস. পি	২৬৬ কেজি
মিউরেট অব পটাশ	১৪০ কেজি
জিপসাম	১১১ কেজি

উৎস : মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, ১৯৯৬

সরাসরি বীজ ও চারার সাহায্যে পেঁয়াজের চাষ করলে গোবর ও টি. এস. পি. সার জমি চাষ করার সময় এবং ইউরিয়া ও মিউরেট অব পটাশ উপরি প্রয়োগ (top dressing) এক বা দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শল্ককন্দ অর্থাৎ গেঁড়ের সাহায্যে চাষ করলে সমস্ত সারই জমি প্রস্তুত করার সময় প্রয়োগ করতে হয়।

সেচ প্রয়োগ : চর অঞ্চলের রসযুক্ত জমিতে পানি সেচ না করেও পেঁয়াজের চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য জমিতে পেঁয়াজ চাষে পানি সেচ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। ইহাতে পেঁয়াজের ফলন বেশ বৃদ্ধি পায়। মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে ১৫/২০ দিন পর পর গোটা দুয়েক সেচ দিলেই চলে যাবে। পেঁয়াজের জমিতে প্রয়োজনের বেশি কখনো সেচ দিতে নেই, কারণ তাতে গাছে কেবল পাতার বৃদ্ধিই হবে, কন্দ তেমন একটা ভালো জন্মাবে না। সমতল জমিতে এবং ছিটিয়ে বোনা ফসলে ভাসান পদ্ধতিতে (flooding) সেচ দেওয়া যায়। সারিতে লাগানো ফসলে দুই সারির মাঝ বরাবর পানি ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সেচ দেওয়া চলে।

অন্যান্য পরিচর্যা : ফসলের প্রাথমিক অবস্থাতেই আগাছা পরিষ্কারের সাথে সাথে মাটি নরম করে দেওয়া ভালো। এই সময় ক্ষেতে চারাগাছ ঘন থাকলে তা পাতলা করে দিতে হবে। বৃষ্টি অথবা সেচ দেওয়ার পর মাটি চাপ বেঁধে গেলে নিড়ির সাহায্যে তা ভেঙ্গে দিয়ে মাটি নরম ঝুরঝুরা করে দেওয়া উচিত। গাছে ফুলের ডাঁট দেখা দেওয়ার পর পরই তা ভেঙ্গে দেওয়া বাঞ্ছনীয়,কারণ সেগুলি বড় হয়ে আগায় ফুল ধরে গেলে কন্দের বৃদ্ধি দারুণভাবে ব্যাহত হয়। পেঁয়াজের অনিষ্টকর পোকা–মাকড় তেমন দেখা যায় না। কোনো কোনো সময় থ্রিপস্ (thrips) নামক এক প্রকার পোকার আক্রমণে পেঁয়াজের ক্ষতি হতে পারে। এই পোকার আক্রমণে ০.০৫ ভাগ শক্তিসম্পন্ন ডাইমেক্রন কিংবা সেভিন ছিটিয়ে দিলে সুফল

পাওয়া যায়। পেঁয়াজ ফসলে রোগ-বালাইর তেমন কোনো আক্রমণ দেখা যায় না। (তবে সংরক্ষণকালে ধূসর-পচা রোগ কন্দ পচিয়ে ফেলতে পারে।)

পেঁয়াজ উত্তোলন : ক্ষেতে পেঁয়াজ গাছের পাতাগুলি যখন প্রায় সম্পূর্ণ মরে আসে তখনই বুঝতে হবে পেঁয়াজ উঠানোর সময় হয়েছে। অর্থাৎ পেঁয়াজ বাল্ভি হয়েছে আর মাটি হতে বাল্ভি পেঁয়াজ উঠানোই ভালো। পেঁয়াজ যাতে তাড়াতাড়ি বাল্ভি এবং আকারে বড় হয় এই বিশ্বাসে আমাদের দেশে কোনো কোনো চাষী পেঁয়াজের পাতা মাড়ায়ে দেন। কিন্তু এর কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তাতে পেঁয়াজের এহেন কোনো উপকার হয় না, বরং কোনো কোনো সময় ফলন কমে যায়।

ফলন : আমাদের দেশে সাধারণত পেঁয়াজ প্রতি একরে ৭৫–১৫০ মণ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ৬৯০০–১৩৮০০ কেজি উৎপন্ন হয়। তবে ফলনশীল জাতের বড় পেঁয়াজের ফলন ২৫০–৩১৫ মণ অর্থাৎ ২৩০০০–২৯০০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। আহমদের[১] এক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে টেক্সাস ইয়েলো গ্রেনো জাত প্রতি একরে ২৬১.৬ মণ ইয়েলো গ্রনেক্স জাত ৩১২.৮ মণ এবং এক্সেল জাত ২৫৮.৫ মণ ফলন দিতে সক্ষম হয়েছে। বিদেশে ইহা হতে আরো অধিক অর্থাৎ একরে ৫০০ মণ অর্থাৎ হেক্টরে ৪৬৬২৫ কেজি ফলন পাওয়া গিয়েছে।[১]

পেঁয়াজ সংরক্ষণ

পেঁয়াজ একটি পচনশীল ফসল। কাটা, জখমী ও অধিক রসযুক্ত পেঁয়াজ গুদামজাত করলে তাহা অতি সহজেই পচে যায়। উপরন্তু গুদামঘরের তাপমাত্রা অধিক হলে পচন আরো দ্রুততর হয়। তবে সৌভাগ্যের কথা এই আমাদের দেশের পেঁয়াজ ভালোভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে আলোবাতাস খেলেও কিছুটা ঠাণ্ডা পরিবেশ বজায় থাকে এমন জায়গায় রাখলে পেঁয়াজ বেশ ভালো থাকে। কাটা ও জখমী পেঁয়াজ যাহাতে গুদামঘরে রাখা না হয় ও মাঝে-মধ্যে পেঁয়াজ পরীক্ষা করে দুই চারিটি পচা পেঁয়াজ ফেলে দিলে অবশিষ্ট পেঁয়াজ বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য ভালো থাকে।

রসুন

পেঁয়াজের সাথে সাথেই যে মসলা ফসলটির নাম করতে হয় সেটি হলো রসুন। পেঁয়াজের চাইতে কম ব্যবহৃত হলেও রসুনের ব্যবহার অপরিহার্য। যে মাছ, মাংস কিছুটা পচে উঠে তাতে রাঁধুনীরা রসুনের ব্যবহার অতি আবশ্যক মনে করে। শুধু মসলা হিসেবে নয়, পেঁয়াজের মতো রসুনেরও বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। সুপ (soup), পিকল্‌স (pickles), সসেজ (susase), চাটনী, আচার প্রভৃতিতে রসুন ব্যবহার করা হয়। আয়ুর্বেদী মতে রসুন বলকারক, উষ্ণবীর্য, শুক্রবর্ধক, বাতরোগ, ফুসফুস রোগ, আতের ঘা, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে উপকারক।[২,৩] রসুনের পুষ্টিমানের দিক লক্ষ্য করলেই (সারণি–৩০) ইহার এরূপ উপকারজনিত গুণাবলি থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।[৫]

সারণি–৩০ : রসুনের মধ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ

উপাদান	পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রাম)
পানি	৬২ গ্রা:
প্রোটিন	৬ গ্রা:
শ্বেতসার	৩০ গ্রা:
স্নেহ	০.৫ গ্রাম
থায়ামিন	০.২ মি: গ্রা:
রাইবোফ্লেভিন	০.১ মি: গ্রা:
নায়াসিন	০.৫ মি: গ্রা:
'সি'	১০–১৫ মি: গ্রা:

উৎস : রশিদ, মা : বাংলাদেশের সবজি, ১৯৭৬

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার সারণিতে উল্লিখিত উপাদান ছাড়াও রসুনে diallyl disulphide ($C_{12}H_{10}S_2$) এবং diallyl trisulphide নামে দুটি সালফারজাতীয় উপকরণ আছে যার জন্য রসুনে এক রকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ বিদ্যমান রয়েছে।

রসুন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার আদি নিবাস কারো মতে ইউরোপ (ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল) ও কারো মতে মধ্য-এশিয়া।[১] ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপে রসুনের ব্যবহার প্রচলিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামান্য পরিমাণ জমিতে রসুনের চাষ হয়, তাই সে দেশ দক্ষিণ-ইউরোপীয় দেশসমূহ হতে তার চাহিদার বাকি অংশ মিটিয়ে থাকে।

রবিখন্দে পেঁয়াজের মতো রসুনও বাংলাদেশের চাষীদের জন্য একটি অর্থকরী ফসল। প্রতি বৎসর তারা গড়ে ১২১৪৫ হেক্টরে জমিতে রসুন চাষ করে থাকে ; ১৯৯৩–৯৪ সালে ১২৪০০ হেক্টরে আবাদ হয়।[১৩] রসুনের চাষ করে থাকে ; ১৯৯৩–৯৪ সালে অন্যান্য ফসল, যেমন— পেয়াজ, ডাল, প্রভৃতির মতো ইহারও আবাদ বৎসর বৎসর কমে যাচ্ছে। ফলে বাজারে দামও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রসুন কমবেশি বাংলাদেশের সকল জেলাতেই জন্মে থাকে। তবে রসুন উৎপাদনে ফরিদপুর জেলা শীর্ষস্থানীয় ; অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে দিনাজপুর পাবনা, বরিশাল ও ঢাকা জেলাতেও উৎপাদিত হয় সারণি–৩১।[৭]

মাটি ও জলবায়ু

পেঁয়াজের তুলনায় মাটির দিক হতে রসুন কিছুটা সহনশীল। প্রায় সকল রকম মাটিতেই রসুনের চাষ করা চলে, তবে বেলে-দোঁয়াশ এবং দোঁয়াশ মাটিই সব চাইতে উপযোগী। এঁটেল মাটিতে রসুনের চাষ করতে গেলে সেচ সহযোগে মাটি নরম রাখা প্রয়োজন, তবে এই রকম মাটিতে রসুনের চাষ না করাই ভালো কারণ এইরূপ পরিবেশে মাটিতে কন্দ সুগঠিত হয় না এবং ফসল তুলার সময়ও যথেষ্ট অসুবিধা হয়।

রসুন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ভালো জন্মে। বৃষ্টির পরিমাণ ২০–৩০ অর্থাৎ ৫০০–৭৬০ মি.মি. এবং তাপমাত্রা ৬৫°–৭৫°ফা: অর্থাৎ ৩৬° সে.–৪২°সে.থাকা বাঞ্ছনীয়। বীজ বপনের পরপরই অধিক গরম, গুমোট বা মেঘলা আবহাওয়া বা বেশি বৃষ্টিপাত হলে কন্দ ভালোভাবে গঠিত হতে পারে না।[৪] উন্মুক্ত সূর্যালোক ছাড়া রসুন ভালো হয় না। ছায়াযুক্ত স্থানে রসুন কিছু [illegible] কন্দই হয়

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় রসুনের আবাদি জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৭৮–৭৯)

সারণি ৩১ : বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় রসুনের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

জেলার নাম	আবাদি জমির পরিমাণ (হেকটরে)	উৎপাদনের পরিমাণ(মে. টনে)
ঢাকা	১২০	১৩০০
নারায়ণগঞ্জ	৫০	৪০০
নরসিংদী	২২০	১৫০০
গাজীপুর	২৫	২০০
মানিকগঞ্জ	৩৪৮	১৮০০
মুন্সীগঞ্জ	১০২	৬০০
টাঙ্গাইল	৫০০	৩৩০০
ময়মনসিংহ	৮০০	৩২০০
জামালপুর	২০০	৮০০
শেরপুর	১২০	১০০
নেত্রকোণা	২০০	১৬০০
কিশোরগঞ্জ	৪৫০	৩৪০০
কুমিল্লা	৩০০	১৪০০
ব্রা. বাড়িয়া	৩০০	১৪০০
চাঁদপুর	৩৮৫	২৫০০
সিলেট	––	––
মৌলভীবাজার	৫	৫০
হবিগঞ্জ	––	––
সুনামগঞ্জ	৭০	৪০০
চট্টগ্রাম	––	––
কক্সবাজার	––	––
নোয়াখালী	২৩৫	৩০০

ফেনী	২৫	৫০
লক্ষ্মীপুর	৩০০	১৪০০
খাগড়াছড়ি	--	--
বান্দরবান	৩০	২০০
বরিশাল	২০০	২০০
পিরোজপুর	২০	১১০০
ঝালকাঠি	৫০	৩০০
ভোলা	৩২০	২৪০০
পটুয়াখালী	৬০	৫০০
বরগুনা	--	--
রাজবাড়ি	১৩২০	৭৫০০
ফরিদপুর	২০০০	১২০০০
গোপালগঞ্জ	২৫০	১৫০০
শরিয়তপুর	৫০০০	১৫০০০
মাদারীপুর	১০১০	৮১০০
রাজশাহী	৮০০	৫২০০
নওগাঁ	৩৫০	২০০০
নাটোর	১৬০০	৫১০০
চা. নবাবগঞ্জ	৪০০	৩৬০০
বগুড়া	৭০০	৫৬০০
জয়পুরহাট	১২০	[illegible]
পাবনা	[illegible]	[illegible]
সিরাজগঞ্জ	২০০	[illegible]
যশোর	[illegible]	[illegible]
নড়াইল	১৪০	১৫০০
মাগুরা	৭০০	৫৬০০
ঝিনাইদহ	১০০০	৮০০০
কুষ্টিয়া	৯৮০	৪৫০০
মেহেরপুর	২৫০	১৭০০
চুয়াডাঙ্গা	৫৪০	৪৮০০

খুলনা	১০০	৮০০
সাতক্ষীরা	৪২০	৪৩০০
বাগেরহাট	১০০	৮০০
রংপুর	৫০০	৪৩০০
গাইবান্ধা	৪০০	২৪০০
কুড়িগ্রাম	২০০	১৮০০
নীলফামারী	৬৭০	৫৪০০
দিনাজপুর	১০০০	৮০০০
পঞ্চগড়	১৫০	৩০০
ঠাকুরগাঁও	৪০০	৩০০০

উৎস : খাদ্যশস্য উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ১৯৯৪–৯৫

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

রসুন পেঁয়াজের মতো Liliaceae পরিবারভুক্ত একবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Allium sativum L. গাছের পাতা পেঁয়াজের পাতার মতই, তবে গোলাকার নয়, চেপ্টা ধরনের এবং কিছুটা নীলাভ প্রকৃতির। মূলগুচ্ছ প্রায় ১ ফুট অর্থাৎ ৩০ সে: মি: এর মতো গভীরতায় প্রবেশ করে এবং পার্শ্বদেশে ৯ ইঞ্চি অর্থাৎ ২৩ সে: মি: এর মতো ছড়িয়ে যায়।[১১] গাছের গোড়ায় কন্দ বৃদ্ধির পর্যায়ে ফুলের ডাট দেখা যায়, তবে পেঁয়াজের মতো সচারাচর তা দেখা যায় না— কালেভদ্রে তার দৃষ্ট হয় যাতে খুব ছোট ফুল ধরে এবং এক রকম ফল বা বীজ জন্মে। ইহা বুলবীল (bulbil) নামে পরিচিত আকারে ছোট, আকৃতিতে চেপ্টা এবং কাল রংয়ের। পেঁয়াজের চাষে যেমন বীজ ব্যবহার করা হয়, রসুনের চাষে সেইরূপ ব্যবহার করা হয় না।

রসুনের জাত বলতে আমাদের দেশে তেমন কিছু নেই। তবে 'বড় জাত' ও 'ছোটজাত'–- এই রকমভাবে রসুনের একটা শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় দু রকম রসুন দেখা যায়— ১. আশু জাত ও (২) নাবি জাত। প্রথমোক্ত অর্থাৎ আশু জাতের রসুনের কোয়া বাদামি রংয়ের, ফলন অধিক তবে স্থায়িত্ব কম। অন্যদিকে নাবিজাতীয় রসুনের কোয়া গোলাপি বর্ণের এবং উৎকৃষ্টতর।

চাষাবাদ পদ্ধতি

জমি প্রস্তুতি ও সার প্রয়োগ : চার পাঁচটি চাষ ও ২/৩টি মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে নরম করে প্রস্তুত করতে হয়। গোবর সার, সরিষার খৈল, ও ফসফেট সার জমি তৈয়ার করার সময়ই প্রয়োগ করা ভালো, তাতে এই সারগুলি মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যেতে পারে। পটাশ ও ইউরিয়া সার জমিতে বীজ অর্থাৎ রসুনের কোয়া রোপণের তিন চার দিন আগে অর্থাৎ জমি শেষবারের মতো চাষ মই দেওয়ার সময় প্রয়োগ করতে হয়। সার ব্যবহারের পরিমাণ নিম্নরূপ হতে পারে।

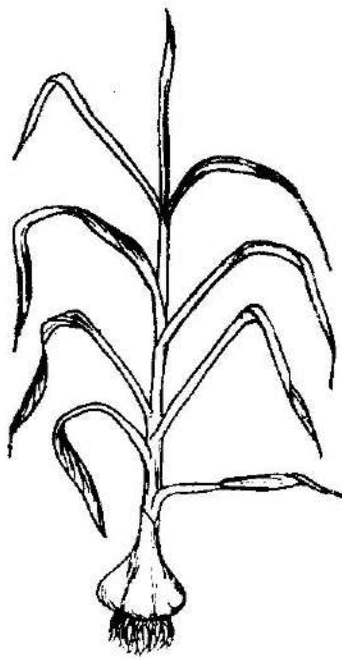

চিত্র : ৭.৩ রসুন গাছ

সারের	পরিমাণ প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
গোবর	১৫০–২০০ মণ	৫ টন
টি. এস. পি	২৫–৩০ সের	২৬৭ কেজি
মিউরেট অব পটাশ		৩৩৩ কেজি
ইউরিয়া		১১৭ কেজি
জিপসাম		১১১ কেজি

উৎস : মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৬

বীজ রোপণ : কার্তিক–অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে বীজ বপন করতে হয়। রসুনের কন্দের প্রতিটি 'কোয়া' বা কোষকে' বীজ বলা হয়। প্রতি হেক্টরে ৯৩ কেজির মতো বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ জমিতে এলোমেলোভাবে রোপণ না করে সারিবদ্ধভাবে রোপণ করা উচিত। দুই সারির মধ্যে দূরত্ব রাখা যায় ৯–১২ ইঞ্চ অর্থাৎ ২৩–৩০ সে: মি: এবং প্রতি সারিতে এক বীজ

থেকে অন্য বীজের দূরত্ব ৪–৫ ইঞ্চ অর্থাৎ ১০–১২ সে: মি:। সারিতে নিড়ির আগার সাহায্যে মাটি ফাঁক করে কোয়ার লেজের দিকটা উপরের দিকে রেখে বপন করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, বীজ যেন মাটির বেশি নিচে লাগানো না হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা : জমিতে বীজ রোপণের ৫–৭ দিনের মধ্যে চারা বের হয়ে আসে। চারার বয়স যখন ১৫/২০ দিনের মতো হয় তখন জমি নিড়েয়ে ঘাসগাছড়া পরিষ্কার করে দিতে হয় ; সেই সঙ্গে গাছের গোড়ার মাটিও নরম করে দেওয়া ভালো।

জমিতে রস থাকলে রসুন ক্ষেতে কোনো সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, তবে অনাবৃষ্টি বা অত্যধিক খরার দরুন মাটিতে রসের অভাব দেখা দিলে ২/৩টি হাল্কা সেচ দেওয়া ভালো। সেচ দেওয়ার পর নিড়ির সাহায্যে মাটির চাপ ভেঙ্গে দিলে কন্দের বৃদ্ধি সহজতর হয়। ইউরিয়া সার আগে জমিতে প্রয়োগ করে থাকলে এক বা দুই কিস্তিতে প্রতি সেচের আগে প্রয়োগ করতে হয়।

পেঁয়াজের মতো রসুনেও পোকা–মাকড় ও রোগ-বালাইর আক্রমণ তেমন কিছু নেই। তবে মাঝে মাঝে 'থ্রিপস' পোকার আক্রমণ হতে পারে। সাধারণত চৈত্র–বৈশাখ মাসে এই পোকার আক্রমণ হয় ; আক্রমণের সময় পোকা পাতার রস খেয়ে চোষে দুর্বল করে ফেলে। সুতরাং পোকার আক্রমণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই তা দমনের বন্দোবস্ত করতে হবে। ডাইমেক্রন অথবা সেভিন (৩৫ ভাগ শক্তিসম্পন্ন) ছিটিয়ে দিলে পোকা দমন হয়ে যায়।

রসুনের উত্তোলন : ফাল্গুনের শেষ হতে বৈশাখের মাঝামাঝি সময় রসুন বাত্তি হয়ে যায়। জমিতে বীজ বপনের ৪–৫ মাসের মধ্যে গাছ মরে যেতে থাকলে বুঝতে হবে রসুন উঠানোর সময় হয়েছে। কোদাল অথবা দেশী লাঙ্গলের 'ভাওরের' সাহায্যে রসুন উঠান যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে উঠানোর সময় রসুন যেন কাটা না পড়ে। জমি হতে উঠানোর পর ৩/৪ দিন ভালো রোদ দিলেই রসুন শুকিয়ে যায়।

ফলন : আমাদের দেশে সাধারণত প্রতি হেক্টরে ৪৬০০–৫৫০০ কেজি রসুন জন্মে। তবে উপরোক্ত বর্ণনামতো অর্থাৎ উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে একর প্রতি ১০০–১২৫ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৯২০০–১১৫০০ কেজি পর্যন্ত রসুন উৎপাদিত হতে পারে।

রসুন সংরক্ষণ : পেঁয়াজের চাইতে রসুন সংরক্ষণ করা সহজ। ভালোভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে রসুন আঁটি বেধে গুদাম ঘরের কোনো অবলম্বনে ঝুলিয়ে রাখলে রসুন প্রায় সারা বৎসর টিকে যায় ; কন্দের উপর হতে গাছের কাণ্ড কেটে নিয়েও রসুন শুকনা মেঝে বা মাচায় গুদামজাত করা যায়।

আদা

আদা একটি মসলাজাতীয় ফসল হলেও আমার প্রমুখ কৃষি বিজ্ঞানীগণ[১২] শস্যের শ্রেণিবিভাগ অনুসারে ইহাকে ঔষধজাতীয় শস্য (medicinal crops) হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করেছেন। ইহা হতে বোধগম্য হয় যে ঔষধ হিসেবে ইহার গুরুত্ব কতটুকু। সর্দি–কাশি বা পেটের গোলমাল হলে আমাদের বয়স্করা আদা খেতে উপদেশ দেন। আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রকারগণ বলেন আদা

রুচিকারক, স্বরবর্ধক, শূল-নিবারক, শুক্রবর্ধক ও বায়ু-নাশক।[৩,৯] রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে আদাতে নিম্নোক্ত উপাদান বর্তমান রয়েছে।[২,৯]

সারণি – ৩২ : আদার বিভিন্ন উপাদান ও পরিমাণ

উপাদান	পরিমাণ
জলীয় অংশ	৮০-৮২%
তৈল	১০%
প্রোটিন	২-২.৫%
শ্বেতসার	১১-১২%
আঁশজাতীয় অংশ	২.৩-২.৫%
খনিজ অংশ	১.১-১.৩%
থায়ামিন	০.১ মি: গ্রা: (প্রতি ১০০ গ্রামে)
রাইবোফ্লেভিন	০.১ মি: গ্রা: (প্রতি ১০০ গ্রামে)
নায়াসিন	১.০ মি: গ্রা: (প্রতি ১০০ গ্রামে)
ভিটামিন-সি	সামান্য

উপরোক্ত তালিকাভুক্ত উপাদান ছাড়াও আদাতে Zingerone $C_{11}H_{14}O_3$ এবং Zingiberol ($C_{15}H_2O_6$) নামে দুটি উপাদান বর্তমান আছে। প্রথমোক্ত উপাদানটির জন্য আদাতে ঝাঁজ থাকে এবং শেষোক্তটির জন্য এক রকম গন্ধ পাওয়া যায়।

সে যাই হোক, আমাদের দেশে প্রধান মসলাগুলির মধ্যে আদাও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, বিভিন্ন ব্যঞ্জন ব্যবহার করা ছাড়াও মাংস রন্ধনে আদার ব্যবহার অপরিহার্য। এতদ্ব্যতীত নানারকম চাটনী, পিকল্‌স (Pickles) এবং কেক তৈরিতেও আদা ব্যবহার করা হয়।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

আদার উৎপত্তিস্থান দক্ষিণ-এশিয়া বলিয়াই অনুমান করা হয়।[৩,৯] আজও সেই অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ আদা উৎপন্ন হয়। অতি প্রাচীনকাল হতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আদার চাষ হয়ে আসছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য আদা উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ও জাপান। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জ্যামাইকাকে 'আদার দেশ' নামে অভিহিত করা হয়।

বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ১৩০০০-১৪০০০ একর অর্থাৎ ৫২৬৩ হতে ৫৬৬৮ হেক্টর জমিতে আদার চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় প্রায় ৩৭০০০ মে. টন. আদা।[১] তবে ১৯৯৩-৯৪ সালে দেশে আদা উৎপন্ন হয় হেক্টরে আর উৎপন্ন হয় ৪০০০০ টন আদা।[১৩] উৎপাদনকারী জেলাগুলি হতে অনেক বেশি আদা উৎপন্ন হয়। আদা উৎপাদনে বাংলাদেশ এক সময় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এমনকি কিছু পরিমাণ আদা বিদেশেও রপ্তানি হয়। কিন্তু

আজকের দিনে দেশ আর আদা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। মাঝে মাঝে বিদেশ হতে আদা আমদানি করতে হয়। ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য আদা উৎপাদনশীল ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে আদার উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

মাটি ও জলবায়ু

আদার জন্য বেলে-দোয়াশ ও দোয়াশ মাটিই সর্বোৎকৃষ্ট। এঁটেল-দোয়াশ মাটিতেও আদার চাষ করা চলে। মাটি যে রকমই হউক না কেন তা সুনিষ্কাশনযুক্ত ও কিছুটা অম্লাত্মক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আদার জন্য বেশ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। যে সমস্ত অঞ্চলে বৎসরে ৮০-৯০ ইঃ অর্থাৎ ২০৩০-২০৮০ মিঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয় সেই সকল অঞ্চলে আদার চাষ ভালো হয়। মুক্ত সূর্যকিরণ আদা সহ্য করতে পারে না, তাই দেখা যায় কিছুটা ছায়াযুক্ত স্থানে আদার চাষ ভালো হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

আদা Zingiberaceae পরিবারভুক্ত দীর্ঘজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Zingiber officinale Rose. গাছ উচ্চতায় ৪৬-৬০ সেঃ মিঃ মতো হয় ; পাতা লম্বা ও চিকন—বোঁটার গোড়ার দিকটা চেপ্টা হয়ে একে অপরকে জড়িয়ে 'রাইজোমের' উপরে কৃত্রিম গুল্মাকার নরম কাণ্ডের সৃষ্টি করে (চিত্র ৭.৪)। রাইজোমের নিচের দিক হতে গুচ্ছমূল বের হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে এবং ২৩-৪০ সেঃ মিঃ গভীরতায় প্রবেশ করে; আদাতে কালেভদ্রে ফুল দেখা দেয় ; ফুল জন্মালেও তাতে বীজ হয় না। রাইজোম অর্থাৎ আদা ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের গোড়ায় সৃষ্টি হয়। ইহা পরিবর্তিত কাণ্ড বৈ আর কিছুই নয়। ইহা এমনভাবে গঠিত হয় যে এক একটি আদার ছড়া (রাইজোম) হাতের পাঞ্জার মতো দেখায়।

বাংলাদেশে যে সমস্ত আদার জাত রয়েছে সেগুলির বিজ্ঞানসম্মত কোনো শ্রেণিবিভাগ করা হয় নি। আঞ্চলিক নাম অনুসারেই কেবল কোনো কোনোটির নামকরণ করা হয়েছে, যেমন—রংপুরী আদা, খুলনাই আদা এবং টেংগুরী আদা। বিদেশের বাণিজ্যিক আদার মধ্যে 'বোল্ড জ্যামাইকা' (Bold Jamaica) 'কালিকট' বা 'কোচিন' (Calicut or Cochin), 'জাপানিজ' (Japanese) এবং ওয়েস্ট-আফ্রিকান' (West African) জাতের আদার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চাষাবাদ পদ্ধতি

জমি প্রস্তুতি : আদার জমি ৫/৬টি চাষ ও ২/৩টি মই দিয়ে গভীরভাবে চাষ করতে হয়। এখানে শুকনো অবস্থায় দুএকটি চাষ দিয়ে পক্ষকাল অপেক্ষা করার পর আবার চাষ দিতে হয়। আদার জমিতে পানি জমে উঠা একেবারে অবাঞ্ছিত। সেজন্য জমি চাষের পর ২০/৩০ ফুট অর্থাৎ ৬-৯ মিটার দূরে দূরে আড়াআড়িভাবে নালা কেটে দিতে হবে। যাতে বৃষ্টি বা সেচের পানি বের হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি নালা ৩০-৪৬ সেঃ মিঃ গভীর এবং ২৩-৩০ সেঃ মিঃ প্রশস্থ হওয়া ভালো।

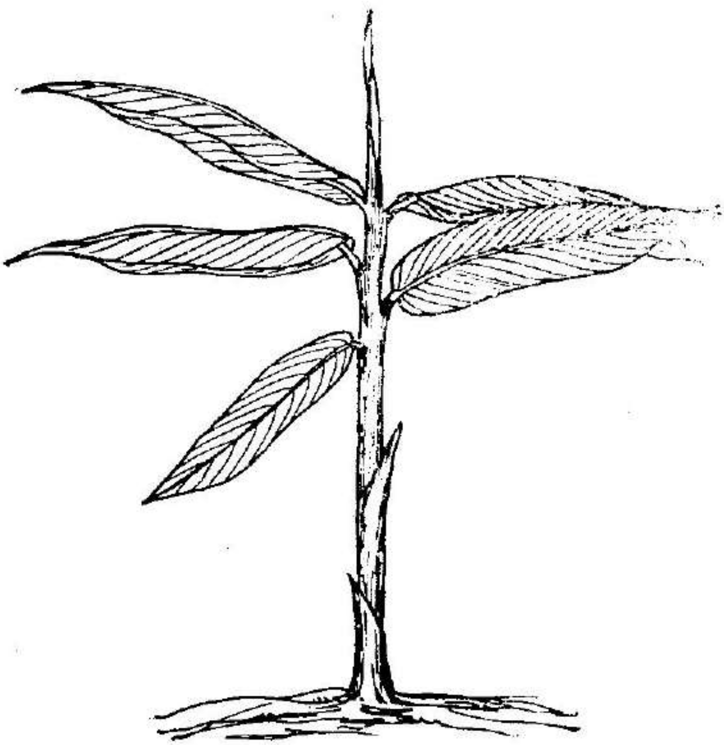

চিত্র : ৭.৪ আদা গাছ

সার প্রয়োগ : আদার ভালো ফলন পেতে হলে সার প্রয়োগ করা অতীব প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় কৃষাণীগণ ছাইয়ের গাদার কিনারায় দুই একটি আদার ফানা পুঁতে রাখেন। ইহাতে ক্রমাগত যে আদা জন্মে তাতেই তাঁদের সারা বৎসর চলে যায়। এভাবে আদা জন্মান পদ্ধতি যে জিনিসটির ইঙ্গিত দেয় তা হলো আদার চাষে পটাশজাতীয় খাদ্যোপাদান সরবরাহ করা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে গাদার ছাইই এই পটাশের যোগান দিয়ে থাকে। সুতরাং আদার চাষে পটাশজাতীয় সারের ব্যবহার অপরিহার্য। পটাশ সারসহ অন্যান্য আর যে যে সার যে যে পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে তা নিম্নে দেখান হলো :

সারের নাম	পরিমাণ
	প্রতি হেক্টর
ক. পচা গোবর অথবা আবর্জনা সার	৫ টন
খ. ইউরিয়া	১০৪ কেজি

গ. টি. এস. পি	২৬৭ কেজি
ঘ. এম. পি	১১১ কেজি
ঙ. জিপসাম	৩৩ কেজি
চ. জিংক অক্সাইড	৩ কেজি

উৎস : মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৬

গোবর খৈল ও টি. এস. পি. সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয় আর ইউরিয়া এবং মিউরেট অব পটাশ জমিতে চারা গজাবার পর দু কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভালো।

বীজ বপন : আদা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বপন করে ফেলতে হয়, তবে জমি রসযুক্ত থাকলে ফাল্গুন-চৈত্র মাসেও আদা রোপণ করা যায়। রোপণের জন্য হেক্টর প্রতি ১৫০০-২৫০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। সারিতে বীজ রোপণের দূরত্বের ব্যবধানের জন্যই বীজের হারের এরূপ তারতম্য ঘটে থাকে।

প্রস্তুত জমিতে লাঙ্গলের সাহায্যে ৪৫ সে: মি: -৬০ সে: মি: ব্যবধানে ৫-১০ সে: মি: গভীর ভাওর অর্থাৎ নালা কাটতে হবে। তৎপর সারির ঐ নালার মধ্যে ২০-৩০ সে: মি: দূরে দূরে বীজ লাগিয়ে তার উপর উঁচু করে মাটি চাপা দিতে হবে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে আদার ফানার আঙ্গুলগুলি না ভেঙ্গে আস্ত ফানা লাগানই ভালো, কারণ তাতে চারা ভালো গজায় এবং পরিণামে ফলন ভালো হয়। এই সম্বন্ধে তাই হয়তো খনার বচনে বলা হয়েছে।

"আদা লাগা ফানা ফানা
হলুদ লাগা কোণো কোণো"

গেজওয়ালা অর্থাৎ কিছুটা অঙ্কুরিত আদার ফানা মাটির ২-২½ ইঃ অর্থাৎ ৫-৬ সে: মি: মাটির নিচে বপন করতে হয়। অঙ্কুরিত আদার ফানা রোপণ করলে এবং মাটিতে প্রয়োজনীয় রস থাকলে তা ১০-১২ দিনের মধ্যে গজিয়ে উঠে।

পরবর্তী পরিচর্যা : আদার সারিগুলি খড়কুটা দিয়ে ঢেকে দেওয়া ভালো। ইহাতে জমিতে রস ও ঠাণ্ডা পরিবেশ বজায় থেকে বীজের অঙ্কুরোদগমে সহায়তা করে। তদুপরি আগাছা ততটা গজাবার সুযোগ পায় না। উপরন্তু খড়কুটা পরিশেষে পচে জমিতে সারের কাজ দেয়।

সারিতে খড়কুটা দেওয়া হলে জমিতে আগাছা কম জন্মালেও খড়কুটাবিহীন অবস্থায় আদার ক্ষেতে প্রচুর ঘাস জন্মে। তাই মাস খানেকের মধ্যেই প্রথমবারের মতো আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। তৎপর আরো দুই একবার আগাছা পরিষ্কার করে দেওয়া ভালো, তাতে ফলন আশানুরূপ হবে।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আদা বপন করলে অথবা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে খরা দেখা দিলে আদার ক্ষেতে দুই একটি সেচ দেওয়া আবশ্যক। প্রতিটি সেচের পর মাটি চাঁপ বেঁধে গেলে তা নিড়ির সাহায্যে ভেঙ্গে দিয়ে মাটি নরম বা আলগা করে দিলে ভালো হয়। ইউরিয়া ও মিউরেট অব পটাশ সার প্রথমবার চারা গজাবার মাসখানেক পরে এবং দ্বিতীয়বার প্রথম প্রয়োগের দু-তিন মাস পর প্রয়োগ করা সুবিবেচনার কাজ হবে।

ক্ষেতে আদা দণ্ডায়মান পানি সহ্য করতে পারে না, কাজেই আদা ক্ষেতে পানি নিষ্কাশনের দিকে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে। অধিক বৃষ্টিপাত অথবা অতিরিক্ত সেচের ফলে ক্ষেতে পানি জমে গেলে তা ক্ষেতের চারিদিকে নালা কেটে তৎক্ষণাৎ বের করে দিতে হবে। আদা সারি করে চাষ করা হয় বলে এবং সারিতে আলুর মতো গোড়ায় মাটি দেওয়া হয় বলে আদা ক্ষেতের পানি নিষ্কাশনের কাজ সহজতর হয়।

বাংলাদেশে আজ পর্যন্তও আদা কোনো প্রকার মারাত্মক পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায় নি।[৩] মাঝে-মধ্যে আদা মাছিপোকা (gingerfly) এবং স্কিপার পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। মাছিপোকার কীড়া আদাগাছ ও তাহার শিকড় আক্রমণ করে। এই পোকার আক্রমণে প্রতি একরের জন্য ৬.৪ সি. সি. ফলিডল-এম.৫০ নামক ঔষধ সাড়ে বার সের পানির সঙ্গে মিশায়ে দুই তিন সপ্তাহ পর পর গাছের উপর প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যাবে।

আদার বিভিন্ন প্রকার রোগের মধ্যে 'পচা রোগ' (soft rot) সবচাইতে মারাত্মক। এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত গাছের পাতা স্বাভাবিক রং হারিয়ে ফেলে এবং অগ্রভাগ হলুদ রং ধারণ করতে থাকে। ক্রমান্বয়ে পাতা শুকিয়ে যায় এবং রোগজীবাণু গাছের মধ্য দিয়ে মাটির নিচে আদাতে পৌঁছে যায়। এই রোগ প্রতিকারের জন্য বোরদো-মিকচার ১৩/১৫ দিন অন্তর অন্তর সেচযন্ত্রের সাহায্যে গাছে প্রয়োগ করলে রোগ দমন হয়। ক্ষেতে যাতে পানি না জমে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। একই জমিতে প্রতি বৎসর আদার চাষ না করে অন্যান্য ফসল যেমন-মরিচ, চীনাবাদাম বা বেগুন ইত্যাদির চাষ করে পর্যায়ক্রমে আদার চাষ করলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

আদা উত্তোলন : আদা ৯-১০ মাসের ফসল। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ রোপণ করলে পরবর্তী মাঘ-ফাল্গুনে আদা তোলা যায়। এই সময়ের মাসখানেক আগে হতেই আদার পাতা শুকিয়ে উঠে। তখন পাতাগুলি কুপিয়ে দিকে কেটে দিয়ে ২/৩ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়। তৎপর কোদালির সাহায্যে কুপিয়ে আদা তুলতে হয়। এইভাবে তোলার পর আদার ফানার গায়ে লেগে থাকা মাটি ও শিকড় পরিষ্কার করে নিতে হয়। তৎপর পানিতে ধৌত করে পরিষ্কার করার পর রৌদ্রে দেওয়া হয়। দুই-একদিন এইভাবে রৌদ্রে শুকানোর পর আদা গুদামজাত করা হয়।

ফলন : বাংলাদেশে আদার গড়-পরতা ফলন অত্যন্ত কম, প্রতি একরে মাত্র ১০০-১২০ মণ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ৯২-১১৫ কুইন্টাল। উন্নত পদ্ধতিতে চাষবাস করলে ফলন ২০০ মণ বা ১৮৪ কুইন্টাল পর্যন্ত হতে পারে।

আদা সংরক্ষণ

আদা একটি পচনশীল শস্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আদা হতে মাটি ভালোভাবে ছাড়িয়ে এবং সেগুলি দুই একদিন রৌদ্রে শুষ্ক করার পর গুদামজাত করা হয়। আদাতে আবার পানির ভাগ কমে গেলে ইহা এমনভাবে শুকিয়ে যায় তখন তা আর ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। অন্যদিকে আবার পানির ভাগ বেশি থাকলে আদা সহজেই পচে যায়।

এই উভয় সঙ্কটের মাঝে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রয়–বিক্রয়ের জন্য আদাকে Dried বা Cured ginger এবং preserved বা green ginger এই দুইভাবে প্রস্তুত করা হয়।[৮] Cured ginger প্রস্তুত করার জন্য খোসা ছাড়ান 'রাইজোম' রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়, কখনো কখনো খোসা ছাড়াবার আগে আদাকে আংশিক সিদ্ধ করে নেওয়া হয়। বাজারে ইহা কালো আদা (black ginger) নামেও পরিচিত। তবে রাইজোম ব্লিচিং করে নিলে তা সাদা আদাতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ (preserved ginger) প্রস্তুত করতে হলে কচি আদা শুকিয়ে পরিস্কার করে পানিতে সিদ্ধ করা হয়, তৎপর খোসা ছাড়িয়ে চিনির সিরাপে সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে আদা সংরক্ষণ চীন দেশেই বেশি প্রচলিত।

হলুদ

আদার পর পরই যে মসলা ফসলটির নাম করতে হয় তা হলো হলুদ। বাংলাদেশের এমন কোনো ব্যঞ্জন নেই যাতে রাঁধুনীরা হলুদের ব্যবহার না করে। আদার তুলনায় হলুদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা রঞ্জকের কাজেও ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে বহুদিন আগে হতেই হলুদের রংয়ের সাহায্যে পশম ও রেশম রাঙ্গানো হয়ে আসছে।[২,১০] প্রাচীনকাল হতে হলুদ পাক–বাংলা–ভারত উপমহাদেশে সৌন্দর্য চর্চায়ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নববধূ ও বর বিবাহের আগে হলুদ মেখে অবশ্যই গোসল করে, ইহাতে ত্বকের উজ্জ্বল্য ও মসৃণতা বৃদ্ধি পায়। কেউ কেউ বলে থাকেন, মিশরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সৌন্দর্যের রানী ক্লিওপেট্রাও নাকি তার সৌন্দর্য–চর্চায় হলুদ ব্যবহার করতেন।

স্বল্প পরিসরে হলেও হলুদ আদার মতো ঔষধ রূপেও ব্যবহৃত হয়। আঁতের ঘা নিরাময়ে ও ছোট কৃমি নিবারণে হলুদের রস ভালো কাজ করে বলে আয়ুর্বেদী মতে বিশ্বাস করা হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে হলুদে Turmerone ($C_{15}H_{20}O$) এবং curcumine ($C_{21}H_{20}O_6$) নামে দুটি পদার্থ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হলুদের সুগন্ধের জন্য এবং দ্বিতীয়টি ইহার 'হলুদ রং–এর জন্য দায়ী।[৬]

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

ইন্দোচীন এবং দক্ষিণ–প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে হলুদের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[৬] নিরক্ষীয় অঞ্চলের অনেক স্থানে আজকাল হলুদের চাষ হতে দেখা যায়। তবে সারা পৃথিবীতে হলুদ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য দেশ হচ্ছে ভারত, বাংলাদেশ ও ফরমোজা।[২,১]

আগের দিনে বাংলাদেশে যথেষ্ট হলুদের চাষ হতো, কম করে হলেও ৪০–৫০ হাজার একর জমিতে হলুদের আবাদ হতো আর উৎপন্ন হতো সাত লক্ষ মণ শুষ্ক হলুদ।[১] আজকাল হলুদের চাষ অনেকটা কমে গিয়েছে ; ১৯৭৯–৮০ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় সে বৎসর মাত্র ৩৪,৩৩০ একর অর্থাৎ ১৩৮৯৮ হেক্টর জমিতে হলুদের চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় ২৪০০০ টন শুকনো হলুদ।[৮] গত এক দশকে হলুদের জমি অন্য ফসল, যেমন— আঁখ, তুলা প্রভৃতির অধীনে চলে যাওয়ায় এটির আবাদ বৎসর বৎসর কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের ছয়টি জেলায় প্রধানত হলুদের চাষ হয়। এই জেলাগুলি হচ্ছে রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, রংপুর যশোর এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম। উল্লেখ্য যে এই ছয়টি জেলায় দেশের সমুদয় হলুদের ৭০ ভাগ উৎপন্ন হয়। এলাকা হিসাবে হলুদ উৎপাদনে নীলফামারী, গাইবান্ধা, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

মাটি ও জলবায়ু

দোঁয়াশ ও বেলে দোঁয়াশ মাটি হলুদের জন্য সব চেয়ে উপযোগী। বেলে ও এঁটেল মাটি হলুদের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। অন্যান্য মাঝারি শ্রেণির সব মাটিতেই হলুদের চাষ করা চলে, তবে আসল কথা এই যে হলুদের জমি সুনিস্কাশনযুক্ত হওয়া চাই।

আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়া হলুদ চাষের জন্য প্রয়োজন। বলা যায় আদার চাষে যেরূপ বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়, সেরূপ পরিবেশ হলুদের জন্যও প্রয়োজন। কিন্তু আদা ও হলুদ চাষের আবহাওয়া সম্বন্ধীয় একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যেক্ষেত্রে আদা কিছুটা ছায়াযুক্ত স্থানে লাভজনকভাবে উৎপাদিত হতে পারে সেক্ষেত্রে হলুদের বেলায় তা সম্ভব নয়। ছায়াযুক্ত স্থানে হলুদের ফলন কম হয় এবং গুণাগুণেও তা নিকৃষ্ট হয়।[২]

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

উদ্ভিদ জগতে হলুদের স্থান আদার অনুরূপ। আদার মতো ইহাও দীর্ঘজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ ; Zingiberaceae পরিবারভুক্ত ও ইহার ভূ-নিম্নস্থ 'রাইজোম' পরিবর্তিত কাণ্ড বিশেষ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Curcuma longa অথবা Curcuma domestica, গাছ দেখতে বন্য শটী গাছের অনুরূপ (চিত্র ৭.৫) ; উচ্চতায় ৬০ সে: মি:-১ মিটার, এক একটি প্রশস্ত (১০-২০ সে: মি:) পাতা বেশ লম্বা (৩০-৪৫ সে: মি:) ধরনের এবং প্রতিটি পাতায় চেপ্টা বোটা একটির উপর অপরটি সজ্জিত হয়ে গাছের কৃত্রিম কাণ্ডের সৃষ্টি করে। গাছের ৭-৮ মাস বয়ঃক্রমকালে 'স্পাইকজাতীয়' ফুলগুচ্ছ দেখা দেয়, ফুলগুচ্ছে অনেকগুলি গোলাপি বর্ণের উপপত্র দেখা যায়। প্রতিটি ফুলে বেশ মধু মজা থাকে, তবে ফুল হতে কোনো ফল বা বীজ উৎপন্ন হয় না।

বাংলাদেশে যে সমস্ত হলুদের জাত দেখা যায় সেগুলিকে বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করা হয় নি। উৎপন্ন এলাকায় কেবল স্থানীয়ভাবে ইহাদের বিভিন্ন জাত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে যেমন— ১. আরাণী, ২. মহিষাবাটি, ৩. বাঁশঝড়িয়া, ৪ হরিণপলী এবং ৫. আদাগতি। হলুদের এইরূপ বিভিন্ন জাতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কি কি আছে সেই সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় নি। তবে হলুদের জাত সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে কামালউদ্দীন[৪] আমাদের দেশের হলুদকে রং ও স্বাদের দিক হতে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

ক. গাঢ় রংয়ের হলুদ : এই জাতীয় হলুদের ভিতরের রং গাঢ় বর্ণের, ইহার চাষ অল্প-বিস্তর সকল জেলাতেই হয়। এই জাতীয় হলুদের ছড়া বেশি পরিমাণে জন্মে এবং সেগুলি খাটো ও মোটা ; ছড়ার উপরের চামড়া ঈষৎ লাল। কাঁচা অবস্থায় চিবাইলে ইহা তিক্ত বলে অনুভূত হয় না। এই জাতের হলুদের একটি উপজাত আছে। এই উপজাতের গাছের পাতার বোটা ঈষৎ লাল।

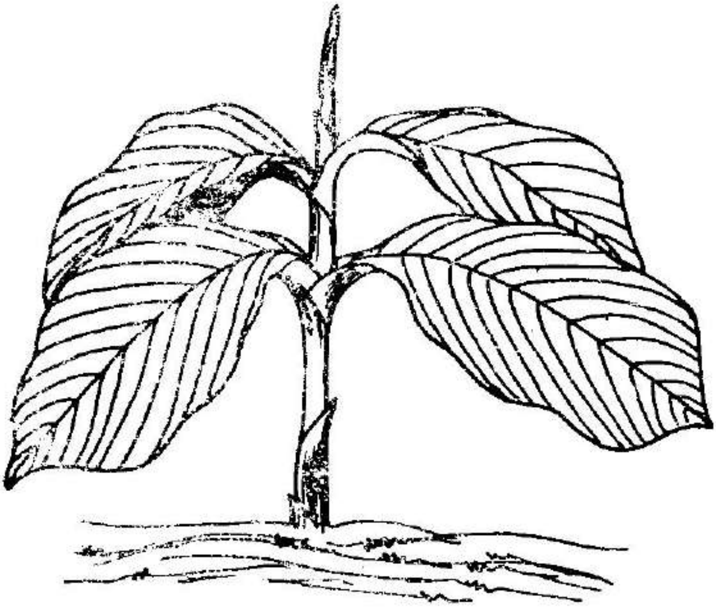

চিত্র : ৭.৫ হলুদ গাছ

খ. হাল্কা রংয়ের হলুদ : এই জাতীয় হলুদের ভিতরের রং হাল্কা হলুদ বর্ণের। ছড়াছড়ি লম্বা, তবে সংখ্যায় কম জন্মে এবং উপরের চামড়ার রং ধূসর বর্ণের। সকল জেলাতেই ইহার চাষ হয়। কাঁচা অবস্থায় চর্বণ করলে তিক্ত স্বাদ লাগে। এই জাতকে একটি নিকৃষ্ট জাত বলে গণ্য করা হয়। বিদেশে ইহার চাহিদা মোটেই নেই।

হলুদের জাতকে আবার কেউ কেউ 'দেশী' ও বিদেশী'— এই দুই সাধারণ নামে শ্রেণিভুক্ত করতে চেয়েছেন। বিদেশী হলুদ আবার 'পাটনাই' বা 'ইরোদ' নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে প্রক্রিয়াজাত করার পর হলুদের মোথা হতে যে হলুদ পাওয়া যায় সেগুলিকেই পাটনাই হলুদ নামে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা ইউনিটের বিজ্ঞানীগণ ডিমলা ও সিন্দুরী নামে দুটি হলুদের জাত উদ্ভাবন করেছে যা ১৯৮৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে।[১৬]

জমি প্রস্তুতি : আমাদের দেশের চাষীরা হলুদের জমি তত ভালোভাবে প্রস্তুত করার প্রয়োজন মনে করেন না, কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে হলুদের জমি খুব ভালোভাবে প্রস্তুত করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে জমিতে ৫/৬টি চাষ ও ৩/৪টি মই দিয়ে মাটি যতদূর সম্ভব গুড়া ও আগাছামুক্ত করে চাষ করতে হবে। জমির চারিপাশে এমনভাবে নালা কাটতে হবে যাতে বর্ষাকালীন অতিরিক্ত পানি সহজেই নিষ্কাশিত হয়ে যেতে পারে।

সার প্রয়োগ : হলুদ চাষে সার ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। জৈব ও অজৈব উভয় প্রকারের সার ব্যবহার করার প্রয়োজন রয়েছে. নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে :

সারের নাম	পরিমাণ প্রতি হেক্টর
গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	২২০ কেজি
টি. এস. পি	১৮০ কেজি
এম . পি	১৭০ কেজি
জিপসাম	১১১ কেজি
জিংক অক্সাইড	৩ কেজি

উৎস : মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫

গোবর, সরিষার খৈল ও টি. এস. পি জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া ও পটাশ দুই কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ হিসেবে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রথম কিস্তি গাছ গজাইবার মাস খানেক পরে এবং দ্বিতীয় কিস্তি মাস তিনেক পরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই দুই সময়েই জমি হতে আগাছা পরিষ্কার করার পর পরই টপ–ড্রেসিং করা বিধিসম্মত।

বীজ বপন : বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস হলুদ রোপণ করার সময়। তবে সেচের সুবিধা থাকলে চৈত্র মাসেও বীজ বপন করা যায়। বীজের জন্য হলুদের মোথা এবং রাইজোম বা ছড়া উভয়ই ব্যবহার করা যায়, তবে বীজ হিসেবে ছড়ার চেয়ে মোথাই শ্রেয়। কিন্তু মোথা পরিমাণে বেশি লাগে এবং ইহার মূল্যও অধিকতর বলে ছড়া বা রাইজোমই বীজ হিসেবে সাধারণত ব্যবহার করা হয়। ছড়া ভেঙ্গে আঙ্গুলগুলি (fingers) লাগাতে হয়। আদার ন্যায় আস্ত ছড়া বপন করলে ফসল ভালো হয় না ; বীজের পরিমাণও বেশি লাগে বলে খরচ বৃদ্ধি পায়। বীজ হিসেবে মোথা ব্যবহার করলে একর প্রতি ২০–২৫ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৫০–৬২ মণ লাগে, আর ছড়া ব্যবহার করলে একর প্রতি ১৫ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ১১১১–১৩৯৮ কেজি লাগে।

দুই রকম পদ্ধতিতে হলুদের বীজ জমিতে বপন করা যায় : ১. ভেলী পদ্ধতি এবং ২. জুলি পদ্ধতি।

ভেলী পদ্ধতি (ridge method) : এই পদ্ধতিতে ৪৫–৬০ সে: মি: দূরে দূরে সারি টানিতে হয়। ঐ টানা অর্থাৎ চিহ্নিত সারির উপর ৮–৯ ইঞ্চ অর্থাৎ ২০–২৩ সে: মি: দূরে দূরে বীজ রেখে মাটি চাপা দিতে হয়। দুই সারির মধ্যবর্তী জায়গা হতে কোদালের সাহায্যে মাটি উঠিয়ে এমনভাবে বীজের উপর দেওয়া হয় যাতে প্রতিটি সারির উপর ৫/৬ ইঞ্চ অর্থাৎ ১২–১৫ সে: মি: উচু মাটির একটি 'কেইলের' সৃষ্টি হয়।

জমি পদ্ধতি (furrow method) এই প্রথায় উপরোক্ত মাপে অর্থাৎ ৪৫–৬০ সে: মি: দূরে দূরে দাগাঙ্কিত লাইন না টেনে একটি দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে ৩–৪ ইঞ্চ অর্থাৎ ৭–১০ সে: মি: গভীর করে জুলি বা 'ভাওর' টেনে নিতে হয়। তৎপর প্রতিটি জুলিতে ৮–৯ ইঞ্চ অর্থাৎ ২০–২৩ সে: মি: দূরে দূরে বীজ ফেলে তার উপর সমান করে মাটি চাপা দেওয়া হয়। $1\frac{1}{2}$ হতে ২ মাস পর চারা গজায়ে উঠলে দুই সারির মধ্যবর্তী জায়গা হতে কোদালীর সাহায্যে মাটি উঠিয়ে কয়েকবার (দুই বারে) গাছের গোড়ায় দিতে হয়।

উপর্যুক্ত দুইটি পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে হলুদের ফলন ভালো হয়, কারণ কেইল বা সারির মাটি আটসাট না হয়ে নরম থাকে বলে হলুদের ফানা বা ছড়া বেশি ও আকারে বড় হয় ; তদুপরি সারি হতে হলুদ সহজে উঠানো যায়। পদ্ধতিটির অসুবিধা এই যে বীজ বপনের পর পরই বৃষ্টি হয়ে গেলে সারির মাটি নেমে আসে এবং মাটি কুপিয়ে আবার কেইলের উপর দিতে হয়। কয়েকবার এই রকম হলে খরচ বেশ বেড়ে যায়। তবে ফলন বেশি হওয়ায় খরচ পুষিয়ে যায়। দ্বিতীয় বা শেষোক্ত পদ্ধতিটির সুবিধার চাইতে অসুবিধাই বেশি। হলুদের বৃদ্ধিকালীন সময়ের মধ্যে এবং অধিক বৃষ্টিপাত হলে জুলির মাটি শক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে হলুদের ছড়া বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পায় না, ফলে ছড়া সংখ্যায় কম এবং ছোট হয় ; পরিণামে ফলন কমে যায়। পদ্ধতিটির সুবিধা এই যে রসযুক্ত মাটিতেও বীজ গজাবার মতো রস থেকে যায়, বৃষ্টিতে মাটি সহজে অন্যত্র সরে যায় না। তবে তুলনামূলকভাবে শেষোক্ত পদ্ধতিটির চাইতে প্রথমোক্ত পদ্ধতিটি শ্রেয়।

পরবর্তী পরিচর্যা : খরিপ মৌসুমে অর্থাৎ বর্ষাকালীন সময়ে হলুদের চাষ করা হয় বলে হলুদ ক্ষেতে যথেষ্ট আগাছা গজাতে পারে। মাস দুয়েকের মধ্যে প্রথমবারের মতো ক্ষেতের আগাছা নিড়িয়ে কুড়িয়ে পরিষ্কার করে দিতে হয়। আবার মাস দুয়েক পর দ্বিতীয় বা শেষবারের মতো আগাছা পরিষ্কারের কাজ সারিয়ে ফেলতে হয়। এই দুইবার আগাছা পরিষ্কারের পর পরই ইউরিয়া ও পটাশ সারের বাকি অংশ গাছের গোড়ায় নিড়ীর সাহায্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া ভালো।

সারা বর্ষাকালীন সময়ের মধ্যে হলুদ জন্মায় বলে ক্ষেতে জলাবদ্ধতা দেখা দিতে পারে। আদার ন্যায় হলুদ এমনই একটি ফসল যা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সুতরাং ক্ষেতে পানি মাত্রই তা নালাপথে দূরীভূত করতে হবে। ক্ষেতের চারিদিকে নালা কেটে রাখলে বৃষ্টির দরুন অতিরিক্ত পানি যে সহজেই নিষ্কাশিত হতে পারে একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। খরার দরুন হলুদক্ষেতের জমিতে রসের অভাব হলে দুই একটি সেচ দেওয়া কর্তব্য, তাহলে ফলন কমে যাবার আশঙ্কা থাকে না। হলুদের অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই তেমন কিছু আমাদের দেশে নেই। মাঝে-মধ্যে 'স্কিপার' ও 'থ্রিপস' পোকার আক্রমণ দেখা যেতে পারে।

হলুদ উত্তোলন : পৌষ-মাঘ মাসে হলুদ গাছের পাতা মরতে থাকে। এই অবস্থা গাছের গোড়ায় হলুদ বাড়ি হবার ইঙ্গিত দেয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে অর্থাৎ বীজ বপনের ৯-১০ মাস পর হলুদ তোলার উপযুক্ত হয়। কোদালীর সাহায্যে কুপিয়ে হলুদ তোলা যায়।

যে রকম ভাণ্ডেই হলদ সিদ্ধ করা হউক না কেন সেটিতে প্রায় গলাগলা পানিতে ভর্তি করে আস্তে আস্তে হলুদ সিদ্ধ করাতে হয়। মোথা ও ছড়া হলুদ আলাদা আলাদাভাবে সিদ্ধ করা ভালো। কারণ, মোথা হলুদ সিদ্ধ করতে সময় বেশি লাগে। জ্বালানির কাজ প্রায় হলুদের শুকনা পাতাতেই হয়ে যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক জ্বাল দিলে যখন পানিতে ২/৩টি 'বলক' উঠে তখনই বুঝতে হবে সিদ্ধ করার কাজ সমাধা হয়েছে। অথবা হাতে টিপ দিলে যদি ছড়া নরম মনে হয় তখনও সেই রকম বুঝতে হবে। এই কাজটিতে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, কারণ হলুদ কম বা বেশি সিদ্ধের কোনোটাই হওয়া উচিত নয়। বেশি সিদ্ধ হলে হলুদের রং বাদামি বা কাল হয়ে যায়। আর কম সিদ্ধ হলে হলুদ ভালোভাবে শুষ্ক হয় না এবং রংও উজ্জ্বল হয় না। এক 'চবা' হলুদ নামিয়ে নিয়ে ভাণ্ডের গরম পানি ফেলে দিয়ে পুনরায় হলুদ সিদ্ধের কাজে ব্যবহার করা সুবিবেচনার কাজ, কারণ তাতে কম সময়েই অর্থাৎ কম জ্বালানি ব্যবহার

করেই কয়েকবার হলুদ সিদ্ধ করা সম্ভব হয়। হলুদ সিদ্ধ করার সময় কখনো কখনো ভাতে কিছু হলুদ পাতা দেওয়া হয়---বিশ্বাস তাতে হলুদের রং উজ্জ্বল হয়। কিন্তু কামালউদ্দীন[৩] বিশ্বাস করে যে এই ধারণা ঠিক নয়। আবার আয়ারের[১০] বিবরণীতে দেখা যায় ভারতে হলুদ সিদ্ধ করার সময় একটুখানি গোবর যোগ করা হয়। কেন ইহা করা হয় সেই কথার অবশ্য কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই।

সিদ্ধ হলুদ রৌদ্রে শুকান যায়। ভালো রোদ থাকলে ৭/৮ দিনেই শুকানোর কাজ হয়ে যায়। আর রোদ কম থাকলে হলুদ শুষ্ক করতে সপ্তাহ দুইয়ের মতো সময় লাগতে পারে। মোথা হলুদ ও বড় আকারের ছড়া লম্বালম্বিভাবে ফালি করে দিলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। কাঁচা ও শুকনা হলুদের অনুপাত ৪ঃ১ অথবা ৫ঃ১ অর্থাৎ ৪/৫ মণ কাঁচা হলুদ হতে ১ মণ শুষ্ক হলুদ পাওয়া যায়।

ফলন : বাংলাদেশের হলুদের গড়পরতা ফলন অত্যন্ত কম। প্রতি হেক্টরে ১২–১৮ কুইন্টাল অর্থাৎ ১৭০০–১৮০০ কেজি শুকনা হলুদ পাওয়া যায়। উন্নত পদ্ধতি ও যত্ন সহকারে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ২০–২৫ টন কাঁচা হলুদ পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আহমদ, কাঃ ফুল-ফল ও শাক-সবজী, ১৯৬৯। ২য় সংস্করণ প্রকাশনায় : আলহাজ কাছিমউদ্দিন, দাশদী, চাঁদপুর, কুমিল্লা। পৃ. ৪৫১–৪৬১।
২. ঐ, পৃ. ৪৬৩–৬৬।
৩. কামালউদ্দীন, আ. স. ম. ঃ সবজীর চাষ, ১৩৭৩। প্রকাশনায় ঃ কামরুন নাহার, ২/২৪ ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং স্টেইট, ঢাকা-৭। পৃ. ৩১০–১৭।
৪. ঐ, পৃ. ৩২৩–২৯।
৫. ঐ. পৃ. ৩৩৭–৩৪৩।
৬. ঐ, পৃ. ৩৫১–৩৬১।
৭. মজুমদার মঃ পূর্ব ভারতের ফসল ১৯৮১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ। ৬/এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা—৭০০০১৩। পৃ. ৩৯৩।
৮. রশিদ, মা ঃ বাংলাদেশের সবজী, ১৯৭৬। বাংলা একাডেমী, ঢাকা -২। পৃ. ৪৪৫–৪৫৭।
৯. ঐ, পৃ. ৪৬০–৬৬।
১০. Aiyar. A. K. Y. N : Field Crops of India, 1947. Bangalore. Printed by the Superintendent at the Govt. Press. pp. 326-339.
১১. Ibid. pp. 383.
১২. Ibid. pp. 567.
১৩. Bangladesh Bureau of Statistics : 1995 Statistical Yearbook of Bangladesh.
১৪. Ibid, pp. 244-245.
১৫. Ministry of Agriculture : Development Statistics of Bangladesh. Series No. 6. Dec. 1981. p. 12.
১৬. Seed Certification Agency : Approved crops varieties. 1995.

অষ্টম অধ্যায়
ফলমূল জাতীয় শস্য
FRUIT CROPS

খাদ্যবস্তু হিসেবে ফলের স্থান অতি উচ্চে। উন্নত দেশের লোকজনের খাদ্যতালিকায় ফল অবশ্যই যুক্ত থাকে। আমাদের দেশে প্রধানত রোগীকেই ফল খাওয়ানোর কথা চিন্তা করা হয়। এমন পরিস্থিতির অবশ্য কারণও আছে। বাজারে ফলের দাম অত্যন্ত বেশি বলে তা অনেকের ক্রয়-ক্ষমতার উর্ধ্বে তবে কারো কারো ক্রয় করার ক্ষমতা থাকলেও ফল খাওয়ার প্রয়োজনের কথা ততটা গুরুত্ব সহকারে মনে করেন না।

ফলের খাদ্যমান ও সহজপাচ্যতার কথা ভেবে ফলকে এত উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্যরক্ষাকারী খাদ্যোপাদান খনিজ (ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ) ও ভিটামিন (এ,বি-১ বি-২, সি) যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান থাকে। অন্যান্য খাদ্যোপাদান —শ্বেতসার, আমিষ এবং চর্বিও কিছু কিছু থাকে। ফলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সেগুলি কোনোরূপ রন্ধন না করে প্রায় ক্ষেত্রেই সরাসরি খাওয়া যায় বলে খাদ্যমানের দিক হতে ফল ভক্ষণকারী যথেষ্ট উপকৃত হয়।

আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে পেঁয়ারা আনারস, কমলালেবু, আঙ্গুর, পীচ, পিয়ার, জলপাই প্রভৃতি ফলজাতীয় শস্য। ইহাদের অধিকাংশই গোলাপ অর্থাৎ (Rosaceae) পরিবারের অন্তর্গত। নিরক্ষীয় নাতিশীতোষ্ণ ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে উপরোক্ত বহু প্রকার ফল জন্মে। তবে ফল উৎপাদনের দিক হতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস, কলা ছাড়াও আরো বহু রকম ফল জন্মে। অনেকের ধারণা আমাদের দেশের ফলের চাইতে বিদেশী ফল, যেমন— আপেল, আঙ্গুর, পীচ অনেক উন্নত মানের। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। আম, কলা, আনারস ও পেঁপের মান ঐ সমস্ত ফলের নিচে নয় ; আম এমনি একটি ফল যা অতি উঁচু মানের এবং এজন্য ইহাকে "প্রাচ্যের ফলের রাজা" (King of fruits of the East) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ফলগুলির মধ্যে যে কয়েকটি পাহাড়ি বা পার্বত্য অঞ্চলে জন্মে সে কয়টিই কেবল এই পুস্তকে আলোচনা করা হলো।

আনারস

'আনারস' নামটি একটি পুর্তুগিজ শব্দ 'Ananas' হতে গৃহীত হয়েছে। 'Ananas' শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'একটি চমৎকার ফল' পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ইহা

একটি সমাদৃত ফল। ফলটি খেতেও যেমন সুস্বাদু গুণেও তেমনি সমৃদ্ধ। কমলালেবুর মতো ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন– 'সি' আছে, তদুপরি কিছু পরিমাণে ভাইটামিন– 'এ' 'বি' এবং ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং লৌহের মতো মূল্যবান খনিজ লবণও রয়েছে সারণি-৩২।[৫] কারো খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি এসে গেলে আনারস ভক্ষণে মুখের রুচি ফিরে আসে। তাই দেখা যায় সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত রোগীকে ডাক্তার আনারস খেতে উপদেশ দেন ; ইহাতে ভাইটামিন–'সি' রোগীর সর্দি উপশমে সহায়তা করে আর ফলের টক-মিষ্টি স্বাদ রোগীর মুখে খাওয়ার স্বাদ পুনর্বার ফিরায়ে আনে।

সারণি-৩২ : আনারসের বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের পরিমাণ

খাদ্যোপাদানের নাম	শতকরা হার
জলীয় অংশ	৮৬–৮৭
আমিষজাতীয় উপাদান	০.৫–০.৭
শর্করাজাতীয় উপাদান	১১.৫–১২.৫
	প্রতি ১০০ গ্রামে
ভিটামিন– 'এ'	৫৯–৬১ আই.ইউ (IU)
ভিটামিন– 'বি'	১২০–১২১ মিঃ গ্রাঃ
ভিটামিন– 'সি'	৬২–৬৪ মিঃ গ্রাঃ

উৎস : আলম, খু : আনারস প্রসঙ্গে, কৃষিকথা, ১৯৭২

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

আনারসের আদি নিবাস কোথায় তাহা সঠিক করিয়া কেউই বলতে পারে না। তবে কারো কারো অভিমত আনারস দক্ষিণ আমেরিকায়, মধ্য ও দক্ষিণ ব্রাজিল, উত্তর আর্জেন্টিনা এবং পেরাগুয়ের যে অঞ্চলে ১৫°-৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৪০°-৬০°পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ সেখানে উৎপত্তি লাভ করে।[৮] কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পর পরই অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আনারস ইউরোপীয়দের কাছে পরিচিতি লাভ করে। তৎপর ১৫০–২০০ বৎসরের মধ্যে অনারস নিরক্ষীয় অঞ্চলের দেশসমূহ যেমন ভারত, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ফরমোজা, জাভা প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে। পর্তুগিজ নাবিকদের দ্বারাই প্রধানত এ কাজ সাধিত হয়। আনুমানিক ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে আনারস পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে আনীত হয়।

বর্তমান দুনিয়ায় উল্লেখযোগ্য আনারস উৎপাদনকারী দেশগুলি হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই ও পোর্টোরিকো দ্বীপপুঞ্জ, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, কিউবা ও ফরমোজা।

আগের দিনে বাংলাদেশে আনারসের আবাদ ছিল সামান্য আর ধারণা ছিল কেবলমাত্র সিলেট জেলাতেই আনারসের চাষ হয়। আজ এই অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এক নীরিক্ষায়[৯] দেখা যায় যেখানে ১৯৬১–৬২ সালে দেশে আনারসের আবাদ ছিল ৫১১০ একর অর্থাৎ ২০৭৯ হেকটরে সেইস্থলে ১৯৭৬–৭৭ সালে সেই আবাদ উন্নীত হয় ১৪৬৮২ হেকটরে। সিলেট জেলার পাহাড়ি অঞ্চলসহ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় আনারস

চাষের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছে। মধুপুর গড়ের গারো আদিবাসীরা সেই অঞ্চলে আনারস চাষে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। এই অঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য জেলায় যে পরিমাণ আনারসের চাষ হয় তার একটি হিসাব পরবর্তী পৃষ্ঠায় সারণি-৩৩ দেওয়া হলো।

মাটি

দোআঁশ হতে এটেল-দোঁয়াশ মাটি আনারসের জন্য সব চাইতে উপযোগী। মাটিতে জৈব পদার্থ ও লৌহের ভাগ বেশি থাকা বাঞ্ছনীয়। চুনযুক্ত তথা ক্ষারমাটি আনারস চাষের জন্য সম্পূর্ণ অনুপোযোগী। অম্ল মাটিতে (PH ৪.৫–৫) আনারস শুধু ভালোই জন্মে না, ইহার স্বাদও ভালো হয়। সর্বোপরি আনারসের মাটি সুনিষ্কাশনযুক্ত হওয়া আবশ্যকীয়। তাই দেখা যায় পাহাড়ের ঢালে উপযুক্ত মাটিতে আনারসের চাষ খুব ভালো হয়।

ভূমির উচ্চতা ও জলবায়ু

ভূমির উচ্চতার দিক হতে আনারস বেশ সহনশীল; প্রায় সমুদ্র সমতল হতে আরম্ভ করে ১৫০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায়ও আনারস জন্মিতে পারে, যেমন— হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় সমুদ্র সমতলে আনারস চাষ করা হয়, অন্যদিকে মধ্য আমেরিকায় ১৫৫০ মি: এবং শ্রীলঙ্কায় ১২২১ মি: উচ্চতায় আনারস চাষ করা হয়। তবে মাঝামাঝি উচ্চতায় (৫৫ মি: ৫৭০ মি:) জমিতে ইহার চাষ করা ভালো। দেখা গিয়েছে, অধিক উচ্চতায় চাষ করলে ফলন ভালো হয় না এবং ফল নিকৃষ্ট মানের হয়।

সারণি – ৩৩ বাংলাদেশে আনারসের এলাকা ও উৎপাদন (১৯৯৩-৯৪)

জেলার নাম	চাষাধীন এলাকা (হেক্টরে)	উৎপাদন (মে. টনে)
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৯৭৫	৪৭৪০
সিলেট	৮৯৪০	৪৭১০০
ঢাকা	৩০৫৫	১৫৭৬৫
চট্টগ্রাম	১৭৮৫	১৩৪০৫
টাঙ্গাইল	৫৬৯৫	৫৫০৩৫
বাকেরগঞ্জ	৬৩০	১৬৮৫
রংপুর	৪৮০	৯১০
দিনাজপুর	৩২০	৫৫৫
ময়মনসিংহ	১১৭৫	২৭৫০
নোয়াখালী	৩৭০	৯২৫
খুলনা	৪৮০	১২২৫
রাজশাহী	২২০	৫৫০
যশোহর	৩৫০	৯৩৫
কুমিল্লা	২৭০	১০২৫
কিশোরগঞ্জ	১৪৫	৫০০
পাবনা	১৫	৫৫

বগুড়া	৬০	১২৩
পটুয়াখালী	৩৪০	৫৬০
ফরিদপুর	--	--
কুষ্টিয়া	--	--
বাংলাদেশ	৩৪২১০	১৪১১৪৫

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯৫

আনারস নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপযোগী ফসল হলেও অবঃনিরক্ষীয় অঞ্চলেও ইহার চাষ করা যায় যদি বায়ুমণ্ডলে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা বজায় থাকে। তাই লক্ষ্য করলে দেখা যায় পৃথিবীর অবঃনিরক্ষীয় অঞ্চলের আনারস বাগানগুলি সমুদ্র অথবা বড় বড় কোনো জলাশয়ের কাছে করা হয়েছে যাতে সমুদ্র বা ঐ জলাধারগুলির প্রভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকার বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট আর্দ্রতা বজায় থাকে। বস্তুত আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু আনারসের জন্য সুপোযোগী ৩৩–৫০° সে. তাপমাত্রা আনারসের অনুকূল। তাপমাত্রা নিচে নেমে আসলেও আনারস সাময়িকভাবে তা সহ্য করতে পারে, তবে ইহা তুষারপাত সহ্য করতে পারে না।

বৃষ্টিপাতের যথেষ্ট কম-বেশির মধ্যেও আনারস জন্মাতে পারে, তবে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০০ মি: মি:–১৫০ মি: মি: আদর্শস্থানীয়।[৮] আনারস গাছের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা উটের মতো সাময়িকভাবে পানি ধরে রাখতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে তা খরচ করতে পারে। তাই দেখা যায় বৎসরের কোনো সময় খরার প্রাক্কালেও আনারস গাছ বেশ টিকে আছে যা অন্যান্য ফল গাছের পক্ষে সম্ভব হয় না।

আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আনারস চাষে বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট আর্দ্রতা বজায় থাকা প্রয়োজন; আর্দ্রতা ৭৫% হতে ততোধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আনারস ভালো জন্মে সেই অঞ্চলসমূহের গড় বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

সারণি –৩৪ : আনারস উৎপাদনকারী কয়েকটি দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাত ও বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা

দেশ	গড় বৃষ্টিপাত(মি: মি:)	বৃষ্টিপাতের তারতম্য	আপেক্ষিক আর্দ্রতা
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ	১১৯০	৫১০–২৫৪০	৭৮%
অস্ট্রেলিয়া	১৬৪০	১০১০–৩৬০০	অধিক
মালয়েশিয়া	১৮৯০	--	অধিক
দক্ষিণ–আফ্রিকা	৭৪০	৬৬০–৯৭০	৭৫%

কারো কারো এমন ধারণা আছে আনারস চাষে সূর্যকিরণের প্রয়োজন নেই, বরং ছায়াতেই আনারস ভালো জন্মে। এই নিমিত্ত দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে যেমন ঢাকার ঘোড়াশাল ও পূবাইলে বাগানের বড় বড় কাঁঠাল বা আম গাছের নিচে আনারসের চাষ করতে দেখা যায়। ইহাতে কম সূর্যালোকের জন্য গাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং গাছে ছোট ও নিকৃষ্ট ধরনের ফল ধরে। সুতরাং সাফল্যজনকভাবে আনারস চাষ করতে হলে এমন জায়গায় বাগান স্থাপন করতে হবে যেখানে সূর্যকিরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে পতিত হয়। সে জন্য পাহাড় এলাকায়

উত্তর-পূর্ব কম আলোকপ্রাপ্ত ঢালে আনারস বাগান না করে বেশি আলোকপ্রাপ্ত দক্ষিণ-পশ্চিম ঢালে করতে হয়। তবে এই কাথাও সত্য যে অধিক সূর্যকিরণ ফলের উপর সরাসরি পড়লে কিছু কিছু ফলের সূর্যের দিকে মুখ করে আবার দিক পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থাকে চলতি কথায় ফলের 'দক্ষিণা লাগা' বলে। এই পরিস্থিতিতে আধাপাকা ফলগুলি খড়কুটা বা জঙ্গল দিয়ে ঢেকে রাখলে দক্ষিণা লাগার হাত হতে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে যেমন তাইওয়ানে (ফরমোজা) বাগানের আনারস খড়কুটা ও আগাছা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।[৮]

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

আনারস Bromilaceae পরিবারের অন্তর্গত বহুবর্ষজীবী একটি সুদৃশ্য খর্বাকৃতির উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Ananas cosmosus অথবা Ananas sativum। গাছের দণ্ডাকৃতির কাণ্ড বেশ ছোট- লম্বায় ২০-২৫ সে: মি: এবং ব্যাসে ২-৩.৫ সে: মি: কাণ্ডের গাইট অতিশয় ঘন এবং তাকে ঘিরে একটির পর একটি লম্বা মসৃণ ও পুরু সূচালো পাতা এমনভাবে জন্মে যার ফলে বাইরে হতে কাণ্ড তেমন একটা দেখা যায় না। গাছের কোনো প্রধান মূল নেই, ছোট ছোট শিকড় কাণ্ডকে ঘিরে জন্মে। কিছু কিছু শিকড় মাটির উপরেও দেখা যায়, সেগুলিকে বায়বীয় মূল বলা হয়। গাছের বয়স যখন ১০/১২ মাস তখন প্রতিটি গাছের আগায় একটি দণ্ডাকৃতির (peduncle) বোটার উপরে বহু পুষ্পের সমন্বয়ে ঘটিত একটি ফল ধরে। ফলের উপরে বা মাথায় আবার একটি ছোট চারা জন্মে যাকে বলা হয় মুকুট (crown)।

বাংলাদেশে স্পষ্টত তিন রকম জাতের আনারস দেখা যায়, যথা ১. কেলেঙ্গা বা জায়েন্ট কিউ (Jiant kiew), ২. জলডুবী বা হানিকুইন (honey queen) এবং ৩. ঘোড়াশাল (Ghorasal)।

১. **কেলেঙ্গা :** ইহা কায়েন (Cayene) শ্রেণীর অন্তর্গত একটি বড় জাতের আনারস। বর্তমান পৃথিবীর ৯০ ভাগ আনারস জমিতে ইহার চাষ হয়। গাছ আকারে অন্যান্য দুই জাতের গাছের চাইতে বড়, পাতা সবুজ এবং দীর্ঘ, মসৃণ ও কাটাবিহীন (চিত্র ৮.১)।

অন্য দুই জাতের চাইতে গাছে চারা কম জন্মে। সিলেট, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে ইহা প্রধানত চাষ করা হয়। ফলের গড়পড়তা ওজন ২ কেজি ; চোখ বড়, অগভীর ও চেপ্টা ; আকার লম্বা ধরনের, আগার দিকটা ক্রমশ সরু এবং এই দিকটা গোড়ার দিক হতে কম মিষ্টি। পাকা ফলের রং সবুজাভ হলুদ এবং ভিতরের এবং হাল্কা বর্ণের এবং শাঁস পাতলা রসে ভরপুর। কেলেঙ্গা মধ্যম জাতের একটি আনারস, ইহা কুইন জাতের পরে ও গোড়াশাল জাতের আগে পাকে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল বাজারে নামে তবে বৎসরের অন্যান্য সময়েও কিছু কিছু ফল পাওয়া যায় সেগুলির স্বাদ ভালো হয় না।

২. **জলডুবী :** এই জাতের আনারস কুইন (queen) শ্রেণীর অন্তর্গত। গাছ ছোট আকারের ও পাটল লালচে বর্ণের এবং পাতার কিনারা কণ্টকময় (চিত্র ৮.২)। ইহা প্রধানত সিলেট জেলায় চাষবাস করা হয়। ফল ছোট ও অনেকটা গোলাকার গড়পড়তা ওজন এক

কেজি কম ; চোখ কিছুটা সূচালো, উন্নত ও গভীর। সেই জন্য ফল কেটে খাওয়ার উদ্দেশ্যে পরিষ্কার করতে গেলে ফলের মাংসল অংশের বেশ কিছুটা বাদ যায়। ফলের শাঁস রসালো না হলেও সব জাতের আনারসের চাইতে মিষ্টি। গাছে অন্যান্য জাতের চেয়ে অধিক চারা জন্মে, কাজেই ইহার চাষ দ্রুত বৃদ্ধি করা যায়। ইহা সব চাইতে আগাম জাতের আনারস, তাই বাজারে ভালো দামে বিক্রি হয়।

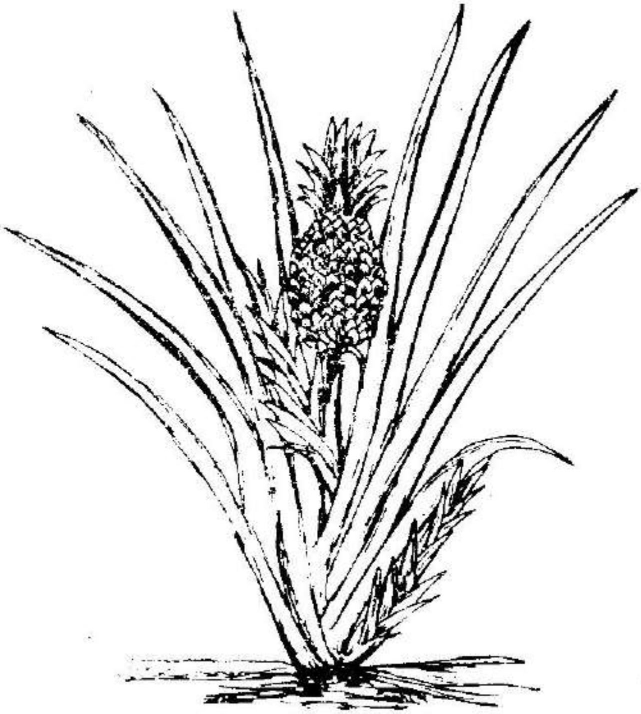

চিত্র : ৮.১ ফলসহ কেলেঙ্গা আনারস গাছ

৩. **ঘোড়াশাল :** ইহা রেড স্পেনিশ (red spanish) শ্রেণির আনারসের একটি জাত। ইহা প্রধানত ঢাকা জেলার ঘোড়াশালে চাষ করা হয় বলে জাতটির এইরূপ নামকরণ হয়েছে। ইহা একটি নাবী জাতের আনারস, অন্যান্য জাতের চাইতে কম যত্নেও জন্মে। গাছের আকার মধ্যম, পাতা হলুদাভ সবুজ, চওড়া, ঢেউ খেলানো ও কণ্টকময় (চিত্র ৮.৩)। পাকা ফলের রং লালচে ও আকার দণ্ডাকৃতির অর্থাৎ আগা ও গোড়া একই আকারের, ভিতরের শাঁস সাদা, এই বৈশিষ্ট্যের দরুন এই জাতীয় আনারস কৌটাজাত (canning) করার জন্য বিশেষভাবে পছন্দনীয়। অন্যথায় অপর দুই জাতের চাইতে ফল নিকৃষ্টমানের, শাঁস বেশ টক ও খাওয়ার পর গলা ধরে আর চোখ গভীর বলে ফল কেটে পরিষ্কার করার সময় মাংসল অংশ অনেকটা বাদ পড়ে যায়।

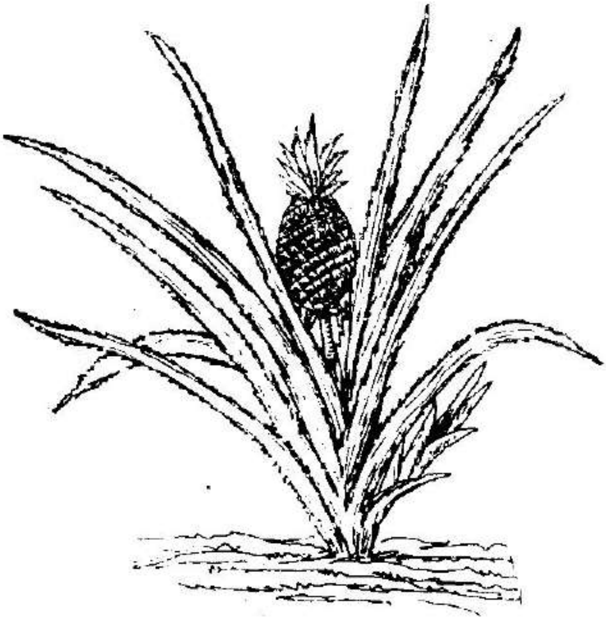

চিত্র : ৮.২ ফলসহ জলডুবী আনারস গাছ

আনারস বাগান সৃষ্টি : আনারসের একটি বাগান স্থাপন করতে হলে প্রথমেই উপযুক্ত পরিবেশে উপর্যুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে। আমাদের দেশে পাহাড়ি অঞ্চলই আনারস চাষের উপযোগী— তাই দেখা যায়, যে কেউ ব্যবসাভিত্তিক আনারস চাষে উদ্যোগী হলেই সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম অথবা চট্টগ্রামের পাহাড়ি জমির ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু এই রকম নির্বাচনের প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত মাটি আনারস চাষে জন্য উপযোগী কিনা। উল্লিখিত পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায়শই বেলে ও বেলে-দোঁয়াশ মাটি দেখা যায়। কেউ কেউ এই রকম জমির ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৮] সুতরাং আনারস চাষের জন্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যার মাটি দোঁয়াশ অথবা এটেল-দোঁয়াশ হয়। তৎপর নিম্নোক্ত প্রণালিতে চাষাবাদ করলে আনারস চাষে সফলতা লাভ করা যাবে।

১. জমি প্রস্তুত ও সার প্রয়োগ : পাহাড়ি এলাকার জমিতে ঝোপজঙ্গল থাকা স্বাভাবিক। সেগুলি কেটে অন্যত্র সরিয়ে ও বাদবাকি পুড়িয়ে দিয়ে জমি পরিষ্কার করে নিতে হবে। কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে জমি তৈরি করে নেয়া ভালো। পাহাড়ের ঢালে জমির কন্টুর লাইন দেখে সেভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

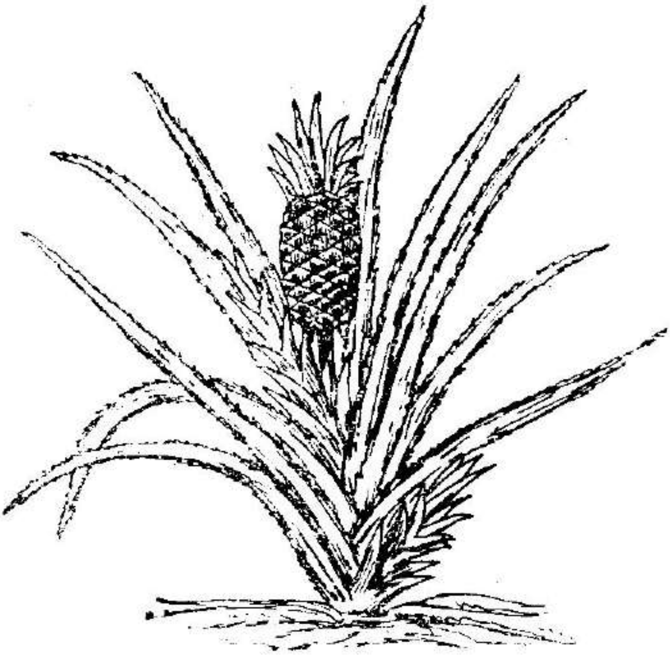

চিত্র : ৮.৩ ফলসহ ঘোড়াশাল আনারস গাছ

আনারসে যথেষ্ট সারের প্রয়োজন হয়। প্রধানত গাছের তিনটি প্রধান খাদ্যোপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের কথা মনে রেখেই আনারসের জমিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। বিদেশে যেমন— হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে আনারসের জমিতে কোনো কোনো গৌণ খাদ্যোপাদান যেমন —লৌহ এবং দস্তা সরবরাহের দিকে লক্ষ্য রেখে সার প্রয়োগ করা হয়

আমাদের দেশে কেবল প্রধান খাদ্যোপাদানের কথা মনে রেখেই বাগানে সার ব্যবহার করা হয়। এই নিয়মে প্রতি হেক্টরে নিম্নোক্ত সার প্রয়োগ করতে হয়।[১,৫]

সারের নাম	পরিমাণ
পচা গোবর	৩৭.৫–৫০ টন
ইউরিয়া	১৪০–১৮৮ কেজি
অথবা	
এমোনিয়াম সালফেট	২৮৩–৩৭৫ কেজি
টি. এস. পি	১৮৮–২৩৫ কেজি
সালফেট অব পটাশ	২৩৫ কেজি

গোবরের পরিমাণ কিছু কমিয়ে সেই সঙ্গে সরিষার খৈল ব্যবহারও করা যায় এবং তাতে ফল আরো ভালো হয়। গোবর, খৈল এবং পটাশের তিন ভাগের এক ভাগ জমি প্রস্তুতের সময় এবং অবশিষ্টাংশ ও টি. এস. পি'র সমস্তটুকু জমিতে বেড (bed) বা কেয়ারী প্রস্তুতকালে মাটির সঙ্গে প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ চারা রোপণের তৃতীয় অথবা চতুর্থ মাসে এবং দ্বিতীয় ভাগ সপ্তম অথবা অষ্টম মাসে গাছের পার্শ্বদেশে প্রয়োগ করলে ভালো হয়।

২. বেড বা কেয়ারী প্রস্তুত : উপরে বর্ণিত নিয়মে জমি প্রস্তুতের পর তাতে কেয়ারী তৈরি করতে হবে। দৈর্ঘে যতটুকু সম্ভব, প্রস্থ ৩ ফুট অর্থাৎ ১ মি: উচ্চতা ৪–৬ ইঃ বা ১০–১৫ সে: মি: করে ২ ফুট অন্তর (৬০ সে: মি:) অন্তর প্রতিটি কেয়ারী প্রস্তুত করতে হয়। দুই কেয়ারীর মধ্যবর্তী ২ ফুট অর্থাৎ ৬০ সে: মি: প্রশস্থ জায়গা হতে মাটি তুলে প্রতিটি কেয়ারী ৪–৬ ইঃ অর্থাৎ ১০–১৫ সে: মি: উঁচু করে প্রস্তুত করতে হয়। মাটি তোলার পর সেই অন্তর্বর্তী জায়গা নিচু হয়ে যায় যার মাধ্যমে বাগানের সেচের ও বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি সরে যেতে পারে। তদুপরি গাছের যাবতীয় পরিচর্যার জন্য এই ফাঁকা স্থান দিয়ে চলাফেরা করা যায়।

প্রতিটি কেয়ারীতে এক জোড়া লাইন করা হয়। এক জোড় লাইন এভাবে করা হয় যে ইহার দুটির মধ্যে ফাঁক থাকে ৪৬ সে: মি: এবং জোড় লাইনের মধ্যরেখা হইতে পার্শ্ববর্তী অপর কেয়ারীর জোড় লাইনের মধ্যরেখা পর্যন্ত ব্যবধান থাকে প্রায় ১ মিটার (চিত্র ৮.৪)।

৩. কেয়ারীতে চারা রোপণ : কেয়ারীতে চারা রোপণ সম্বন্ধে বলার আগে আনারসের চারা কিভাবে পাওয়া যায় তা বলা প্রয়োজন। কোনো আনারস বাগানে লাগানো চারা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ফল ধরা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রতিটি গাছে নানাপ্রকার চারা উৎপন্ন হয়। এই সকল রকম চারাই রোপণের জন্য ব্যবহার করা গেলেও কোনো কোনোটি বিশেষভাবে পছন্দনীয়। এই সম্বন্ধে এখন বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে :

ক. গোড়ার চারা (Ground sucker) : এই প্রকার চারা গাছের ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের পাতার কক্ষমুকুল হতে উৎপন্ন হয়। চারা বেশ সবল এবং গোড়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিকড় দেখা যায় ; রোপণের জন্য চারা বেশ উপযোগী।

খ. কাণ্ডের চারা (Stem sucker) : এই চারা গাছের কাণ্ডের পাতার কক্ষ হতে বের হয়। চারাগুলি বেশ সবল এবং রোপণের জন্য সর্বোত্তম।

গ. ফলের বোঁটার চারা (Slip) : ফলের বোঁটার কক্ষমুকুল হতে এই চারা উৎপন্ন হয়। চারা তত সবল নয়।

ঘ. হাপা (Hapa) : এই নামীয় চারা ফলের বোঁটা ও গাছের কাণ্ডের সংযোগস্থল হতে বের হয়। দেখতে উপরোক্ত চারার অনুরূপ।

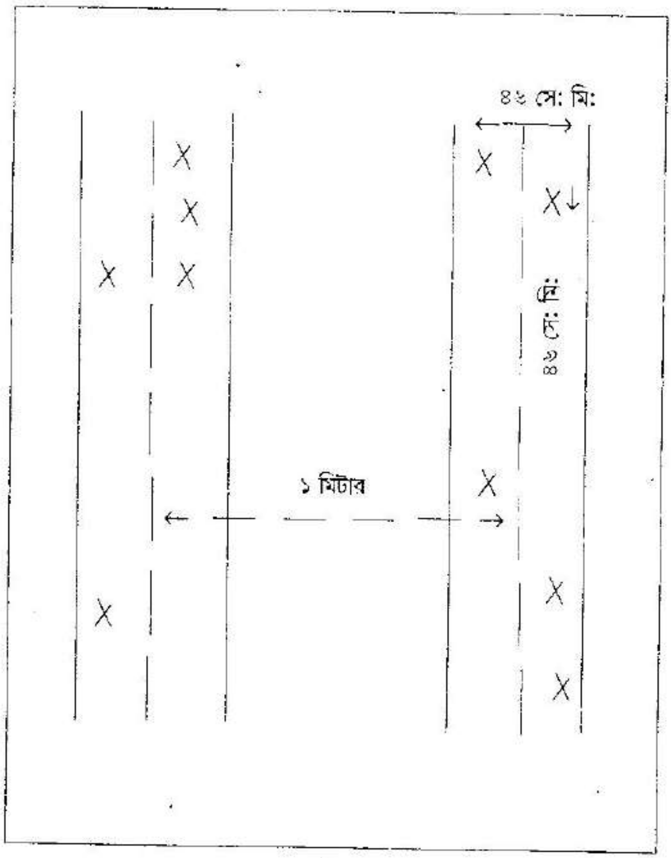

চিত্র : ৮.৪ জোড় লাইন পদ্ধতিতে আনারসের চারা রোপণের নক্সা

ঙ. মুকুট বা কিরীট (Crown sucker) : ফলের মাথায় এই চারা বের হয়। এই চারা রোপণের জন্য ততটা পছন্দীয় নয়, কারণ তাতে ফল ধরতে অনেক সময় (দুই বৎসর) লাগে। তবে ফল আকারে বড় হয়।

চ. গোড়ার চারা (Stump) : পুরাতন গোড়া অথবা কাণ্ড টুকরা টুকরা করে রোপণ করলেও তা হতে চারা উৎপন্ন হয়। তবে এইরূপ চারা সচরাচর ব্যবহার করা হয় না।

ছ. বীজের চারা : পাকা আনারসের চোখে ছোট ছোট বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ হতে যে চারা জন্মে তা প্রধানত প্রজননের কাজেই ব্যবহৃত হয়, বাগানে রোপণের জন্য নয়।

'ক' হতে 'গ' পর্যন্ত বর্ণিত চারাই সচরাচর বাগানে রোপণের জন্য ব্যবহৃত হয়। পুরাতন বাগান হতে এইরূপ চার/পাঁচ মাস বয়সের চারা সংগ্রহের পর সেগুলির প্রত্যেকটির গোড়া হতে ২/৩টি করে পাতা ফেলে দিতে হয়, তৎপর চারাগুলি কয়েকদিন ফেলে রাখলে ভালো হয়। এরূপে প্রস্তুত চারা বাগানের কেয়ারীতে জোড় লাইনে রোপণ করতে হয় ; এক চারা হতে অন্য চারার দূরত্ব রাখলে হয় ৪৬ সে: মি:। আগের উল্লেখ করা হয়েছে কেয়ারীর এক লাইন হতে অন্য লাইনের দূরত্বও ৪৬ সে: মি:। প্রতি লাইনের নির্দিষ্ট স্থানে ২.৫–৪ সে: মি: গভীর গর্ত করে তাতে আঙ্গুলের চাপে চারা লাগাতে হয় ; জুলাই–আগস্ট মাসের মধ্যে রোপণের কাজ শেষ করা ভালো। এ সময় রোপণ করলে প্রতি হেক্টরে ২৭০০০টি চারা লাগাতে হয়।

৪. পরবর্তী পরিচর্যা : আনারস বাগান পরিচর্যার একটি অন্যতম প্রধান বিষয় হলো আগাছা দমনে রাখা, কারণ আনারস গাছের অগভীর মূল ঘাস–গাছড়ার গভীর মূলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মাটি হতে খাদ্যোপাদান আহরণ করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং বাগানে যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে প্রথম হতেই সেই ব্যবস্থা নেয়া ভালো। বাগানে চারা রোপণ করার পর–পরই গাছের গোড়া তথা সমস্ত কেয়ারী খড়কুটা বা শুকনা জঙ্গল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ইহার পরিবর্তে এক রকম শক্ত কাগজ (asphalt paper) দিয়ে মাটি ঢেকে দেওয়া হয়। এরূপ ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় paper mulching আর পূর্বোক্ত ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় rubbish mulching বা খড়কুটা মালচিং। এই উভয় ব্যবস্থাতে শুধু আগাছাই দমনে রাখা হয় না, মাটির অতি প্রয়োজনীয় রসও সংরক্ষণ করা হয়। কোনো রকম মালচিং করা সম্ভব না হলে যথাসময়ে নিড়ানীর সাহায্যে আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হবে। বাগানে গাছ একবার বড় হয়ে উঠলে আগাছা তখন আর কোনো সুবিধা লাভ করতে পারে না, গাছের ঘন পাতার নিচে পড়ে থাকা ঘাস আর উপরে উঠতে না পেরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

শীতের সময় অর্থাৎ অক্টোবর মাস হতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বৃষ্টিহীন বলে বাগানে পানি সেচ করা প্রয়োজন। পনেরো দিন অথবা একমাস অন্তর অন্তর বাগানে প্লাবন সেচ দিতে পারলে ভালো হয়। পাহাড়ির ঢালু জমিতে এরূপ সেচ দেওয়া সম্ভব নয়। সেই অঞ্চলে ফোয়ারা সেচ (sprinkler irrigation) দেওয়াই ভালো, যদিও এরূপ সেচ আমাদের দেশে ব্যয়বহুল।

আনারস উৎপাদনকারী প্রধান প্রধান দেশ, যেমন— হাওয়াই, ফিলিপাইন, ব্রাজিল, মেক্সিকো, পোর্টোরিকো ও অস্ট্রেলিয়ায় আনারস নানা প্রকার রোগ ও কীট–পতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। রোগসমূহের মধ্যে মারাত্মক হলো 'ঢলে পড়া রোগ' (wilt

disease), 'হলুদে দাগ রোগ' (yellow spot) এবং 'মূল ও কাণ্ড পচা রোগ' (heart rot & root rot)। এক প্রকার ভাইরাসের (yellow spot) এবং 'মূল ও কাণ্ড পচা রোগ' (heart rot & root rot)। এক প্রকার ভাইরাসের আক্রমণে ঢলে পড়া রোগ দেখা দেয়। Mealy bug নামে এক প্রকার ছাতরা পোকা এই ভাইরাসের বাহক। রোগাক্রান্ত গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি প্রথমে স্থগিত হয়ে যায়, পরে তা পচে যায়। মাটিতে বসবাসকারী এক প্রকার ছত্রাক (phytopthora) আনারসের মূল ও কাণ্ডপচা রোগ ঘটায়ে থাকে। কেয়ারীতে রোপণের পরপরই চারার এই রোগের আক্রমণ দেখা যায়। আক্রান্ত চারার গোড়ার শিকড়, কাণ্ড ও পাতার গোড়া পচে যায়। বয়স্ক গাছের কাণ্ডে এবং ফলেও এই রোগের আক্রমণ হতে পারে।

ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী এক প্রকার কীড়ার আক্রমণে আনারস অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়। Thelca echion নামে এক প্রকার প্রজাতির পোকা ফলের উপরে ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে কীড়া বের হবার পর সেগুলি ফলের গায়ে ছিদ্র করে ভিতরে বাইরে আসা-যাওয়া করে এবং সেই সঙ্গে ছিদ্রপথের আশেপাশের নরম অংশ খেতে থাকে। তৎপর এক সময় ফলের বোটায় ও পাতায় আক্রমণ চালায়। ব্রাজিল দেশে ইহার আক্রমণে কখনো কখনো বাগানে শতকরা ৫০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে যায়।[১২] ত্রিনিদাদ, মেক্সিকো ও গুয়েতেমালাতেও ইহার প্রকোপ দেখা যায়। Metamasius ritchici নামে এক প্রকার খাপড়াজাতীয় পোকার কীড়া গাছের কাণ্ডের ভিতর দিয়ে ঢুকে ফলের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসে। পরিণামে ফল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়।

সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে আনারস বাগানে কীটপতঙ্গ ও রোগের আক্রমণ কদাচিৎ দেখা যায়। মাঝে মাঝে যে দুই একটি পোকার আক্রমণ দেখা যায় তা হচ্ছে এক সময় ছাতরা পোকা (pineapple mealy bug) এবং এক রকম খোসা পোকা (pineapple scale)। যে কোনোটির আক্রমণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। ছাতরা পোকা ফলের বোটা ও চোখে দলে দলে বসে রস চুষে খেতে থাকে। খোসা পোকাও ফলের রস চুষে খায়। ইহাতে ফলের বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যায় এবং পরিশেষে অতি নিম্নমানের ফল উৎপাদিত হয়। এই দুইটি পোকার যে কোনোটির আক্রমণে ম্যালাথায়ন বা ডাইমেক্রন নামক ঔষধ ছিটালে উপকার পাওয়া যাবে। রোগের মধ্যে ভাইরাস এবং কাণ্ড ও মূল ও পচা রোগ দেখা যেতে পারে। রোগ দুটির কোনোটিরই নিরাময় নেই। সুতরাং রোগমুক্ত বাগান হতে নীরোগ চারা রোপণ করাই শ্রেয়। উপরন্তু চারা বাগানে রোপণ করার আগে বোর্দো মিক্চার ডুবিয়ে রাখলেও ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ফল আহরণ : আনারসের চারা বাগানে লাগাবার পর ১০/১১ মাসের মধ্যে প্রথম ফল পাওয়া যেতে পারে। তবে তা আংশিক মাত্র। বাগানের সমস্ত গাছে ফল পেতে সময় লাগে প্রায় দুই বৎসর। আমাদের দেশে জুলাই-আগস্ট মাসে বাগানে চারা লাগানো হয়, সেই হিসেবে পরবর্তী জুন-জুলাই মাসে বাগানে ২০% গাছে ফল দিবে ; নভেম্বর মাসে ২৫% গাছ এবং পরবর্তী জুন-জুলাই মাসে প্রায় ১০০% গাছ ফল উৎপন্ন করবে। আনারস গাছের এ রকম ফল ধরার বৈশিষ্ট্য ব্যবসাগত দিক হতে অবাঞ্ছিত তথা ক্ষতিজনক। প্রথমবারেই যদি সমস্ত গাছে ফল ধরতো তাহলে একবারেই বাগানের ফল আহরণ করে বাজারজাত করা যেতো, পরবর্তী আর প্রায় এক বৎসরের জন্য অপেক্ষা করতে হতো না। ইহাতে যে টাকা পয়সা কম খরচ হবে তাহা সহজেই বোধগম্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অনেক দেশই আজ

আনারসের ফল ধরার এই অনিয়মানুবর্তিতা বশে আনতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয় নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেও বাগানে ফুল– ফল ধরাতে সফলতা লাভ করেছে। আনারস গাছে কাঠ পুড়ানো ধোঁয়া ও ANA (Alpha napthy L acetic acid) এবং BNA (Beta napthyl acetic acid) নামক হরমোন (hormone) প্রয়োগ করে এজোর দ্বীপপুঞ্জ, পোর্টোরিকো, হাওয়াই প্রভৃতি দেশে বাগানের প্রায় সমস্ত গাছেই এক সঙ্গে এবং কখনো কখনো সপ্তাহ খানেক আগে ফল ধরান হয়। হাওয়াইয়ে এই বিষয়ে এতই অগ্রগতি হয়েছে যে ব্যবসাগত দিক হতে সুবিধাজনক হিসেবে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়, যেমন,— ৪ জুলাই তারিখে বাগানের ৮০% ফল পাকান হয়।[৯] আমাদের দেশেও আজকাল দুই একটি বাগানে হরমোন ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গিয়েছে।

স্থানীয়ভাবে বাজারজাত করা হলে গাছপাকা আনারস আহরণ করা ভালো। তবে দূরদূরান্তের জন্য বাজারজাত করা হলে ফল একটু রং ধরলেই দিলেই ভালো। ফলের বোঁটার মাঝখানে আঙ্গুলের চাপ দিলেই বোটা ভেঙ্গে যায় অর্থাৎ হাতের সাহায্যেই আনারস বাগান হতে উঠান যায়। দরকার মনে করলে কাস্তের সাহায্যে বোঁটা কেটে ফল আহরণ করা যায়। আনারস পৃথিবীর দুই একটি উন্নত দেশে যান্ত্রিক উপায়েও আজকাল বাগান হতে উঠান হয়, তবে এই ব্যবস্থা তত ফলপ্রদ ও সুবিধাজনক নয়।

আনারসের ফলন ও বাগানের স্থিতিকাল : আনারসের ফলন, সংখ্যা বা ওজন এই দুভাবেই প্রকাশ করা যায়। যেহেতু প্রতি একটি গাছে একটি ফল ধরে সেই হিসেবে প্রতিটি গাছে ফল ধরলে বাগানে যতটা গাছ রোপণ করা হয়েছে ততটি ফল পাওয়া যেতে পারে। তবে বাস্তবে তা সম্ভব নয়— প্রকৃতপক্ষে বাগানের শতকরা ৮০টি গাছ হতে ফল পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। সেই হিসেবে প্রতি হেক্টর (২৭০০০ টি গাছ) ২১৬০০টি ফল উৎপাদিত হতে পারে। যেহেতু বাগানের ফলের আকার তথা ওজনের মধ্যে জাতভেদে এবং একই জাতের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য হয়, সে হিসেবে এবং ব্যবসাগত কারণে আনারসের ফলন ওজন হিসেবে প্রকাশ করাই ভালো। কেলেঙ্গা, জলডুবী ও গোড়াশাল আনারসের হেক্টর প্রতি দ্বিবার্ষিক গড়পড়তা উৎপাদন যথাক্রমে ৩৬.৯ টন ২৩.৭ টন এবং ১৮.৪ টন।

যেহেতু সচরাচর আনারস বাগানের সমস্ত গাছে ফল প্রথমবার ধরতে প্রায় দুই বৎসরের মতো সময় লাগে, সেই হিসেবে দুইটি মুড়ি ফসল (ratoon crop) সহ ৪/৫ বৎসরকাল সময় রাখা যায়। তৎপর সেই বাগান ভেঙ্গে দিয়ে অন্য ফসল করা হয় এবং পূর্বের সেই জমিতে আনারস বাগান করা যায়। আনারস চাষের ইহাই বিধিসম্মত ব্যবস্থাপনা, তবে ইচ্ছা করলে একটি আনারস বাগান ২০/২৫ বৎসর পর্যন্তও রাখা যায়। যে সমস্ত দেশে বিস্তর জমিজমা আছে এবং পুঁজি বিনিয়োগের অসুবিধা আছে সেই সকল দেশেই এই রকম ব্যবস্থা করা যায়।

কমলালেবু

কমলালেবু শিশুদের কাছে একটি প্রিয় ফল। সত্যি কথা বলতে কি ইহা এমনই একটি ফল যা পৃথিবীর সকল দেশের ছেলেমেয়ে, যুবা, বৃদ্ধ সকলের কাছেই সমাদৃত। নাবিকেরা সমুদ্র যাত্রার আগে তাদের জাহাজে যথেষ্ট পরিমাণ কমলালেবুর সংস্থান রাখে, তাতে তাহার স্কার্ভি রোগ

হতে রক্ষা পায়। ইহার অর্থ এই যে কমলাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন— 'সি' থাকে যা চর্মরোগ দমনে রাখে। বাড়ন্ত শিশুদের বৃদ্ধি ও তাদের সর্দিকাশির হাতে হতে রক্ষার জন্য এই ভিটামিনের খুব প্রয়োজন, তাই চিকিৎসকরা ছোটদের কমলালেবুর রস খাওয়ানোর জন্য পরামর্শ দেন।

চীন, পাক–ভারত এবং মালয়েশিয়া কমলার আদি নিবাসভূমি বলে মনে হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দেও চীন দেশে ইহার চাষ বর্তমান ছিল।[২,১১] আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশেই কমলালেবু জন্মাতে দেখা যায়। তন্মধ্যে চীন, ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, লেবানন, পেলেস্টাইন প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে কমলালেবু খুবই সামান্য জন্মে। সিলেট জেলার খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও পাথারিয়া পাহাড় অঞ্চলে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সাজেক উপত্যকায় কিছু কিছু কমলালেবুর চাষ হয়, সাকুল্যে চারশত হেক্টরের মতো। হালে জাপান ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে আমাদের দেশে কমলালেবু চাষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ঢাকার জয়দেবপুরস্থ কৃষি গবেষণা খামারে কমলালেবুর উপর পরীক্ষা–নীরিক্ষা চালানোর জন্য একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে।

জলবায়ু ও মাটি

কমলালেবু অবঃগ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ু অঞ্চলে ভালো জন্মে। তন্মধ্যে অবঃগ্রীষ্মপ্রধান তথা ভূ–মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল কমলালেবুর জন্য উত্তম। অত্যধিক ঠাণ্ডা ও গরম —এই দুই অবস্থাই ফলের গুণগত উৎকর্ষতা কমায়ে দেয় ; ফলের সুগন্ধি নষ্ট হয় ও তা টকযুক্ত হয় পড়ে।

দোঁয়াশ–ও বেলে–দোঁয়াশ মাটি কমলালেবু চাষের উপযোগী ; ভূমি উঁচু ও ঢালু ধরনের হলে ভালো হয়। পাহাড়িয়া অঞ্চলের এই রকম মাটিতে অতিরিক্ত পানি সহজে গড়ায়ে চলে। জমির উপরিস্তরের মাটি ১৫–২৫ সে: মি: অর্থাৎ বেশ গভীর হওয়া চাই আর মাটিতে যথেষ্ট জৈব পদার্থ থাকা প্রয়োজন। নিচের স্তরের মাটিতে পাথর খণ্ড, নুড়ি, চুনি ইত্যাদি থাকলেও কমলালেবুর চাষ করতে অসুবিধা হয় না।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

কমলালেবু ঝোপজাতীয় একটি ছোট ধরনের বহুবর্ষজীবী গাছ ; উচ্চতায় ৩–৪ মিটার হতে ৫–৪.৮ মিটার পর্যন্ত হয়। অন্যান্য লেবুর মতো ইহার পাতা ডিম্বাকৃতির ও গাঢ় সবুজ বর্ণের (চিত্র ৮.৫) বীজের গাছ কলমের গাছ হতে অতিরিক্ত লম্বা ও কাটাযুক্ত। আজকাল বাগানে শুধু কলমের গাছই দেখা যায়। সাধারণত ৪/৫ বৎসর বয়সে গাছ ফল দিতে শুরু করে ; ১০/১২ বৎসরের সময় হতে গাছ পূর্ণ ফল দিয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি–মার্চ মাসে গাছে সুগন্ধিযুক্ত সাদা থোকা ফুল ধরে, ফুল ধরার ৮/১০ মাস পর ফল পাকে। কমলালেবুর বহু জাত রয়েছে, এই সমস্ত জাতকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ক. ম্যান্ডারিন কমলালেবু (Mandarin Oranges) ও খ. মাল্টা কমলালেবু (malta Orangs)।

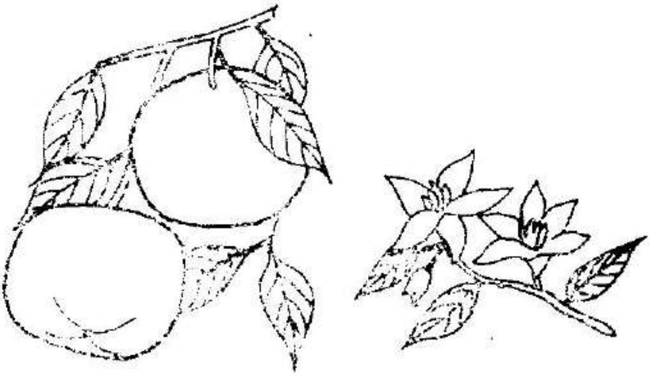

চিত্র : ৮.৫ ফুল-ফলসহ কমলা গাছের একাংশ

ম্যান্ডারিন কমলালেবু Citrus riticulata Blanco. আমাদের দেশে যে সমস্ত কমলা দেখা যায় সেগুলি ম্যান্ডারিন শ্রেণিভুক্ত। এই কমলার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার খোসা সহজে ছাড়ান যায় এবং এক কোষ হতে অন্য কোষও ছাড়ান সহজ। এই শ্রেণির কমলার বহু জাত আছে, তন্মধ্যে কিং, সাতসুমা, ডেন্সী, ক্লিওপেট্রা, কিনো, সাংত্রা, ছাতক, দার্জিলিং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আহমদের[২] বর্ণনা অনুসারে এই সমস্ত জাতের কয়েকটির বৈশিষ্ট্য নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. **কিং** (King) : এই কমলা নাবীজাতীয়, ফল আকারে বড় ; খোসা পুরু ও খেতে সুস্বাদু। গাছে যথেষ্ট ফল ধরে এবং এই ফল ধরার রীতি একান্তরক্রমিক।

২. **সাতসুমা** (Satsuma) : এই জাতের ফল মাঝারি হতে বড় আকারের, খোসা পাতলা, প্রায় বীজশূন্য ; ফল আশুজাতীয় মিষ্টি ও সুস্বাদু।

৩. **ডেন্সী** (Dancy) : গাছ বেশ বড় ও খাড়া প্রকৃতির। ফল কমলাভ লালবর্ণের, সাতসুমা জাতের চাইতে মিষ্ট।

৪. **ক্লিওপেট্রা** (Cleopetra) : এই জাতের গাছ ছোট ; ফল আরো ছোট, মশলা, গন্ধযুক্ত ও বীজবহুল। গাছে ফল অনেক দিন পর্যন্ত থাকে।

৫. **কিনো** (Kinnow) : ইহা কিং ও উইলো লিক এই দুই জাতীয় কমলার শঙ্কর। ফল মাঝারি হতে বড় আকারের ; চর্ম মসৃণ ও পাতলা ; সুস্বাদু ; সুগন্ধিযুক্ত, তবে অধিক বীজযুক্ত।

মাল্টা কমলালেবু Citrus sinensis (L) osbeck মাল্টা কমলালেবু সাধারণত ম্যান্ডারিন কমলালেবু হতে বড় আকারের হয়। ইহাদের খোসা পুরু ও কোষের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। সেইজন্য খোসা ছাড়ান যায় না এবং এক কোষ হতে অন্য কোষও আলাদা করা

সহজতর হয় না। গাছ বেশ জোরদার হয়, স্থানীয় কমলা হতে ফলন অনেক বেশি ; পাক ফল বেশ কিছুদিন গাছে রাখা যায়।

মাল্টা কমলাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— ক. ন্যাভেল কমলা, খ. রক্তব কমলা ও সচরাচর দৃষ্ট কমলা।

ন্যাভেল কমলা (Naval orange) : এই শ্রেণির কমলায় অনেক জাত দৃষ্ট হয় যেমন— ওয়াশিংটন ন্যাভেল, বাহিয়া নিনহা, থমসন ন্যাভেল, ট্যাস্নাস ন্যাভেল ইত্যাদি ওয়াশিংটন ন্যাভেল ফল আকারে বড়, পুরু খোসাযুক্ত, সুস্বাদু, কম রসযুক্ত এবং সচরাচর বীজশূন্য। থমসন ন্যাভেলের খোসা কিছু মসৃণ এবং ফল কিছু আগে পাকে।

রক্তবর্ণ কমলা (Blood-red-orange) : এই কমলার কোষে মাঝে মাঝে রক্ত বর্ণের ছোপ দেখা যায়, এজন্য এই জাতের কমলার এরূপ নামকরণ হয়েছে। ইজিপশিয়ান, রুবী মালটিজ প্রভৃতি রক্তবর্ণ কমলা। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এই সকল কমলার গুরুত্ব অধিক

সাধারণ কমলা : (Common orange) : যে জাতীয় কমলার নাভী দেখা যায় না এব কোষও রক্তিম বর্ণ হয় না সেগুলিই এই জাতের কমলার অন্তর্ভুক্ত। ভ্যালেন্সিয়া, লিউগম কিং, মালটিজ ওভাল, পাইন এপেল প্রভৃতি সাধারণ কমলা। ভ্যালেন্সিয়া কমল ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা, চীন ও পৃথিবীর আরো বহু স্থানে জন্মে। ইহা সম্ভবত পৃথিবীর সের কমলা। ইহা নাবীজাতীয়, সুস্বাদু ও অল্প বীজযুক্ত। লিউগম গং প্রায় ভ্যালেন্সিয়ার অনুরূপ মালটিজ ওভাল নাবীজাতীয়, পাইন এ্যাপল মধ্যম, সুস্বাদু কিন্তু অধিক বীজযুক্ত। জাফ প্যালেস্টাইনের একটি উৎকৃষ্ট কমলা।

কমলার বাগান সৃষ্টি

কমলা এরকম একটি ফল যাহা মাটি, জলবায়ু ও অন্যান্য পরিবেশের বিশেষ এক সংযোগে জন্মে। বাংলাদেশে এমন পরিবেশ খুব অল্প জায়গাতেই দৃষ্ট হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ অঞ্চলে কিছু কিছু কমলার চাষ হয়। তাই নতুন কমলা বাগান স্থাপন করতে হলে এইরূপ অঞ্চলে জমি নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জমি গভীর সুনিষ্কাশনযুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী গাছ উৎপাদনে সক্ষম হতে হবে।[১২]

জমি নির্বাচন : কমলা চাষের উপযুক্ত জমি নির্বাচন করে তা হতে ঝোপ-জঙ্গল ও ছোট-বড় গাছপালা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। তৎপর জমি এমনভাবে চাষ করতে হবে যাতে জমি হতে গাছের ছোট বড় মূল ও শিকড় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। পরিশেষে জমি ভালভাবে সমতল করে নিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে চাষ করলে কন্টুল লাইন দেখে সেইভাবে জমি প্রস্তুত করতে হবে।

পিট বা মাদা প্রস্তুত করা : কোনো পদ্ধতিতে ও কত দূরে দূরে কমলার চারা লাগানো হবে তা নির্ধারণ সাপেক্ষে বাগানের জমিতে মাদা প্রস্তুত করতে হবে। আগের দিনে বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন— আয়তক্ষেত্রাকার, বর্গক্ষেত্রাকার, ষড়ভূজ ও ত্রিভুজ পদ্ধতিতে চারা লাগানো হতো। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রাকার প্রণালিতে বাগানে চারা লাগানো হয়, কারণ এইরূপ পদ্ধতিতে সৃষ্ট বাগানে চলাফেরা করা সহজ ও গাছের যত্ন লওয়া ও ফল তোলা সুবিধাজনক। মাটির প্রকৃতি, উর্বরতা ও কমলার জাতভেদের পর নির্ভর করে

বাগানে চারা রোপণের দূরত্ব ১৫´ × ১৫´ (৫ × ৫ মি:) বা ২০´ × ২০´ (৬.৫ × ৬.৫ মিঃ) হতে পারে। আবার অন্য মতে ২৫´ × ২৫´ (৮ × ৮ মি: দূরত্বের ব্যবধানেও চারা লাগানো যেতে পারে। প্রথমোক্ত নিয়মে বাগানের প্রতি হেক্টরে মাদা তথা গাছের সংখ্যা হয় ৪৫টি দ্বিতীয় নিয়মে ২৫০ এবং তৃতীয় বা শেষোক্ত নিয়মে ১৭৫টি। এক মিটার ব্যাস ও ১ মিটার গভীর মাপে প্রতিটি মাদা প্রস্তুত করে তাতে ১৫ কেজি গোবর, ২½ ইউরিয়া, .৫ কেজি হাড়ের গুড়া এবং ২ কেজি ছাই মিশ্রিত করতে হয়।[২]

চারা তৈরি ও মাদায় রোপণ : আজকাল বর্ম কলমের (Shield budding) সাহায্যেই বেশির ভাগ চারা প্রস্তুত করা হয়। এই পদ্ধতিতে আদিজোড় (stock) হিসেবে টক কমলার চারা, বাতাবীলেবুর চারা, লেবুর চারা অথবা সাতকরার চারা ব্যবহার করা যেতে পারে। উপজোড় (scion) হিসেবে নির্বাচিত গাছ হতে চোঁখ (bud) বর্মের (shield) আকারে প্রায় ২৩৫ সে: মি: লম্বা ধারাল চাকুর সাহায্যে কেটে নিতে হয়। তৎপর আদিজোড়ের কাণ্ডে (মাটি হতে ২–৩ইঃ) অর্থাৎ ৫–৭.৫ সে: মি: উপরে) ইংরেজি T অক্ষরের আকারে চামড়া কেটে তাতে সেই চোখ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আদিজোড়ের কাণ্ডের ব্যাস ১২/১৩ মি: মি: হলে এবং কাটা চামড়া সহজেই কাণ্ড হতে উঠিয়ে আনলে কলমের কাজ সহজেই করা যায়। কাটা স্থানে চোখ বসাবার পর সেই স্থান প্লাসটিক কাগজের টুকরা দ্বারা আঁটসাট করে বেঁধে দিতে হয় যাতে সেস্থলে কোনো পানি প্রবেশ না করতে পারে। এইভাবে বাঁধার তিন চার সপ্তাহ পর প্লাসটিক কাগজ খুলে দিলে যদি দেখা যায় কাটা স্থান সবুজ রং ধারণ করে জোড়া লেগে গিয়েছে তা হলে বুঝতে হবে কলমের কাজ সার্থক হয়েছে। চোখ ফুটে বের হয়ে ডালা বা চারা কিছুটা বড় হলে আদিজোড়ের আগা কেটে ফেলতে হয়। তা হলে উপজোড় অর্থাৎ কলমের চারার বৃদ্ধি সুষ্ঠুরূপে চলতে থাকে। প্রয়োজনমতো চারার পাশে একটি ঠেস দিয়ে তাতে চারা বেঁধে দিলে ভালো হয়। এভাবে কলম অর্থাৎ চারার বয়স এক বৎসর হলে বাগানে স্থানান্তর করা যায় অর্থাৎ বাগানের পূর্বপ্রস্তুত মাদায় একটি একটি করে লাগানো হয়। বর্ম কলমের চারা ছাড়াও দাবা কলম (ground layer) ও শূটি কলমের চারা দ্বারা কমলার বাগান সৃষ্টি করা যায়। জুন–জুলাই মাসে বাগানে চারা লাগাতে হয়, তাতে মৌসুমের বৃষ্টির পানিতে চারার বৃদ্ধি সুষ্ঠুরূপে চলতে থাকে।

পরবর্তী পরিচর্যা : পুরাতন বাগানের চেয়ে নতুন বাগানে প্রাথমিক অবস্থায় আগাছার প্রকোপ বেশি দেখা যায়, তাই সময়মতো বাগানের আগাছা বা ঘাসগাছড়া পরিষ্কার করে দিতে হয়, তৎসঙ্গে মাটি কুপিয়ে দেওয়া আরো ভালো। লক্ষ্য রাখতে হয় গাছের গোড়ার মাটি যেন কখনো শক্ত না হয়ে যায়। তদ্রূপ হয়ে গেলে মাটি কুপিয়ে নরম করে দিতে হয়। বাগানে চারা লাগাবার পর পরই একটি আচ্ছাদন শস্য যেমন বরবটি অথবা মাযকলাই জন্মিয়ে তা কুপিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে খুব ভালো হয়। এতে একদিকে যেমন মাটিতে জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের যোগ সাধন হয়, অন্যদিকে তেমনি আগাছাও সহজে দমন করা হয়।

শুকনার দিনে কমলার বাগানে পানি সেচ দিতে পারলে যথেষ্ট উপকার হয়। আমাদের দেশে যে সমস্ত পাহাড়ি এলাকায় কমলার চাষ হয় সেইসব অঞ্চলে সেচ দেওয়ার যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। তাই গাছের গোড়া অন্তত শুকনা জঙ্গল বা খড়কুটা দিয়ে ঢেকে রাখতে পারলে জমিতে দীর্ঘদিন রস সংরক্ষিত থাকে।

বাগানে দ্বিতীয় বৎসর হতে আরম্ভ করে প্রতি বৎসর বাগানের প্রতিটি গাছের গোড়ায় সার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কমলার চাষে নাইট্রোজেনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; ফসফরাস ও পটাশের ভূমিকাও নগণ্য নহে। দস্তা, ম্যাংগানিজ, বোরণ ও মলিবডেনাম কমলা গাছের পুষ্টির জন্য প্রয়োজন বলে প্রমাণিত হয়েছে।[১৩] এই সমস্ত খাদ্যোপাদানের কথা মনে রেখে কমলার বাগানে প্রতি বৎসর সার প্রয়োগ করা উচিত। শেষোক্ত গৌণ খাদ্য উপকরণের জন্য ততটা চিন্তা না করে প্রতিটি গাছের জন্য ৭৫ কেজি, পচা গোবর ৪৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১½ কেজি হাড়ের গুড়া, ১½ কেজি সুপার ফসফেট অথবা ৪৫০ গ্রাম টি. এস. পি এবং ৩ কেজি ছাই মিশাইয়া প্রয়োগ করা বিধেয়।

কমলা গাছের গোড়ার দিকে কিছু কিছু ডালপালা বা ফেকরী বের হয়, সেগুলি ছোট অবস্থায়ই ভেঙ্গে দেওয়া ভালো। হাতের আঙ্গুলের চাপে এই কাজ সম্পন্ন করা যায়। গাছ ছাটাইর তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। কেবল ভাঙ্গা মচকানো, মৃত ও রোগাক্রান্ত ডালপালা কেটে সরিয়ে ফেলতে হয়। তবে একবার গাছের ১ মিটার উচ্চতায় প্রধান কাণ্ডের আগা ছেদন করে দিলে গাছের গঠন ও কাঠামো সুগঠিত হয়। কোনো বাগানে গাছের অতিরিক্ত বৃদ্ধি দেখা দিলে তাহা একান্তর বৎসরে (alternate year) গাছের কিছু কিছু শিকড় কেটে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

কমলালেবু অনেক প্রকার কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক. কমলালেবুর ছাতরা পোকা, খ. কমলালেবুর মাছি পোকা, গ. কমলালেবুর কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা এবং কমলালেবুর লম্বা লেজওয়ালা মিলিবাগ।

পূর্ণবয়স্ক ও বাচ্চা এই দুই অবস্থাতেই ছাতরাপোকা ইহার লম্বা ঠোটের সাহায্যে কচি কমলার রস চুষে খায় ; ফলে কমলা দুর্বল হয়ে গাছ হতে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত গাছের নিচে অনেক ঝরা ফল পড়ে থাকতে দেখা যায়। জুলাই–আগস্ট মাসে আক্রমণ তীব্র আকারে দেখা দেয়। প্রতি বিঘার জন্য ম্যালাথায়ন নামক বিষাক্ত ঔষধের ১১ সি. সি. ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করলে পোকা দমন হয়ে যায়। মাছি পোকার কীড়া পাকা ফলের ভিতরে ঢুকে ইহা খাবার অনুপোযোগী করে ফেলে। আক্রান্ত ফল পরিশেষে ঝরে পড়ে। এই পোকার আক্রমণ হতে ফল রক্ষা করতে হলে প্রতি বিঘার জন্য ডিপটেরেকস নামক ঔষধ ১ আউন্স (২৮ গ্রাঃ) প্রতি ১২½ সের (১১.৭৫ কেজি) পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ দিন অন্তর অন্তর বাত্তি ফলে প্রয়োগ করতে হবে। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাগানে গাছের কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকার প্রকোপ দেখা যায়। এই পোকার সাদার কীড়া গাছের কাণ্ডে ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে যায় এবং ভিতরের শক্ত কাঠ কুড়ে কুড়ে খায়। আক্রমণ তীব্র হলে গাছ কোনো কোনো সময় সম্পূর্ণ মারা যায়। এপ্রিল হতে আগস্ট মাসের মধ্যে বাগানের গাছ পরীক্ষা করে যদি প্রাপ্তবয়স্ক পোকা দেখা যায় সেগুলি ধরে মেরে ফেলতে হবে। কীড়া কাণ্ডে যে ছিদ্র করে সেগুলির মুখ ক্রিয়োজোট অথবা কোলটারে সিক্ত ন্যাকড়া দিয়ে তার উপর কাদামাটি দ্বারা চেপে বন্ধ করে দিলে কীড়া মারা যেতে পারে। লম্বা লেজওয়ালা মিলিবাগ কমলা গাছের কাণ্ড, ডালপালা, মুকুল, ফল প্রভৃতির উপর মোম অথবা তুলার ন্যায় আচ্ছাদনের নিচে বসে রস চুষে খায়। ম্যালাথায়ন অথবা প্যারাথায়ন যে কোনো একটির ৪–৬ সি: মি: ১২ কেজি পানির সাথে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে গাছে প্রয়োগ করলে পোকা দমন হয়ে যায়।

ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, এলগি, ভাইরাস ও নেমাটোডের আক্রমণে কমলালেবুর রোগ হতে পারে। এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া (Phytomonas citri) ক্যাঙ্কার (Canker) এবং এক প্রকার ছত্রাকের (Phytopthora spp) আক্রমণে গ্যামেসিস নামক রোগ দেখা দিতে পারে। বোর্দো মিকচার দ্বারা মাঝে মাঝে গাছ ভিজিয়ে দিলে রোগের উপশম হতে পারে। গ্যামেসিস রোগে গাছে নিম্নাংশ হতে আঠা বের হতে থাকে। এতে গাছ আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যায়। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন আদিজোড় ব্যবহার করলে, সেচের পানি গাছের গোড়ায় না লাগতে দিলে, গাছের গোড়ার দিকে বোর্দো–পেস্ট (Bardeau paste) ব্যবহার করিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

গাছে ফুল ও ফল ধরা : বীজের গাছে ৭/৮ বৎসরেই ফুল–ফল ধরে। অন্যদিকে কলমের গাছে ৪/৫ বৎসরে ফল ধরে এবং ১০/১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গাছে পূর্ণ মাত্রায় ফল ধরে। সাধারণত ফেব্রুয়ারি–মার্চ মাসে গাছে নব পহলব দেখা দেওয়ার সাথে সাথে কোথায় কোথায় সুগন্ধিযুক্ত ফুল বের হয়। ফুল ধরার ৮/১০ মাস পরে পরিপক্ক ফল পাওয়া যায়। মজার ব্যাপার এই যে পরবর্তী বৎসর যখন গাছে আবার ফুল দেখা দেয় তখনও গাছে কিছু কিছু ফল থেকে যায়।

ফল সংগ্রহ : ফল সবুজ রং বদলায়ে হলুদ এবং তৎপর কমলা রং ধরলেই বুঝায় গাছে ফল পেকে গিয়েছে। ছোটখাটো বাগানের গাছে পাকা ফলই সংগ্রহ করা যায়, তবে বড় বড় বাগানের ফল সংগ্রহ করে বাজারজাত করতে গেলে ফল একটু একটু হলুদ রং ধরলেই সেগুলি উঠিয়ে লওয়া উচিত। তা হলে ফল দূরদূরান্তে পৌঁছোনোর সময়ের মধ্যে পেকে উঠে এবং পচে যাওয়ার হাত হতে রক্ষা পায়।

গাছে মই লাগিয়ে হাতের সাহায্যে গাছ হতে ফল উঠিয়ে ব্যাগ ভর্তি করে কমলা সংগ্রহ করা যায়। কিছু কিছু ফল মাটিতে দাঁড়িয়েও গাছ হতে আহরণ করা যায়; গাছে উঠে ফল না উঠানই ভালো।

ফলন : প্রতি গাছ হতে ২০০–৪০০টি কমলা পাওয়া যেতে পারে। এই হারে এক হেক্টরের বাগান হতে ৭০০০০–২০০০০০টি ফল সংগ্রহ করা যাবে।

কাজুবাদাম

বাংলাদেশে কাজুবাদাম একটি অপ্রধান ফল হলেও ইহা রপ্তানির মাধ্যমে দেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। লোকালয়ে এই ফলের গাছ কাদাচিৎ দেখা যায়, যা কিছু গাছ জন্মে তাহা পাহাড়ি এলাকায় অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামেই বেশি দৃষ্ট হয়। গাছের ফলটি অর্থাৎ বাদাম অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের বোটার সঙ্গে মাংসল অংশের মধ্যে বাদামের গোড়া প্রোথিত থাকে আর বাদামের নিম্নাংশ বড়শীর ন্যায় নিচের দিকে ঝুলতে থাকে (চিত্র ৮.৬)। খোলা অবস্থায় ফলের বীজ এমনভাবে জন্মিতে খুবই কম দেখা যায়।

কাজুবাদামের আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা।[৩] মেক্সিকো, ব্রাজিল, ও পেরু দেশে এই ফলের চাষ প্রায়শই চোখে পড়ে। ভারতবর্ষেও ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ; প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি করে সে দেশ যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। আফ্রিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল, মালয় উপদ্বীপ ও সিংহলেও কাজুবাদামের চাষ হতে দেখা যায়।

কাজুবাদামের গাছ বেশ বড় হয়— উচ্চতায় ৩০-৪০ ফুট অর্থাৎ ৯.৫–১৩ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা যায়। পাতা বেশ বড় আকারের, দৈর্ঘ্যে ৪–৮ ইঃ অর্থাৎ ১০–২০ সে: মি: এবং প্রস্থে ২–৩ ইঃ অর্থাৎ ৫–৭.৫০ সে: মি:। ইংরেজিতে কাজুবাদামকে Cashewnut ও উদ্ভিদতত্ত্বে Anacardium occidentale L. নামে অভিহিত করা হয়।

সমুদ্র সমতল হতে পার্বত্য এলাকার মতো উঁচু পরিবেশেও কাজুবাদাম জন্মাতে পারে। কাজুবাদামের জন্য লাল, বেলে ও বেলে-দোঁয়াশ মাটি উপযোগী। ইহা ছাড়া অন্যান্য হাল্কা ধরনের মাটি যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে তাতেও ইহার চাষ চলে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৫–১৩০ ইঃ অর্থাৎ ৮৯–৩৩০ সে: মি: পর্যন্ত চলে, তবে এই গাছ অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু বলে এর চাইতে কম বৃষ্টিপাত অর্থাৎ অনাবৃষ্টিতেও টিকে থাকতে পারে।

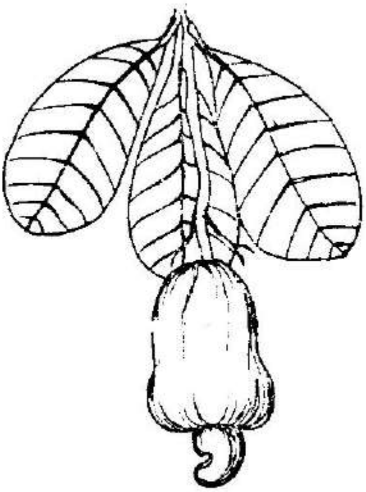

চিত্র : ৮.৬ কাজুবাদামের ফল

চাষাবাদ প্রণালি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজুবাদাম জন্মে। সেই বিবেচনায় সে এলাকায় উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে। পাহাড়ের উপত্যকা অথবা খাঁজকাটা ঢাল নির্বাচন করা যেতে পারে। তৎপর মাটির উর্বরতা অনুযায়ী ২০ হতে ৩০ ফুট অর্থাৎ ৬–৯ মিটার দূরে দূরে গর্ত প্রস্তুত করতে হবে। গর্তগুলি ৪৬ সে: মি: প্রশস্ত হবে। গর্তে চারা লাগাবার এক হতে দুই মাস আগে তা হতে মাটি উঠিয়ে নিয়া কিছু মাটির সঙ্গে অল্প পরিমাণ চুন মিশিয়ে খোলা রেখে দিতে হবে। উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রতি গর্তে মাটি ভরাট করার সময় $১\frac{১}{২}$ – $২\frac{১}{২}$ কেজি চুলার ছাই ও পোড়া মাটি মিশায়ে দিতে হবে। পচা আবর্জনা সার প্রতি গর্তে কিছু কিছু প্রয়োগ করতে পারলে খুবই ভালো হয়।

বীজ সংগ্রহ, চারা উৎপাদান ও বাগানে চারা রোপণ

কাজুবাদামের কোনো নির্দিষ্ট জাত এদেশে নেই। তবে অধিক ফলনযুক্ত গাছের মাঝারী হতে বড় আকারের পুষ্ট ও নীরোগ বীজ সংগ্রহ করা বিধেয়। পাতা বা বাঁশের তৈরি ছোট ছোট ঝুড়িতে মাটি ভর্তি করে তাতে বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা ভালো। এভাবে জন্মান চারা বাগানে রোপণ করতে খুব সুবিধাজনক ও তাতে চারা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তবে বীজের সরবরাহ বেশি থাকলে প্রচলিত নিয়মে বাগানের গর্তে সরাসরি বীজ বপন করাই ভালো। এই নিয়মে প্রতি গর্তে তিনটি করে বীজ পুঁততে হয়। যদি কোনো গর্তে দুটি বা তিনটি চারা জন্মে তবে ভালো চারাটি রেখে বাকিগুলি উঠায়ে ফেলতে হবে। হাতে বীজ কম থাকলে প্রতি গর্তে একটি বীজ বপন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একই সময়ে আলাদাভাবে কিছু চারা উঠাতে হবে, কারণ কোনো গর্তে চারা না উঠলে সেই গর্তে তখন সেই চারা রোপণ করে দিতে হবে। তাতে করে বাগানে কোনো যায়গায় ফাঁক পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

এপ্রিল–মে মাসের প্রথম দুই এক পশলা বৃষ্টিপাতের পরেই বাগানের গর্তে বীজ বা চারা লাগান যেতে পারে। কাজুবাদামের বীজ সাধারণত ২০ দিনে অঙ্কুরিত হয়। তবে গর্তের মাটি শুষ্ক হলে অঙ্কুরোদ্গমের সময় আরো বেশি হতে পারে। দেখা গিয়েছে ৪০ দিন পরেও বীজ গজায়। যদি এই সময়ের মধ্যেও বীজ না গজায় তবে ধরে নিতে হবে সেই বীজ গজানোর আশা আর নেই এবং তখনই সেই গর্তে একটি চারা লাগায়ে দিতে হবে।

বাগানের পরবর্তী পরিচর্যা : বাগানে আগাছা জন্মানো স্বাভাবিক। বৎসরে দু তিনবার আগাছা পরিষ্কার করা বাঞ্ছনীয় এবং তিন বৎসর পর্যন্ত তা সঠিক নিয়মে করা উচিত। কচি কাজুবাদামের চারা কাক, শিয়াল, বানর ও গরু নষ্ট করতে পারে। সেজন্য বাগানের চারিদিকে বেড়া দিয়ে অথবা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সেগুলির হাত হতে চারা রক্ষা করতে হবে। পাহাড়ের উপত্যকায় বা সমতল এলাকায় বাগান করলে গাছের ফাঁকে ফাঁকে অন্য ক্ষুদ্রাকার ফল গাছ যেমন আনারসের চাষ করা যেতে পারে। ইহাতে বাগানে আগাছার প্রকোপ কমে যায় ও বাগান হতে একুনে লাভ বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু পাহাড়ের খাঁজে কাজুবাদামের গাছ লাগান হলে সেক্ষেত্রে মধ্যবর্তী আর কোনো ফলের গাছ লাগানো উচিত নয়, কারণ তাতে উপরের মাটি সরে গিয়ে বাগানের সমুদয় ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকবে।

কাজুবাদামের বাগানে ছাটাইয়ের প্রয়োজন হয় না। তবে মাঝে মধ্যে মরা ও কীটদ্রষ্ট ডালপালা কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া ভালো। তাতে গাছের বৃদ্ধি ভালো থাকে ও দাবাগ্নির সময় গাছ সহজে জ্বলে নষ্ট হয় না।

গাছে ফুল ও ফল ধরা : কাজুবাদাম গাছের বয়স ৩/৪ বৎসর হলেই তাতে ফল ধরা শুরু হয়। তবে দশ বৎসর বয়সের সময় হতে পূর্ণরূপে ফল ধরে এবং ৩০/৪০ বৎসর পর্যন্ত সেভাবে ফল ধরতে থাকে।

আমাদের দেশে সাধারণত ফেব্রুয়ারি–মার্চ মাসে ফল পাকে। দুই বা তিনটি ঝাকে ফুল ফুটে এবং মাঝের ঝাকের ফুল হতে ভালো ফল ধরে। ফুল ফুটার সময় মেঘলা আবহাওয়া ও বৃষ্টি হলে অনেক ফল নষ্ট হয়ে যায়। ফল পাকতে দুই মাস সময় লাগে।

ফল সংগ্রহ ও বাদাম বের করা : কাজুবাদাম এক সঙ্গে পরিপক্ক হয় না। কাজেই অনেক দিন ধরে এই ফল সংগ্রহ করতে হয়— ৪৫ দিন হতে ৭০ দিন পর্যন্ত ফল তোলা চলে। ফল পেকে মাটির নিচে পড়লে তা সংগ্রহ করা যায় এবং অনেক দেশে সেটাই নিয়ম। তবে গাছ হতে সরাসরিও ফল তোলা যায়।

কাজু ফল বা বীজ হতে বাদাম আলাদা বা বের করে নেয়ার কাজটি মোটেই সহজ নয়। চাকু বা ছুরি দিয়ে খোসা কেটে বীজ ছাড়ান যায় না, কারণ খোসা অত্যন্ত শক্ত এবং ঐ খোসার উপরে এক রকম বিযাক্ত তৈল (Cardol ও anacardic acid) হাতে লাগলে হাতের চামড়া পুড়ে যায়। কাজেই নিম্নোক্ত উপায়ে খোসা হতে বাদাম ছাড়াতে হয়।

ধাতু নির্মিত একটি কড়াইয়ে খোসাসহ বীজ ভাজতে হয়। ভাজার সময় তা অনবরত নাড়তে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না খোসা হতে নির্গত তরল পদার্থের ধুয়া হওয়া বন্ধ না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত বাদাম ভাজার কাজ চলতে থাকে। তৎপর তা ঠাণ্ডা করে সেটির প্রান্তে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে বাদাম দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় ; ইহাতে বাদাম চূর্ণ হয় না। শাঁস বা বাদামের উপরস্থ পাতলা পর্দা আঙ্গুলের ঘসাতেই সরে যায়। তৎপর সেগুলিতে একটু লবণ ঢেলে প্যাকেটে প্যাকিং করা হয়। এই অবস্থায় সেগুলি খেতে বেশ মুখরোচক।

একটি বয়স্ক কাজুবাদাম গাছ হতে বৎসরে ৪.৫–১৪ কেজি ফল পাওয়া যায় এবং তা হতে উৎপন্ন হয় প্রায় ১ কেজি হতে ৩.৫ কেজি বাদাম। মাদ্রাজের কোনো কোনো পরিণত গাছে বৎসরে ১ মন ৩৫ সের অর্থাৎ ৭৫.৫ কেজি পর্যন্ত ফল পাওয়া গিয়াছে।[৪]

কাজুবাদামের ব্যবহার

কাজুবাদাম একটি অধিক প্রোটিন ও চর্বিযুক্ত এবং মুখরোচক খাদ্যবস্তু। ইহাতে শতকরা ২১.২ ভাগ প্রোটিন ও ৪৬.৯ ভাগ চর্বি আছে। তাই পশ্চিমের দেশগুলিতে ইহার বিশেষ চাহিদা আছে যদিও আমাদের দেশে ইহার ততটা কদর নেই।

কাজুবাদামের খোসা হতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহাও কাজে লাগে। এই তৈলের পরিমাণ প্রায় শাঁসের ওজনের অর্ধেক। এই তৈল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল' (Insulating material) রূপ ব্যবহার করা যায়। ঝাঁঝরি কড়াইয়ে বাদাম ভেজে নিচে অপর একটি পাত্র ধরলে তাতে তৈল জমা হয়। এই নিয়মে শতকরা ৫০ ভাগ তৈল সংগ্রহ করা যায়। আধুনিক প্রথায় ছিদ্রযুক্ত ও ডঙ্গিকৃত রোস্টার (rotary roaster) ব্যবহার করে আরো অধিক পরিমাণ তৈল সংগ্রহ করা হয়।[৩]

কাজুবাদামের উপরের মাংসল অংশ মোলায়েম, রসাল, ও অম্লস্বাদযুক্ত। ইহা হতে জ্যাম (Jam) প্রস্তুত করা যায় ; বিশেষ তীব্র গন্ধের জন্য ইহা কারো কারো কাছে আকর্ষণীয়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আহমদ, কা : ফুল-ফল ও শাক-সবজী, ১৯৬৭। প্রকাশনায় : আলহাজ কামিছউদ্দীন আহমদ। সর্বজনীন গ্রন্থালয়, ১৪০, নিউ মার্কেট, ঢাকা পৃ. ২৭২–৭৬।
২. ঐ, পৃ. ৩১৭–৩০।
৩. ঐ, পৃ. ৩৪৬–৪৭।
৪. আপনার প্রিয় ফল কাজুবাদাম। কৃষিতথ্য কেন্দ্র। কৃষি কমপ্লেক্স, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. আলম, খুঃ আনারস প্রসঙ্গে। কৃষিকথা, ১৯৭২। কৃষিতথ্য কেন্দ্র। কৃষি কমপ্লেক্স, শেরে–বাংলা নগর, ঢাকা। পৃ. ২১৪–২১৭।

৬. কামালউদ্দীন, আ.স.ম : ফলের চাষ, ১৯৬৬। প্রকাশনায় : কামরুন নাহার। ৪১ এফ, আজিমপুর এস্টেট, ঢাকা। পৃ. ১৪২-৫৮।

৭. Collins J. L. The Pineapple. 1960. The Interscience Publications. INC. New York. p. 32.

৮. Ibid, 132-35.

৯. Ibid. p. 154.

১০. Ibid. p. 205.

১১. Ziegler, L. W. and Wolfe, H. S : Citrus Growing in Florida, 1961. University of Florida Press, Gainville. p. 2.

১২. Ibid, p. 119.

১৩. Ibid, pp. 163-65.

নবম অধ্যায়
নেশাকর বা আমেজ সৃষ্টিকারী শস্য
NARCATICS

তামাক, গাঁজা, ভাং, আফিং প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ উপকরণ সেবনকারীর কর্মক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত দেহ–মনে এমন এক তৃপ্তি ও আমেজ বা তন্দ্রা সৃষ্টি করে যাতে সে নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করে। কিন্তু দিনের পর দিন ব্যবহার করার ফলে তা এক সময় অভ্যাস বা নেশায় দাঁড়িয়ে যায়। তখন ইচ্ছা করলেও সেবনকারী তা আর ছাড়তে পারে না।

তামাক, গাঁজার ব্যবহার যে ক্ষতিজনক সে সম্বন্ধে আজ কারো মনে কোনো সংশয় নেই। গাঁজা জাতীয় উপকরণ যেমন ভাং চরস, হেশহিশ প্রভৃতি ব্যবহারে পাশ্চাত্যের সভ্যতা পর্যন্ত আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বহু যুবক–যুবতী এমনকি কিশোর–কিশোরী এই নেশার প্রভাবে সংসার বিরাগী হয়ে মাতালের মতো ভব-ঘুরের জীবন কাটায়। সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ম–কানুনকে ফাঁকি দিয়ে দিন দিন নেশাগ্রস্তের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে 'বিষ' কথাটি লেখা থাকে। তবুও নেশাগ্রস্ত তামাকসেবীরা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিয়মিত ধূমপান করে যাচ্ছে।

তামাক ও গাঁজা এই দুটি নেশাকর শস্যই বাংলাদেশে জন্মে। সাধারণ চাষীরা তামাক যথেচ্ছা চাষ করতে পারলেও গাঁজার চাষ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। রাজশাহী জেলার নওগাঁতে প্রতি বৎসর মাত্র ১৫০ একর অর্থাৎ ৬১ হেক্টর জমিতে গাঁজার চাষ হয়।[৮] বর্তমানে এটির চাষ সরকার কর্তৃক একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে ধরা যায়।

তামাক

তামাক সারা বিশ্বে আজ একটি বিতর্কিত শস্য। নেশাকর তামাক সেবনকারীরা মনে করে তামাক সেবনে কর্মক্লান্ত শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠে, দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয় ইত্যাদি আর বিপরীত পন্থীরা মনে করে ইহা সেবনে মানবদেহে বিষক্রিয়া হয়, ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের সৃষ্টি হয়। তবুও বিশ্বের কোথায়ও তামাক সেবন বা উৎপাদনের কোনো ঘাটতি বা বিরতি নেই এবং তা দিন দিন বেড়ে চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়। সারা বিশ্বের উৎপাদনের $\frac{১}{২}$ ভাগ উৎপাদিত হয় এই দেশে।[৫] ৪৩৯৪ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ হয় আর উৎপন্ন হয় ৩৯৮২৭ টন তামাক পাতা (সারণি–৩৫ দ্রষ্টব্য)[৮] হুক্কা তামাক দেশের সর্বত্র কিছু কিছু উৎপন্ন হলেও আসলে উন্নত মানের

বাংলাদেশের প্রতি বৎসর গড়ে ৪ অর্থাৎ সিগারেট তামাক উৎপন্ন হয় দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটির জেলায়। রংপুর জেলা এই হিসেবে শীর্ষ স্থানীয়। অন্যান্য জেলার মধ্যে সিগারেট তামাক ভালো উৎপন্ন হয় কুষ্টিয়া, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও ঢাকা জেলায়।

তামাক উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে বাজারদরের অনিশ্চিয়তার দরুন উৎপাদনের পরিমাণের স্থিরতা নেই। কোনো বৎসর দাম অত্যাধিক হয়ে যায়। আবার কোনো বৎসর দাম বেশ কমে যায়। যে বৎসর দাম কমে যায় ঠিক পরবর্তী বৎসরে তামাকের আবাদ বেশ কমে যায়। আবার যে বৎসর

সারণি – ৩৫ : বিভিন্ন বৎসরে বাংলাদেশে তামাকের আবাদি জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

বৎসর	জমির পরিমাণ (হেক্টরে)	উৎপাদন মে. টনে
১৯৮৪–৮৫	৫১২৫৬	৪৯৩৩৭
১৯৮৫–৮৬	৫২৮৯৪	৪৬৪৭৬
১৯৮৬–৮৭	৫৭৪৭৫	৩৯৯৯০
১৯৮৭–৮৮	৪৬৬২৬	৪১৫৪৫
১৯৮৮–৮৯	৪৫২৪৮	৩৯৩০১
১৯৮৯–৯০	৪৪৫৪৬	৪০৬১৩
১৯৯০–৯১	৩৭৫৮০	৩২৭৭৫
১৯৯১–৯২	৩৬৩৬৪	৩৪০৮০
১৯৯২–৯৩	৩৫৭৩০	৩৬৩৮০
১৯৯৩–৯৪	৩৬২১৮	৩৭৭৭০

উৎস : বাংলাদেশে পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯৫

তামাকের দাম বেশ বৃদ্ধি পায় পরবর্তী দুই এক বৎসর আবাদও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে তামাক চাষীরা কোনো কোনো বৎসর দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দেশের তামাক চাষ যাতে একটা সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে, উন্নত মানের তামাকের উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, চাষীরা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে সমস্ত দায়িত্ব 'তামাক উন্নয়ন বোর্ড' নামে একটি সরকারি সংস্থার উপর অর্পণ করা হয়। তামাক যাতে বিদেশে রপ্তানি করা যায় সেদিকে প্রচেষ্টায় ও তৎপর থাকার জন্যও এই সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে এ সংস্থা বেশ কয়েক বৎসর আগে থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

তামাকের আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা বলে ধরা হয়।[৩] স্পেনবাসীদের দক্ষিণ আমেরিকা বিজয়ের পর হতে ইহা ইউরোপ মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর আমেরিকায় তামাকের চাষ শুরু হয় ১৬১২ সাল হতে। পাক–ভারত–বাংলা উপমহাদেশে পর্তুগিজদের দ্বারা তামাক চাষের প্রবর্তন হয়। আস্তে আস্তে পৃথিবীর অপরাপর দেশে তামাকের আবাদ শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ চীন, ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ান, ব্রাজিল, জাপান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে উল্লেখযোগ্য তামাক উৎপন্ন হয়।[৬, ৯]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতেই বেশি এবং উন্নত মানের তামাক উৎপন্ন হয়। তবে দেশের পূর্বাঞ্চলের অনেক জেলাতেই কম-বেশি তামাক উৎপন্ন হয়।

মাটি ও জলবায়ু

বহু ধরনের মাটি ও জলবায়ুতে তামাক চাষ সম্ভব হলেও বিশেষ ধরনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর উচু মানের তামাক উৎপাদন নির্ভর করে। তাই দেখা যায় বাংলাদেশের রংপুর ও কুষ্টিয়া জেলায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া, কেন্টাকী, উত্তর কেরোলাইনা এবং দক্ষিণ কেরোলাইনা অঙ্গরাজ্যে উন্নত মানের তামাক উৎপন্ন হয়।

তামাকের মাটি সুনিষ্কাশনযুক্ত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এ জন্য খুব হাল্কা যেমন— বেলে-দোঁয়াশ ও পলি–দোঁয়াশ মাটিই তামাকের জন্য সব চাইতে উপযোগী। তবে বেলে মাটিতেও তামাক জন্মাতে পারে। আবার ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকার মতো ভারি মাটিতেও তামাকের চাষ করা হয়ে থাকে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে হাল্কা ও কম উর্বর মাটিতে তামাকের পাতা পাতলা অর্থাৎ উন্নত মানের হয় আর ভারি উর্বর মাটিতে মোটা বৃহদাকার নিম্নমানের পাতা উৎপাদিত হয়।

ক্ষারাত্মক মাটি দূরে থাকুক নিরপেক্ষতার কাছাকাছি মাটিও তামাক চাষের জন্য মোটেই ভালো নয়। অম্লাত্মক মাটি যার পি. এইচ. (PH ৫.৫–৬.৫) তাই তামাকের জন্য সর্বোত্তম।

মৌসুমে মাঝারি ধরনের অর্থাৎ ৭৬২–১০১৫ মি: মি: বৃষ্টিপাত তামাকের জন্য যথেষ্ট। বৃষ্টিপাত সারা মৌসুম ধরে বিস্তৃত থাকলে ২০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫০৮ মি: মি: বৃষ্টিতেও তামাক ভালো জন্মাতে পারে। তামাক পাতা পেকে আসার বেশ কিছু পূর্ব হতেই একটুও বৃষ্টিপাত না হলেই ভালো। ভারি বৃষ্টি হলে পাতার গুণাগুণ একেবারে ধুয়ে যায়। এজন্য চাষীরা সন্ত্রস্ত থাকে কিভাবে বৃষ্টির আগেই তামাক কেটে ঘরে উঠানো যায়। বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত ৭৫ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৯০৫ মি: মি: হলেও তামাক চাষ সম্ভব হয় এজন্য যে রবি অর্থাৎ তামাকের মৌসুমে বৃষ্টি মোটেই হয় না। এজন্য এদেশে সার্থক তামাক চাষ করতে হলে পানি সেচের বন্দোবস্ত করতে হবে।

তামাক আবাদকালীন সময়ে তাপমাত্রা ১৫° সে: হতে ৩৮° সে: বা ৪১° সে: পর্যন্ত হলে ভালো হয়।[৩] তামাক বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য ৮৮° ফা: অর্থাৎ ৩১° সে: তাপমাত্রা যুগোপযোগী আর মাঠে ৮০° ফা: অর্থাৎ ২৭°সে: তাপমাত্রায় তামাক গাছ সুষ্ঠুরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তামাক চাষের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এই পাতা শুকাবার সময় বায়ুতে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকা দরকার ; শতকরা ৮০ ভাগ আর্দ্রতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহাতে পাতা শুকাবার সময় মচমচা না হয়ে মোলায়েম থাকে। মচমচা পাতা ভঙ্গুর। গুদামজাত বা বাজারজাত করার প্রাক্কালে এরূপ পাতা ভেঙ্গে সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

তামাক (Solanaceae) পরিবারভুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Nicotiana tabacum L. ও Nicotiana rustica L. প্রথমোক্ত নামের তামাক সিগারেট ও চুরুট প্রস্তুত করতে ও শেষোক্ত নামের তামাক হুক্কায় ব্যবহার করা হয়।

সিগারেট তামাকের গাছ উচ্চতায় ৪–৬ ফুট অর্থাৎ ১.২৪–১.৮৫ মিটার পর্যন্ত হয়। বারো হতে পঁচিশটি বৃহদাকারের লম্বাকৃতি পাতা গাছের নরম কাণ্ডকে ঘিরিয়া জন্মে (চিত্র ৯.১)। পাতার বোঁটা নেই বললেই চলে। গাছের আগার দিকে পাতা ক্রমশ ছোট হতে থাকে। কোনো কোনো জাতে একটি পাতা ২১ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫৩ সে: মি: লম্বা ও ১১ ইঞ্চি অর্থাৎ ২৫ সে: মি: প্রশস্ত হতে পারে। গাছের ডগায় ফানেল আকৃতির ১৩০–১৩৫টি সাদা বা গোলাপি রংয়ের ফুল ধরে। ফল গোলাপি রংয়ের একটি কেপসুল (Capsule) ; এক একটিতে ৪০০০–৫০০০ টি বীজ থাকতে পারে। বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র। দেখা গিয়েছে একটি মাত্র গাছে দশ লক্ষ পর্যন্ত বীজ উৎপন্ন হতে পারে।[৬]

হুক্কা তামাকের গাছ খর্বাকৃতির ; উচ্চতায় ২–৩ ফুট অর্থাৎ ৬২–৯২ সে: মি: হয় (চিত্র ৯.২)। পাতা দেখতে অনেকটা গোলাকার ; ঢেউ খেলানো ও মোটা লোমশ যা হাতে স্পর্শ করলেই বুঝা যায়। ফুলগুলির রং হাল্কা সবুজ।

চিত্র : ৯.১ সিগারেট তামাক গাছ

সিগারেট তামাকের বেশ কিছু জাত রয়েছে। এগুলির মধ্যে কতকগুলি জাত বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়ায় ভালো জন্মে। সেই জাতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'হ্যারিসন স্পেশাল' (Harisson Special), ম্যাকনিয়াম—১২ (Macnier-12), এন. সি,–৯৫ (N. C. 95), পোকার ২৫৪ (Poker 254) এবং বার্লি–২১ (Burley-21), হুক্কা তামাকের উল্লেখযোগ্য জাত হলো ক. মতিহারি এবং খ. জাতি। সম্প্রতি 'মলডোভান' নামক সিগারেট

তামাকের একটি জাত রংপুর অঞ্চলে আবাদ করে খুব ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে বলে বাংলাদেশে লিফ টোবাকো কোম্পানির ম্যানেজার দাবি করেছেন*

চিত্র : ৯.২ হুক্কা তামাক গাছ

দেশে যাতে সিগারেট তামাকের আবাদ বৃদ্ধি পায় সেজন্য তামাক উন্নয়ন বোর্ড চেষ্টা চালিয়েছিল। তার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় দেশে গত দু দশকে সিগারেট তামাকের আবাদ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ঢাকা জেলায় যেখানে ১৯৭৭-৮৭ সালে ১৩ হেক্টর জমিতে এই তামাকের চাষ হয় সেখানে ১৯৭৮-৭৯ অর্থাৎ পরের বৎসরেই চাষ হয় ৪০৫ হেক্টর জমি এবং ১৯৮০-

* ১৯৯৭ সালের ২৪ আগস্টে প্রকাশিত বাংলাদেশ অবজার্ভার পত্রিকার সৌজন্যে

৮১ সালে তাহা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয় ১৮২২ হেক্টরে। কুষ্টিয়া জেলাতেই ইহার আবাদ বেশি বৃদ্ধি পায়; ১৯৭৭–৭৮ সালে যেক্ষেত্রে ৪৬০৭ হেক্টর জমিতে সিগারেট তামাকের আবাদ হয় সেক্ষেত্রে ১৯৮০–৮১ সালে আবাদ হয় ৮০৯৭ হেক্টর জমিতে। সিগারেট তামাকে আদি জেলা রংপুরেও ইহার আবাদ বৃদ্ধি পায়, তবে তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি তত বেশি নয়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

বীজতলা প্রস্তুত ও চারা উৎপাদন : তামাকের চাষ করতে গেলে প্রথমেই চারা উৎপাদন করতে হবে। ক্ষেতে চারা রোপণ করবার মাস দেড়েক আগে বীজতলায় চারা জন্মাতে হয়।

বীজতলা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে হাল্কা সেচ বা বৃষ্টির পানিও অতি সহজে নিষ্কাশিত হয়ে যেতে পারে। এজন্য বীজতলার মাটি বেলে–দোঁয়াশ বা পলি–দোঁয়াশ দেখে নির্বাচন করতে হবে। বীজতলার নিচে এক স্তর ইটের টুকরা বা খুয়া দিলে পানি নিষ্কাশন বেশ সহজতর হয়। পনেরো ফুট অর্থাৎ ৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও দশ ফুট অর্থাৎ ৩ মিটার প্রশস্ত এরূপ মাপের একটি বীজতলাই যথেষ্ট, কারণ ইহাতে যে চারা জন্মাবে তা দ্বারা এক একর জমি অনায়াসেই লাগানো যেতে পারে। তবে ইহার চাইতে ছোট আকারের অর্থাৎ ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ১.২৪ মিটার প্রস্থ ও ১৫ সে: মি: উঁচু বীজতলা প্রস্তুত করাই ভালো। এরূপ দুইটি বীজতলার মধ্যে হাটাচাড়া ও পানি সরানোর জন্য দুই ফুট অর্থাৎ ৬১ সে: মি: জায়গা খালি রাখা ভালো। বীজতলায় মাটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যে তা যেন মিহিন বালুর মতো মনে হয়। এবার মাটির উপর কিছু খড় ও শুকনা পাতা রেখে সেগুলি জ্বালিয়ে দিতে হবে। পাতা ও খড়ের ছাই আস্তে আস্তে নেড়ে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। তৎপর বীজতলায় ৪–৫ কেজি পচা গোবর, ৩ কেজি গোবর ৪৪ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪৪ গ্রাম পটাসিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এইবার বীজ বপন করার পালা। প্রতি বীজতলাতে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি এক গ্রাম (চায়ের চামচের এক চামচ) বীজ বপন করলেই যথেষ্ট, কারণ তাতেই কয়েক লক্ষ বীজ থাকতে পারে। বীজ অত্যন্ত ছোট বলে ছাই বা বালির সাথে মিশিয়ে বপন করতে হয়। ইহাতে বীজতলার সমস্ত জায়গায় বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় বীজতলা হতে পিঁপড়া বীজ নিয়ে যায়। বোনার আগে বীজ হাতের তলায় নিয়ে সামান্য একটু কেরোসিন দিয়ে ঘসে দিলেই পিঁপড়া আর বীজ ধরে না। বীজতলায় বীজ বুনার পর মাটি একটু একটু আচড়িয়ে দিয়ে পরে হাতের চাপে মাটি একটু আটসাট করে দিলে ভালো হয়। এখন ঝাঝরির সাহায্যে পানি দিয়ে বীজতলার মাটি হাল্কাভাবে ভিজিয়ে দেওয়ার পর মিহি বালুর একটি আবরণ দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে।

রৌদ্রের তেজ ও বৃষ্টির ফোঁটা হতে রক্ষা করার জন্য বীজতলার উপরে একটি চালা উঠাতে হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চারা বীজতলার উপর হতে সরিয়ে নিতে হয় এবং সকালে উঠিয়ে দিতে হয়। প্রতিদিন নিয়মিত বীজতলায় হাল্কাভাবে সেচ দিতে হবে। পাছ ছয় দিন পর বীজ ভালোভাবে গজিয়ে উঠলে সরিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা গেলে চারা দিন বা রাত্রি যে কোনো সময়েই ব্যবহার করা উচিত। নচেৎ বৃষ্টির ফোঁটায় চারাগাছ বীজতলার মাটি হতে উঠে যেতে পারে।

বীজতলায় দুই একবার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। চারা খুব ঘন থাকলে সপ্তাহ দুই পর কিছু কিছু পাতলা করে দিতে হবে, এক চারা হতে অন্য চারার দূরত্ব ২.৫৪ সে: মি: রাখলেই চলবে। ইহাতে চারাগুলি সতেজ হয়ে জন্মাবে। বীজতলায় মাটি শুষ্ক হয়ে উঠলে যথারীতি সেচ দিতে হবে। আবার বেশি সেচ দিয়ে মাটি খুব সিক্ত রাখা উচিত নয়, কারণ সে পরিবেশে বীজতলার 'চারা পচা রোগ' (Daming off) দেখা দিতে পারে। এই রোগ দেখা দিলে দমন করার জন্য প্রতি সপ্তাহ পর পর কপার অক্সিক্লোরাইড হেক্টর প্রতি প্রায় ১ কেজি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

জমি প্রস্তুতি : ভাদ্র মাসের প্রথম হতেই তামাকের জমি প্রস্তুতির কাজ শুরু করতে হয়। তামাকের জমি হাল্কা দেখে নির্বাচন করা হলেও খুব ভালো অর্থাৎ ৭/৮ বার চাষ মই দিয়ে অতি মোলায়েমভাবে তৈরি করা উচিত। শেষ মইটি একটু আটসাট করে দিতে হয় ; তাতে জমির রস বেশি দিন টিকে থাকে।

সার প্রয়োগ : তামাকের জমি উর্বর হওয়া উচিত, তবে বেশি উর্বর নয়। অধিক পরিমাণ গোবর বা নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে সিগারেট তামাকের পাতা পুরু হয়ে পড়ে, পাতার সুগন্ধ নষ্ট হয় এবং নিকোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। হুক্কা তামাকের জন্য অবশ্য তেমন কিছু আসে যায় না।

তামাকে নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে :

	একর প্রতি	হেক্টর
ইউরিয়া	৩৫ সের	৮০ কেজি
টি. এস. পি	২২ সের	৫০ কেজি
পটাসিয়াম সালফেট	৩৫ সের	৮০ কেজি
অথবা		
কচুরীপানার ছাই	১ মণ ২২ সের	১৪০ কেজি
অথবা		
চুলার ছাই	৫ মণ	৪৫০ কেজি

অর্ধেক পরিমাণ ইউরিয়াসহ অন্যান্য সার জমিতে শেষবার চাষ মই দেওয়ার আগে ব্যবহার করতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া চারার বয়স দেড় মাস হলে গাছের গোড়ায় চারি পাশের মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

চারা রোপণ : পুরা কার্তিক মাস সিগারেট তামাকের চারা লাগানো যায়। হুক্কা তামাকের চারা অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোপণ করা যেতে পারে। বীজতলায় একটি সেচ দিয়ে চারা উঠানো সহজতর হয়। মাঝে মাঝে যে দুই একটি বড় চারা বীজতলায় দেখা যায়, সেগুলি উঠিয়ে ফেলে দিয়ে একই আকারের চারা উঠিয়ে চারা সারি করে খেতে লাগাতে হয়। প্রতি দুই সারির মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে ৩ ফুট বা ১ মিটার এবং সারিতে চারার মধ্যে ২ ফুট অর্থাৎ ৬১ সে: মি:। উত্তর দক্ষিণে সারি করে নিড়ির আগার সাহায্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে চারা রোপণ করা যায়। কাঠের বা লোহার গোলাকৃতি আগা সূচালো ৮–১০

ইঃ অর্থাৎ ২০–২৫ সে: মি: লম্বা খুঁটি বা গচির সাহায্যে চারা লাগানো অধিকতর সুবিধাজনক। চারা প্রতি গর্তে রোপণ করার পর গোড়ার মাটি টিপ দিয়ে ভালোভাবে আটসাট করে দিতে হয়। সকালবেলা বীজতলা হতে চারা উঠিয়ে সেই সকালবেলার মধ্যেই চারা ক্ষেতে রোপণ করে ফেলা বিধেয়। না পারলে সেই দিন বিকেলে অবশ্যই লাগাতে হবে। চারা লাগাবার পর ঝাড়ির সাহায্যে সকাল বিকাল ৩/৪ দিন সেগুলির গোড়ায় সেচ দিলে চারা মরে যাবার ভয় থাকে না। পূর্বে উল্লিখিত ৩ মিটার দীর্ঘ ও ১.২৪ মিটার প্রশস্ত একটি বীজতলার চারা দিয়ে এক বিঘা জমিতে তামাক লাগানো যায়। উল্লিখিত নিয়মে লাগালে এক হেক্টরে ১৭৫০০ এর কিছু বেশি চারা লাগাতে হয়।

মাটি আলগা করা ও আগাছা দমন : সাত–আট দিনের মধ্যে জমিতে তামাকের চারাগাছ লেগে যায়। তখন হতেই ক্ষেতের মাটি আলগা করে দেওয়া কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে দুই সারির মধ্যবর্তী মাটি ছোট কোদালীর সাহায্যে হাল্কাভাবে কোপায়ে নরম ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। মাটিতে ঢেলা থাকলে তা হাত মুগুরের সাহায্যে চূর্ণ করে দিতে হবে। ইহাতে জমিতে অতিরিক্ত রস থাকলে তা চলে যাবে। জমিতে ঘাস দেখা দিলে তা নিড়িয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। সিগারেট তামাক হুক্কা তামাকের চাইতে ঘাসের আক্রমণে সহজেই কাবু হয়ে পড়ে। সেইজন্য সেই তামাকের চাষে যথাসময়ে আগাছা দূরীভূত করা অবশ্য কর্তব্য। প্রয়োজনবোধে দুই তিন বার নিড়ানী দিতে হবে। জমিতে সেচ দেওয়ার পর পরই ঘাসের জোর দেখা দেয় বলে সেচের পরেই জমিতে নিড়ি দিতে হয়।

আগা ও শোষক ভাঙ্গা : হুক্কা তামাকের গাছে ৫/৬টি পাতা জন্মাবার পর পরই আগা ভেঙ্গে দিতে হয় তা হলে পাতা বড় ও পুরু হয়। অন্যথায় গাছে অধিক সংখ্যক পাতা ও ফুল ধরলে আসল পাতাগুলি ছোট ও পাতলা হয়ে যায়, ফলে উৎপাদন দারুণভাবে কমে যায়। আগা ভাঙ্গার কয়েকদিন পরেই দেখা যায় গাছের গোড়ার দিক হতে দ্রুত শোষক গজিয়ে উঠে। এগুলি বাড়তে দিলে তামাক পাতার সমূহ ক্ষতি হয়। কাজেই দেরি না করে প্রত্যেকটি শোষকই ভেঙ্গে দিতে হয়।

সিগারেট তামাকে গাছের আগা পর্যন্ত পাতা ধরা শেষ হওয়ার পর ফুল ধরা আরম্ভ হলে তখন সেই পুষ্প মঞ্জরী ভেঙ্গে দিতে হয়। এই কাজটির পর হুক্কা তামাকের মতো গাছের গোড়ার দিক হতে শোষক গজিয়ে উঠে। কালবিলম্ব না করে সেগুলি ভেঙ্গে দিতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তামাক ক্ষেতে আগা ভালোগার পর মালিক হাইড্রোজাইড (Malic hydrazide) নামে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ছিটিয়ে দেওয়া হয়।[৭] তাতে আর কোনো শোষক গজায় না। তদুপরি এই ব্যবস্থায় বিষপাতা দূরীভূত করা তামাক পাতার ওজন বাড়ে ও মানগত উন্নতি হয়। তামাক গাছের গোড়ার দিকে ৩/৪টি পাতা নিকৃষ্ট ধরনের হয়। এই পাতাগুলি বিষপাতা নামে অভিহিত করা হয় যা সিগারেট তামাকে একেবারে অনাবশ্যক মনে করা হয়। পাতাগুলি ধুলাবালি মিশ্রিত থাকে এবং তাতে নানা রোগের জীবাণু থাকতে পারে। সেই জন্য সিগারেট তামাক চাষে সেগুলি কেটে ফেলে দিতে হয়। হুক্কা তামাক চাষে তেমন কিছু করা হয় না।

সেচ প্রয়োগ : হুক্কা তামাক অনেক ক্ষেত্রে বিনা সেচেই চাষ করা হয়। তবে সেচ দিলে ফলন ভালো হয়। সিগারেট তামাকে অবশ্যই সেচ দিতে হবে। অবস্থাভেদে ২/৩ বার সেচ

দিলেই চলে। তবে কোনোক্রমেই বেশি সেঁচ দিতে নেই। তাতে কেবল পাতা সবুজ ও পুরু হবে। আবার প্রয়োজনের কম সেচ দিলে ফলন কম হয়।অন্যদিকে তামাকের জমিতে সেচ দেওয়ার পর পরই যদি দেখা যায় কোথায়ও পানি জমে আছে তা অনতিবিলম্বে বের করে দিতে হবে ; কারণ ক্ষেতে পানি জমে থাকলে তামাক গাছ মারা যেতে পারে।

রোগ ও কীট-পতঙ্গ দমন : তামাকের জমিতে নানা রকম রোগ ও পোকার আক্রমণ হয়। ভালো ফলন পেতে হলে যথাসময়ে রোগ ও কীটপতঙ্গ দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ক. মোজাইক রোগ (Mossaic disease) : এক প্রকার ভাইরাসের আক্রমণে তামাকের পাতায় এই রোগ দেখা দেয়। আক্রান্ত পাতার উপর সবুজ ও হাল্কা সবুজ রংয়ের বিভিন্ন আকৃতির নক্সার মতো দাগ দেখা দেয়। আস্তে আস্তে পাতা বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে যায়। গাছ সম্পূর্ণ মরে না গেলেও গাছের বৃদ্ধি যথেষ্ট ব্যাহত হয়। পরিশেষে ফলন ও পাতার গুণাগুণ কমে যায়।

প্রতিকার

১. জাবপোকা এই রোগ ছড়ায় বলে প্রথমেই ইহার ধ্বংস সাধন করতে হবে।
২. আক্রান্ত গাছ সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
৩. রোগটি ছোঁয়াছে বলে আক্রান্ত ক্ষেতে কাজ করার পর হাত পা খুব ভালোভাবে না ধুয়ে অন্য ক্ষেতে কাজ করতে যাওয়া উচিত নয়।
৪. সুস্থ চারা দেখে রোপণ করতে হবে।
৫. তামাক কাটার পর ক্ষেতে পরিত্যাক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

খ. পাতা কোকড়ানো রোগ (Leaf curling) : পূর্বোক্ত রোগটির মতো ইহাও এক প্রকার ভাইরাসের আক্রমণে সংঘটিত হয়। এবং জাব পোকা তা ছড়ায়ে থাকে। এই রোগের আক্রমণের ফলে পাতাগুলি আগা হতে কোকড়াতে আরম্ভ করে পরিশেষে পাতার বোটা পর্যন্ত কোকড়ায়ে যায়।

এই রোগটির প্রতিকারের জন্য মোজাইক রোগের মতো ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

গ. ঢলে পড়া রোগ (Wilting) : বাংলাদেশের তামাক উৎপাদন এলাকায় প্রায়ই এই রোগ দেখা যায়। এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে ইহা সংঘটিত হয়ে থাকে। আক্রান্ত গাছ ঢলে পড়ে ও তৎপর হলুদ বর্ণ ধারণ করে। রোগ জীবাণুর আক্রমণের ফলে গাছের শিকড় ও গোড়া পচে যাবার ফলেই গাছ ঢলে যায়।

প্রতিকার

১. জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।
২. জমিতে গাছের পরিত্যাক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
৩. আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
৪. জমিতে পর্যায়ক্রমে তামাকের চাষ করতে হবে অর্থাৎ একই জমিতে বারবার তামাকের চাষ না করে অন্যান্য ফসল, যেমন আঁখ, সরিষা, মশুর, ইত্যাদি অন্যান্য ফসল জন্মাতে হবে।

ঘ. চারা পচা রোগ (Damping off of seedlings) : বীজতলায় চারা গাছের ইহা সব চাইতে মারাত্মক রোগ। কয়েক প্রকার ছাতার আক্রমণে এই রোগ দেখা দেয়। আক্রান্ত গাছ মাটির উপরে গোড়ার দিকে পচে ঝিমিয়ে পড়ে। ইহাতে সেই চারা আর তামাক ক্ষেতে লাগাবার উপযোগী থাকে না। অধিক বৃষ্টিপাতে ও স্যাতস্যাতে পরিবেশে এই রোগ দেখা দেয়।

প্রতিকার

১. ডাইথেন, জারলেট, পারজেট ইত্যাদির যে কোনোটির একটি প্রতি হেক্টরের জন্য ০.৯০ কেজি ১১৩৮.০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০/১২ দিন অন্তর অন্তর বীজতলায় ছিটাতে হবে।
২. কখনো যে বীজতলায় পানি জমতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
৩. অধিক বৃষ্টিপাতের সময় চালা দ্বারা বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে।
৪. চারা ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে ; ইহাতে আলো-বাতাস ভালোভাবে লাগতে পারবে।

ঙ. ভূলকী (Orbanche) : ইহা এক প্রকার পরগাছা। তামাক গাছের শিকড়ের সান্নিধ্যে এই পরগাছার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মাটি ভেদ করে চলে আসে। কিছু দিনের মধ্যে সেই গাছে কচুরি পানার ফুলের মতো নীলাভ ফুল দেখ দেয়। এই পরগাছাগুলি খুব সতেজ দেখায় যার অর্থ তামাক গাছের শরীর হতে খাদ্যবস্তু আহরণ করে সেই গাছকে দুর্বল করে দেওয়া। আস্তে আস্তে তামাক গাছের পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ফলন একেবারে কমে যায় এবং পাতার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিকার : ১. তামাক ক্ষেতে ভূলকীর ফুল দেখা দেওয়ার আগেই সেগুলি উঠিয়ে মাটি চাপা অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২. পর্যায়ক্রমে তামাকের চাষ করতে হবে।

ক. কাটুই পোকা (Cutworms) : 'লেপিডপটেরা' (Lepidoptera) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এক প্রকার কীড়া তামাক গাছের কচি চারার গোড়া মাটির সামান্য উপরে বা নিচে কেটে ফেলে। দিনের বেলায় কীড়াগুলি মাটির অল্প নিচে লুকিয়ে থাকে আর রাত্রি বেলায় গাছ আক্রমণ করে। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে এই পোকার আক্রমণ বলবৎ থাকে।

প্রতিকার : ১. বিষটোপ (Poison bait) প্রয়োগ করে কাটুই পোকার কীড়া মারা যেতে পারে। নয় বা দশ কেজি চাউলের গুড়া বা গমের ভূষির সাথে ২.২৫ কেজি প্যারিস গ্রিন বা ৩.৬৩ কেজি হেপ্টাক্লোর ভালোভাবে মিশিয়ে সেই মিশ্রণের সঙ্গে চিটাগুড়ের রস ও সঙ্গে কিছু পানি মিশিয়ে ছোট ছোট বড়ি বা বিষটোপ প্রস্তুত করা যায়। এক একর পরিমাণ জমিতে প্রস্তুত এই বড়ি ব্যবহার করা যায়। বড়িগুলি গাছের গোড়ার আশে পাশে ছড়ায়ে রাখলে কীড়া সেইগুলি খেয়ে মারা যাবে।

২. ম্যালাথায়ন -১০% অথবা সেভিন (গুড়া)-১০% এক হেক্টরের জন্য ৪.৫ কেজি পরিমাণ ১০ কেজি ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে জমিতে রোপণকৃত চারার চারিদিকে গোল করে ছড়িয়ে দিলে কীড়া ধ্বংস হয়ে যায়।

৩. সকালে গাছের গোড়ায় পানি দেওয়ার সময় কীড়া উপরে উঠে আসে, তখন সেগুলি ধরে মেরে ফেলা যায়।

৪. বীজতলার মাটি হেপ্টাক্লোর নামক ঔষধ দ্বারা শোধন করে নিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

খ. লেদাপোকা (Leaf caterpillar) : এই পোকার কীড়াগুলি তামাক গাছের কচি পাতা খেতে থাকে, ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ পাতাই ফলের মতো ছিদ্র করে ফেলে। ফলে ফলন কমে যায়, পাতার গুণাগুণও তেমনিই নষ্ট হয়। পৌষ-ফাল্গুন মাস ধরে এই পোকার আক্রমণ চলতে থাকে।

প্রতি হেক্টরের জন্য ১১৩৮.০০ পানিতে ১১৩৫ মি: মি: লিবাসিড অথবা ডাইজিনন-৫০ ই: সি: অথবা ৫৭৫ সি: সি: ডাইমেক্রন ১০০-ই: সি: মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করলে পোকার আক্রমণ সহজেই কমে যায়।

গ. মাজরা পোকা (Stem borer) : পূর্ণ বয়স্ক পোকা রাত্রিবেলা বীজতলার চারা গাছে অথবা ক্ষেতে লাগানো নতুন চারা গাছের ডগায় অথবা কাণ্ডে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বের হবার পর সেগুলি ছোট ছোট ছিদ্র করে গাছের ডগা ও কাণ্ডের ভিতর ঢুকে পড়ে। কাণ্ডের ভিতরে পোকাগুলি নরম অংশ খেতে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যেখানে পোকার আক্রমণ হয়েছে গাছের সে অংশ স্ফীত দেখায়।

এই পোকার আক্রমণের ফলে চারাগাছ দুর্বল হয়ে পড়ে, পরিশেষে বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যায়। কখনো কখনো গাছে অনিয়মিত শাখা প্রশাখা বের হতে দেখা যায়।

প্রতিকার

১. আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে ফেলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
২. সুস্থ চারাগাছ রোপণ করতে হবে।
৩. আক্রমণের প্রথম দিকে বুঝতে পারলে গাছের কাণ্ড চিরে কীড়া বের করে ফেলতে হবে।
৪. সম্ভব হলে রাত্রিবেলা বীজতলা পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। তা হলে স্ত্রী পোকা ডিম পাড়তে পারবে না।
৫. বীজতলা হতে চারাগাছ উঠিয়ে রোপণ করার পূর্বে আর্সেনিক মিশ্রিত ঔষধে একবার ডুবিয়ে নিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ঙ. জাবপোকা : সরিষা, সিম ইত্যাদিতে যে জাব পোকার আক্রমণ দেখা যায় সেগুলি তামাকের জমিতেও আক্রমণ করতে পারে। সাধারণত পাতার নিচে অসংখ্য জাবপোকা বসে বসে পাতার রস চুষে খায়। এতে গাছের চেহারা মলিন ও রোগাটে হয়ে যায় এবং বৃদ্ধিও স্থগিত হয়ে যায়। ইহারা আবার মোজাইক ও পাতা কোকড়ানো রোগের জীবাণু বহন করে রোগ ছড়াতেও সাহায্য করে। তদুপরি ইহাদের উৎপন্ন মিষ্টি রস তামাক পাতায় লেগে গেলে সেই পাতাগুলি কিউরিং করায় ভয়ানক অসুবিধা হয় এবং ফলে পাতা নির্গুণ হয়ে পড়ে।

প্রতিকার : সময়মতো ঔষধ প্রয়োগ করলে এই পোকা সহজেই দমন করা যায়। প্রতি হেক্টরের জন্য ১১৩৮ লিটার পানিতে ৭৫০ মি: মি: ম্যালাথায়ন অথবা ৫৭৫ মি: মি: ডাইজিনন

সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে পাতার নিচে ও উপরে প্রয়োগ করলে জাবপোকা সহজেই ধ্বংস হয়ে যায়।

ফসল সংগ্রহ (পাতা কাটা) : সিগারেট তামাক পাতা ঠিকমতো পরিপুষ্ট হওয়ার পর কাটতে হবে। তা হলে পাতার মান উন্নত হবে। অধিক ও কম পরিপুষ্ট পাতা—ইহার কোনোটাই ভালো নয়। কারণ, বেশি পুষ্ট পাতার এবং তামাটে হয়ে যায় আর কম পুষ্ট পাতার রং সুন্দর এবং হলদে হয় না। মাঘ-ফাল্গুন মাসে পাতা যখন সজীবতা হারায়ে হলুদ রং ধারণ করতে থাকে এবং পাতার অগ্রভাগ নিচের দিকে ঝুলে পড়ে তখন বুঝতে হবে পাতা কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে।

ভোর বেলা তামাক পাতা তোলার উৎকৃষ্ট সময়। সূর্যের আলোতে পুষ্ট ও অপুষ্ট বুঝে তুলতে অসুবিধাজনক বলেই ভোরবেলা পাতা উঠানো বিধেয়। বিকালবেলা উঠালে পশ্চিম দিক হতে তুলে যেতে হয় যাতে সূর্যের আলো পাতায় পড়তে বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রতি গাছ হতে প্রতিবারে সাধারণত ১-৩টি পাতা তোলা যায়। এইভাবে ৪/৫ বারে পাতা তোলার কাজ সমাপ্ত করতে হয়।

হুক্কা তামাকের গাছ পাতাসহ কেটে লওয়া হয়, আলাদাভাবে পাতা তোলা হয় না। আস্ত গাছ বাঁশের কাঠি বা রশির সাহায্যে উল্টা করে ঝুলিয়ে রৌদ্রে বা বাতাসে শুকানো হয়।

সিগারেট তামাক পাতা কিউরিং বা শুষ্ককরণ

ফ্লু কিউরিং পদ্ধতি (Flue curing method) : হুক্কা তামাক পাতার মতো সিগারেট তামাকের পাতাও রৌদ্রে বা বাতাসে শুকানো যায়। তবে অধুনা উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে বিশেষ এক তথা 'ফ্লু কিউরিং পদ্ধতিতে' সিগারেট তামাক পাতা শুকান যায়। এই পদ্ধতিতে তামাক পাতা শোধন করার জন্য বিশেষ এক ধরনের ঘর বা বার্ন (Bern) নির্মাণ করতে হয়। এই বার্ন নানা আকারের হতে পারে, যেমন— ছোট আকারের ৪ মি: × ২.৫ মি: × ৪ মি: মাঝারি আকারের ৪ মি: × ৪ মি: × ৫ মি: এবং বড় আকারের ৫ মি: × ৫ মি: × ৫ মি:। ঘরে যথাক্রমে সোয়া এক একর, আড়াই একর এবং ৫-৬ একরের তামাক সহজেই শুকানো যায়। বার্নগুলির ভিতর চারিদিকে ঘুরে লোহার পাইপ এমনভাবে বসানো হয় যার ভিতর দিয়ে গরম বাতাস চালনা করে ঘরের উত্তাপ ইচ্ছামতো বাড়ানো কমানো যায়। ঘরের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইহাতে কেবলমাত্র একটি দরজা ও উপরে এবং নিচে কয়েকটি জানালা রাখা হয়। উপরন্তু ঘরের ভিতর পাতা ঝুলিয়ে রাখার বন্দোবস্ত থাকে।

ক্ষেত হতে পাতা কেটে সংগ্রহ করার পর মুঠা বাঁধতে হয়। সমান আকারের চার চারটি পাতা দিয়ে এক একটি মুঠা বাঁধতে হয়। এইভাবে বেঁধে ১৪/১৫ মুঠা ১.২৫ মি: লম্বা একটি বাঁশের অথবা কাঠের কাঠিতে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতে হয় যাতে পাতার আগা নিচের দিকে ঝুলতে থাকে। অতঃপর পাতাসহ কাঠিটির বার্নের তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ২৩ সে: মি: পর পর পাতাসহ কাঠি এভাবে ঝুলিয়ে বার্ন ভর্তি করার পর সেটির দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঠিক ইহার আগে তাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি কিউরোমিটার (Curometer) বার্নের ভিতর ঝুলিয়ে রাখা হয়। এইভাবে পাইপের ভিতর দিয়ে গরম বাতাস চালনা করে আস্তে আস্তে বার্নের ভিতরকার উত্তাপ বৃদ্ধি করা হয়।

বার্নের ভিতরে পাতা শোধনের কাজ তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হয় :

১. **পাতা ঘামানো ও হলুদ রং করা :** এই পর্যায়ে বার্নের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম ও আর্দ্রতা বেশি রাখা হয়। তাতে পাতাগুলি নিজে নিজে ঘেমে সবুজ হতে হলুদ রং ধারণ করে। প্রথম অবস্থায় ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত তাপ ৮০°ফা: অর্থাৎ ২৭° সে: এর মধ্যে রাখা হয়। পরবর্তী ১৮ বা ২৮ ঘণ্টার মধ্যে তাপ আস্তে আস্তে ১০০°ফা: অর্থাৎ প্রায় ৩৮°সে: পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এই সময়ের মধ্যে বার্নের দরজা জানালা সবই বন্ধ রাখতে হবে।

২. **পাতা শুকানো ও রং পাকা করা :** এই দ্বিতীয় পর্যায়ে পাতা শুকনো হয়, সেইহেতু তাপের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি এবং আর্দ্রতা কম হবে। এই সময় বার্নের জানালাগুলি খুলে দিয়ে আস্তে আস্তে তাপ বাড়াতে হবে। হঠাৎ তাপ বাড়ালে ভুল হবে, কারণ তাতে পাতা ঝলসিয়ে যাবে। আবার তাপ ধীরে ধীরে কমালেও বিপত্তি থাকে। ইহাতে পাতায় দাগ পড়ে যায়। কাজেই পাতার অবস্থা বুঝে বার্নের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে এবং জানালা সব সময় খোলা রাখতে হবে। প্রতি দুই ঘণ্টায় ৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট করে ১৪ ঘণ্টায় ১২০°ফা: অর্থাৎ প্রায় ৪৯° সে: পর্যন্ত তাপ বৃদ্ধি করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৩. **পাতার মোটা শিরা শুকানো :** এবারে পাতার মোটা শিরা শুকাতে হয়। এই জন্য উত্তাপ প্রায় ৪৯°সে: হতে আস্তে আস্তে ৬৮° সে: পর্যন্ত বাড়াতে হয় এবং পাতার শিরা কড়কড়া না হওয়া পর্যন্ত শুকাতে হবে। ইহাতে ২০–৩০ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। পাতা সম্পূর্ণ শুকাতে গেলে বার্নের দরজা–জানালা রাত্রিবেলা খুলে দিয়ে বার্নের মেঝেতে পানি ছিটিয়ে দিতে হয়। ইহার ফলে বার্নের ভিতরকার আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ায় পাতাগুলি সকালবেলা বেশ নরম বা মোলায়েম হয়ে আসে। তখন পাতা তাক হতে সহজেই নামিয়ে আনা যায় ; অন্যথায় পাতা ধরার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে যাবে।

পাতা গাঁদা করা

বার্ন হতে বের করে আনার পর সিগারেট তামাক পাতা ঠাণ্ডা করার পর গাঁদা দিয়ে রাখতে হয়। এই উদ্দেশ্যে ২০টি করে পাতা দিয়ে এক একটি মুঠা বাঁধা হয়। মুঠাগুলি একটি পরিষ্কার কাঠের বা বাঁশের পাটাতনের উপর পালা বা গাঁদা করে সাজানো হয়। গাঁদা সাধারণত প্রায় ২ মিটার প্রশস্ত, ১.২৫ মিটার উচু ও লম্বায় যতটা সুবিধাজনক ততটা করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় গাঁদার উত্তাপ যেন কখনো ৯০° ফা: অর্থাৎ ৩২°সে: উপরে না উঠে, উঠলে পাতা কালো হয়ে যাবে এবং সিগারেট প্রস্তুতের অনপোযোগী হয়ে পড়ে। গাঁদা করার পর প্রথম দুই মাস পাতা ঘন ঘন উলট–পালট করলে উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত থাকে, তৎপর আর এই রকম করার প্রয়োজন হয় না। তখন হতে গাঁদার তাপমাত্রা স্থির থাকে এবং তামাক সিগারেট প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহার করার উপযুক্ত হয়।

ফলন : বাংলাদেশে শোধন করা তামাক পাতার হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৭৮৬–৯০০ কেজি উন্নত প্রথায় ভালো জাতের তামাক চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ১৭০৫ কেজি এমনকি ২২৭২ কেজি পর্যন্ত, উৎপাদন হতে পারে।

তামাকের ব্যবহার

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে তামাক প্রধানত ধূমপানের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে তামাক পাতা সিগারেট, সিগার, পাইপ তামাক, হুক্কা তামাক ও বিড়ি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কেউ কেউ তামাক পাতা সরাসরি অল্প পরিমাণে পানের সঙ্গে চিবিয়ে থাকে। বাজারে যে নানাপ্রকার জর্দা দেখা যায় তা তামাক পাতা হতেই প্রক্রিয়াজাত করে প্রস্তুত করা হয়। কেউ নাকে যে নস্যি ব্যবহার করে থাকে তা তামাক পাতার গুড়া বই আর কিছুই নয়।

তামাক পাতায় যে নিকোটিন থাকে তা আহরণ করে কীটনাশক ঔষধ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাঠ হতে পাতা কেটে নেয়ার পর যে ডাট পড়ে থাকে সেগুলির সাহায্যে পটাশ সার প্রস্তুর করে জমিতে ব্যবহার করা যায়। সিগারেট কারখানায় উচ্ছিষ্ট তামাকও এইরূপ সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ভার্জিনিয়া তামাকের বীজে শতকরা ৩৫–৩৭ ভাগ তৈল থাকে। এই তৈলে কোনো নিকোটিন থাকে না, দেখতে হলুদ রংয়ের, সুগন্ধিযুক্ত ও খেতে কোনো রকম অসুবিধা হয় না।[২] কাজেই এই তৈল ভোজ্য তৈল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তৈল বের করার পর যে খৈল থাকে তা গবাদি পশুর খাদ্য ও জমিতে সার হিসেবে ব্যবহৃত করা যেতে পারে।

গাঁজা
(Indian Hemp)

ইহা তামাকের ন্যায় একটি বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহাতে অধিক পরিমাণে 'নিকোটিন' (nicotine) থাকে বলে গাঁজা সেবনকারীরা অধিক নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

গাঁজা প্রথমে মধ্য এশিয়ায় উৎপত্তি লাভ করেছিল বলে মনে হয়; খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দেও ইহা চীনদেশে চাষ হতো বলে জানা গিয়েছে।[২] ভারতবর্ষে ইহা কখনো কখনো আগাছা হিসেবেও দেখা যায়, তবে গাঁজা সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে অল্প পরিমাণ জমিতে চাষ হয়। বাংলাদেশের নওগাঁ জেলাতে মাত্র ১৫০ একর জমিতে গাঁজার চাষ হয় আর তা হতে উৎপন্ন হয় ৪৫ মে: টন গাঁজা

গাঁজা Cannabinaceae পরিবারভুক্ত ৪–১০ ফুট ১–৩ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বীরুৎজাতীয় লোমশ উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Canabis sativa L. ইহা একটি Monocious উদ্ভিদ অর্থাৎ আলাদা আলাদা পুরুষ ও স্ত্রীগাছ জন্মে। গাঁজা উৎপাদন করতে হলে ক্ষেত পুরুষ গাছে ফুল ধরা মাত্র সেগুলো উঠিয়ে ফেলে দিতে হবে যাতে স্ত্রীগাছের ফুল নিষিক্ত হতে না পারে। স্ত্রীগাছের অনিষিক্ত পুষ্পমঞ্জুরী হতেই গাঁজা প্রস্তুত হয়। আর ক্ষেত হতে পুরুষ গাছ না উঠিয়ে পুরুষ ও স্ত্রী গাছের পুষ্পমঞ্জুরী একত্রে মিশিয়ে যা প্রস্তুত হয় তাহা ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে 'ভাং' এবং বিদেশে 'হাশহিশ' (Hashish) নামে পরিচিত। গাছের কাণ্ড ও আগা হতে এক রকম আঠালো পদার্থ হতে যা উৎপন্ন হয় তা আমাদের দেশে 'চারস (Charas)' এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে 'মারিজুয়ানা (Marijuana) নামে অভিহিত। উল্লেখ্য যে পুরুষজাতীয় গাঁজা গাছ হতে এক প্রকার তন্তু বা আঁশ (Fibre) উৎপন্ন হয়।

চাষাবাদ প্রণালি

গাঁজার চাষের জন্য তামাকের মতো পরিবেশই প্রয়োজন। তাই দেখা যায়, ইহার চাষের জন্য বেলে–দোয়াশ অথবা পলি–দোঁয়াশ মাটি সব চাইতে উৎকৃষ্ট।

তামাকের চাষের মতো জমি উত্তমরূপে চাষ-মই দিয়ে প্রস্তুত করতে হয় তৎপর নিম্ন হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।[১,২]

	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
গোবর	৫০ মণ	৪.৫ টন
খৈল	৩ মণ	২৫০ কেজি
ইউরিয়া	$\frac{১}{২}$ মণ	৪৭ কেজি
টি. এস. পি	১ মণ	৯৪ কেজি
মিউরেট অব পটাশ	$\frac{১}{২}$ মণ	৪৭ কেজি

এইভাবে প্রস্তুত জমিতে ৯ ইঞ্চি অর্থাৎ ২৩ সে: মি: ব্যবধান সারি সারি করে গাঁজার বীজ বপন করতে হয়। এপ্রিল হতে মে মাসের মধ্যে বীজ বপনের কাজ সমাধা করতে হয়; প্রতি হেক্টরে বীজ বপনের হার প্রায় ২ কেজি। সময়মতো জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হয়, সেই সঙ্গে সারি গাছ পাতলা করে দিয়ে ২২-২৩ সে: মি: ব্যবধানে এক একটি চারা রাখতে হয়। সনাক্ত করার সময় হলেই পুরুষ গাছগুলি জমি হতে তুলে ফেলে দিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ : স্ত্রী গাছের ফুল হতে গাঁজা প্রস্তুত করা হয় সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। গাছে পুষ্পমঞ্জুরী ধরার পর সেগুলি অক্টোবর-নভেম্বর মাসে যখন হলুদ রং ধারণ করতে থাকে তখনই তা উঠিয়ে নিতে হয়। এই পুষ্পমঞ্জুরী পিষ্ট করে নিলেই গাঁজা প্রস্তুত হয়। প্রতি হেক্টরে ৯০০-১০০০ কেজি ফলন হতে পারে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই গাঁজার চাষ হতেই সমজাতীয় দ্রব্য 'ভাং' এবং 'চারস' উৎপাদন করা যেতে পারে। গাঁজার চাষের সময় পুরুষ গাছ না উঠিয়ে ফেলে পুরুষ ও স্ত্রী গাছের পাতা ও ফুল একত্রে উঠিয়ে শুষ্ক করার পর মিশিয়ে নিয়ে পিষ্ট করলেই ভাং পাওয়া যায়। আর গাছের উপরাংশের কাণ্ড হতে সংগৃহীত আঠা (গাদ বা রেজিন) হতে যে তরল পানীয় বা সিগারেটের মিশ্রণ তৈয়ার করা হয় (Marijuana) তাই 'চারস'।

গাঁজার ব্যবহার

গাঁজা মূলত ধূমপানের জন্য ব্যবহৃত হলেও ইহা হতে এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। আর পুরুষ গাছের কাণ্ড হতে এক প্রকার তন্তু উৎপন্ন হয় যে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Ahmad. K. U : Bangladesh Agriculture and Field Crops. 1980. Publisher : Mrs. Mumtaj Kamal. Bunglow No. 2. Farmgate. Dhaka- 15.
২. Ahmad. K. U : Garden's Book of Production and Nutrition 1982. Publisher : Mrs. Mumtaj Kamal. Bunglow No. 2. Farmgate, Dhaka -- 15.

৩. Aiyar, A. K. Y. N : Field Crops of India. 1947. Bangalore. Printed by the Superintendent at the Govt. Press. p. 441.

৪. Ibid. p. 468.

৫. Martin, J. H. and Leonard, W. H : Principles of Field Crop Production. 2nd. edn. The Macmillan Company. N. Y. 796.

৬. Ibid. pp. 800-01.

৭. Ibid, p. 809.

৮. Ministry of Agriculture : Development Staistics of Bangladesh Agriculture. Series No. 6.Dec., 1981.

৯. Wolfe, T. K. and Kipps. H. A : Production of Field Crops. 1959. Mcgrow-Hill Book Company. INC. N. Y. p. 428.

দশম অধ্যায়

উদ্দীপক পানীয় উৎপাদনকারী শস্য

BEVERAGE CROPS

Camellia sinensis, *Coffea arabica* L. *Coffea liberica*, *Coffea robusta* *Theobroma cacao* প্রভৃতি উদ্ভিদ হতে উদ্দীপক পানীয় উৎপন্ন করা হয় বলে এগুলিকে 'উদ্দীপক পানীয় উৎপাদনকারী শস্য' নামে অভিহিত করা হয়। পানীয় হিসেবে ইহাদের প্রথমটি হতে চা ; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থটি হতে কফি এবং পঞ্চমটি হতে কোকোয়া প্রস্তুত করা হয়।

এই সমস্ত পানীয়তে 'ক্যাফেইন' (caffeine)' নামে এক প্রকার অ্যালকলয়ড (alkaloid) স্নায়ুতন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে একরূপ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, ফলে পানকারী কর্মক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত শরীর ও মনে সাময়িক তৃপ্তি ও উদ্দীপনা অনুভব করে। চা'তে সব চাইতে কম, কফিতে আর একটু বেশি এবং কোকোয়াতে সব চাইতে বেশি মাত্রায় ক্যাফেইন থাকে। তাই কোকোয়া ও কফি বেশি মাত্রায় পান করলে স্বাস্থ্যহানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চা পান নিরাপদ হলেও বেশি পান না করাই ভালো।

চা বাংলাদেশে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। চা গাছের দুটি কচি পাতাসহ একটি কুড়ি হতে চা প্রস্তুত করা হয়। কফি প্রধানত ব্রাজিল, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল ভারত, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন হয়। কফি বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কিছু উৎপন্ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে কপি চা এর মতো গাছের পাতা হতে উৎপন্ন হয় না, ফলের বীজ হতে প্রস্তুত হয়। কোকোয়া বাংলাদেশে মোটেই জন্মে না। ইহা দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার শস্য। কফির মতো ইহাও গাছের বীজ হতে উৎপন্ন হয়।

চা

চা এক ধরনের নিশাকর পানীয়। পাটের পর চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল। প্রতি বৎসর গড়ে ২২.৭–২৬.৭ মিলিয়ন কেজি রপ্তানি করে বাংলাদেশ ১২/১৩ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে চা পান করার অভ্যাসটি এসেছে চীনদেশ থেকে। চীনাদেশে অতি পুরাতন কাল হতে (৮ম শতাব্দী) চা খাওয়ার রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে। এর আগেও সেই দেশে চায়ের কথা জানা ছিল এবং তখন তা ব্যবহৃত হতো ঔষধরূপে। জাপানে চায়ের ব্যবহার শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, ইহার তিন শতাব্দী পর ইংল্যান্ডবাসীরা

চা পান করতে শিখে। প্রথমত তারা চীনদেশ হতেই চা আনতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে তারা চিন্তা করতে থাকে তাদের তৎকালীন অধিকৃত দেশ ভারতবর্ষে চা উৎপাদন করা যায় কিনা। এই চিন্তার ফলস্বরূপ ভারতের আসাম প্রদেশে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ হতে চা উৎপাদন শুরু হয়।[৪]

আজ বাংলাদেশে চা অতি জনপ্রিয় পানীয়। শহর, বন্দর, হাট, বাজার, এমনকি প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায়ও চায়ের দোকান দেখা যায়। আর ধনী–গরিব, মেয়ে–পুরুষ, যুবা–বৃদ্ধা সবাই চা পান করে তৃপ্তি লাভ করে। আত্নীয়স্বজনকে আপ্যায়ন করার ইহা যেন সহজ ও ভদ্র উপায়।

বাংলাদেশে চা উৎপাদনের এলাকা বলতে গেলে একটি বৃহত্তর জেলা সিলেটকেই বুঝায়। সে জেলার মালানিছেড়া এলাকায় প্রথম চায়ের আবাদ শুরু হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। আজ পর্যন্তও সে জেলায় ছোট–বড় ১৩০টি চা বাগান দেখা যায়। অতঃপর চট্টগ্রামে ২০টি, পার্বত্য চট্টগ্রামে ও কুমিল্লায় ৮টি করে চা বাগান স্থাপিত হয়। এই সমস্ত বাগানগুলির আওতায় ১৯৯৩–৯৪ সালের হিসেব অনুযায়ী মোট জমি রয়েছে ৪৭২০০ হেক্টর, আর এ পরিমাণ জমি হতে উৎপন্ন হয় ১১২৪৪৪ পাউন্ড অর্থাৎ ৫১০০০ কেজি চা।[১১]

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

চা পৃথিবীর কোনো দেশে প্রথম উৎপত্তি হয় তা সঠিক বলা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন চায়ের আদি নিবাস ভারতের আসাম প্রদেশ। আবার চীনদেশকেও কেউ কেউ চায়ের পিতৃভূমি বলে মনে করেন। বার্মার যে উপরি অংশ আসামের সঙ্গে মিশেছে সে অঞ্চলে অনেক রকম এবং অনেক জাতের চায়ের আবাদ হয়। সেগুলির মধ্যে 'আসাম' 'মনিপুরী' ও চাইনিজ জাতের নাম উল্লেখযোগ্য। আসাম ও চাইনিজ জাতের মিলনে অনেক ভালো ভালো শঙ্কর জাতের সৃষ্টি হইয়াছে।[৫]

এশিয়া মহাদেশের মধ্যেই চা এর অবাদ বেশি প্রসার লাভ করেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি যেমন— ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, প্রজাতন্ত্রী চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। আজকাল আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশেই চা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণমণ্ডলীর এলাকার ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও পেরুতেও চা এর আবাদ শুরু হয়েছে। চা উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া ও তুরস্কের নামও উল্লেখযোগ্য।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কতিপয় উল্লেখ্যযোগ্য দেশে কি পরিমাণ জমিতে চা এর আবাদ করা হয় তার মোট উৎপাদনসহ ৩৬ নং সারণিতে দেখানো হলো :

সারণি ৩৬ : এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কতিপয় উল্লেখযোগ্য চা উৎপাদনকারী দেশে ১৯৯৪ সালে শস্যটির উৎপাদন এলাকা, মোট উৎপাদন ও উৎপাদনের হার

দেশের নাম	উৎপাদন এলাকার ('০০০' হেক্টরে)	উৎপাদন ('০০০' মে. টনে)	উৎপাদন হার (কেজি/ হেক্টরে)
গণপ্রজাতন্ত্রী চীন	৮২০	৬০০	৭৩১
ভারত	৪৬০	৭২০	১৫৬৫

শ্রীলঙ্কা	২২২	২৪০	১০৮০
ইন্দোনেশিয়া	৯৯	১৭৪	১৭৬৭
ভিয়েৎনাম	৬৪	৩৬	৫৬০
জাপান	৫৫	৮৬	১৫৮৩
ইরান	৫৫	৭৫	১৩৬৩
বাংলাদেশ	৪৮	৫১	১০৫৭
থাইল্যান্ড	১৭	৫	৩১৪

উৎস : এফ এ ও (এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল)। ব্যাংকক, থাইল্যান্ড, ১৯৯৫।

মাটি

হাল্কা অম্লাত্মক মাটি চা এর উপযোগী। পলি-দোঁয়াশ হতে বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে চা ভালো জন্মে। তবে বেলে-দোঁয়াশ মাটিই সর্বোত্তম বলে মনে হয়। কিছুটা এটেঁলজাতীয় মাটিতেও চা জন্মাতে পারে, তবে তা সুনিষ্কাশনযুক্ত হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। মাটির অম্লতা ৪.৫ হতে ৫.৮ পি. এইচ. পর্যন্ত হতে পারে।

জলবায়ু ও ভূমির উচ্চতা

প্রচুর বৃষ্টিপাত ও গরম আবহাওয়া চা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ। চা বাগানে যেন পানি একটুও দাঁড়াতে না পারে। সারা বৎসর সমবিস্তৃত ৬০-৭০ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৫২০-১৭৮০ মি: মি: বৃষ্টি চা আবাদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ২০০-২৫০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫০৮০-৬৩৫০ মি: মি: বৃষ্টিতেও চা জন্মাতে পারে। আসামের চা উৎপাদন এলাকায় বৎসরে ইহার চেয়েও বেশি বৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে অক্টোবর হতে মার্চ পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না বলে এই সময়ে চা পাতা জন্মায় না বললেই চলে। অন্যদিকে জাভা, সুমাত্রা ও শ্রীলঙ্কায় বৎসরের সব সময় বৃষ্টি হয় বলে সারা বৎসর হতে চা তোলা যায়।

চা উৎপাদন এলাকার তাপমাত্রা ২৯°সে: হতে ৫৬° সে: এর মধ্যে দেখা যায়। তবে ৬০০০ ফুট অর্থাৎ ১৯৩৫ মিটার উঁচু পার্বত্য অঞ্চলের চা বাগানের তাপমাত্রা ২৮°সে: এর নেমে নিচে আসতে পারে। অল্প পরিমাণ বরফ পড়লে চা বাগানের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না।

প্রায় সমুদ্র সমতলে চা জন্মালেও উঁচু পার্বত্য এলাকায় উন্নত মানের চা জন্মে। আড়াই হাজার হতে ৬০০০ ফুট অর্থাৎ ৮০৬-১৯৩৫ মিটার উচ্চতায় চা সব চাইতে ভালো হয়। এর বেশি অর্থাৎ ২২৫৮ মিটার অধিক উঁচু বাগানের চা আবার ভালো হয় না। তুলনামূলকভাবে উঁচু এলাকার চা বাগানের আর একটি সুবিধা এই যে সেখানে মৌসুমী প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও পানি অতি তাড়াতাড়ি নিষ্কাশিত হয়ে যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

চায়ের বৈজ্ঞানিক নাম Camelia sinensis। ইহা চির সবুজঘন পল্লব সন্নিবেশিত ঝোপবাঁধা একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার কোনো জাতের গাছ ১ মিটারের মতো উঁচু আবার কোনো জাতের গাছ ৩০-৪০ ফুট অর্থাৎ ৯.৫-১৩মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। গাছের পাতা দেখতে

অনেকটা গন্ধরাজ ফুল গাছের পাতার মতো (চিত্র ১০.১) লম্বা ধরনের, আগা সূচালো সবুজ ঢেউ খেলানো পাতা কোনো জাতে ৩০সে: মি: হতে ৩৬ সে: মি: লম্বা ও ১৫ সে: মি: প্রশস্ত; আবার কোনো জাতে ১৫–২৩ সে: মি: লম্বা ও ৫–৯ সে: মি: প্রশস্থ। চাইনিজ জাতের পাতা আরো ছোট হয়। চা গাছের ফুল সাদা রংয়ের ও সুগন্ধিযুক্ত। ফল একটি গোলাকার কেপসুল (capsule) এবং বেশ শক্ত ধরনের। ভালো মতো পাকলে ফল ফেটে বীজ মাটিতে পড়ে যায়।

সাধারণত বীজ হতে চারা উঠায়ে চা বাগানে লাগানো হয়। কিন্তু আজকাল অঙ্গজ উপায়েও চারা প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সিলেট জেলার 'শ্রীমঙ্গল চা গবেষণা কেন্দ্রের' বিজ্ঞানীরা এইভাবে চারা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্র : ১০.১ চায়ের চারা গাছ

এই প্রথায় প্রথমে বাগানে একটি ভালো চা এর ঝোপ (clone) নির্বাচন করা হয়। তৎপর পেন্সিলের মতো সরু ডালা টুকরা টুকরা করে কাটা হয়। ৬–৭ সে: মি: লম্বা প্রতি টুকরা বা কাটিংএ একটি করে পাতা রাখা হয়। গোলাপের কাটিং বীজতলায় যেভাবে একটু কাৎ করে লাগান হয় সেই রকমভাবে এই কাটিংগুলি বীজতলায় লাগাতে হয়। কিছুদিনের মধ্যেই কাটিং মাটিতে লেগে গেলে পাতার গোড়ায় কুঁড়ি গজিয়ে চারাতে পরিণত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীগণ

এইভাবে কয়েকটি ভালো ভালো জাতের চারার উদ্ভাবন করেছেন। সেই জাতগুলি হইতেছে ১. বি-টি-১ (BT_1), ২. বি-টি-২ (BT_2) এবং ৩. বি-টি ৩ (BT_3)। ভারত হতে একটি ভালো জাতের চারা আনা হয়েছে, সেটির নাম টি-ভি১ (Tv_1) পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশের চায়ের জাত '(বি-টি-১)' ভারতীয় জাত-'(টি-ভি-১) হতেও ভালো ফলন দিতেছে। শ্রীমঙ্গল চা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ বি-১২ (B-12) নামে আরো একটি চায়ের উন্নত জাতের উদ্ভাবন করেছেন। এই জাতটির দুটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সুঘ্রাণযুক্ত যা আমাদের দেশের অনেক চায়ের জাতে নেই এবং ফলনের দিক হতেও অন্যান্য জাতের চেয়ে চার গুণ বেশি।

চার বাগান স্থাপন একটি বিশেষ ধরনের প্রচেষ্টা। সবার পক্ষে চা বাগান করা বা তার মালিক হওয়া সম্ভব নয়। যে চা বাগান করতে চায় তার কতকগুলি গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, যেমন— তাকে বিত্তশালী ও চা বাগান করার মতো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। 'পাহাড়ি এলাকায় নিরিবিলি জীবনযাপন করার মতো মনোবৃত্তি বা পছন্দ থাকতে হবে। শত শত শ্রমিকের কাজ দেখাশুনা করার মতো দক্ষতা ও যোগ্যতাও তার থাকা বাঞ্ছনীয়।

চা বাগানের জন্য জমি নির্বাচন করার পর সেখান হতে ছোট-বড় গাছ-গাছড়া কেটে পরিষ্কার করে নিতে হবে। বড় বড় গাছগুলির মধ্যে যদি কোনো কোনোটি স্থায়ী ছায়াবৃক্ষের (Shade plants) কাজ দিতে পরে তবে সেগুলির কিছু কিছু না কেটে রেখে দেওয়া যেতে পারে।

ছায়াবৃক্ষ (shade plants) : চা বাগানে এমন কতকগুলি বড় বড় গাছ জন্মাতে হয় সেগুলি চা গাছকে প্রখর সূর্যতাপ ও ঝড়বৃষ্টির ঝাপটা হতে রক্ষা করে। এইরূপ গাছগুলিই ছায়াবৃক্ষ নামে অভিহিত। এই বৃক্ষসমূহ যদি শিম্বি পরিবারভুক্ত হয় তা হলে বাগানের মাটিতে জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের যোগ সাধনের ফলে তা উর্বরা হয়ে উঠে। এজন্য পৃথিবীর সর্বত্রই এই জাতের গাছ চা বাগানে জন্মানোর প্রবণতা দেখা যায়।

আজকাল পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে চা বাগানে ছায়াবৃক্ষ জন্মানো হয় না। তবে যে দেশে বাগানে সারা বৎসর বৃষ্টি হয় না এবং প্রখর সূর্যতাপ পড়ে সেই বাগানসমূহে ছায়াবৃক্ষ থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে অক্টোবর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে কোনো বৃষ্টিপাত হয় না বলে এতদঞ্চলের সব চা বাগানেই ছায়াবৃক্ষ দেখা যায়। ভারত ও শ্রীলঙ্কার চা বাগানেও ছায়াবৃক্ষ জন্মানো হয়। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার কয়েকটি বাগানে ছায়াবৃক্ষ বাদ দেওয়া হয়েছিল যার ফল শুভ হয়নি বলে শুনা যায়।

কথায় আছে বন্যেরা বনে সুন্দর— ঠিক তেমনি বলা যায় চা বন্য পরিবেশে সুন্দর অর্থাৎ ছায়াবৃক্ষের আশ্রয়ে ভালো জন্মায়। বনের গাছপালা কেটে পরিস্কার করে যখন চা' এর চারাগাছ লাগানো হয় তখন বন্য পরিবেশ থাকে না। যখন ছায়াবৃক্ষ জন্মানো শুরু হয় তখন হতেই আস্তে আস্তে সেই পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সুতরাং চা বাগান করতে হলে ছায়াবৃক্ষ বাদ দেওয়া সমীচীন নয়।

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা করলে দেখা যায় ছায়াবৃক্ষ চা বাগানের অনেক উপকারে আসে। ছায়াবৃক্ষ থাকায় সূর্য কিরণের শতকরা ৫০ ভাগের বেশি চা গাছের উপর বা জমিতে

পড়তে পারে না, ফলে শুকনার দিনে জমির রস অধিক পরিমাণে উড়ে যাওয়ার হাত হতে রক্ষা পায় এবং চা গাছের পাতায় প্রস্বেদন ক্রিয়া কম হয় বলে গাছের পাতা তাজা থাকে। ছায়াবৃক্ষহীন বাগানের গাছের পাতা রৌদ্রে সহজেই ঝলসায়ে যেতে দেখা যায়। শিলা বৃষ্টির সময় ছায়াবৃক্ষ চা গাছের পাতাকে শিলার আঘাত হতে অনেকটা রক্ষা করে ; ছায়াবৃক্ষের প্রভাবে প্রখর সূর্যকিরণ চা গাছের উপর ততটা পতিত হয় না বলে একটি ঠাণ্ডা পরিবেশ বিরাজ করে। এই পরিবেশে পাতার রন্ধ্রপথ (stomata) বেশি খোলা থাকায় অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান অধিক পরিমাণে পাতায় প্রবেশ করতে পারে। ফলে গাছে বেশি পরিমাণ কার্বন-আত্মীকরণ হওয়ায় ইহার উপকার সাধিত হয়। ছায়াবৃক্ষের প্রচুর পাতা বাগানের মাটিতে পড়ে পচে জৈব পদার্থের সৃষ্টি করে আর গাছগুলি শিম্বীজাতীয় হলে মাটিতে নাইট্রোজেনের যোগ সাধন হয়। ছায়াযুক্ত বাগান হতে ছায়াহীন বাগানের চা গাছে অধিক রোগ ও পোকার আক্রমণ হতে দেখা যায়।

বাংলাদেশের চা বাগানে দুই শ্রেণির ছায়াবৃক্ষ লাগান হয়। প্রথম শ্রেণির গাছগুলি স্বল্পস্থায়ী (Temporary Shade Plants) আর দ্বিতীয় শ্রেণির গাছগুলি দীর্ঘস্থায়ী (Permanent Shade Plants)। বাস্তবিক পক্ষে শেষোক্ত শ্রেণির ছায়াবৃক্ষই চা বাগানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য প্রথমোক্ত ছায়াগাছগুলি বাগানের প্রথম পর্যায়ে চারাগাছগুলির যথেষ্ট উপকারে আসে। বগামেডুলা (Crotoloria anagyrorides) ও অড়হড় জাতীয় গাছ (Cajanous spps,) স্বল্পস্থায়ী ছায়াবৃক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাগানের চা গাছের দুই সারির মধ্যে অথবা এক সারি পর পর লাইন করে গাছগুলি জন্মানো হয়। গাছগুলি দ্রুত বর্ধনশীল ও পত্রবহুল বলে চায়ের ছোট চারাগুলিকে রৌদ্র ও ঝড়বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করে। দুই এক বৎসর পর সেগুলি কেটে ফেলা হয়। এই সময়ের মধ্যে গাছগুলির পাতা ও মূল বেশ পরিমাণ জৈব পদার্থ যোগ করে মাটিকে বেশ উর্বর করে তুলে।

দীর্ঘস্থায়ী ছায়াবৃক্ষগুলিও শিম্বীজাতীয় দেখে নির্বাচন করা হয়। এদেশের বাগানে সচরাচরদৃষ্টি বৃক্ষগুলি হলো :

১. করই (Albizzia procera),

২. চাম করই (Albizzia odoratissima),

৩. কালা শিরীষ (Albizzia sinensis)

৪. ছাফেদ শিরীষ (Albizzia lebbek)

৫. লোহা শিরীষ (Derris robusta)।

উপর্যুক্ত ছায়াবৃক্ষগুলির জন্য বীজতলায় চারা করে ১ হতে ১½ বৎসর বয়সের চারা চা বাগানে ৪০´ × ৪০´ অর্থাৎ ১৩ মি: × ১৩ মিঃ দূরত্বে লাগানো হয়। কোনো কোনো সময়ে এর চাইতে ঘন করেও ছায়াবৃক্ষ রোপণ করা হয়ে থাকে। স্বল্পস্থায়ী ছায়াবৃক্ষগুলি বাগান হতে কেটে নেয়ার পর এই দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ষগুলি চা বাগানকে ছায়া দিতে শুরু করে।

বীজতলায় চা গাছের চারা জন্মানো : চা বাগানের আশেপাশেই বীজতলার জন্য জমি ঠিক করা হয়। জমি খুব ভালোভাবে খুড়ে নিয়ে তা হতে ঘাসগাছড়া গুড়ি, শিকড় ইত্যাদি দূরীভূত করতে হয়। জমির মাটি খুব ভালোভাবে কুপিয়ে নরম করে প্রস্তুত করতে

হবে। তৎপর বীজতলায় ফাটলযুক্ত বীজ বপন করতে হয়। প্রতি হেক্টরে ১১–১৪ কুইন্টাল অর্থাৎ ১১০০–১৪০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

চায়ের বীজ বেশ শক্ত। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র সে বীজ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হারায়ে ফেলে। কাজেই চারা করতে হলে গাছ হতে সংগৃহীত অল্প দিনের ও বড় আকারের বীজ ব্যবহার করতে হয়। বীজ সরাসরি বীজতলায় বপন না করে ছায়াযুক্ত স্থানে অর্থাৎ চারিদিকে বেড়া দেওয়া অন্ধকার ঘরে বালির স্তরে প্রথমে বপন করা হয়। বালি যথোপযুক্ত পানি দিয়ে সিক্ত রাখা হয়। ১০–১২ দিন পরে এইভাবে বালুতে রাখা বীজ ফেটে উঠে। এই ফাটলযুক্ত বীজগুলিই তখন সেই বালুস্তর হতে উঠিয়ে নিয়ে ২০ সে: মি: × ২০ সে: মি: দূরে দূরে বপন করা হয়। বপনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বীজের ফাটা দিকটা উপুড় করে মাটিতে লাগিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। বীজতলায় চারাগুলিকে ১$\frac{১}{২}$ বৎসর পর্যন্ত জন্মাতে দেওয়া হয়। এই সময়ে আগাছা যতবার প্রয়োজন ততবার পরিষ্কার করতে হবে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ— এই তিন রকম সারই বীজতলায় ব্যবহার করা যায়। ১ ঃ ১ ঃ ১ ঃ অনুপাতে মিশ্রিত এই তিন রকম সারের প্রায় ২৭.৫ কেজি প্রতি হেক্টরে ৮ হতে ১২ বারে প্রয়োগ করতে হয়। তবে চারাগাছের সার না দিলেও চলে।

আগরে দিনে চারাগাছ ছাটাই করা হতো না। কিন্তু আজকাল গাছের বয়স ৭/৮ মাস হলে আগা কেটে বা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। গাছ ছোট বলে না ছেটে ভেঙ্গে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তাতে গাছ কমজোর হওয়া বা মরে যাওয়ার শঙ্কা থাকে না। ১ হতে ১$\frac{১}{২}$ বৎসর সময়ের মধ্যে চারাগাছে তখন বেশ কয়েকটি ডালপালা বের হয় এবং তা ঝোপের মতো আকার ধারণ করে।

চা-বাগানে চারা লাগান (planting seedlings in the tea garden) : চায়ের চারা লাগাবার উদ্দেশ্যে পূর্ব হতেই প্রস্তুত বাগানে নির্দিষ্ট মাপের দূরত্বে গর্ত বা পিট (pit) তৈরি করতে হয়। পাহাড়ের টিলার চারাগাছ কিছু ঘন ও সমতল জায়গায় কিছু পাতলা করে লাগাতে হয়। আজকাল বাগানে শুধু বীজের চারাই লাগানো হয় না— অঙ্গজ উপায়ে প্রস্তুত চারাও ব্যবহার করা হয়। জাতের বিভিন্নতার কথা মনে রেখে বিভিন্ন দূরত্বে চারা লাগাতে হয়। টিলার ও সমতলে কোনো জাতের চারা কত দূরত্বে লাগতে হয় তা নিম্নে বলা হলো।

সারণি –৩৬: চা–এর জাতভেদে বাগানের টিলা ও সমতলে চারা লাগানোর দূরত্ব

জাতের নাম	টিলা	সমতল
বি–টি–১ (BT_1)	৪× ২$\frac{১}{২}$ (১.২ মি×৭৬ সে. মি.)	৪ × ৩ (১.২ মি.× ১ মি.)
বি–টি–২ (BT_2)	৪× ২$\frac{১}{২}$ (১.২ মি ৭৬×সে. মি.)	৪ × ৩ (১.২ মি.× ১ মি.)
বি–টি–৩ (BT_3)	৪× ২ (১.২ মি.× ৬১ সে.মি.)	৪× ২$\frac{১}{২}$ (১.২ মি. × ৭৬সে. মি.)
টি–ভি–১ (TV_1)	৪× ২ (১.২ মি.×৬১ সে. মি.)	৪× ২$\frac{১}{২}$ (১.২ মি. × ৭৬সে. মি.)

বাগানে চা মে-জুন মাসে লাগাতে হয়, তবে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চারা লাগানো যেতে পারে। চারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে লাগান যায়— এক একটি পদ্ধতি চিত্র সহযোগে বর্ণনা করা হলো।[১১]

১. **ত্রিভুজাকার পদ্ধতি** (Triangular system) : এই পদ্ধতিতে চারাগাছগুলি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি শীর্ষবিন্দুতে লাগানো হয় (চিত্র ১০.২)। সমতল

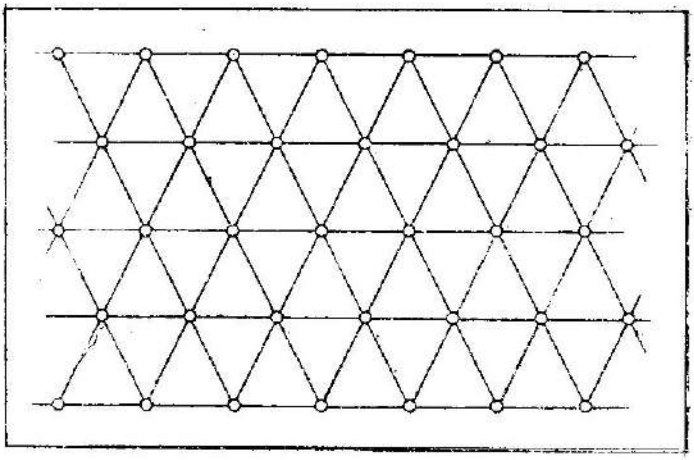

চিত্র : ১০.২ ত্রিভুজাকার পদ্ধতিতে চায়ের চারা রোপণ

জমির জন্য এই পদ্ধতি উপযোগী। এই নিয়মে চারাগাছ লাগানো একটু কঠিনতর হলেও প্রতি হেক্টরে চারার সংখ্যা নিম্নোক্ত দুটি পদ্ধতিতে লাগানো চারার সংখ্যা হতে বেশি হয়।

২. **বর্গক্ষেত্রাকার পদ্ধতি** (Square system) : এই পদ্ধতিতে প্রতি সারির মধ্যে এক গাছ অন্য গাছের দূরত্ব একই হয় (চিত্র ১০.৩)। সমতল জমিতে এই নিয়মে চারা লাগান সহজতর হয়। প্রতি হেক্টরে চারাগাছের সংখ্যা প্রথমোক্ত পদ্ধতির চাইতে কিছু কম হয়।

৩. **আয়তক্ষেত্রাকার বা এক লাইন পদ্ধতি** (Rectangular or single hedge system) এই পদ্ধতিতে এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব লাইনে মধ্যবর্তী দুটি চারার মধ্যবর্তী দূরত্ব হতে বেশি হয় (চিত্র ১০.৪)। সমতল ও টিলা এই দুই রকম জমির জন্যই এই পদ্ধতি উপযুক্ত। উপরোক্ত পদ্ধতির চাইতে প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা কম হয়।

৪. **জোর লাইন পদ্ধতি** (Double hedge system) : ইহা উপর্যুক্ত আয়তক্ষেত্রাকার পদ্ধতির একটি পরিবর্তিত রূপ। এক লাইনের জায়গায় দুই লাইন চারাগাছ রোপণ করার পর পরিমিত দূরত্বে দ্বিতীয় জোড় লাইনে চারাগাছ লাগানো হয় (চিত্র ১০.৫) প্রতি জোড় লাইনের মধ্যে গাছগুলি সামান সমান দূরে লাগান হয়। এই পদ্ধতিটি টিলা জমির উপযোগী।

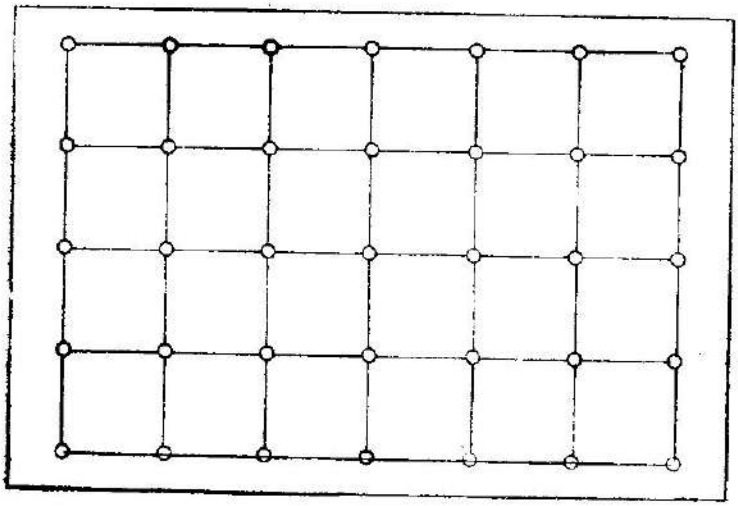

চিত্র : ১০.৩ বর্গক্ষেত্রাকার পদ্ধতিতে চায়ের চারা রোপণ

৫. **তিন লাইন পদ্ধতি (Triple hedge system)** : এই পদ্ধতিটি উপর্যুক্ত পদ্ধতির অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে দুই লাইনের জায়গায় তিন লাইনের জায়গায় তিন লাইন চারাগাছ লাগান হয় (চিত্র ১০.৬)। টিলা জমির জন্য ইহাও একটি উপযুক্ত পদ্ধতি।

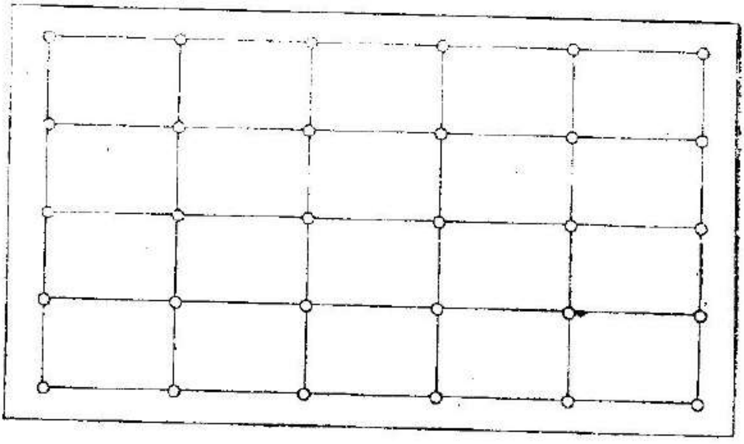

চিত্র : ১০.৪ আয়তক্ষেত্রাকার পদ্ধতিতে চায়ের চারা রোপণ

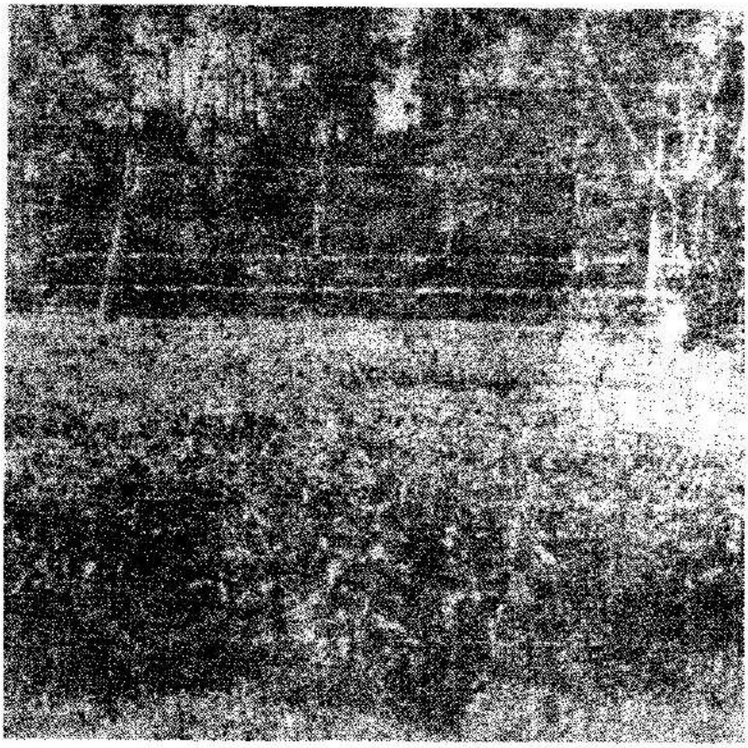

আলোকচিত্র : ১০.৭ ছাঁটাই করা একটি চায়ের বাগান

৫৬ সে: মি:) অথবা ২৪″ (৬১ সে: মি:) হয় তখন হতে প্রতি বৎসর মাত্র আধ ইঞ্চি (১.২৫ সে: মি:) করে উপরে কাটা হয় আর কাটাইয়ের ৮–১০ ইঞ্চি অর্থাৎ ২০–২৫ সে: মি: উপরে চায়ের পাতা আহরণ করা হয়। এইভাবে কাটাই–ছাঁটাই করতে করতে যখন গাছের উচ্চতা ৪০ ইঞ্চি অর্থাৎ ১ মিটারের বেশি হয়ে যায় তখন আবার কাটাইর জন্য ২২–২৭ ইঞ্চি অর্থাৎ

৫৬–৬৮ সে: মি: পর্যন্ত নেমে আসা হয়। কারণ ১ মিটার বেশি উচ্চতার গাছ হতে চা–পাতা তোলা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়।[৯]

চা গাছ কাটাই–ছাঁটাই করার বিষয়টি সাধারণভাবে যতটা সহজ মনে হয় আসলে তা নয়। এই কার্যক্রমের উপর কোনো একটি বাগানের সার্থকতা নির্ভর করে। সঠিকভাবে কাজটি পরিকল্পনা ও সম্পন্ন করা হলে বাগানের প্রতিটি ঝোপ বা গাছ সতেজ ও বহুবিত থেকে বৎসরের সারা সময় ফলপ্রসূ থাকবে। কিন্তু তা না হলে অনেক ঝোপ দুর্বল হয়ে পড়বে, কোনো কোনোটি মারা যাবে বা ফলন আস্তে আস্তে অনেক কমে যাবে।

উপরে বর্ণিত চা গাছ কাটাই–ছাঁটাই পদ্ধতি আজকাল অচল হয়ে যাচ্ছে। এর চাইতে আরো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চা গাছ কাটাই–ছাঁটাই করে লাভবান হওয়া যায় কিনা এই নিয়ে বেশ কিছুদিন পূর্ব হতেই আমাদের দেশে শ্রীমঙ্গল চা গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে কম বয়সী (Young tea upto 5-6 yrs) ও পূর্ণ বয়সী (Mature Tea) চা গাছ কিভাবে কাটাই–ছাঁটাই করেও তা হতে পাতা আহরণ করত অধিক লাভবান হওয়া যাবে তার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো।

কম বয়সী চা গাছ : বাগানে চারা গাছ লাগাবার দুই মাস পর গাছটিকে মাটির ৪ ইঞ্চি অর্থাৎ ১০ সে: মি: উপর হতে বাঁকিয়ে আগা খুটির সাহায্যে মাটিতে আটকিয়ে দেওয়া হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় গাছের আগা যেন মাটিতে ছুঁয়ে না যায়। এই ব্যবস্থাটি সময় সাপেক্ষ বলে গাছটি না বাকিয়ে ৪ ইঞ্চি বা (১০ সে: মি:) উপরে ভেঙ্গে বা থেতলিয়ে দেওয়া হয়। এই উভয়বিধ ব্যবস্থায় গাছ হতে অনেক ডালপালা বের হয়। এই সময় হতে দুই মাস পর গাছের মাথায় বাঁশের সাহায্যে প্রস্তুত ১৫–১৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ৩৮–৪০ সে: মি: ব্যাসবিশিষ্ট একটি বেড় (Ring) পরাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে চারাগাছ একটি সুন্দর ঝোপের আকার নেয়। ইচ্ছে করলে ২১–২২ ইঞ্চি (৫৩–৫৬ সে: মি:) উচ্চতায় ১ম বৎসরেই কিছু কিছু চা–পাতা আহরণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় বৎসরে ২২ ইঞ্চি (৫৬ সে: মি:) উচ্চতায় নিয়মিত চা–পাতা উঠানো যায়। তৃতীয় বৎসরে ১৬–১৮ ইঞ্চি (৪০.৪৬ সে: মি:) উচ্চতায় গাছ কাটাই করে ২৪–২৫ ইঞ্চি (৬১–৬৩ সে: মি:) উচ্চতায় পাতা উঠানো হয়। চতুর্থ বৎসরে কাটাই না করে ২৫–২৬ ইঞ্চি (৬৩–৬৬ সে: মি:) উচ্চতায় ছাঁটাই দিয়ে ২৬–২৭ ইঞ্চি (৬৬–৬৯ সে: মি:) উচ্চতায় পাতা আহরণ করা হয়। পঞ্চম বৎসরে আবার ২৪–২৫ ইঞ্চিতে (৬১–৬৩ সে: মি:) কাটাই করা হয় এবং ৩২–৩৩ ইঞ্চিতে (৮১–৮৪ সে: মি:) পাতা তোলা হয়। ষষ্ঠ বৎসরে আর না কেটে ৩৩–৩৪ ইঞ্চিতে (৮৪–৮৬ সে: মি:) ছাঁটাই করে দেওয়া হয় এবং ৩৪–৩৫ ইঞ্চি (৮৬.৮৯ সে: মি:) উচ্চতায় পাতা আহরণ করা হয়।

বয়স্ক চা গাছ : এই রকম বয়সের (৭ম বর্ষ হতে তদূর্ধ্ব) চা বাগানে চক্রাকারে (তিন বৎসরীয় চক্র) কাটাই–ছাঁটাই করে কিভাবে চা পাতা আহরণ করতে হয় তা নিম্নে দেখান হলো।

সারণি–৩৭ : বয়স্ক চা গাছ কাটাই–ছাঁটাইয়ের তিন বৎসরীয় চক্র।

চক্র সংখ্যা	বৎসর (৭ম বর্ষ হতে	কাটাই–ছাঁটাইয়ের উচ্চতা (ইঞ্চিতে স: মি:)	পাতা তুলার উচ্চতা (ইঞ্চিতে সে: মি:)
	১ম	কা– ২৯/৭৪	৩৭/৯৪
১	২য়	গ : ছা –৩৩/৮৪	৩৭/৯৪
	৩য়	৩য় হা: ছা – ৩৮/৯৬	৩৮$\frac{১}{২}$/ ৯৮
	৪র্থ	কা–৭৯$\frac{১}{২}$/৭৫	৩৭$\frac{১}{২}$ /৯৫
২	৫ম	গ: ছা:–৩৩$\frac{১}{২}$/ ৮৫	৩৭$\frac{১}{২}$ /৯৫
	৬ষ্ঠ	হা: ছা–৩৮$\frac{১}{২}$৭ ৯৮	৩৯/৯৯
	৭ম	কা– ৩০/৭৬	৩৮/ ৯৬
৩	৮ম	গ: ছা – ৩৪/৮৬	৩৮/৯৬
	৯ম	হা: ছা ৩৯/৯১	৩৯$\frac{১}{২}$/ ১ মি:
৪	১০ম	কা– ৩০$\frac{১}{২}$/ ৭৭	৩৮/৯৬
	১১শ	গ : ছা– ৩৪/৮৬	৩৮/৯৬ সে: মি:
	১২শ	হা: ছা ৩৯/৯১ সে:মি:	৩৯$\frac{১}{২}$/ ১ মি:
৫	১৩শ	কা– ৩১/৭৯	৩৮/ ৯৬
	১৪শ	গ: ছা– ৩৪/৮৬	৩৮/৯৬
	১৫শ	হা: ছা – ৩৯/৯৯	৩৯$\frac{১}{২}$/ ১ মি:
৬	১৬শ	কা–৩১$\frac{১}{২}$/ ৮০	৩৮/৯৬
	১৭শ	গ: ছা – ৩৪/৮৬	৩৮/৯৬
	১৮শ	হা : ছা – ৩৯/৯৯	৩৯$\frac{১}{২}$/ ১ মি:
৭	১৯শ	কা–৩২/৮১	৩৮/৯৬
	২০শ	গ: ছা – ৩৪/৮৬	৩৮/৯৬
	২১শ	হা: ছা – ৩৯/৯৯	৩৯$\frac{১}{২}$/ ১ মি:

কা–কাটাই : গ: ছা—গভীর ছাঁটাই ; এবং হা: ছা: —হাল্কা ছাঁটাই।

এইভাবে কাটাই–ছাঁটাই করতে করতে চা গাছে পাতা তোলার উচ্চতা যখন ৪০ ইঞ্চি অর্থাৎ ১ মিটারের উপরে চলে আসতে চায় তখন তা আর সুবিধাজনক থাকে না। কারণ, একজন মানুষের পক্ষে তখন মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই উচ্চতায় পাতা তোলা আর সম্ভবপর হয় না। সেই অবস্থায় চা গাছকে আবার বেশি নিচে হতে কাটাই করে পাতা তুলার উচ্চতায় নামিয়ে আনতে হয়। এই রকম কাটাইকে বলা হয় মাঝারি ধরনের কাটাই (Medium

Prunning in tea) এই পদ্ধতিতে গাছকে আবার ২২ হতে ২৭ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫৬–৫৯ সে: মি: উচ্চতায় কাটা হয় এবং আবার ধীরে ধীরে ৩২ ইঞ্চি অর্থাৎ ৮১ সে: মি: উচ্চতায় উঠানো হয়।

সার প্রয়োগ : চা গাছ চির সবুজ এবং পাতাই ফসল হিসেবে গণ্য করা হয় বলে নাইট্রোজেনজাতীয় সার এই ফসলটির জন্য স্বাভাবিকভাবেই অতীব প্রয়োজনীয়। তবে ফসলটির সম্যক বৃদ্ধির জন্য ফসফরাস ও পটাশজাতীয় সার ব্যবহারেরও তাগিদ রয়েছে।

পরীক্ষামূলক সমীক্ষায়[১০] জানা গিয়েছে অল্প বয়সী চা বাগানে প্রতি হেকটরের জন্য ৪৫–৯০ কেজি হিসেবে নাইট্রোজেন ব্যবহার করতে হয়। আর পূর্ণ বয়স্ক চা বাগানের জন্য প্রয়োজন হয় প্রতি হেক্টরে ৯০ কেজি নাইট্রোজেন।

নাইট্রোজেনজাতীয় সারের মধ্যে চা বাগানের জন্য পছন্দনীয় সার হলো এমোনিয়াম সালফেট। ফসফরাস ও পটাশের জন্য টি. এস. পি এবং মিউরেট অব পটাশ সার ব্যবহার করলেই চলে। গাছ কাটাই–ছাঁটাই করার পর তাতে যখন পাতার কুঁড়ি ধরতে শুরু করে তখন প্রতি হেক্টরে ২২৫–৪৫০ এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা হয়। পূর্ণবয়স্ক চা বাগানে প্রতি বৎসর প্রতি হেক্টরে ৪৫০ কেজি করে এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে যেতে হয়।

সেচ প্রয়োগ : অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি এমনকি মার্চ মাস পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে কোনো বৃষ্টিপাত নেই বলে বাংলাদেশের চা বাগানে পানি সেচ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তাহলে বর্ষাতি মৌসুম ছাড়াও এই মাসগুলিতেও কিছু কিছু চা পাতা পাওয়া যাবে। প্রতি মাসে ৪ একর—ইঞ্চি পানি সেচ দিলে চা বাগান উৎপাদনক্ষম হয় ; এর চাইতে কম পানি দিলে ফল ভালো হয় না।

কীটপতঙ্গ ও রোগ বালাই দমন : চা বাগানে নানারকম পোকা ও রোগের আক্রমণ হয়। আশানুরূপ ফলন পেতে হলে যথাসময়ে সেগুলি দমন করা উচিত।

পোকার মধ্যে লাল মাকড়সা, ফ্লাস ওয়ার্ম, চা পাতার মশক পোকা, উইপোকা এবং রোগের মধ্যে রেড রাস্ট, ব্ল্যাক রট এবং ভায়লেট রট উল্লেখযোগ্য।

১. **লাল মাকড়সা** (Red spider mite) এইপোকা চা'এর কচি পাতা ও কুঁড়ির উপর সারা বৎসর খেয়ে চলে। মে হতে জুলাই মাসে ইহার আক্রমণ প্রবল হয় এবং তখন আক্রান্ত পাতাগুলি লাল হয়ে যায়। গাছ কাটাইয়ের পর বাকিগুলো ঝরায়ে দিলে লাল মাকড়সা দূরীভূত হয়। লাইম–সালফার প্রতি সপ্তাহে ছিটালেও পোকার আক্রমণ কিছুটা কমে যায়।

২. **চা পাতার মশা** (Tea mosquito bug) : চা 'এর কচিপাতা ও কুঁড়ির রস চুষে খায়। প্রতি হেক্টরের জন্য ১.২৫ কেজি ডি. ডি. টি ৪০ গ্যালন অর্থাৎ ১৮২ লিটার পানিতে মিশিয়ে সন্ধ্যাবেলা ও খুব ভোরে প্রয়োগ করলে এই পোকা দমন করা হয়।

৩. **ফ্লাশ ওয়ার্ম** (Flush worm) : এই পোকা চা গাছের কুঁড়ি ও কচি পাতা খেয়ে চরম ক্ষতি করে। মিথাইল প্যারাথায়ন (Methyl parathion-50%) প্রয়োগে এই পোকা দমন করা যায়।

৪. **উইপোকা** (Termites) : চা বাগানে উইপোকার আক্রমণ মারাত্মক হতে পারে। গাছের সজীব ডালাপালার উপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে এই পোকা উপর হতে ভিতরের দিকে

যেতে থাকে। আক্রান্ত ডালাতে পাতা বা কুঁড়ি কিছুই হয় না। এক সময় দেখা যায় ডাল ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছে। ডাইলেড্রিন (Dieldrin) প্রতি হেক্টরে ৪.৫০ কেজি হারে প্রয়োগ করলে এই পোকা দমন করা যেতে পারে।

৫. **রেড রাস্ট** (Red rust) : এপ্রিল–জুন মাসে গাছের কাণ্ড এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত কাণ্ড এক রকম কমলা রঙের দেখায়। তাম্রঘটিত ঔষধ (Copper fungicides) প্রতি হেক্টরের জন্য ১.২৫ কেজি ১৮২ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করলে রোগ প্রশমিত হয়। বগা মেডুলা গাছ (স্বল্পস্থায়ী ছায়াবৃক্ষ) এই রোগ জীবাণু দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হতে পারে। অতএব, দুই বৎসরে ব।স হওয়ার আগেই এই গাছ চা বাগান হতে উঠিয়ে ফেলা আশু কর্তব্য।

৬. **কালো পচা** রোগ (Black Rot) : এই কাল পচা রোগ চা গাছ কাটাইয়ের পর মেঘলা গোমটবাধা আবহাওয়ায় দেখা দেয়। আক্রান্ত গাছের পাতা সূর্যালোকে ঝলসানো দাগ পড়ার মতো দেখায়। পরিশেষে পাতা ঝরতে থাকে বা ছত্রকের দেহের সঙ্গে ঝুলে থাকে। এপ্রিল–মে মাসের মধ্যবর্তী সময়ে তাম্রঘটিত ঔষধ ১৫ দিন পর পর প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়।

৭. **ভায়োলেট রুট রট** (Violet root rot) : এই রোগের জীবাণু গাছের শিকড়ে আক্রমণ চালায়। আক্রান্ত শিকড় হতে এক রকম উগ্র টকযুক্ত গন্ধ বের হয় এবং আক্রান্ত স্থান গোলাপি হতে কালো রং ধারণ করে। চা বাগানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে এই রোগ দেখা দেয়। কাজেই চা বাগানে যাতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ফলন : (Yield of tea) আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পাতার জন্য চা' এর আবাদ করা হয়। দুটি পাতাসহ একটি কুঁড়ি উঠানোই নিয়ম, অবশ্য কখনো কখনো তিন–চারটি পাতাসহও কুঁড়ি উঠানো হয়। তবে পুর্বোক্ত নিয়মে উঠানো পাতা হতেই উৎকৃষ্ট মানের চা উৎপন্ন হয়।

চা বাগানে সাত দিন পর পর পাতা উঠানো সাধারণ নিয়ম, তবে ছয় দিনের চক্রেও পাতা উঠানো যেতে পারে এবং এই নিয়মে উঠানো পাতা হতেই উন্নতমানের চা প্রস্তুত হয়। মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত যখন গাছের বৃদ্ধি দ্রুত থাকে তখন এই নিয়মেই পাতা তোলা প্রশস্তনীয়।

চা পাতার উৎপাদন বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ৭/৮ বৎসর বয়সের সময় সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে এবং এর পর কিছু সময়সীমা পর্যন্ত উৎপাদন একই মাত্রায় স্থির থাকে। এই সময়ের উৎপানকেই চা'এর প্রকৃত ফলন বলে ধরতে হয়। এই ফলন প্রতি হেক্টরে ১৭৭৮–৩৫৫৭ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। বাগান হতে সংগৃহীত কাঁচা বা সবুজ পাতা হতে প্রস্তুত চা পাতার উৎপাদন ১/৪ ভাগ অর্থাৎ ৪৪৫–৮৯০ কেজি। তবে খুব ভালো বাগান হতে প্রতি হেক্টরে ১১১৬–১১৩৫ কেজি প্রস্তুত চা (made tea of the market) উৎপাদিত হতে পারে।[১১] আবার তেমনি পুরোনা বাগানের উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ২৮৪ কেজি নেমে যেতে পারে।

---

১১. বাংলাদেশ অবজার্ভার (৩ নভেম্বর, ১৯৯৮) দৈনিক পত্রিকার সৌজন্য।

চা একটি দীর্ঘস্থায়ী ফসল। একটি চা' এর বাগান হতে অনেক দিন পর্যন্ত চা পাতা উঠানো যেতে পারে। বলা যায় গড়পড়তা চা বাগানের বয়স ৫০ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু ১০০ বৎসর এমনকি ২০০ বৎসরের পুরাতন চা বাগানও জাপানে দেখা যায়।[৮] তবে একটি বাগানের অবস্থা ২০/২৫ বৎসর পর্যন্তই খুব ভালো থাকে, পরে আস্তে আস্তে মন্দার দিকে যেতে থাকে।

বাজারে প্রাপ্ত চা পাতা প্রস্তুত প্রণালি (Processing of garden tea in to made tea) : আমরা ছোট হাটে বাজারে যে চা পাতা দেখি এবং যা হতে পানীয় চা তৈরি করা হয় তা কারখানায় সবুজ পাতা চা হতে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এই বিষয়ের আলোচনা এই পুস্তকের আওতাভুক্ত নয়। তবে সাধারণ কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করা হলো।

চা বাগানের মালিকদের এই কারখানা বাগানের সন্নিকটেই স্থাপন করা হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সবুজ পাতাকে পর্যায়ক্রমে কতকগুলি ধাপের মাধ্যমে চালনা করে এই চা প্রস্তুত করা হয়।

১. সবুজ পাতা ঈষৎ শুকানো (Withering the green leaf) : একটি আবদ্ধ একতলা বা বহু তলাবিশিষ্ট ঘরে চটের অথবা বাঁশের বা তারের মাচাঙ্গে পাতাগুলি এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যেন প্রতি বর্গফুটে ১ পা: পাতা ছড়ানো হয়। পাতাগুলি উদ্দিষ্ট মাত্রায় শুকাবার জন্য ১৮ ঘণ্টা এইভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়।

২. পাতা থেতলানো (Rolling the leaf) : অল্প পরিমাণে শুকানো পাতা যান্ত্রিক উপায়ে চাপ দিয়ে থেতলায়ে দেওয়া হয়। ইহাতে পাতার ভিতরের এক প্রকার তৈল ও জারক রস বের হয়ে পাতা সিক্ত করে দেয়। ইহার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই পাতার জারণ ক্রিয়া (oxidation) শুরু হয়।

৩. জাঁকে বসানো (Fermenting the leaf) : থেতলানো পাতাগুলি এখন পরিষ্কার ও মসৃণ সিমেন্ট অথবা এলুমিনিয়ামের মেঝেতে [illegible] সে: মি: করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জাঁকে বসানোর ঘর ঠাণ্ডা ও আর্দ্র রাখা হয়। ঠিকমতো জাঁক আসার উপরই প্রস্তুত চা পাতার গুণাগুণ প্রধানত নির্ভর করে। [illegible] ফা অর্থাৎ [illegible] সে: তাপমাত্রায় ৩ ঘণ্টা ৪৫ মি: সময় পর্যন্ত পাতা জাঁকে রাখলেই ঈপ্সিত গুণাগুণ চা পাতা লাভ করে বলে ধরে নেওয়া হয়।[৯]

৪. পাতা শুকানো (Firing or drying the leaf) : জাঁক আসা পাতা এখন শুকানোর জন্য প্রায় ১১১°সে: তাপমাত্রায় বায়ুর সংস্পর্শে আনা হয়। দুইটি ধাপে পাতা পুরাপুরি শুকানোর কাজ সমাপ্ত করা হয়। প্রথম ধাপে [illegible] মিনিট তাপে ঝলসানোর পর পাতায় শতকরা ১৫ ভাগ জলীয় অংশ থাকে; দ্বিতীয় ধাপে [illegible] মিনিট ঝলসানোর পর পাতার জলীয় অংশ শতকরা ১–৩ ভাগে নেমে আসে। শুকনো চা পাতা গুদামে থাকাকালীন সময়ে সহজেই জলীয় অংশগ্রহণ করে সিক্ত হতে পারে। এইরূপে চা পাতা বাজারে ছাড়ার উদ্দেশ্যে বাক্সবন্দী করার আগে পুনরায় ৮৯° তাপমাত্রায় ঝলসিয়ে জলীয় অংশের পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগে নামিয়ে আনা হয়।

কফি

চায়ের মতো কফিও একটি নিশ্যাকর পানীয়। তবে কফি চায়ের ন্যায় গাছের পাতা হতে প্রস্তুত হয় না, প্রস্তুত হয় কফি-বীন (Coffee bean) অর্থাৎ গাছের পরিপক্ক ফলের বীজ হতে। কফি খাওয়ার অভ্যাসটি প্রথম প্রচলিত হয় আরবদের মধ্যে। পঞ্চদশ শতাব্দীরও পূর্বে তারা ইয়েমেন দেশে প্রথম কফির আবাদ প্রচলন করেন। ইহার পর হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কফির চাষাবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষে কফির চাষ শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। কেউ কেউ মনে করেন বাবা বোধন নামে একজন তীর্থযাত্রী মক্কা শরিফ হতে ফেরার পথে কফির সাতটি বীজ পকেটে পুরে নিয়ে আসেন এবং তা হতেই দেশে ফসলটির আবাদ প্রচলিত হয়।[১]

বাংলাদেশে কফির চাষ সত্যিকারভাবে না হলেও এ সম্বন্ধে কিছুটা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতে ঢাকা কৃষি ফার্মের শস্য প্রবর্তন কেন্দ্রে ১৯৬৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ছোট একটি কফি বাগান স্থাপন করা হয়। পরীক্ষার প্রথম কয়েক বৎসর উৎসাহজনক ফল পাওয়া গেলেও শেষের দিকে তেমন কোনো ভালো পাওয়া যায় নি। দুই একটি করে বাগানের সবগুলি গাছই মারা যায়। তবে এই অবস্থা দৃষ্টে এই কথা বলা উচিত হবে না যে বাংলাদেশে কফি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যে দেশে চা জন্মাতে পারে সে দেশে কফির চাষও সম্ভব, কারণ চা ও কফির জন্য মাটি, জলবায়ু ও অন্যান্য পরিবেশে অনেকটা একই রকম। কফি চাষের প্রাথমিক পরীক্ষাটি ঢাকার মতো অনপোযোগী জায়গায় না করে যদি সিলেট, চট্টগ্রাম অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় পরিচালনা করা হতো তা হলে এমন অবস্থাটি হতো না বলে সে কথাটি এক রকম জোর দিয়ে বলা যায়। বাস্তবিক পক্ষে তাই হয়েছে। ঢাকা ফার্মের পরীক্ষার সাথে চট্টগ্রামের রাইখালীতে যে পরীক্ষাকার্য চালানো হয়েছিল অর্থাৎ যে কয়টি কফি গাছ রোপণ করা হয়েছিল সেইগুলির প্রায় সবগুলি আজ পর্যন্তও টিকে আছে।

কফি চাষ বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় ধীরে ধীরে শুরু করা যেতে পারে, তবে যা কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যেই। বিদেশে রপ্তানি ভিত্তিক কফির আবাদ এদেশের জন্য চিন্তা একেবারেই না করা ভালো, কারণ কফির আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা করার কোনো কথাই উঠে না।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

আরব দেশে কফি পান করার অভ্যাস প্রথমে প্রচলিত হলেও আবিসিনিয়া দেশকেই কফির আদি নিবাস বলে মনে করা হয়।[২] ইউরোপ মহাদেশে আরব ও তুর্কি বণিকদের মাধ্যমে কফির পরিচিতি ঘটে। শ্রীলঙ্কা, ভারত ও জাভা দ্বীপে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে কফি চাষের প্রচলন হয়। ফরাসি ও ডাচ অধিবাসীগণ ব্রাজিল ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কফি চাষের প্রবর্তন করে। এভাবে কফির আবাদ পৃথিবীর আরো অনেক দেশ, যেমন— কলম্বিয়া, সালভেডর, গোয়াতেমালা, নেদারল্যান্ড, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, কিউবা, কোস্টারিকা, নিকরাগুয়া ও পোর্টোরিকোতে ছড়িয়ে পড়ে।

মাটির প্রকৃতি ও ভূমির উচ্চতা

চা'-এর মতো বেলে-দোঁয়াশ মাটিই কফির জন্য সর্বোত্তম। এটেঁল মাটি ইহার জন্য মোটেই ভালো নয়। অধিক অম্লাত্মক মাটিতে কফি ভালো হয়। পরীক্ষায়[৮] দেখা গিয়াছে, যে মাটির পি. এইচ. (PH) ৪.২-৫.১ এর মধ্যে তেমন মাটিই কফির জন্য সবচাইতে উপযোগী। অধিক হিউমাস ও পটাশযুক্ত মাটি কফির খুব উপকারে আসে। কফি বাগানের মাটিতে নাইট্রোজেনের চাহিদা যথেষ্ট, ফসফেট অল্প হলেও চলে। লৌহ, ম্যাংগানিজ ও বোরণ মাটিতে সামান্য পরিমাণে থাকলেও উপকারে আসে।

এরাবিকা শ্রেণীর কফি (Arabica spps) কেবল উচ্চ ভূমিতেই ভালো জন্মে। ২৫০০ ফুট হতে ৫০০০ ফুট অর্থাৎ ৮০৬-১৬১৬ মিটার উঁচু অঞ্চলেই এই জাতের কফি চাষের সফলতা নির্ভর করে। রুবাস্টা (Rubasta) কফি নিচ ভূমি এমনকি সমুদ্র সমতলেও চাষ করা যায়।

জলবায়ু

কফি নিশ্চিতরূপে নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফসল। তাই কফির প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলি নিরক্ষ রেখার উত্তর ও দক্ষিণে ২৫° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া কফির উপযোগী হলেও ৯০°ফা: অর্থাৎ ৫০°সে: তাপমাত্রার চাইতে বেশি তাপমাত্রায় কফি ভালো হয় না এবং ফল পাকার সময় বায়ুমণ্ডল শুষ্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। কফি চাষের জন্য সর্বনিম্ন তাপ ৩১° সে, সর্বোচ্চ ৫০°সে. এবং সব চাইতে উপযোগী তাপ ৩৯° সে. তুষারপাত কফির জন্য মঙ্গলজনক নয়।

কফির জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। সারা বৎসর সমভাবে বিস্তৃত ৬০-৯০ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৫২০-২২৯০ মি: মি: বৃষ্টিপাত খুব উপযোগী। তবে ৩০৫০-৫০৮০ মি: মি: পর্যন্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চলেও কফি ভালো হতে দেখা যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

কফি রুবিয়েসি (Rubiaceae) পরিবারভুক্ত বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ (চিত্র ১০.৭)। Coffee arabica, Coffea robusta এবং Coffea liberica এই তিন প্রজাতির কফি বিশ্বে বহুল প্রচলিত। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত কফি সব চাইতে সমাদৃত।

এরাবিকা কফি গাছ ঝোপ বেঁধে ১০-১২ অর্থাৎ ৩-৪ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। তবে বাগানে ৪-৫ ফুট অর্থাৎ ১.৩-১.৬ মিটারের বেশি উঁচু হতে দেওয়া হয় না। ডালগুলি জোড়ায় জোড়ায় একের পর এক আড়াআড়ি ও মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে জন্মে। পাতা লম্বাটে—দৈর্ঘ্যে ১২.৭-২০ সে: মি: এবং প্রস্থে ৭.৬-১০ সে: মি: এবং গাঢ় সবুজ রংয়ের। কচি পাতাগুলি হাল্কা বাদামি বা তামাটে রংয়ের ; পরে বৃদ্ধি হওয়ার সাথে আস্তে আস্তে সবুজ রং প্রাপ্ত হয়।

এপ্রিল মাসে গাছে ফুল ধরা শুরু হয়। ছোট ছোট সাদা ফুল সারা গাছে বরফের মতো দেখায়। ডিসেম্বর মাসে ফল পাকে। ফলগুলি থোকায় থোকায় পাতার বোঁটার গোড়া হতে ঝুলতে থাকে। একেক থোকায় প্রবাল প্রাথরের ন্যায় লাল রংয়ের ১৫-২০টি ডিম্বাকার ফল

ধরে। এরাবিকা প্রজাতির কফির মধ্যে কয়েকটি জাতের উদ্ভাবন করা হয়েছে, তন্মধ্যে দক্ষিণ ভারতে দৃষ্ট 'কেন্টস কফি' (Kents Coffee), জ্যামাইকার ব্লু মাউন্টেন (Blue mountain) উল্লেখযোগ্য।

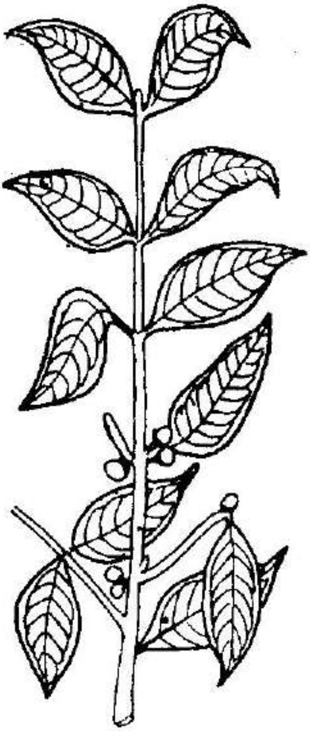

চিত্র : ১০.৮ ফল বা বীজসহ কপি গাছের একাংশ

রোবাস্টা কফির গাছ এরাবিকা গাছ হতে স্বতন্ত্র ; অধিকতর উঁচু গাছ ও বেশি ঝোপবাঁধা, পাতা অধিকতর বড় ও লম্বা এবং প্রতি থোকায় অনেক বেশি ফল ধরে। সমস্ত ফুল এক সঙ্গে ফুটেনা। ফল ও বীজ উভয়েই আকারে ছোট। পূর্বোক্ত কফির চাইতে অধিকতর নিচু জায়গায় জন্মাতে পারে এবং অনেকটা টিকসই।

লাইবেরিকা কফির গাছ সব চাইতে লম্বা। ছাটাই না করলে ২৫ ফুট অর্থাৎ ৮ মিটার পর্যন্ত উচু হতে পারে। গাছের গোড়া বেশ মোটা হয় ; পাতা অন্য দুই প্রজাতির পাতা হতে অনেকটা আলাদা ধরনের —বেশ ছোট, গোলাকার এবং হাল্কা সবুজ রংয়ের। ফল গাছের নানা জায়গায় ধরে এবং আকারে বেশ বড়, তবে বীজ ছোট কিন্তু গুণগত মানের দিক হতে ভালো।

কফি বাগান স্থাপন

কফি বাগান স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত পাহাড়ি এলাকার ছোট-বড় গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। তবে সমস্ত গাছপালা না কেটে যেগুলি বাগানে ছায়াবৃক্ষের কাজ দিতে পারে সেগুলি কিছু বাগানে রেখে দেওয়া যেতে পারে। কফি রোপণের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব ঢাল সব চাইতে ভালো। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ঢাল একেবারেই ভালো নয়। দক্ষিণ ঢাল ভালো না হলেও কাজ চলে যেতে পারে।

বাগানে ছায়াবৃক্ষ রোপণ (Planting shade trees in the garden) : চা বাগানের মতো কফি বাগানেও ছায়াবৃক্ষ জন্মাতে হয়। স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী —এই ধরনের ছায়াবৃক্ষ ব্যবহার করার রীতিই দেখা যায়। তবে ছায়াবৃক্ষের ব্যাপারে চা বাগানের চাইতে কফি বাগানে অনেকটা শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর কয়েকটি বড় বড় কফি উৎপাদনকারী দেশ— যেমন, ব্রাজিল ও কেনিয়ায় ছায়াবৃক্ষ একেবারেই ব্যবহার করা হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশেই নামে মাত্র ছায়াবৃক্ষ, যেমন— কদলী, পেঁপে ও ভেরেণ্ডা গাছ জন্মানো হয়। তবে বাংলাদেশের কফি বাগানে চা বাগানের মতো ছায়াবৃক্ষ ব্যবহার করা উচিত। স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী এই দুই রকম ছায়াবৃক্ষই ব্যবহার করা সমীচীন হবে। ভারতবর্ষের কোনো কোনো কফি বাগানে এই দুই রকম ছায়াবৃক্ষই ব্যবহার করতে দেখা যায়। চা বাগানে যে সমস্ত গাছ ছায়াবৃক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেগুলিই কফি বাগানে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বীজতলায় চারা উৎপাদন (Raising seedlings in the nursery) : বাগানে লাগানোর জন্য চারা গাছ আগেভাগেই বীজতলায় জন্মাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত বাগানের কাছাকাছি কিছু ঢালু জমিতে বীজতলা বসাতে হবে। বীজতলার মাটি কোপিয়ে তা হতে আগাছা, গাছের গুড়ি, ডালপালা ইত্যাদি পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে বীজতলার মাটিতে যেন কোনো ইলওয়ার্ম (Eeelworm) না থাকে। বীজতলার সম্পূর্ণ জমি ৪ ফুট অর্থাৎ ১.৩ মি: প্রশস্থ ও ৫/৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৩/১৪ সে: মি: উঁচু করত ফালি ফালি করে প্রস্তুত করতে হবে। দুই ফালির মধ্যে ১ মিটার করে জায়গা হাটাচলার জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

দুই রকম পদ্ধতিতে বীজতলায় চারা উঠানো যায়। প্রথম পদ্ধতিতে বীজ অন্যত্র অর্থাৎ প্রথম বীজতলায় অঙ্কুরিত করে দ্বিতীয় বীজতলায় প্রয়োজনীয় দূরত্বে আধা সে: মিটার মাটির নিচে বপন করতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বীজ অঙ্কুরিত না করে সরাসরি বীজতলায় বপন করে চারা জন্মাতে হয়।

বাগানে চারা রোপণ (Transplanting in the main garden) : বাংলাদেশের মৌসুমী আবহাওয়ার কথা মনে রেখে কফি বাগানে মে-জুন হতে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চারা লাগানো যেতে পারে। চারা রোপনের জন্য প্রতিটি গর্তের ব্যাস ৩০ সে: মি: এবং গভীরতা ৬০ সে: মি: হতে পারে অথবা ৪৬ সে: মি: দৈর্ঘ্য ৬০ সে: মি: প্রশস্থ ও ২৩ সে: মি: গভীরতা বিশিষ্ট গর্তেরও চারা রোপণ করা যেতে পারে। বাগানে এক বৎসর হতে দেড় বৎসর বয়সের চারা লাগাতে হয়। কফির জাতের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দূরত্বে চারা লাগানো বিধেয়।[৪]

কফির জাত	দূরত্ব
কফিয়া এরাবিক	৩ × ৩ মি : অথবা ৩.২ × ৩.২ মি:
কফিয়া রুবাস্টা	২.৫ × ২৫ মি: প্রথমে, পরিশেষে কেটে ৫×৫ দূরত্বে গাছ রাখতে হয়।
কফিয়া লাইবেরিকা	৩.২ × ৩.২ মি: প্রথমে, পরিশেষে ১৩ × ১৩ মি: দূরত্বে গাছ রাখতে হয়।

বাগানে চারা গাছ লাগাবার সাথে সাথে স্বল্পস্থায়ী ছায়াবৃক্ষ উঠাতে হবে। তৎসঙ্গে মাটি ঢেকে রাখতে পারে। এমন, শস্য, যেমন— মাটিকলাই বা বরবটি জন্মালে বাগানের অনেক উপকার হবে। প্রথমত মাটি ক্ষয়ের হাত হতে রক্ষা পাবে এবং জমিতে নাইট্রোজেন জমা হয়ে ইহাকে উর্বর করে তুলবে।

আগাছা দমন : চা বাগানের আগাছা যেভাবে দমন করার কথা বলা হয়েছে, ঠিক সেভাবে কফি বাগানের আগাছা দমন করতে হবে। বাগানে কফি গাছ একবার ঝোপ বেঁধে গেলে পরবর্তী পর্যায়ে আগাছা আর জোর করতে পারে না।

কফি গাছ কাটাই-ছাঁটাই (Prunning coffee plants) : চা এর মতো কফি বাগানেও কাটাই-ছাঁটাই করার প্রয়োজন আছে। গাছের বয়স যখন বৎসর দুয়েক হয় তখন ২½ ফুট অর্থাৎ ৭৬ সে: মি: উচ্চতায় আগা কেটে দেওয়া হয়। এই সময় গাছের ৪ হতে ৬ জোড়া শাখা দেখা যায়। গাছের আগা কাটিয়া দেওয়ার পর ইহার গোড়ার দিক হতে কতকগুলি ডালপালা গজিয়ে উঠে। সেগুলি দেরি না করে কেটে ফেলতে হবে।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে গাছের প্রধান শাখাগুলি বড় হতে থাকে এবং সেগুলি হতে দ্বিতীয় পর্যায়ের শাখা বের হয়। গাছের আগার কাছাকাছি প্রধান কয়েক জোড়া শাখা কেটে দেওয়া বিধেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের শাখাগুলির জোড়া হতে একটির পর একটি কেটে দিতে হয়, ইহার উদ্দেশ্য ডালগুলি সবল ও সতেজ রাখা তাতে অধিক হারে ফল ধরানো। দ্বিতীয় পর্যায়ের ডালগুলি হতে জন্মানো তৃতীয় পর্যায়ের সমস্ত ডালগুলি কেটে ফেলতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ডালগুলি দ্বিতীয়বার ফল ধরার পর অবশ্য কেটে ফেলতে হবে। প্রাথমিক ডালগুলি খুব লম্বা হয়ে গেলে সেগুলি কেটে ছোট করে দিতে হবে।

ইহাই কফি গাছ কাটাই-ছাঁটাই করার সাধারণ নিয়ম। তবে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিছুটা ভিন্ন রকমেও এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। এমনকি কোনো কোনো দেশে যেমন— ব্রাজিলে কফি গাছ একেবারেই কাটাই-ছাঁটাই করা হয় না। একই গর্তে দুটি করে গাছ লাগিয়ে সেগুলি বাড়তে দেওয়া হয়। স্বভাবতই গাছগুলি যথেষ্ট উঁচু হয়ে যায় বলে ফল আহরণ করার জন্য মই ব্যবহার করতে হয়।

বয়স্ক কফি গাছ সাধারণত ফল তোলার পর এবং অল্প বয়সী গাছ বর্ষান্তে কাটাই-ছাঁটাই করা হয়।

সার প্রয়োগ : (Application of fertilizers) : কফি বাগানে আগের দিনে সার প্রয়োগের কথা চিন্তা করা হতো না, কারণ বিনা সার প্রয়োগেই বাগানে যথেষ্ট কফি উৎপাদিত হতো। বাগানের জমিতে পচা পাতার পুরু আবরণ থাকার ফলে মাটি যথেষ্ট উর্বর ছিল। কিন্তু সময়ান্তরে আজকাল তেমনটি আর নেই।

তাই কফি বাগানে আজকের দিনে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ এই তিন জাতীয় সারই ব্যবহার করা হয়। একই প্রকার সারের মাধ্যমে নাইট্রোজেন বা অন্যান্য উপাদান সরবরাহ না করে বিভিন্ন প্রকার সার ব্যবহারের মাধ্যমেই তা করা উচিত। তাই কফি বাগানের মালিককে এমোনিয়াম সালফেট, সরিষা বা বাদামের খৈল, টি. এস. পি, হাড়ের গুড়া ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেখা যায়। প্রতি বৎসর প্রতি হেক্টর নাইট্রোজেন ৬৩–১০০ ফসফরিক এসিড ৫০–৭৩ কেজি এবং পটাশ ৬৮–৯০ কেজি ব্যবহার করা বিধেয়।[৫] নাইট্রোজেন সার একবারে ব্যবহার না করে বৎসরে দুইবার ব্যবহার করা ভালো—একবার বর্ষার শুরুতে ও আর একবার বর্ষা শেষে।

কীটপতঙ্গ ও রোগ দমন (insect and disease control) : রোবাস্টা কফির চাইতে এরাবিকা কফিতে রোগ পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

কফি কেঙ্কার (Coffee canker) নামক রোগের আক্রমণে গাছের কাণ্ড ও বড় বড় ডালার উপরে আড়াআড়ি চষা অপঘাতের (Wound) সৃষ্টি হয়। ইহাতে গাছ আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে। আক্রান্ত ডাল-পালার কিছুটা সুস্থ অংশ কাটিয়া ফেলে তামাঘটিত রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগের আক্রমণ কমে আসে। ব্রাউন ব্লাইটের (brown blight) আক্রমণের ফলে গাছের ফলগুলি পচে যেতে থাকে। অন্য আরেক প্রকার কাল পচা (Black rot) রোগ গাছের পাতা, ডালা এবং ফল পচিয়ে ফেলে। বোর্দো মিকচার (bardeaux mixture) প্রয়োগে এই পচা রোগসমূহ দমনে রাখা যায়। হেমেলিয়া ভেস্টট্রিক্স (Hemelia vastatrix) কফি গাছের পাতার দারুণ ক্ষতি করে থাকে। ইহার আক্রমণে পাতার নিচের দিকে হলদে কমলা দাগ দেখা দেয় এবং শীঘ্রই পাতাগুলি ঝড়ে যায়। ফলে গাছ আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমাগত ফলন কমে যেতে থাকে। বোর্দো মিকচার বৎসরে দুইবার—একবার এপ্রিল মাসে এবং পুনর্বার সেপ্টেম্বর মাসে প্রয়োগ করলে রোগ দমনে থাকে।

কফি গাছের কাণ্ড ও ডালা চষা (stem borers) ও পাতা চোষা (leaf sucker) পোকা বাগানের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে থাকে। কাণ্ড চষা পোকার কীড়া গাছের কাণ্ড ও বড় বড় ডালার ভিতরে সুরঙ্গ করে ভিতরকার নরম অংশ খেতে থাকে। ফলে আক্রান্ত কাণ্ড ও ডালা কয়েক বৎসরের মধ্যে দুর্বল হয়ে পরিশেষে মারা যায়। বাগানের কিছু সংখ্যক ঝোপ বৎসর বৎসর উপড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। নতুবা অতি শীঘ্র বাগানের অনেক গাছ আক্রান্ত হয়ে পড়বে। অন্যভাবেও এই পোকা দমনের ব্যবস্থা করা যায়। পোকার ডিম গাছের কাণ্ড ও ডালা হতে নারিকেলের রশির সাহায্যে খসে ফেলে দেওয়া যায়। কাণ্ডে ও ডালায় আলকাতরার প্রলেপ দিলেও ডিমগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং বয়স্ক পোকাও তখন সেই যায়গায় আর ডিম

পারতে যায় না। সবুজ গান্ধী পোকা (green bug) নামে এক রকম পোকা পাতার রস চুষে খেয়ে গাছ দুর্বল করে ফেলে, ইহাতে গাছের বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছে সাবান গোলা পানি (৫ গ্যালন পানিতে ১ পাঃ সাবান) ১৫ দিন অন্তর অন্তর দুই তিনবার প্রয়োগ করলে পোকা দূরীভূত হয়ে যায়।

ফল সংগ্রহ (Collecting or harvesting fruits) : কফি গাছে তৃতীয় বৎসর হতে ফুল-ফল ধরা শুরু হয়। তবে সেই বয়সের গাছে যাতে ফল না ধরে সেজন্য ফুলগুলি ঝরিয়ে দেওয়া ভালো। পঞ্চম বৎসর হতে কফিগাছ পূর্ণমাত্রায় ফল ধরতে শুরু হয় এবং তখন হতেই ফল আহরণ করা রীতিসিদ্ধ। এইভাবে একটি কফি বাগানে ৪০/৫০ বৎসর পর্যন্ত ফসল সংগ্রহ করা যায়।

কফি গাছে এপ্রিল মাসে ফুল ধরে এবং নভেম্বর মাস হতে ফল পাকতে শুরু করে এবং জানুয়ারি মাসে তা শেষ হয়। ডিসেম্বর মাসে অধিক পরিমাণ ফল গাছে পাকা অবস্থায় পাওয়া যায়। ফল বিভিন্ন সময় পাকে বলে সেগুলি একবারে আহরণ করা যায় না। নভেম্বর হতে শুরু করে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ৪/৫ বার এমনকি ৮/১০ বার ফল তুলতে হয়। ফল পেকে যখন প্রবাল রং ধারণ করে তখন সেগুলি তোলার প্রকৃষ্ট সময়। সুপরিপক্ক ফল হতেই ভালো কফি প্রস্তুত হয়।

বাজারে প্রাপ্ত কফি প্রস্তুত (Processing commercial coffee) : বাজারে যে কফি পাওয়া যায় তা পাওয়ার আগে কফি ফল হতে প্রথমে পার্চমেন্ট কফি তৈয়ার করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সুপরিপক্ক কফি ফল বেছে নিতে হয়। প্রথমে ফলের মাংসল অংশ ত্বকসহ আলাদা করে ফেলে দেওয়া হয়। তৎপর ফলের বীজগুলি স্তূপ করে এক রাত্রি বা তার কিছু অধিক সময় রেখে দেওয়ার পর পায়ের নিচে মাড়াই করে পরিষ্কার পানিতে কয়েকবার ধুয়ে নিলে বীজের উপর লেগে থাকা সমস্ত নরম অংশ দূরীভূত হয়ে যায়। এইসব বীজগুলি রৌদ্রে শুকিয়ে নিলে যবা প্রস্তুত হয় তাই পার্চমেন্ট কফি। কফি বীজের উপরে পার্চমেন্টের ন্যায় একটি আবরণ থাকে বলে এই নামকরণ হয়েছে। ইহার ভিতর সচরাচর দুটি বীজ থাকে যাকে বলা হয় কফি বীন (Coffee bean)। কখনো দুটির স্থলে একটি বড় গোলাকার বীজ থাকে। ইহাকে বলা হয় পি-বেরী (pea-berry)।

ছোটখাটো বাগানের ফল উপরোক্ত প্রথায় না শুকিয়ে সরাসরি রৌদ্রে শুকিয়ে ফেলা হয়। এইভাবে যে কফি বীন প্রস্তুত হয় তাকে বলা হয় চেরি কফি (cherry coffee)। প্রথমোক্ত কফির চাইতে এই কফি অনেক নিম্নমানের হয়।

বাজারে ছাড়ার আগে কফির পার্চমেন্ট অথবা খোসা ছড়িয়ে নিতে হয় যান্ত্রিক উপায়ে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই সময় কফি বীন কিছু কিছু ভাঙ্গিয়া যায়। খোসা, পাতলা পর্দা, ভাঙ্গাচোরা বীজ ইত্যাদি হতে আস্ত বীজ আলাদা করে নেয়া হয়।

কফি বীন ভেঙ্গে নিয়ে পেষণযন্ত্রে (grinding machine) গুঁড়া করে লওয়া হয়। এইরূপ প্রস্তুত কফির গুড়া দুধ চিনির সাথে মিশিয়ে পানীয় কফি প্রস্তুত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Aiyar, A. K. Y. N. : Field crops of India, 1947. Bangalore. Printed by the Superintendent at the Govt. Press. P. 470.

২. Ibid, pp. 470-71.

৩. Ibid, pp. 480-81.

৪. Ibid, pp. 502-03.

৫. Ibid, pp. 503-04.

৬. Ibid, pp. 510-11.

৭. Akbar, K : Control of weeds in Tea Estates. Tea Journal of Bangladesh. Vol. No 6. No 2 ; July, 1967. pp. 25-28.

৮. Ali, M. M.: Prunning of Tea in Bangladesh. Tea Journal of Bangladesh. Vol. 8 No. 2 July, 1970. pp. 8-14.

৯. Choudhury, A. R : Beverage Crops of Bangladesh. 1961. Directorate of Agricllture, East Pakistan.

১০. Faizullah, M., Hasan. K. A. and Ali M. M. : Effect of N P K on young Tea. Journal of Bangladesh. Vol. 4 No. 2. July, 1969. p. 18.

১১. Bangladesh Bureru of Statistics. Statistical yearbook of Bangladesh 1995.

১২. Mullah, A. H : Number of Tea Plants per acre. Tea Journal of Bangladesh.Vol. 6 No. 2, July, 1868. pp. 18-22.

একাদশ অধ্যায়
তন্তু জাতীয় শস্য
FIBRE CROPS

অন্নের পরেই মানুষের প্রয়োজন বস্ত্রের। উদ্ভিজ্জ তন্তু বা আঁশের সাহায্যেই প্রধানত রকমারী বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ, যেমন— কাণ্ড (পাট, মেস্টা, তিসি, রেমি), বীজ (কার্পাস তূলা শিমুল তূলা), পাতা ('এগেব', 'সিসাল', আনারস) প্রভৃতি হতে আঁশ উৎপন্ন হয়। আঁশ উৎপাদনকারী এই সমস্ত উদ্ভিদ—পাট (Jute), মেস্টা (Rozelle), তূলা (Cotton), রেমি (Ramie), ম্যানিলা হেম্প (Manila hemp), এগেব (Agave) ইত্যাদিই তন্তুজাতীয় শস্য নামে পরিচিত।

পৃথিবীতে বহু প্রজাতির তন্তুজাতীয় গাছ আছে, তন্মধ্যে Tiliaceae. Malvaceae, Palmaceae Musaceae, Liliaceae, Bombaceae, Leguminosae এবং Bromoliaceae পরিবারের অন্তর্গত গাছগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের কোনোটি হতে মিহিন, খাট, নরম ও টেকসই (তূলা) ; কোনোটি হতে লম্বা, মোলায়েম এবং কম টেকসই (পাট) ; কোনোটি হতে শক্ত এবং দৃঢ় (নারিকেল) আবার কোনোটি হতে মিহিন, খাট ও অত্যন্ত শক্তি (রেমি, হেম্প) আঁশ উৎপন্ন হয়। তন্তু বা আঁশের এই গুনাগুণ অনুসারে কোনোটি দ্বারা মিহিন ও মোলায়েম দামি বস্ত্র ; কোনোটি দ্বারা মোটা কম দামি বস্ত্র ; কোনোটি দ্বারা চট থলে, কার্পেট, দড়ি, কাছি ; কোনোটি দ্বারা মাছ ধরার জাল ; কোনোটি দ্বারা গদী, তোশক আবার কোনোটি দ্বারা কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়।

বাংলাদেশে তন্তুজাতীয় শস্যের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় পাটের। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে ; দেশের অতি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার এক বিরাট অংশ অর্জিত হয় এই পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি মাধ্যমে। অন্যান্য তন্তুজাতীয় ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপাদিত হয় মেস্টা, তূলা, ও শন। শিমুল তূলা বাংলাদেশের বনে জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে জন্মে থাকে।

পাট

সংস্কৃত 'পট্ট' কথা হতে বাংলা পাট কথাটি এসেছে। আর ইহার ইংরেজি শব্দ 'Jute' কথাটি এসেছে উড়িয়া শব্দ 'ঝুটে' (jhoute) হতে।[২] পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বৃক্ষপুত্র, যমুনা মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদীর পলিবাহিত উর্বর সমতল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মে। বিদেশে পাট রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। সেজন্য পাটকে 'সোনালি আঁশ' নামে অভিহিত করা হয়। মাঝে মাঝে পাটের বাজারে দারুন মন্দাভাব

দেখা গেলেও এই ফসলটির প্রতি বাংলাদেশের চাষীদের এমনই একটা নাড়ীর যোগ রয়েছে সেজন্য তারা এই চাষে কখনও বিরত থাকে না। তাই বলতে হয় ফসলটি বাংলাদেশের চাষীকুলের একান্তই আপনার।

নিম্নের তালিকায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বৎসর ৫.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাটের চাষ হয় আর তাতে উৎপন্ন হয় গড়ে ৫০.৪০ লক্ষ বেল পাট।[৮]

সারণি ৩৯ : বাংলাদেশে গত পাঁচ বৎসরে পাটের উৎপাদন

সাল	পাটের জমি (লক্ষ হেকটরে)	পাট উৎপাদন (লক্ষ বেলে)
১৯৯০	৫.৮৩	৫৩.৩২
১৯৯১	৫.৯০	৫২.৭৩
১৯৯২	৪.৫০	৪৮.০০
১৯৯৩	৪.৫০	৪৫.০০
১৯৯৪	৪.৬০	৫৩.১০

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯৫

উপর্যুক্ত তালিকায় লক্ষ্য করলে আরো দেখা যাবে যে ১৯৭৮ সাল হতে নিয়মিতভাবে পাটের আবাদি এলাকা কমে যাচ্ছে এবং ১৯৮১ সালে তা কমে সর্বনিম্ন ৫.৬৬ হেক্টরে দাঁড়ায়। এই হেন পরিস্থিতির জন্য চাষীদের উৎসাহহীনতা বা অনীহা দায়ী নয়, সরকারি পরিকল্পনার প্রভাবও ইহাতে বিদ্যমান রয়েছে। গত ৫/৬ বৎসর হতে নিবিড় পাট চাষ পরিকল্পনার (Intensive Jute Cultivation Scheme) মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ ও উন্নত পদ্ধতিতে পাটের চাষাবাদ করে প্রতি হেক্টরে ফলন বৃদ্ধি করা হবে তথা অল্প জমিতে অধিক পাট উৎপাদন করে পাটের পূর্বতন অধিক আবাদি এলাকা হতে অতিরিক্ত জমি অন্য ফসলের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশে পাট সার্থকভাবে উৎপাদিত হয়নি বলে মনে হয় এবং বেশ কিছুদিন আগেই এই পরিকল্পনার কাজ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

পাটের উৎপত্তি স্থল ঠিক কোথায় আজো সেকথা সঠিকভাবে জানা যায় নি। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ হতে পাটের চাষ হয়ে আসতে থাকলেও ইহা মনে করা হয় যে পাটের উৎপত্তি হয় ভূ-মধ্যসাগরীয় উপকূলে।[২] নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে কারো কারো মতে লম্বা-শুঁটি (Corchorus olitorius) পাটের জন্ম আফ্রিকায়। কারণ, সেখানে নানা জাতের লম্বা-শুঁটি পাট গাছ ঝোপে জঙ্গলে আজো দেখা যায়। আর অনেকের ধারণা গোল শুঁটি (Corchorus capsularis) পাটের জন্ম হয় দক্ষিণ এশিয়ায়। খুব সম্ভব দক্ষিণ-এশিয়ার পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে কিংবা দক্ষিণ চীনে অথবা বার্মার কোনো না কোনো এক জায়গায় সর্বপ্রথম গোল-শুঁটি পাটের উদ্ভব হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আরো কয়েকটি দেশে পাট জন্মে। সেই দেশগুলি হলো— ভারত, ফরমোজা, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, বার্মা, মিশর, প্যারাগুয়ে ও ব্রাজিল। তথাপি কেউ কেউ বলে থাকেন পাট চাষে বাংলাদেশের একচেটিয়া অধিপত্য অর্থাৎ পাট যেন শুধু বাংলাদেশেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু কথাটির আসল তাৎপর্য এই যে বাংলাদেশে পাট চাষের যত রকম সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা পৃথিবীর অনেক দেশেই নেই। উর্বর মাটি, অনুকূল জলবায়ু, পাট পচানোর মতো অপরিমিত পানি আর সর্বোপরি পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমিক — এই সবের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশ বাংলাদেশকে পাট চাষে স্বার্থক করে তুলেছে। অপরদিকে পৃথিবীর কোনো কোনো দেশের জমিতে পাট ভালো জন্মিতে দেখা গেলেও হয় পর্যাপ্ত পানি না হয় পর্যাপ্ত ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবে সেই পাট চাষ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

জেলাওয়ারী হিসেবে দেশে ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা ফরিদপুর, কুমিল্লা ও যশোর জেলায় প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালী জেলায় পাটের চাষ হয় না বললেই চলে।

মাটি

নদীবাহিত গভীর পলিমাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এই প্রকৃতির মাটি স্বভাবতই অত্যন্ত উর্বর। তবে দোঁআশ হতে বেলে দোঁআশ মাটিতেও পাট ভালো জন্মে।

জলবায়ু

পালাক্রমে বৃষ্টি ও রৌদ্র এবং তৎসঙ্গে ভ্যাপসা অর্থাৎ ৮০–৯০% আর্দ্রতাবিশিষ্ট গরম আবহাওয়া পাট চাষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। মৃদুমন্দ বাতাসও পাট চাষের অনুকূলে। পাট উৎপাদন এলাকায় বৎসরে ৫০–৭০ ইঞ্চি অর্থাৎ ১২৫০ মি: মি: —১৭৫০ মি: মি: বৃষ্টিপাত ও দৈনিক তাপমাত্রা ২৪° সে. ২৬সে. এমনটি ৩২° পর্যন্ত দেখা যায়। বৃষ্টিপাত চৈত্র–বৈশাখ মাস হতে আরম্ভ করে ভাদ্র–আশ্বিন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকলে পাট চাষ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

পাট টিলিয়াসি (Tiliaceae) পরিবারভুক্ত সরু দণ্ডাকৃতির ডালপালাবিহীন বর্ষজীবী উদ্ভিদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় একশত রকম আবাদি ও বন্যপাট দেখা যায়। কিন্তু তন্মধ্যে দুই রকম পাটই ১. Corchorus capsularis L.২. Corchorus olitorius L. ব্যবসাগত দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে কেবল এই দুই রকম পাটেরই আবাদ হয়ে থাকে। মেস্টা (Mesta) নামক আর এক রকম পাটের আবাদ কিছু হয় মাত্র।

উপর্যুক্ত প্রথম প্রকার পাট বাংলাদেশের চাষীদের কাছে সাদা বা দেশী বা তিতা এবং দ্বিতীয় প্রকার পাট তোষা বা বগী বা মিঠা পাট নামে পরিচিত। ইহাদিগকে যথাক্রমে গোল-শুটি পাট নামেও অবিহিত করা যেতে পারে।

সাদা বা দেশী পাট ১২/১৩ ফুট অর্থাৎ ৩.৫–৪ মিটারের মতো লম্বা হয়। পাতার রং ফিকে সবুজ, দৈর্ঘ্যে ৫–১৩ সে: মি: ও প্রস্থে ৩.৫ সে: মি: আর পাতাতে তিক্ত গ্লুকোসাইড (glucoside) থাকায় ইহার পাতার স্বাদ তিক্ত। তোষা বা মিঠা পাটের পাতা অপেক্ষাকৃত বড় ও স্বাদহীন আর উচ্চতায় ১৭/১৮ ফুট অর্থাৎ ৫.২৫–৫.৫০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক ও কৃষিতাত্ত্বিক বিচারে এই দুই প্রকার পাটের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে সেই প্রভেদগুলি দেখান হলো :

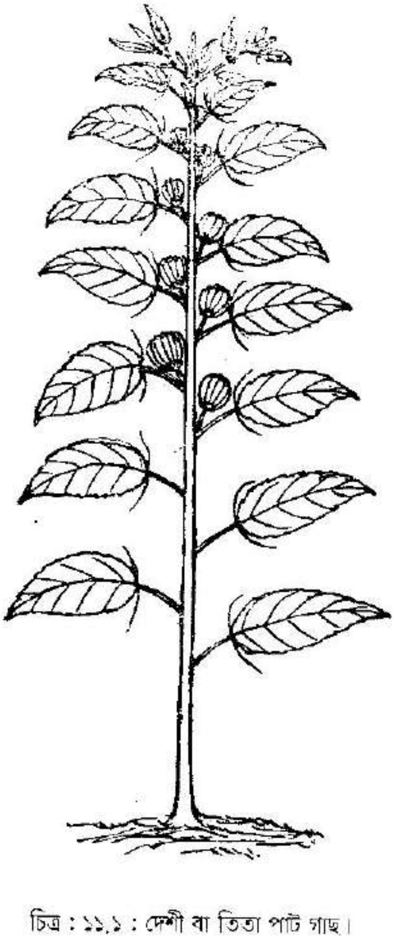

চিত্র : ১১.১ : দেশী বা তিতা পাট গাছ।

সাদা ও তোষা পাটের তুলনা

দেশী বা সাদা পাট	তোষা পাট
১. উচ্চতায় ৩.৫–৪ মিটারের বেশি হয় না	১. উচ্চতায় ৫.২৫–৫.৫০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

২. পাতা ফিকে সবুজ রংয়ের, অপেক্ষাকৃত ছোট ও তিতা স্বাদযুক্ত	২. পাতা গাঢ় সবুজ রংয়ের, অপেক্ষাকৃত বড় ও স্বাদহীন বা কিছুটা মিঠা স্বাদযুক্ত।
৩. ফুল অপেক্ষাকৃত ছোট ও গাঢ় হলুদ রঙের।	৩. ফুল অপেক্ষাকৃত বড় ও হাল্কা হলুদ রঙের।
৪. ফল বা শুঁটি / গুটি গোলাকার, উপরিভাগ খসখসে খাজকাটা, বীজ ঈষৎ বাদামি রঙের।	৪. ফল বা শুঁটি / গুটি লম্বাটে, দেখতে জিঙ্গার মতো পাজর-বিশিষ্ট ; বীজ অপেক্ষাকৃত ছোট ও ঈষৎ সবুজ রংয়ের বা নীলাভ।
৫. উঁচু ও নিচু উভয় স্থানেই জন্মাতে পারে ; ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বপন করতে হয়।	৫. শুধু উঁচু স্থানেই জন্মাতে পারে, বৈশাখ মাসে বপন করতে হয়।
৬. জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।	৬. জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।
৭. আঁশের রং সাদা-হলুদ অনুজ্জ্বল বাদামি হতে ধূসর রঙের।	৭. আঁশের রং লালচে বাদামি হতে গাঢ় ধূসর রঙের।
৮. অপেক্ষাকৃত কম আলোকসুগ্রাহী (Photosensitive)	৮. অপেক্ষাকৃত বেশি আলোক সুগ্রাহী ; এজন্য বৈশাখ মাসের আগে বপন করলে ডালপালা ও ফুলে ভরে যায় অর্থাৎ ফসল বলতে কিছুই হয় না।

পাটের জাত

ধানের তুলনায় পাটের জাত বেশ কম। দেশী (C. capsularis) ও তোষা (C. olitarins)– এ দুই রকম পাটের একটি করে জাত ১. ডি-১৫৪ (D-154) এবং ২.ও-৪ (0-4) বহুদিন আগে থেকেই বাংলাদেশের চাষীরা চাষ করে আসছিলেন। এর এ দুটি জাতের মধ্যে প্রথমোক্তটি হলো দেশী পাটের জাত ও দ্বিতীয়োক্তটি হলো তোষা পাটের জাত যা কৃষি বিভাগ কর্তৃক বহুদিন আগে থেকেই অনুমোদন প্রাপ্ত। বাংলাদেশে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হবার পর উভয় প্রকার পাটের উন্নত মানের কয়েকটি করে জাত উদ্ভাবিত হয়েছে যা বাংলাদেশের সর্বত্র চাষীদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে।[১১] সে জাতগুলো হলো :

ক. দেশী পাট

১. সবুজ পাট (CVL-1)
২. আশু পাট (CVL-3)
৩. জো পাট (cc-45)
৪. বি জে আর ই পাট –৫
৫. বি জে আর ই পাট–৬
৬. এটম পাট –৩৮ (এ জাতটি অবশ্য বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে)।

খ. তোষা পাট

১. ও -৯৮৯৭ (0-9897)
২. বি জে আর ই তোষা পাট –৩

এ জাতগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির বৈশিষ্ট্য ডি-১৫৪ এবং ও-৪ জাতসহ সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো।[৪]

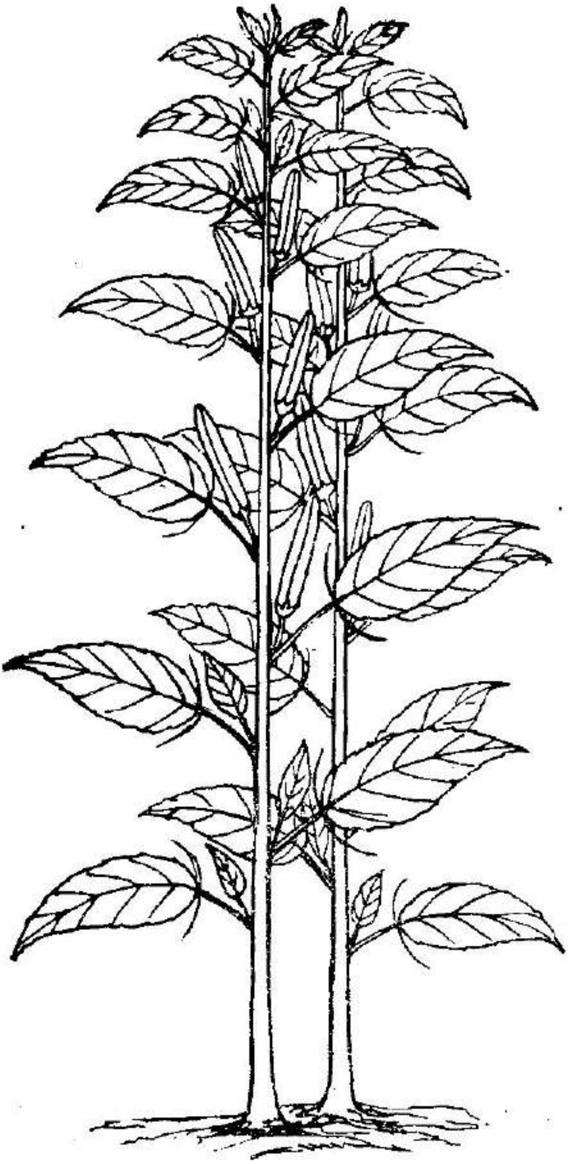

চিত্র : ১১.২ তোষা বা মিঠা পাট গাছ

সি ভি এল-১ (সবুজ পাট) : এ জাতের পাট গাছ পরিণত বয়সে প্রায় ৪.৯০ মিটার লম্বা হয়, গাছ সম্পূর্ণ সবুজ ও মোটা আকৃতির। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি থেকে সারা চৈত্র এ জাত বপনের উপযুক্ত সময় ; সাধারণত ১২৫–১৩৫ দিনে গাছে ফুল আসে। আঁশের জন্য উৎপাদিত ফসল ফুল আসার সময় বা প্রয়োজনে তার আগেও কেটে ফেলা যায় এবং সে জমিতে নাবী রোপা আমন ধানের চাষ করা যায়। ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাসম্পন্ন পাটের এ জাত অন্যান্য জাতের চেয়ে অধিক ফলনশীল। সময়মতো বীজ বপন ও প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করে এ পর্যন্ত এ জাতের ফলন হেক্টর প্রতি ৩.১৬ টন পাওয়া গেছে।

সি ভি ই-৩ (আশু পাট) : এ জাতটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অন্যান্য জাতের চেয়ে তা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক পরিবেশে ১০৫–১১০ দিনের মধ্যে গাছে ফুল ধরে। এর কাণ্ড সম্পূর্ণ সবুজ, পাতার বোটার উপর উজ্জ্বল তামাটে রং দেখা যায়, পরিণত বয়সে গাছের আগায়, শাখা-প্রশাখাও তামাটে রং দেখা দিতে পারে। চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সারা চৈত্র বীজ বপনের উপযুক্ত সময়, যথাসময়ে বপন করে উপযুক্ত পরিচর্যা করলে হেক্টর প্রতি ৪.৫১ টন আঁশের ফলন হতে পারে। এ জাতের পাট আগাম কাটা যায় বলে আশু আমন ধানের চাষ করা সম্ভব হয় এবং এটি আশু জাতের পাট বলে তে-ফসলা শস্যক্রমের জন্য সুবিধাজনক।

সি সি-৪৫ (জো-পাট) : দেশী জাতের পাটের মধ্যে এটিই একমাত্র অকাল ফুলমুক্ত ও দীর্ঘবপনকালীন জাত। ফাল্গুনের প্রথম থেকে চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এ জাত বপনের আসল সময়। তবে প্রয়োজন হলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত বপন করা যায়। এ জাত আশু বপন করে ও আশু কেটে একই জমিতে রোপা আমন ধানের পর বিভিন্ন রবি শস্য চাষ করে লাভবান হওয়া যায়, সুতরাং তে-ফসলার জন্য বেশ উপযোগী। সবুজ রঙের কাণ্ডবিশিষ্ট এ জাতের গাছ পরিণত বয়সে ৫.৫০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। উপযুক্ত পরিবেশে ও যত্নে এ জাতের সর্বোচ্চ ফলন ৫. ১৬ টন পর্যন্ত হতে দেখা গেছে।

ডি-১৫৪ : এ জাতের গাছের কাণ্ড সবুজ, পাতার বোটার উপবিভাগ ঘোলা তামাটে, অন্যান্য জাতের তুলনায় কাণ্ডের গোড়া অপেক্ষাকৃত মোটা। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি থেকে সারা চৈত্র মাস এ জাতের বীজ বপন করা যায় ; সাধারণত ১২০–১২৫ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে, আঁশের জন্য প্রয়োজনবোধে তার আগেও কেটে নাবী রোপা আমন ধানের চাষ করা যায়। এ জাতটির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে অন্যান্য পাটের জাতের তুলনায় এটি প্রতিকূল পরিবেশে ও অপেক্ষাকৃত কম পরিচর্যার বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যায় এ জাতটির আঁশের ফলন ৪.৮৯ টন পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

ও-৯৮৯৭ (ফাল্গুনী তোষা) : এক দশক আগে উদ্ভাবিত পাটের এ জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রচলিত তোষা পাট ও-৪ জাতের চেয়ে আগে অর্থাৎ দেশী জাতের পাট বপনের সময়ও বীজ বুনলে অকালে ফুল আসে না। এ জাতের গাছ ৬ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়; কাণ্ডের রঙ সম্পূর্ণ সবুজ, পাতা ও-৪ জাতের চেয়ে বেশি লম্বা ও চওড়া। আশু বপন করে ও কেটে একই জমিতে রোপা আমন ও রবি ফসলের আবাদ করা যায় বলে এ জাতের পাটের আবাদ করা সবচেয়ে লাভজনক। সঠিক সময়ে বীজ বুনে ও প্রয়োজনীয় যত্ন করে

১২০ দিনে পাট কেটেও প্রতি হেক্টরে ৪.৬১ টন ফলন পাওয়া যায়, ফুল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে উপযুক্ত পরিবেশে আরো অনেক বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব। অন্যান্য জাতের পাটের চেয়ে এ জাতের আঁশ অনেক উন্নত মানের ও সমাদৃত।

ও-৪ : এ জাতের পাট আবাদ করার জন্য প্লাবনমুক্ত উঁচু জমি বিশেষ উপযোগী। গাছের কাণ্ড সবুজ, পাতা যেমন লম্বা তেমন চওড়া। বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শেষ পর্যন্ত বপন করা যায়, বৈশাখের আগে বপন করলে গাছে অকালে ফুল আসে। সময়মতো বীজ বুনলে ১৩০-১৩৫ দিনে গাছে ফুল আসে ও কাটার উপযুক্ত হয়। এ জাতের পাটের আঁশ ফসল দেশী পাটের জাতের আঁশের চেয়ে সূক্ষ্ম ও শক্ত, তাই বাজারে তুলনামূলকভাবে দাম বেশি। সঠিক সময়ে বীজ বপন করলে ও উপযুক্ত পরিচর্যায় হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৫১ টন পর্যন্ত হতে পারে।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : পাটের জমি হাল্কা বলে বেশি চাষের প্রয়োজন হয় না। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দুই-এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় সাথে সাথে পাটের জমি আলাগা করা ভালো। তৎপর তাড়াতাড়ি ৩/৪ টি চাষ এবং দুই তিন বার মই দিয়ে খুব ভালোভাবে পাইট করে জমি প্রস্তুত করতে হয়। পাট গাছের শিকড় ৩০-৩১ সে: মি: এর অধিক মাটির নিচে প্রবেশ করতে পারে বলে পাটের জমি গভীরভাবে চাষ করা বাঞ্ছনীয়।

সার প্রয়োগ

নদ-নদীর চর এলাকায় যেসব অঞ্চলে প্রতি বৎসর প্লাবনের পানি আসে সে সমস্ত জমিতে সার প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন হয় না, কারণ সে রকম পলি-পড়া জমি স্বাভাবিকভাবেই খুব উর্বর। তবে প্লাবনমুক্ত অর্থাৎ উঁচু জমিতে পাট চাষের জন্য সার ব্যবহার করা আবশ্যক। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট যে পরিমাণ সার যেভাবে প্রয়োগ করার জন্য অনুমোদন করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।[৪]

১. ডি-১৫৪, সি ভি এল -১, সি সি-৪৫, সি ভি ই-৩, ও-৪ এবং ও-৯৮৯৭ জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ৪৬ কুইন্টাল পচা গোবর বীজ বপনের ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

২. বীজ বপনের দিন ফাল্গুনী তোষা জাত বাদে অন্যান্য জাতের বেলায় প্রতি হেক্টরে ৫ কেজি ইউরিয়া, ৭.৫০ কেজি টি. এস. পি এবং ১০ কেজি এম পি সার এবং ফাল্গুনী তোষার বেলায় ৫৫ কেজি ইউরিয়া, ৩২ কেজি টি. এস. পি এবং ৫৫ কেজি এম. পি সার একত্রে মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

৩. বীজ বপনের ৬-৭ সপ্তাহ পরে জমি নিড়ানি দিয়ে আগাছা মুক্ত করে ফাল্গুনী তোষা জাত বাদে অন্যান্য জাতের বেলায় হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া কিছু পরিমাণ শুকনা মাটির সাথে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে নিড়ানির সাহায্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপনের সময় ও পদ্ধতি : সঠিক সময়ে পাটের বীজ বপন করা অবশ্য কর্তব্য। অসময়ে অর্থাৎ আগে বা পরে বীজ বপন করলে পাট গাছ সুষ্ঠুরূপে বাড়তে পারে না। সময়ের আগে বপন করলে গাছে অসময়ে ফুল দেখা যায়, পরিণামে পাটের ফলন দারুণভাবে কমে যায়।

দেশী জাতের পাটের মধ্যে সি–১৫৪, সি ভি এল–১ ও সি. ভি ই তি চৈত্র মাসের ২য় সপ্তাহের পর থেকে সারা চৈত্র মাস এবং তোষা জাত ও–৪ বৈশাখ মাসের প্রথম থেকে সারা বৈশাখ মাসের মধ্যে বপন করতে হবে। দেশী পাটের জাত সি সি – ৪৫ ও তোষা জাত ফাল্গুনী তোষা অবস্থান ভেদে ফাল্গুনের একেবারে শেষে অথবা চৈত্রের প্রথম থেকে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত বপন করলেও আগাম ফুল আসার সম্ভাবনা থাকে না।[৪]

বাংলাদেশের চাষী সম্প্রদায় জমিতে ছিটিয়ে পাট বুনতেই অভ্যস্ত। কিন্তু তা না করে তারা যদি সারিতে বীজ বপন করেন তা হলে অনেক দিক দিয়ে উপকৃত হবেন। সারিতে বীজ বপন করার জন্য পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক যে সিড ড্রিল (seed drill) উদ্ভাবন করা হয়েছে তা পাটচাষীরা ব্যবহার করতে পারেন। সারিতে বীজ বপন করলে বীজের পরিমাণ কম লাগবে, আগাছা পরিষ্কার সহজতর হবে এবং প্রত্যেকটি গাছ সমান তালে বৃদ্ধি পাবে।

সারিতে (এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব ৩০.৫ সে: মি: এবং প্রতি সারিতে এক গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব ৫.০ সে: মি:) বীজ বপন করলে দেশী পাটের বীজ প্রতি হেক্টর ৬–৭ কেজি এবং তোষা পাটের বীজ ৩.৫–৪.৫ কেজির প্রয়োজন হবে। আর ছিটিয়ে বপন করলে প্রতি হেক্টর প্রথমোক্ত জাতের বেলায় ৮–১০ কেজি আর শেষোক্ত জাতের বেলায় ৬–৮ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে।[৪]

মাটি আলগা, আগাছা দমন ও চারাগাছ পাতলাকরণ : বীজ বপন করার পর পরই যদি দুই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যায় তা হলে মাটি চাপ বেধে যায়, ফলে বীজ গজাতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় 'জো' বুঝে মই অথবা আঁচড়া দিয়ে সেই চাপ ভেঙ্গে বীজ অঙ্কুরোদ্গমের পথ সুগম করে দিতে হয়।

পাটের জমিতে বীজ বপন করার ৩/৪ দিনের মধ্যেই চারা গজায়ে যায়। চারা গাছের বয়স ২০/৩০ দিন হলেই প্রথম বারের মতো আগাছা পরিষ্কারের কাজ করতে হয়। আগাছার মধ্যে মুথা, শ্যামা, দুর্বা প্রভৃতির প্রাধান্য থাকে। যে জমিতে ছিটিয়ে বীজ বপন করা হয় তেমন জমিতে আগাছা দমনের জন্য প্রথমে দুই একটি আঁচড়া দিতে হয়। আঁচড়া দেওয়ার পর দিন পর্যন্ত যদি কড়া রোদ থাকে তা হলে অধিকাংশ ঘাস মারা যায় এবং পরবর্তী সময়ে বাকি আগাছা নিড়ীর সাহায্যে দমন করা সহজতর হয়। চারা কোনো স্থানে ঘন থাকলে তা নিড়ির সময় উঠিয়ে ফেলতে হবে। আর যে জমিতে সারি করে বীজ বপন করা হয় সেক্ষেত্রে দুই সারির মাঝখানে উইডার (weeder) অর্থাৎ নিড়ানীযন্ত্র চালিয়ে অতি সহজেই আগাছা পরিষ্কার করা যায়। সারির মধ্যে গাছের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি থাকলে তা নিড়ানীর সাহায্যে কমিয়ে ফেলতে হবে।

পাটক্ষেতে আগাছা কোনো কোনো সময় দ্বিতীয়বারের মতো পরিষ্কার করতে হয়। এই সময় দ্বিতীয় বা শেষবারের মতো পাটের চারা পাতলা করে দিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাছ জমিতে রাখতে হয়। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে জমিতে পাট গাছ যেন বেশি পাতলা না করা হয়। কারণ তাতে একদিকে যেমন উৎপাদন কমে যাবে, অন্যদিকে আবার পাট গাছে শাখা-প্রশাখা গজানোর ফলে নিকৃষ্ট মানের আঁশ উৎপন্ন হবে।

কীটপতঙ্গ ও রোগ দমন : নানা প্রকার কীট-পতঙ্গ পাটের চারাকে আক্রমণ করে ফলন যথেষ্ট কমিয়ে ফলতে পারে। উরচুঙ্গা পাটের কচি চারা কেটে নষ্ট করে। অলড্রিন (Aldrin 40%) অথবা হেপ্টাক্লোর (Heptachlor) নামক ঔষধ ঝোলা গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে বিষাক্ত টোপ তৈরি করার পর সেগুলি মাঠে ছড়িয়ে রাখলে উরচুঙ্গা সেগুলি খেয়ে মারা যায়। শুয়া পোকা ও খোড়া পোকা পাট গাছের কচি পাতা ও ডগা খেয়ে বিষম ক্ষতি করতে পাড়ে। এই সবের স্ত্রী-জাতীয় পোকা পাতার নিচে গাদা করে ডিম পাড়ে। লক্ষ করে ডিমসহ পাতাগুলি তুলে নষ্ট করলে পোকার উপদ্রব অনেক কমে যায়। প্রতি বিঘার জন্য সেভিন (Sevin) নামক ঔষধ প্রতি ১২½ সের পানিতে দুই তোলা মিশায়ে পাট গাছের উপর ছিটিয়ে দিলে পোকা দমন হয়। সাদা ও লাল এই দুই জাতীয় মাকড়ই পাটের কচি পাতার রস খেয়ে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। টিডিয়ন নামক ঔষধ উপর্যুক্ত নিয়মে পানির সঙ্গে মিশিয়ে পাটক্ষেতে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

পাট ফসলে যে সমস্ত রোগের আক্রমণ হয় তন্মধ্যে কাণ্ডপচা (stem rot) রোগই বেশি মারাত্মক। এই রোগের আক্রমণের ফলে গোড়া ও শিকড় পচে যায় এবং কাণ্ডে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সেই ক্ষতস্থানে গাছগুলি ভেঙ্গে পড়ে। রোগ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রান্ত গাছগুলি উঠিয়ে ক্ষেতে রোগ নিবারণী ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি মণ পানিতে ৫ তোলা 'টু-জ্রেড' কিংবা ২½ তোলা 'ডাইথেন-এম ৪৫' গুলে ৩/৪ দিন অন্তর অন্তর ২/৩ বার জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। বাংলাদেশে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের আবিষ্কৃত ও অনুমোদিত ডি-১৫৪, মি. মি. -৪৫ এবং ও-৩ জাতের পাটে রোগের আক্রমণ হতে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়।

অন্যান্য পরিচর্যা : পাট গাছ ৩/৪ ফুট অর্থাৎ ১ মিটার লম্বা হবার পূর্বে জমিতে পানি দাঁড়ালে উহা দ্রুত বের করে দিতে হবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশী জাতের পাট দাঁড়ানো পানি বেশ সহ্য করতে পারে। কিন্তু তোষা পাট তা পারে না। সেইজন্য এই জাতের পাটে কোনো অবস্থাতেই পানি দাঁড়াতে দেওয়া উচিত নয়। সেহেতু প্রচলিত নিয়ম পাট চাষীরা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে দেশী বা সাদা পাট এবং উঁচু জমিতে তোষা পাটের চাষ করে থাকেন। নিচু জমিতে কোনো কোনো সময় নদীর পানি আকস্মিকভাবে ঢুকে যায়, সেই ক্ষেত্রে আর দেরি না করে পাট কেটে ফেলাই ভালো। ইহাতে ফলন কম হলেও আঁশের গুণাগুণ ভালো হয় বলে দাম বাজারে বেশি পাওয়া যায়। অন্যথায় অর্থাৎ দেরিতে কাটা পাটগাছ হতে নিকৃষ্ট মানের পাট উৎপন্ন হয়, বাজারে যার দাম বেশ কম হয়।

পাটের জমিতে স্থানে স্থানে বাঁশের আগা পুঁতে দেওয়া ভালো, তাতে পাখি মাঝে মাঝে আশ্রয় নিয়ে কীটপতঙ্গ ধরে খেতে পারে। গরু-বাছুর ও ছাগল হতে পাট ক্ষেত রক্ষা করা কর্তব্য। কারণ, পাটের ডগা খাওয়া গেলে গাছের বৃদ্ধি রহিত হয়ে যায় অথবা গাছে অনেক ডালপালা দেখা দেয়। এই অবস্থায় ফলন কমে যায় ও তা হতে নিকৃষ্ট মানের পাট উৎপন্ন হয়।

পাট কাটা : সঠিক সময়ে পাট কাটার উপর পাটের গুণাগুণ ও ফলন অনেকখানি নির্ভর করে। সেজন্য নির্দিষ্ট সময়ে পাট কাটা অবশ্য কর্তব্য। সাধারণভাবে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে দেশী পাট ও শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে তোষা পাট কাটতে হয়। পাট গাছে যখন ফুল ও ছোট

ছোট শুঁটি দেখা দেয় তখনই পাট কাটার উপযুক্ত সময়। সঠিক সময়ের আগে পাট কাটলে ফলন কমে যায় আর পরে কাটলে নিকৃষ্ট মানের আঁশ উৎপন্ন হয়।

পাটের জমিতে ছোট, বড় ও মাঝারি রকমের পাট জন্মে। পাট কেটে আঁটি বাঁধার আগে অন্তত ছোট পাটগাছগুলি আলাদাভাবে আগভাগেই কেটে নেয়া উচিত। ইহাতে পাট পচানো ও আঁশ লওয়ার কাজ সহজতর হয়।

পাট জাঁক দেওয়া : পাট কেটে আঁটি বাঁধা হয়। কোনো কোনো সময় কাটা পাট মাঠে ২/৩ দিন জাঁক দিয়ে পাতা ঝড়ায়ে আঁটি বাধা হয়। তৎপর আঁটি জলাশয়ে নিয়ে গেঁথে পানির নিচে ডুবান হয়। ইহাকে পাটের জাঁক দেওয়া বলে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে জাঁকের উপরে যেন ১ ফুট অর্থাৎ ৩০.৫ সে: মি: এবং নিচে ২ ফুট অর্থাৎ ৬১ সে: মি: পানি থাকে। যে জলাশয়ে মৃদু স্রোত থাকে এমন জলাশয়েই পাট জাঁক দেওয়া ভালো। তাতে পাটের আঁশ উন্নত মানের হয়। বদ্ধ পানিতে পাট জাঁক দিলে ইউরিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। ইহাতে প্রতি একশত আঁটির জন্য ১০ সের অর্থাৎ ৯$\frac{১}{৪}$ কেজি ইউরিয়া জাঁকের উপর ছিটিয়ে অথবা পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি পাট পচে এবং আঁশের রং ভালো হয়।[৪]

পাটের জাঁক ডুবাতে গিয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ চাষী জাঁকের উপর কাদামাটি, কলাগাছ, জিগা প্রভৃতি গাছ ব্যবহার করে। ফলে আঁশের রং খারাপ হয়। এইক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ হচ্ছে যে জাঁকের দুই পাশে খুটি পুঁতে তাতে রশি বেঁধে জাঁক ডুবাতে হয়। এই ব্যবস্থায় জাঁক ডুবাবার জন্য কোনো রকম ওজনের প্রয়োজন হয় না। তবে কচুরীপানার সাহায্যে পাটের জাঁক ডুবালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

পাটের আঁশ ছাড়ানো : জাঁকের পাট ঠিক মতো পচে উঠলে আঁশ ছাড়িয়ে নিতে হয়। উৎকৃষ্ট আঁশ পাওয়ার জন্য ইহাও একটি অন্যতম উপায়। জাঁক দেওয়ার ৮/১০ দিন পর হতেই দুই এক দিন অন্তর অন্তর এক মুঠা করে পাট জাঁক হতে উঠিয়ে আঁশ ছাড়াতে হয়। সেদিন দেখা যাবে আঁশ পাটকাঠি হতে সহজেই খুলে আসে এবং ধৌত করলে অল্প আয়াসেই ময়লা পরিষ্কার হয়ে আঁশ উজ্জ্বল বর্ণের দেখায় তখনই বুঝতে হবে পাট লওয়ার সময় হয়েছে। সাধারণভাবে ধরে লওয়া যায় গরম আবহওয়ায় ১২/১৪ দিন ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ২০/২৫ দিনের মধ্যে পাটের জাঁক আসে। পাট সঠিকভাবে পচার সঙ্গে সঙ্গে আঁশ ছাড়ায়ে নিতে হয়। এই সময় চাষীকে অপেক্ষাকৃত বেশি শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। তাই কখনো কখনো চাষী পরিবারের ছেলেমেয়ে, বউ সবাই পাটে আঁশ ছাড়ানোর কাজে লেগে যায়, পাছে দেরিতে পাটের আঁশ পচে যায়।

পাট ধৌত করা ও শুকানো : পরিষ্কার পানিতে পাটের আঁশ আঁছড়িয়ে ধৌত করতে হয়। আবদ্ধ জলাশয় হতে নদীতে বা বিলে পাট ধৌত করা ভালো। পাট চাষের সময় বাংলাদেশে প্রচুর পানি মিললেও অনেক চাষী এমন অপরিষ্কার পানিতে পাট পচায় ও ধৌত করে যার জন্য অনেক পরিমাণ পাট অতি নিম্নমানের হয়। এই অবস্থায় উন্নতি করতে পারলে অর্থাৎ চাষীরা যদি পরিষ্কার নির্মল পানিতে পাট জাঁক দিতে ও আঁশ ধৌত করতে পারত তা হলে বাংলাদেশে নিবিড় পাট চাষের মাধ্যমে এক বিরাট কার্য সমাধা হতো।

আঁশ ধৌত করার পর ভালোভাবে শুকানো প্রয়োজন। বাঁশের আঁড়ায় পাট শুকাতে হয়। পর পর কয়েক দিন রৌদ্রে দিলেই পাট শুকিয়ে যায়। পাট ভিজা থাকলে খুব ক্ষতি হয়— আঁশ নরম ও অনুজ্জ্বল হয়। তাতে দেশে ও বিদেশে পাটের দাম কম হয়। তৎজন্য পাট খুব ভালোভাবে শুকানো দরকার

পাটের ফলন : উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে দেশী পাটের ফলন হেক্টর প্রতি ৯ বেল তোষা পাটের ফলন ১৩.৩৫ বেল হতে পারে। তবে পাটের গড়পড়তা ফলন হেক্টর প্রতি ৪–৫ বেল।

পাটের ব্যবহার : পাটের তন্তুজাত চট হতে যে থলে উৎপন্ন হয় তা কৃষিজাত পণ্য হতে আরম্ভ করে শিল্পজাত পণ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে পরম উপকারী বস্তু বলে সারা বিশ্বে স্বীকৃত ও সমাদৃত। এই হিসেবে ইহা যেন তুলনাবিহীন, কারণ ইহা অনেক বেশি টেকসই, সহজে নষ্ট হয় না ; আবার সহজে মেরামতও করা যায়। প্রতিকূল পরিবেশে চোটপাটও সামলাইতে পারে অনায়াসে। শহরে বন্দরে ও বাজারে হুক পেরেক, বোমা (seed trier) ইত্যাদির দ্বারা ছিদ্র করা হইলেও আপনা আপনিই ছিদ্রটা পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। তদুপরি সচ্ছিদ্র বলে ভিতরকার পচনশীল কাচামাল বাতাসের সংস্পর্শে আসার দরুন অবিকৃত থাকে।

থলে প্রস্তুত করা ছাড়া আঁশের শত শত রকমের ব্যবহার রয়েছে যেমন— দড়ি, কাছি, কাপড়, গালিচা, কৃত্রিম পশম ইত্যাদি পাট হতে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

পাটকাঠি একটি ভালো জ্বালানি, চাষীরা তাদের ঘর ও খেতের বেড়া প্রস্তুতের জন্য কিছু কিছু পাট কাঠি ব্যবহার করে থাকেন। বাংলাদেশের পরলোকগত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই খুদার তত্ত্বাবধানে ঢাকাস্থ শিল্প গবেষণাগারে কয়েক বৎসর ধরে যে গবেষণা হয় তাতে জানা গিয়েছে যে পাট কাঠি দিয়ে বেশ সস্তায় উৎকৃষ্ট মানের কাগজ, হার্ডবোর্ড এবং কাঠের অন্যান্য বিকল্প তৈয়ার করা যায়। অন্যান্য কিছু প্রস্তুত না হলেও পাট কাঠির উপকরণজাত পারটেক্স (Partex) বাজারে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে।

পাটের বীজে এক রকম তৈল, প্রোটিন ও তিক্ত অংশ আছে। এইসব উপাদানের আশাপূর্ণ ভবিষ্যৎ আছে বলে মনে হয়। পর্যাপ্ত গবেষণার মাধ্যমে এই আশাকে কোনোদিন হয়ত বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

মেস্টা ও কেনাফ
(Mesta / Kenaf)

পাটজাতীয় আঁশ (jute-like fibres) উৎপাদনকারীর শস্য হিসেবে পাটের পরেই মেস্টা / কেনাফের স্থান। মেস্টা ভারতে 'গোগু' বা 'পাটোয়া নামে অভিহিত।[৫] আহম্মদের[৬] উদ্ধৃতিতে দেখা যায় আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থার (FAO) ১৯৭৬ সালের প্রতিবেদন অনুসারে সারা বিশ্বে ১৫.৯৯ লক্ষ টন মেস্টা উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে চীন উৎপন্ন করে ৯০০০০০ মে: টন, থ্যাইল্যান্ড

৩০০০০০ মে: টন, ভারত ২৩০০০০ মে: টন, ব্রাজিল ৪২৭০০ মে: টন, সোভিয়েট রাশিয়া ৪০০০০ মে: টন, এবং বাংলাদেশ ২০০০০ মে: টন।

আবাদি এলাকা ও উৎপাদনের দিক হতে বাংলাদেশে পাটের পরেই মেস্টার স্থান ১৯৭৯–৮০ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সারাদেশে ২৪৫৩০ একর অর্থাৎ ৯৯৩০ হেক্টর জমিতে মেস্টার চাষ হয় এবং উৎপন্ন হয় ৭২০০০ মে: টন মেস্টা।[১২] বাংলাদেশের বাজারে পাটের তুলনায় মেস্টার চাহিদা অনেক কম হলেও কতকগুলি কারণে কোনো কোনো চাষী মেস্টার চাষে উৎসাহ দেখান। সেই কারণগুলি হচ্ছে :

১. মেস্টা যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু বলে অনুর্বর বেলে জমিতেও জন্মাতে সক্ষম।
২. আগাছার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে বলে ইহার চাষে চাষীরা আগাছা পরিষ্কারের কাজে হাত দেয় না।
৩. মোটের উপর ইহা সহজে ও অল্প খরচে জন্মানো যায়।
৪. প্রতি হেক্টরে প্রায় পাটের সমান আঁশ উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

মেস্টা ও কেনাফ উভয়েই Malvaceae পরিবার ও Hibiscus 'জেনাসের' (Jenus) অন্তর্ভুক্ত। মেস্টার বৈজ্ঞানিক নাম Hebiscus Cannabinus L. এবং কেনাফের Hibiscus saldarifa L. var. attissima বাংলাদেশে প্রথমটি অর্থাৎ মেস্টা দেশী মেস্টা এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কেনাফ বিলাতি মেস্তা বলিয়া পরিচিত।* উভয় প্রকার গাছই পাট গাছের মতো দণ্ডাকার ও ডালপালাবিহীন, তবে উচ্চতায় পাটের চাইতেও লম্বা অর্থাৎ ১২-১৯ ফুট অর্থাৎ ৪–৬ মিটার হয় (চিত্র ১১.৩ এবং ১১.৪) গাছের পাতা ও ফুল অনেকটা ঢেড়শের মতো ; ফলের উপরে লাল রংয়ের বৃত্তাংশ (sepala) বেশ পুরু, রসাল ও কিঞ্চিৎ অম্লাত্মক। কেউ কেউ ফলের এই অংশ দ্বারা চাটনি বা জেলি (Jelly) প্রস্তুত করে থাকে।

বাংলাদেশে চাষীদের হাতে মেস্টা কেনাফের অনেক জাত আছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণাগারের বিজ্ঞানীগণ সেই সমস্ত জাত নিয়ে পরীক্ষা–নীরিক্ষার পর মেস্টার একটি এবং কেনাফের একটি করে ভালো জাত নির্বাচন করেছেন যা জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে। মেস্টার জাতটি হলো টানি মেস্টা–১ (Mesta S-24) এবং কেনাফের জলী কেনাফ–১ (Kenaf C-2)।

মেস্টার চাষাবাদ পদ্ধতি

ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া ও যশোহর জেলার উঁচু সুনিষ্কাশনযুক্ত জমিতে মেস্টা ভালো জন্মে। তবে অন্যান্য জেলাতেও যে অঞ্চলে তোষা পাট জন্মে সে অঞ্চলের টান জমিতেও মেস্টার আবাদ করা চলে।

---

* পাট গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের একটি প্রতিবেদন অবলম্বনে

জমি প্রস্তুতি : হাল্কা বেলে বা পলি-দোঁয়াশ জমিতে মেস্টার চাষ করা হয় বলে তত চাষবাসের প্রয়োজন হয় না। ৩টি চাষ ও গোটা দুই মই দিয়েই জমি প্রস্তুতের কাজ শেষ করা যায়।

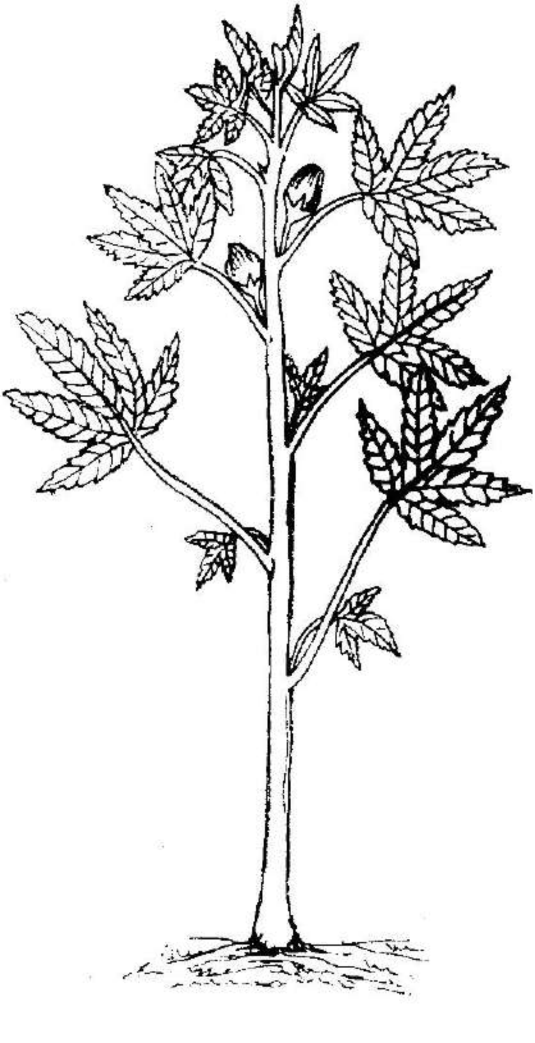

চিত্র ১১.৩ : মেস্টা পাট গাছ

বীজ বপন : মৌসুমের প্রথম বর্ষণের পর পরই বীজ বপন করা যায়। চাষীরা সাধারণত বীজ ছিটিয়ে বপন করে। উন্নত পদ্ধতির নিয়ম অনুসারে বীজ সারি করে বপন করতে হয়। একটি দেশী লাঙ্গলের অথবা হ্যান্ড হো'র সাহায্যে ৩০ সে. মি. দূরে দূরে সারি করে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের পর সারি বা লাইনগুলির উপর ভালোভাবে মাটি চাপা দিতে হয় যাতে বীজ মাটির ১.২৫ সে. মি. নিচে পড়ে।

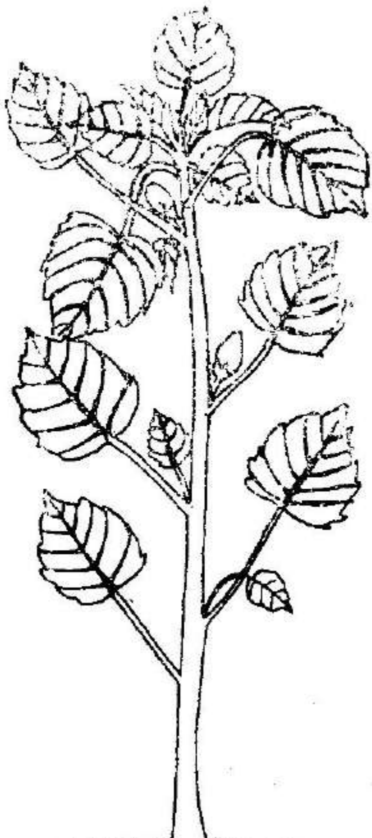

চিত্র ১১.৪ কেনাফ পাট গাছ

ছিটিয়ে বীজ বপন করলে প্রতি হেক্টর প্রতি ১৪-১৮.৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। সারি করে বপন করলে ইহার চাইতে কম বীজ লাগে। কখনো কখনো আউশ ধানের সঙ্গে

মিশ্র ফসল হিসেবে মেস্টার চাষ করা হয়। সেই ক্ষেত্রে একর প্রতি ২৫ সের অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৫৮ কেজি ধান ও ৬ সের বা ১৪ কেজি মেস্টা বীজ ছিটিয়ে বোনতে হয়। সময়ান্তরে ধান পাকলে কেটে নেয়া হয়, তৎপর কাটার উপযুক্ত সময়ে মেস্টা কাটা হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা : পাটের জমির মতো মেস্টার জমিতেও যথেষ্ট আগাছা জন্মে। আগেই বলা হয়েছে মেস্টার জমিতে চাষীরা আগাছা পরিষ্কারের প্রয়োজন মনে করে না, তবে একবার অন্তত আগাছা পরিষ্কার করে দিলে ফলন ভালো হয়।

এইরূপ প্রথম নিড়ানীর পর জমিতে একর প্রতি ২২ সের অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৫১ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিতে হয়। এই নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের পর পরই দেখা যাবে মেস্টার বৃদ্ধি হচ্ছে। পুনরায় দেড় মাসের মধ্যে পূর্ব হারে অর্থাৎ প্রতি হেক্টর ৫১ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ইহার আগে দ্বিতীয়বারের মতো আগাছা পরিষ্কার করে নেয়া ভালো।

ফসল কাটা : গাছে যখন ফল ধরে তখনই মেস্টা কাটার সময়, তবে মেস্টার পর সেই জমিতে যদি কোনো রবি ফসল করার ইচ্ছা থাকে তা হলে আরো কিছু আগে অর্থাৎ গাছে ফুল ধরলেই মেস্টা কাটতে হয়। হাসুয়া বা কাস্তের সাহায্যে গাছ কেটে পাটের আঁটির মতো ছোট ছোট আঁটি বেঁধে নিতে হয়।

আঁটি জাঁক দেওয়া, আঁশ লওয়া ও শুস্ককরণ : আঁটিগুলি ৩/৪ দিন মাঠে স্তূপ করে রেখে পাতা ঝরানোর পর পাটের মতো হাওড়, বাওড় বা বিলের পরিষ্কার পানিতে জাঁক দিতে হয়, জাঁক দেওয়ার ২০–২৫ দিনের মধ্যে গাছ পচে উঠে অর্থাৎ আঁশ ছাড়াবার উপযোগী হয়। একটির পর একটি আঁটি শুকনায় উঠিয়ে অথবা পানির মধ্যে ভাসমান মাচানের উপর রেখে পাটের মতো আঁশ ছাড়িয়ে নিতে হয়। তৎপর পরিষ্কার পানিতে ভালোভাবে ধরে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয়।

এক্ষণে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে মেস্টা পচানোর জন্য যদি তাৎক্ষণিক পানির অভাব হয় তা হলে গাছগুলি রৌদ্রে শুকিয়ে রেখে দেওয়া যায়। যেইমাত্র আবার খালে–বিলে পানি পাওয়া যাবে তখন সেগুলি পচানোর জন্য জাঁক দিতে হবে। ইহাতে আগের ন্যায় মেস্টা পচবে এবং আঁশ ছাড়ানোর উপযোগী হবে। এইরূপ ব্যবস্থায় আঁশের গুণাগুণের কোনোরূপ ক্ষতি হবে না।*

ফলন : মেস্টার গড় ফলন একর প্রতি ১৪/১৫ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ১৩০০–১৪০০ কেজি। তবে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে হেক্টর প্রতি ৩২০০–৩৪০০ কেজি আঁশ উৎপাদিত হতে পারে। মেস্টার আঁশ আপাতদৃষ্টিতে পাটের আঁশের চাইতে বেশ ভালো দেখায়। উজ্জ্বল সাদা রংয়ের ও লম্বা আঁশযুক্ত কিন্তু আঁশ মোটা এবং তাতে 'টুইস্ট (Twist)' কম অর্থাৎ ভালো বয়নের উপযোগী নয়।

কেনাফের চাষ

কেনাফের চাষ মেস্টার অনুরূপ, তবে মেস্টা যেমন উঁচু জমির উপযোগী সেইক্ষেত্রে কেনাফ নিচু জমির উপযোগী। ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ,

---

* বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি প্রতিবেদন অবলম্বনে

যশোহর জেলার নাড়াইল, উত্তর-পূর্ব খুলনা, উত্তর বাকেরগঞ্জ এবং রংপুর জেলার এইরূপ নিচু পলি মাটিতে কেনাফের চাষ হয়।

জমি প্রস্তুতি ও বীজ বপন : দুই তিনটি মই দিলেই জমি প্রস্তুতের কাজ শেষ হয়ে যায়। মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিতেই ১ চৈত্র হতে ৩০ চৈত্রের মধ্যে বীজ বপন করে ফেলা ভালো। সারিতে বীজ বপন করা বাঞ্ছিত— এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব হবে ১ ফুট বা ৩০ সে: মি.। ইহাতে একর প্রতি ৪-৫ সের অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৯-১১.৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। ছিটিয়ে বীজ বুনেও কেনাফের চাষ করা যাবে। ইহাতে বীজের পরিমাণ কিছু বেশি অর্থাৎ একর প্রতি ৬-৮ সের বীজ লাগবে।

পরবর্তী পরিচর্যা ও সার প্রয়োগ : চারা সারিতে ঘন হয়ে জন্মিতে পারে। আগাছা পরিষ্কারের সময় (চারা যখন ৩-৪ ই: হবে) প্রতি তিন ই: অর্থাৎ ৭.৫ সে. মি. দূরে দূরে চারা রেখে বাকিগুলো কেটে দিতে হবে। এই প্রথমবার আগাছা পরিষ্কারের পর জমিতে একর প্রতি ২২ সের অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৫১ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম নিড়ানীর এক হতে দেড় মাস পর দ্বিতীয় বারের মতো নিড়ানী দিলে ভালো হয় যদিও চাষীরা এইরূপ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার নিড়ানী দিতে খুবই নারাজ। দ্বিতীয় নিড়ানীর পর পুনরায় একর প্রতি ২২ সের হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল কাটা, জাঁক দেওয়া ও আঁশ ছাড়ানো : গাছে ফুল ফুটতে শুরু হলেই বুঝতে হবে ফসল কাটার সময় হয়েছে। কাটার পর মেস্টার ন্যায় কেনাফ পচায়ে আঁশ সংগ্রহ করতে হবে। উল্লেখ্য যে মেস্টার চেয়ে কেনাফ ৪/৫ দিন আগে অর্থাৎ জাঁক দেওয়ার ১৫-২০ দিনের মধ্যে পচে উঠে। আঁশ পাটের ন্যায় ছড়িয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে পর পর কয়েক দিন রৌদ্রে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

ফলন : কেনাফের ফলন মেস্টার অনুরূপ।

তুলা

সভ্য দুনিয়ার মানব জাতির জন্য খাদ্যের পরই বস্ত্রের স্থান। এই বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য যে সুতার প্রয়োজন হয় তা প্রধানত তুলা হতেই উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে তুলার চাষ তুলনামূলকভাবে খুবই নগণ্য ; খুব সীমিত এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীয়া অধিবাসীরা তুলার চাষ করে থাকে। ইহা ছাড়া তুলা উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে যশোহর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হচ্ছে। অথচ এমন একদিন ছিল যখন এদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে অত্যন্ত উন্নত মানের তুলা উৎপন্ন হতো যা দ্বারা ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'সমলিন' কাপড় প্রস্তুত হতো। কিন্তু কালের অভিশাপে ব্রিটিশ বেনিয়াদের কারসাজিতে এদেশ হতে শুধু কিংবদন্তির মসলিনই লোপ পায় নি, লোপ পেয়েছে তুলা চাষ।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৩টি তুলার কলে বছরে প্রায় ৩.২০ লক্ষ বেল মাঝারি ও লম্বা আঁশযুক্ত তুলার দরকার। যার প্রায় ৮৫% বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় আর এজন্য সরকারকে যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়।[৩]

এইরূপ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার গভীরভাবে উপলব্ধি ও চিন্তা করেছে যে এই দেশে উন্নতমানের তুলা উৎপাদন সম্ভব কী না। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা 'তুলা উন্নয়ন বোর্ডকে' এই ব্যাপারে দেশের সম্ভাব্য এলাকায় তুলা উৎপাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭৫-৭৬ সাল হতে তুলার উৎপাদনমূলক এই কাজে হাত দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৭-৭৮ সাল হতে ৩০০০ একর অর্থাৎ ১২১৪ হেক্টর জমিতে তুলা উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশে উন্নত জাতের তুলা চাষের যাত্রা শুরু হয়। তৎপর প্রতি বৎসর এই ফসলটির উৎপাদন এলাকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক হিসাবে[১২] দেখা যায় ১৯৮০-৮১ সালে বাংলাদেশে ১৮,৭৭০ একর অর্থাৎ ৭৬৪০ হেক্টর জমিতে উন্নত মানের তুলা হয় এবং তাতে উৎপন্ন হয় ৯৭৭০ বেল তুলা। নব্বইয়ের দশকে ১৯৯৩-৯৪ সালে এই উৎপাদন এলাকা ৩,১২০০ হেক্টরে দাঁড়ায় আর সে উৎপাদন এলাকা হতে উৎপন্ন হয় ৭৯০০০ বেল তুলা।[৮]

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

তুলা বিশ্বের কোথায় প্রথম উৎপত্তি লাভ করে তা নিয়ে যথেষ্ট মতোভেদ আছে। জানা গিয়েছে দূরপ্রাচ্যের পৌরাণিক কাহিনীতে তুলাকে "উদ্ভিদ মেষ-শাবক" (vegetable lambs) নামে অভিহিত করা হতো। যিশুর জন্মের বহু শতাব্দী আগে প্রাচীন মিশরীয়েরা তুলার চাষ করত। খ্রিস্টপূর্ব ৫০২ সালের দিকে চীনের লোকেরা তুলার কথা জানত বলে মনে হয়। আবার কেউ কেউ মনে করে ভারতীয়রাই প্রথম কার্পাস হতে সুতা কাটে ও কাপড় বুনে। আজটেক্ রেড ইন্ডিয়ানদের প্রাচীন নিদর্শন হতে বোঝা যায় যে মেক্সিকোর লোকেরা কার্পাস তুলার কাপড় বুনায় সুদক্ষ শিল্পী ছিল।[২]

এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে বিশ্বের দুটি কেন্দ্রে আলাদা আলাদাভাবে তুলার উৎপত্তি হয়। ইন্দোচীন, ভারত ও আফ্রিকা মহাদেশের নিরক্ষীয় অঞ্চল একটি কেন্দ্র এবং দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা অপর একটি কেন্দ্র।

আজকাল বিশ্বে তুলা উৎপাদনে [illegible] যুক্তরাষ্ট্র এক বিরাট স্থান [illegible] আছে। সমগ্র বিশ্বের উৎপাদিত তুলার মধ্যে শতকরা [illegible] যুক্তরাষ্ট্রের পর পরই [illegible] রেখার উভয় দিকে [illegible] ভারত, ইরান, ইরাক, [illegible] ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়।

মাটি

একথা সুবিদিত যে ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকায় প্রচুর তুলা জন্মে। এই কথার অর্থ এঁটেল মাটি তুলা চাষে সুপোযোগী। তবে বেলে মাটিতেও তুলার চাষ করা যায়। কিন্তু বেলে-দোঁয়াশ ও এঁটেল মাটির মিশ্রণে সৃষ্ট এক প্রকার মাটি যাতে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ, মাঝারি পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ থাকে তাতে তুলা খুব ভালো জন্মে। ক্ষারাত্মক মাটির চাইতে অম্লাত্মক মাটিই তুলার জন্য শ্রেয়।[৯]

জলবায়ু

তুলা নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফসল বলে গরম ও কিছু আর্দ্র আবহাওয়া তুলা চাষের জন্য উপযোগী, তবে তুলা উঠাবার সময় কুয়াশা ও মেঘযুক্ত আকাশ থাকাই বাঞ্ছনীয়। সারা মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম-বেশি হলে বাৎসরিক সর্বনিম্ন ২০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫০৮ মি. মি. ও সর্বোচ্চ

৭৫ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৯০৫ মি. মি. বৃষ্টিপাতও তুলা উৎপাদনের সহায়ক হয়। সেচের সুবিধা থাকলে ৫০৭ মি. মি. কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলেও তুলার চাষ করা যেতে পারে। ১০–১৫° সে. বাৎসরিক তাপমাত্রা তুলা চাষের জন্য উপযোগী।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

তুলা Malvaceae পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium harbaceum।

চিত্র ১১.৫ : তুলা গাছ

তুলাকে বর্ষজীবী গাছ হিসেবে গণ্য করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বহুবর্ষজীবী গাছজাতীয় তুলা শস্য (Tree cotton) যা বাংলাদেশে দেখা যায় তা সব সময়ই বহুবর্ষজীবী। সাধারণ তুলা গাছ সবুজ পত্র সন্নিবেশিত মধ্যস্থিত কাণ্ড হতে ডালপালায় বিস্তৃত প্রায় ১ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট উদ্ভিদ (চিত্র ১১.৫)

ইহার ফুল সাদা অথবা গোলাপি ফলকে সাধারণ ভাষায় কলা (bowl) বলা হয়। পরিপক্ক হলে ইহা ফেটে তুলা বের হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ভারত, রাশিয়া প্রভৃতি হতে অনেক জাতের মাঝারি ও লম্বা আঁশযুক্ত তুলার বীজ এদেশে আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের তুলা গবেষণা শাখা এই সমস্ত তুলার জাত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর কতকগুলি জাত বাংলাদেশে উৎপাদনের উপযোগী বলে মতামত দিয়েছে যা জাতীয় বীজবোর্ডের অনুমোদন লাভে সমর্থ হয়েছে। সেই জাতগুলি হচ্ছে রংপুর, দিনাজপুর, যশোহর ও কুষ্টিয়া জেলার জন্য ডি-৫, ডি-১০, ডি-পি-ওয়াই এবং ঢাকা, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার জন্য ডি-১২৪ ও ডেফ-১। এরপর আরো দুটি তুলার জাত রূপালি এবং আভা উদ্ভাবিত হয়েছে যা যথাক্রমে ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে।[১১]

চাষাবাদ প্রণালি

জমি প্রস্তুতি : বাংলাদেশে সম্ভাব্য ৩.৭০ লক্ষ হেক্টর তুলা-জমির মধ্যে তুলা পর্যালোচনা কমিটির মতে ২.৪০ হেক্টর তুলা চাষের জন্য খুব উপযোগী। এই জমি দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোহর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় অবস্থিত।

পূর্ববর্তী ফসল ধান বা তোষা পাট উঠার পর পরই 'জো' মতো জমিতে প্রথম চাষ দিতে হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে তুলার জমি প্রস্তুত করতে হয় বলে 'জো' পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। কাজেই 'জো' পাওয়া গেলে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ ৪/৫টি চাষ ও গোটা দুই মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি প্রস্তুতির কাজ শেষ করতে হবে।

সার প্রয়োগ : তুলা চাষে জৈব ও অজৈব এ দু প্রকার সারই ব্যবহার করার প্রয়োজন রয়েছে। জৈব সারের মধ্যে গোবর, আবর্জনা সার এবং সবুজ সারের যে কোনো একটি প্রতি হেক্টরে ৫-৬ টন প্রয়োগ করতে হবে। এ সার ব্যবহার করার ফলে অপ্রধান পুষ্টি, যেমন বোরণ, জিংক, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতির ঘাটতি কিছুটা কমে যায়। তুলা জমির প্রথম চাষের আগে জৈব সার যেমন গোবর বা আবর্জনা পচা সার ছিটিয়ে দিয়ে চাষ মইয়ের সাহায্যে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

জমির মাটি যদি অম্লাত্মক হয়, তবে অম্লমান জেনে প্রতি হেক্টরে ২-৪ টন পর্যন্ত চুন প্রয়োগ করলে তুলার ফলন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়। লাল মৃত্তিকাঞ্চলে যেখানে অম্লমান ৩-৫ এর মধ্যে তাকে সেখানে চুন অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে।

তুলা আবাদ করে উচ্চ ফলন পেতে হলে প্রতি হেক্টরে রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নরূপ হবে।[৩]

সারের নাম	প্রয়োগ মাত্রা (কেজিতে)
ইউরিয়া	২০০–২৫০
টি এস পি	১৫০–১৭৫
এম পি	১০০–১৫০
জিপসাম	১০০–১২৫
বোরাক্স (প্রয়োজন হলে)	১০–১২

উপরোক্ত সার ছাড়াও প্রয়োজনবোধে প্রতি হেক্টরে ২০–২৫ কেজি ম্যাগনেসিয়াম এবং ১০–১২ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে অনুমোদিত মাত্রায় সবটুকু টি এস পি, এম পি এবং জিপসাম ছিটিয়ে দিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অন্যদিকে মোট পরিমাণ ইউরিয়ার ১/৪ ভাগ বীজ বপনের ঠিক আগে সারিতে প্রয়োগ করতে হবে, এ সময় সাবধানে থাকতে হবে যেন ইউরিয়া সার বীজের সংস্পর্শে না আসে। বাকি ৩/৪ ভাগ ইউরিয়া ফেলে মাটির ক্ষেত্রে সমান ৩ ভাগে বিভক্ত করে পার্শ্বপ্রয়োগ করতে হবে। তুলা গাছের বয়স ২০–২৫ দিন হলে ১ম পার্শ্বপ্রয়োগ, ৪০–৫০ দিনে ২য় পার্শ্বপ্রয়োগ ও ৬০–৭০ দিনে ৩য় পার্শ্বপ্রয়োগ করতে হবে। বেলে বা হাল্কা মাটির বেলায় এ নিয়মে ইউরিয়া সার ব্যবহার করা বিধেয়, কিন্তু মাটি এঁটেল বা ভারি ধরনের হলে সে পরিস্থিতিতে উক্ত ইউরিয়া সার সমান ২ ভাগে ভাগ করে ১ম ভাগ গাছের ২০–২৫ দিন বয়সে এবং ২য় ভাগ ৫০–৬০ দিন বয়সে প্রয়োগ করলেই চলবে। ইউরিয়া পার্শ্বপ্রয়োগের সময় প্রতিবারই সারির দু'পাশে ছিটিয়ে দিয়ে মাটি আলগা করে সার মাটির সাথে ভালোভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ইউরিয়া প্রয়োগের সময় মাটিতে সঠিক পরিমাণে রস থাকে, তা না হলে সার গাছের কোনো কাজে আসবে না।

বীজ বপন : তুলা বাংলাদেশে খরিপ ও রবি– এই দুই মৌসুমে চাষ করা গেলেও পূর্বোক্ত সময়ে অর্থাৎ খরিপ মৌসুমে লাভজনকভাবে চাষ করা যায় না। কারণ, সেই সময় চাষ করলে তুলা উঠতে ১০–১১ মাস অর্থাৎ প্রায় ১ বৎসর সময় লাগে, পোকামাকড়ের উপদ্রবে ফলন কম হয় এবং বৎসরে অন্য আর কোনো ফসল করা যায় না। এই হেতু রবি মৌসুমেই এদেশে তুলা চাষের জন্য উপযুক্ত সময়। শ্রাবণের মাঝামাঝি হতে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ বপন করার উত্তম সময়। দেশের উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টি আগে উঠে যায় বলে। রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলাগুলিতে উপরোক্ত সময়ে অর্থাৎ শ্রাবণের মাঝামাঝি হতে ভাদ্রের মাঝামাঝি এবং ঢাকা, টাঙ্গাইল, যশোহর প্রভৃতি জেলাগুলিতে ভাদ্রের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত বীজ বপন করা যেতে পারে। তবে 'জো' পেলে এই অঞ্চলেও প্রথমোক্ত সময়ে বীজ বপন করা সুবিবেচনার কাজ হবে। দেরি করে বীজ বপন করলেও ভালো হয় না। বীজ বপন করার আগে সেগুলির গায়ে লেগে থাকা তুলা পরিষ্কার করে নিতে হয়। তা না থাকলে বীজ গায়ে গায়ে লেগে থাকে বলে বপন করতে অসুবিধা হয় এবং অঙ্কুরোদগমেরও খুব বাধাপ্রাপ্ত হয়। বীজ পরিষ্কার করতে হলে সেগুলি বপনের আগে ৩/৪ ঘণ্টা সময় পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে নিংড়িয়ে রাখতে হয়। তৎপর সামান্য শুকনা গোবর ও বালি মিশিয়ে বীজগুলি কোনো শক্ত অমসৃণ বস্তুর উপরিভাগে ঘসলে বীজের গায়ে লেগে থাকা আঁশ খুলে আসে। ইহাতে বীজগুলি পরস্পর হতে আলাদা হয় এবং বপন করতে তখন আর কোনো অসুবিধা হয় না।

এ ছাড়া সালফিউরিক এসিড দিয়ে বীজ আঁশমুক্ত করা যায়, অধিকন্তু তাতে বীজের গায়ে লেগে থাকা রোগ জীবাণু ও পোকার ডিম নষ্ট করা যায়।

একরে ৮–০ সের অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ১৮.৫–২৩ কেজি বীজ বপন করতে হয়। সারিতে বীজ বপন করা বিধেয়। এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব রাখতে হয় ২ ফুট অর্থাৎ ৬১ সে. মি. এবং এক গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব ৯–১২ ইঞ্চি অর্থাৎ ২৩–৩০.৫ সে.মি.। সারির মধ্যে বীজ ২.৫৪ সে. মি. গভীরতায় বপন করতে হয়। গভীরতা ইহার বেশি হলে বৃষ্টি-বাদলার দিনে বীজ অঙ্কুরিত হবার আগেই পচে যেতে পারে আর গভীরতা স্বল্প হলে বীজ বৃষ্টির ফোটার আঘাতে মাটির বাইরে চলে এসে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

জমিতে ভালো রস থাকলে তুলাবীজ ৪/৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। নানা কারণে, যেমন— রসের অভাব, অতি বৃষ্টি বা রোগের আক্রমণে কোনো কোনো সময় অনেক বীজ নাও গজাতে পারে। এইজন্য বপনের সময় প্রতি সারিতে ঘন করে বীজ লাগাতে হয়।

আগাছা দমন ও অন্যান্য পরিচর্যা : তুলা গাছ বর্ষার দিনে ও যথেষ্ট ফাঁক করে লাগানো হয় বলে তাতে প্রচুর ঘাসগাছড়া জন্মায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগাছা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। এই সময় সারিতে চারা ঘন থাকলে তা পাতলা করে দিতে হয়। আবার পাতলা থাকলে নির্দিষ্ট জায়গায় ঘন জায়গা হতে চারা তুলে এনে লাগানো যেতে পারে। চারা গজানোর সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই এই কাজ সমাধা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত হেক্টর প্রতি ৩০–৩৭ হাজার চারাগাছ থাকলেই চলে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতি সারির নির্দিষ্ট স্থানে যেন কেবল একটি করে সুস্থ সবল চারা রাখা হয়।

কোনো কোনো এলাকার মাটি বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে চাপ খেয়ে শক্ত হয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে 'জো' মতো নিড়ি বা কোদালের সাহায্যে মাটি আলগা করে দিতে হয়। আর একটি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে বৃষ্টির পানি যেন জমিতে না জমতে পারে। এইরূপ সম্ভাবনা দেখা দিলে যথাশীঘ্র নালাপথে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ : তুলা চাষে বেশি না হলেও কিছু সেচের পানি ব্যবহার করা আবশ্যক। রবি মৌসুমের ফসলেই এই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বীজ বপন হতে দুই মাস পর্যন্ত সেচের কোনো প্রয়োজন হয় না। তৎপর গাছে যখন ফল ধরতে শুরু করে আর বর্ষা বিদায় নেওয়ার পর আস্তে আস্তে মাটির রস জমিতে থাকে তখনই প্রথমবারের মতো সেচ দিতে হয়। আবার যখন শুঁটি বেঁধে পুষ্ট হতে থাকে এবং ফেটে তুলা বের হবে মনে হয় তখন আর একবার সেচ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। মোটের উপর ১০–১২ 'একর ইঞ্চি' পানি তুলার লাভজনক ফলনের জন্য যথেষ্ট। আর জমিতে কতবার সেচ দেওয়া প্রয়োজন তা নির্ভর করে মাটির রস, জমির প্রকৃতি ও বৃষ্টিপাতের উপর। রংপুর দিনাজপুর, ও যশোহর এবং সেই জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে আগাম বপন করলে সেচের পানি ব্যবহার না করলে ফসল ভালো হয়।

পোকামাকড় ও রোগ-বালাই দমন : অন্যান্য ফসলের মতো তুলাগাছেও কীটপতঙ্গ ও রোগের আক্রমণ হয়। তবে রবি মৌসুমে চাষ করলে তুলার এই সবের আক্রমণ অনেকটা কম হয়।

বোলওয়ার্ম (Boll-warm) তুলার প্রধান শত্রু। তুলা গাছের বয়স যখন ৩–৪ সপ্তাহ তখনই এই পোকার কীড়া গাছের ডগা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে ডগার কচি অংশ খেতে থাকে। ফলে ডগা ঢলে পড়ে ও আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এই কীড়া ফুল ও

ফলে আক্রমণ চালায়, সেইজন্য সেগুলি ঝরে পড়তে থাকে। ফলে তুলার ফলন দারুণভাবে কমে যায়। আক্রমণের প্রথম পর্যায়েই এই পোকা দমন করার জন্য উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। প্রতি হেক্টর ফসলের জন্য রিপকর্ড বা সিমাস ৩০০ মি: লি: ১১৩৮ লিটার সাথে মিশিয়ে সিঞ্চন–যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত গাছে ভালোভাবে ছিটিয়ে দিলে পোকা দমন হয়। ভালো ফলের জন্য ১৫–২০ দিন অন্তর অন্তর ৩/৪ বার ওষধ ছিটান উচিত। আক্রান্ত গাছের ডগা, কুড়ি, ফুল ও ফল গাছ হতে ছিড়ে মাটির নিচে পুতে বা আগুনে পুড়িয়ে ফেললেও কিছুটা শুভ ফল পাওয়া যায়। বোলওয়ার্ম ছাড়া 'জ্যাসিড', 'জাবপোকা', ও 'তুলার পাতা মোড়া' পোকা দ্বারা তুলা ফসল আক্রান্ত হতে পারে। আক্রমণের সাথে সাথে ফসলে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করে পোকা দমন করতে হবে।

তুলার রোগের মধ্যে 'চারা পচা' রোগই মারাত্মক। অতি বৃষ্টিতে মাটি স্যাতস্যাতে হয়ে গেলে এবং ভ্যাপসা আবহাওয়া বিরাজ করলে চারাগাছে এই রোগের আক্রমণ হয়। আক্রান্ত গাছে মাটির কাছাকাছি কাণ্ডের চারিদিকে কালচে–খয়েরী বা লাল রংয়ের দাগ দেখা যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই কাণ্ডের আক্রান্ত জায়গা সরু হয়ে চারা মারা যায়। এই রোগ দেখা দিলে খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। 'এরোসান' বা 'গ্রানোসান–এম' নামক ঔষধ দ্বারা শোধিত বীজ বপন করলে এই রোগের আশঙ্কা থাকে না। রোগাক্রান্ত গাছ 'কপার অক্সিক্লোরাইড' ১.৩৫ কেজি অথবা 'ডায়থিন–এম' প্রায় ১ কেজি প্রতি হেক্টরের জন ১১৩৮ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় ভালোভাবে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়। জমির অতিরিক্ত পানির সুষ্ঠু নিকাশের ব্যবস্থা থাকলে ও মাঝে–মধ্যে মাটি আলগা করে দিলেও এই রোগের আক্রমণ কমে যায়।

তুলা সংগ্রহ : তুলার ফল দেখতে অনেকটা কাগজী লেবু বা আখরোটের মতো ; পিছন দিকটা কিছু সূচালো। পাকার পর এই ফল ফেটে যায়। ফাটার ১০/১২ দিন পর সাদা ধবধবে তুলা বের হয়। এই সময়ই হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে তুলা টেনে তোলা হয়। এই তুলাকে বীজতুলা বলা হয়। জমির সম্পূর্ণ তুলা তিনবারে উঠাতে হয়। প্রথমবারে এমনভাবে তুলা তুলতে হয় যাতে ১ বিঘার মতো জমি হতে অন্তত ১ মণ তুলা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। তুলা গাছ হতে উঠিয়ে পরিষ্কার কাপড়ের ব্যাগে জমা করতে হয়। অপরিষ্কার কোনো ভাণ্ড বা ধারকে তুলা সংগ্রহ করতে নেই ; কোনোক্রমে খড়কুটা বা জঙ্গল বীজতুলার সঙ্গে মিশে গেলে পরবর্তী পর্যায়ে বীজ হতে তলার আঁশ আলাদা করা অসুবিধাজনক হয় এবং সেই আঁশ হতে সুতা তৈয়ার করাও কষ্টসাধ্য হয় এবং সুতা নিম্নমানের হয়। এইজন্য খুব সতর্কতার সঙ্গে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে গাছ হতে তুলা সংগ্রহ করতে হয়।

প্রথমবারে উঠানো তুলাই সর্বোত্তম। ইহা হতে প্রাপ্ত বীজ ও আঁশ দুইই উন্নতমানের হয়। সুতরাং তুলার মানগত কথা চিন্তা করলে তুলা আলাদাভাবে সংগ্রহ ও গুদামজাত করতে হয়।

আজকাল বিদেশে হাতের সাহায্যে না লয়ে যন্ত্রপাতির সাহায্যে গাছ হতে তুলা উঠানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে যেখানে বিশাল প্রান্তরের পর প্রান্তরে তুলার চাষ করা হয় সেখানে যান্ত্রিক উপায়ে ছাড়া হাতের সাহায্যে তুলা উঠানোর কথা চিন্তাও করা যায় না। তবে যান্ত্রিক উপায়ে তুলা সংগ্রহ করতে গিয়া ঝামেলাও কিছু কিছু আছে, যেমন— তুলা সংগ্রহের আগে গাছের সমস্ত পাতা ঝরিয়ে নিতে হয়। এইজন্য অতিরিক্ত খরচ হয় আর যত সাবধানতা অবলম্বন করেই যন্ত্রের সাহায্যে, তুলা উঠানো হউক না কেন সেক্ষেত্রে তুলাতে

কিছু না কিছু জঙ্গল লাগবেই লাগাবে। ইহার অর্থ আঁশের গুণগত মানের দিকটা খর্ব হওয়া। এইজন্য নিশ্চিতরূপে বলা যায় হাতে উঠানো তুলার মান যান্ত্রিক উপায়ে উঠানো তুলার মানের চাইতে শ্রেয়। কিন্তু খরচের কথা চিন্তা করে মানুষের পরিবর্তে সে দেশে যন্ত্রদানবের সাহায্যে এই কাজ করা হয়।

তুলা সংগ্রহকালে লক্ষ রাখতে হবে যে তা যেন বৃষ্টিতে না ভিজে। আমাদের দেশে প্রধানত রবি মৌসুমে তুলা চাষ করা হয় বলে তা পৌষ–মাঘ মাসে উত্তোলন করার সময় হয়। এই সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে তুলা ভিজার কথা নয়। কিন্তু দৈবক্রমে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার তুলা আগে ভিজে গেলে সেই তুলা গাছে ১০/১২ দিন রেখে শুকানোর পর উঠাতে হয়। এইবারে সংগৃহীত তুলা প্রথমবারে উঠানো তুলার সঙ্গে মিশাতে নেই, কারণ— এই তুলা ভিজার দরুন মানগত দিক হইতে প্রথমবারের তুলার চাইতে নিকৃষ্ট মানের হয়।

ফলন : গাছ হতে যে তুলা আহরণ করা হয় তাকে বীজতুলা বলে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে এক হেক্টরে ১২০০–১৫০০ কেজি বীজতুলা উৎপন্ন হতে পারে, তবে সাধারণত একরে ৫–৬ মণ অর্থাৎ হেক্টরে ৪০০–৫০০ কেজি তুলা উৎপন্ন হয়। বীজের উপরিভাগে তুলার আঁশ শক্তভাবে আটকিয়ে থাকে, হাতের সাহায্যে তা বীজ হতে আলাদা করা যায় না। যান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ জিনিং (ginning) পদ্ধতিতে বীজ হতে তুলা আলাদা করতে হয়।

জিওটি (Got) : কোনো একটি হাতের বীজ তুলার আঁশ ও বীজের অনুপাতকে জিওটি বলে। যদি সে জাতের জিওটি হয় ৩৭%, এর অর্থ হলো এ জাতের ১০০ কেজি বীজতুলা জিনিং করলে ৩৭ কেজি আঁশ এবং ৬৩ কেজি বীজ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বীজতুলা হতে যান্ত্রিক উপায়ে আঁশ বীজ হতে আলাদা করে নেয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় জিনিং (Ginning) আমেরিকান জাতের বীজতুলার আঁশ এবং বীজের অনুপাতিক হার ১ : ২ অর্থাৎ ১ ভাগ আঁশ এবং দুভাগ বীজ।

আঁশ তুলার গুণাগুণ

একটি তুলার আঁশ কতটুকু লম্বা ইহাই তার প্রধান গুণ। এই হিসাবে লম্বা আঁশযুক্ত তুলাই সর্বোত্তম। আঁশের দৈর্ঘ্য গড়ে মি. হতে ৫ সে. মি. পর্যন্ত হয়। অসঙ্কোচে বলা যায় ৫ সে. মি. লম্বা আঁশের তুলা সব চাইতে ভালো। আঁশের দৈর্ঘ্যের তারতম্য অনুসারে আঁশতুলাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ; যথা : — ক. খাটো আঁশের তুলা ১৯ মি. মি. এর কম খ. মাঝারি আঁশের তুলা ১৯ মি. মি. এবং গ. লম্বা আঁশের তুলা ৩২ মি. মি. এর চেয়ে লম্বা উল্লেখ্য বাংলাদেশের উৎপাদিত তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭–৩০ মি. মি.।[৩]

লম্বা আঁশের তুলার জিনিং হার খাটো আঁশের তুলার চাইতে কম। ইহার অর্থ প্রতি হেক্টর জমি হতে কম আঁশ উৎপাদন। কিন্তু লম্বা আঁশের তুলা হতে খুব ভালো সুতা ও কাপড় প্রস্তুত করা যায় বলে এর চাহিদা ও সমাদর বেশি। বাংলাদেশের গাড়ো তুলার (Comilla cotton) জিনিং হার ৪৮% অর্থাৎ আঁশতুলার উৎপাদন অনেক, কিন্তু এই তুলার আঁশ এত খাটো যে তা দ্বারা কোনো ভালো কাপড় প্রস্তুত করা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঝুমিয়া চাষীরা তাহাদের নিজ প্রয়োজনে এই তুলা দ্বারা মোটা কাপড় প্রস্তুত করে। দেশের সুতাকলে এই তুলার চাহিদা নেই— এই কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে পশমের সঙ্গে ভালোভাবে মিশ্রণ করা যায় বলে এই তুলা বিদেশের বাজারে রপ্তানি করা হয়।

আঁশ কত শরু, শক্ত ও মোলায়েম —এই বৈশিষ্ট্যগুলিরও ভালো আঁশতুলার গুণাগুণের অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যের কথা আঁশের শক্ত ও সরু গুণ দুইটি একই সঙ্গে পাওয়া যায় না। আঁশ যত সরু শক্ত হয় ইহার শক্তিও তত কমে যায়।

ধবধবে সাদা রংয়ের আঁশ উচ্চমানের তবে স্বাভাবিক রঙ্গীন আঁশেরও মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে যদি সে রং স্থায়ী হয়। যেমন 'খাকি' রংয়ের আঁশতুলার মূল্য দেওয়া হয়। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ স্থায়ী ধূসর সবুজ ও বাদামি রংয়ের আঁশ উদ্ভাবন করতে সমর্থ বলে জানা গিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ এই ধরনের তুলা উৎপাদন করতে সমর্থ হলেও সেই আঁশের রং স্থায়ী নয়।[৬]

তুলার ব্যবহার

আঁশতুলা প্রধানত সুতা তথা কাপড় প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। খাটো আঁশতুলা পশম শিল্পে মিশ্রণের কাজে লাগে। এইজন্য বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপন্ন 'কুমিল্লা তুলা' বিদেশে রপ্তানি করা হয়। রোগীদের চিকিৎসার কাজে তুলা নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। গোলাবারুদ প্রস্তুতের কাজেও কখনো কখনো তুলা ব্যবহার করা হয়।[৬]

তুলাবীজ হতে উৎকৃষ্ট মানের ভোজ্যতৈল প্রস্তুত হয়। বীজে শতকরা ১৭.৫ হতে ২২.৫ ভাগ তৈল থাকে। ইহা ছাড়া প্রোটিন ২২.৪%, কার্বোহাইড্রেড ২৭.৪%, ছাই-৪.১% থাকে।[৬] তুলাবীজ হতে উৎপন্ন তৈল দ্বারা 'ভেজিটেবল ঘি' প্রস্তুত করা যায়। তৈল বের করার পর তুলাবীজ হতে যে খৈল পাওয়া যায় তা গো-খাদ্য অথবা সার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

তুলাগাছ শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশের মতো জ্বালানি অভাবগ্রস্ত দেশে এই ব্যবহারের শুরুতে নেহাত কম নয়। তুলা গাছের বাকল হতে এক প্রকার শক্তি টিকসই আঁশ উৎপন্ন হতে দেখা যায়। তা ছাড়া বাকল বা শিকড়ে 'আর্গটের' বিকল্প উপাদান রয়েছে বলে কেউ কেউ বলে থাকেন।[৬]

বাংলাদেশে তুলা চাষের ভবিষ্যৎ

মহাপ্রয়োজনে বাংলাদেশ তুলা উৎপাদনের ব্রতী হয়েছে। প্রাথমিক হিসাব-নিকাশ করে দেখা গিয়েছে এদেশে তুলা উৎপাদনযোগী যথেষ্ট জমি আছে ও তুলা চাষ করলে তা জন্মেও ভালো। কিন্তু ভাবনা-চিন্তা করার অনেক কিছু আছে।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মতে এদেশে তুলার বীজ বপনের উৎকৃষ্ট সময় শ্রাবণ-ভাদ্র এমনকি আষাঢ় মাস। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায় এই সময়টা পুরা বর্ষার মৌসুম। শুকনা জমি তৈয়ার করার মতো পরিবেশ এই সময় পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তুলা চাষ করতে হলে এই সময় জমি প্রস্তুত করতেই হবে। তাছাড়া এই সময় চাষীরা আউশ ও পাট কাটা, লওয়া এবং রোপা আমন ধান লাগাবার জন্য এত ব্যস্ত থাকে যে এইসব করে তুলার চাষে মন দিতে তাহারা যথেষ্ট অনীহা প্রকাশ করে বলেই মনে হয়। অধিকন্তু বর্ষাশিক্ত পরিবেশে তুলাবীজের অঙ্কুরোদ্গম প্রায়শই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে এবং ঐ সময় আগাছা পরিষ্কার করার কাজও বিশেষ অসুবিধাজনক হতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে যে আজকাল জমি পতিত থাকে না এই কথাটা অতি সত্য। কাজেই তুলা চাষ নিঃসন্দেহে গম, তামাক, গোল আলু, রোপা আমন প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। এই ফসলগুলি ফেলে চাষীরা যে একটি নতুন তুলা ফসল চাষে ততটা আগ্রহী হবে এমন চিন্তা করা ঠিক নয়।

কোনো জমিতে তুলার চাষ করে বৎসরে আর একটি ফসল করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বলা হয় তুলা ফসল উঠানোর পর সেই জমিতে আউশ বা পাটের চাষ করা সম্ভব হলেও বাস্তবিক পক্ষে সেই ফসলের যে কোনো একটি করে আবার সেই জমিতে তুলা করতে গেলে জমি প্রস্তুত করার সময় খুবই কম পাওয়া যায়। অন্যদিকে তুলার জমিতে কোনো উপযুক্ত সাথী ফসল (Inter Crop) পাওয়া খুব কঠিন ; কারণ ঐ মৌসুমের উপযোগী ফসল খুব কমই দেখা যায়। দুই এক মাস পরে কোনো রবি ফসল করাও সম্ভব নয়, কারণ তখন তুলাগাছের ডালপালায় ক্ষেত ভরে যায়।

তুলার বাজারদর ও বাজারজাত করার ব্যাপারেও যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। বীজ প্রক্রিয়াজাত করারও কোনো ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নি।

তুলা এই দেশে একটি নতুন ফসল হিসেবেই গণ্য। এই নতুন ফসলের চাষবাস সম্বন্ধে অনেক চাষীই অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। কাজেই এমন চাষীদের দ্বারা ফসলটির দ্রুত উন্নতির আশা করা যায় না।

পোকামাকড়ের আক্রমণ তুলা ফসলে কোনো কোনো সময় এমন ভয়াবহ হয় যে বিস্তীর্ণ তুলা ফসলের জমি কয়েক বৎসরের জন্য তুলা চাষ হতে বিরত রাখতে হয়। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের এমন অবস্থার নজির রয়েছে।

তবে নিরাশ না হয়ে সুপরিকল্পনা গ্রহণ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে কিছু পরিমাণ তুলা এই দেশে উৎপাদন করা সম্ভবপর হতে পারে। দ্রুত তুলা চাষে বিরাট একটা কিছু করার বাসনা না থাকাই ভালো।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আহমেদ, কা. আ. গবেষণালব্ধ ফল পাট উৎপাদনে কতটা সুফল আনতে পেরেছে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সামার সায়েন্স ইনস্টিটিউটের ১৯৮২ সালের ১২ জুন তারিখে উপস্থাপনের জন্য লিখিত একটি কথিকা)।

২. করিম, সা : সোনালী আশ, রূপালী আঁশ। নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা-১।

৩. তালুকদার, ন. ই. তুলা উৎপাদন, ১৯৯৪। বাংলা একাডেমী। ঢাকা।

৪. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা : পাটের উন্নত জাতসমূহ, ১৯৯০।

৫. মজুমদার, ম. পূর্ব-ভারতের ফসল ; ১৯৮১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। আর্য ম্যানসন, ৬/এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা ৭০০০১৩।

৬. Ahmed, K : Bangladesh Agriculture and Field Crops. 1980. Publisher : Mrs. Mumtaj Kamal, Bangalore No. 2 Farm Gate. Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka.

৭. Aiyar, A. K. Y. N : Field Grops of India, 1947. Bangalore Printed by the Suptd. at the Govt. Press, pp. 407-34

৮. B. B. S : Statistical Yearbook of Bangladesh, 1995.

৯. Martin, J. H. and Leonard, M.H : Principles of Crop Production. 1967. The Macmillan Co. N. Y. pp. 762-66.

১০. Ministry of Agriculture : Development Statistics of Bangladesh Agriculture. Series. No . 6 Dec. 1981.

১১. Seed Certification Agency, Gazipur : Approved Crop Varities, 1995.

দ্বাদশ অধ্যায়

সবুজ সার জাতীয় শস্য

GREEN MANURING CROPS

এমন কতকগুলি উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলি কোনো জমিতে জন্মিয়ে কচি অবস্থায় পুনর্বার সেই জমিতে চাষবাস করে মিশিয়ে দিয়ে এক রকম সবুজ সার প্রস্তুত করা হয় সেই সমস্ত উদ্ভিদকে সবুজ সার জাতীয় শস্য বলা হয়। ধইঞ্চা (S. aculaeta) শণ (C. Juncea), বরবটি (V. sinensis) প্রভৃতি এই জাতীয় শস্য। সবুজ সারজাতীয় শস্যগুলি সাধারণত শিম্বী বা শুঁটীজাতীয় (Leguminous) হয় ; তবে কখনো কখনো অশিম্বী বা অশুঁটীজাতীয় উদ্ভিদও সবুজ সার প্রস্তুতের জন্য চাষ করা হয়, যথা —রাই, সরিষা ইত্যাদি।

সবুজ সার প্রস্তুত করার প্রধান উদ্দেশ্য জমিতে জৈব পদার্থ (organic matter) যোগ করে জমিকে উর্বর ও নানাভাবে উন্নত করে তোলা ; গৌণ উদ্দেশ্য জমিতে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেনও যোগ করা। শিম্বীজাতীয় শস্য, যেমন—ধইঞ্চা, শণ, বরবটি প্রভৃতি চাষ করে সবুজ সার প্রস্তুত করলে এই দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। শিম্বীজাতীয় গাছের শিকড়ের গুটীতে বসবাসকারী এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে বায়বীয় নাইট্রোজেন তথায় সঞ্চিত হয় এবং সমান্তরে তা মাটিতে যোগ হয়। অশিম্বীজাতীয় ফসলের চাষ করলে কেবল জৈব পদার্থ যোগ হয়, কোনো নাইট্রোজেনের যোগসাধন হয় না। কিন্তু মজুমদারের[১] উল্লেখে দেখা যায় 'ক্যাশুয়ারিনা' (Casuarina) এবং অ্যালনাস (Alnus) নামক অশুঁটিজাতীয় গাছের শিকড়ে এবং 'সাইকোট্রিকা' (Psychotrica) ও আর্দিশিয়া (Ardisia)' নামক অশুঁটীজাতীয় গাছের পাতায় শুটী দেখা যায়। এগুলি তখন সবুজ সারজাতীয় ফসল হিসেবে চাষ করলে মাটিতে বায়ুবীয় নাইট্রোজেনের যোগসাধন হয়।

বাংলাদেশে জমিতে সবুজ সার প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য সবুজ সারজাতীয় ফসলের চাষ করা হয় না বললেই চলে। ইহার প্রধান কারণ, এই জাতীয় ফসল চাষে চাষীর সরাসরি কোনো শস্য পায় না। কেবলমাত্র সরকারি খামারে ও দুই চারজন উৎসাহী চাষীর জমিতে মাঝে-মধ্যে এই জাতীয় শস্যের চাষ করতে দেখা যায়। এই উদ্দেশ্যে সাধারণত ধইঞ্চা ও শণের চাষ করতে দেখা যায়। বরবটি ও মাষকলাই এর চাষও কখনো কখনো করা হয়।

ধইঞ্চা

ইহা শিম্বীজাতীয় দণ্ডাকৃতির (পাটের ন্যায়) একটি সবুজ রঙের ঘন পল্লবযুক্ত গাছ ; উচ্চতায় ১০/১২ ফুট অর্থাৎ ৩-৪ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে সবুজ সারের জন্য গাছ ছোট অবস্থায়ই অর্থাৎ প্রায় ২ মিটার হয়ে ফুল ধরা মাত্রই তা চাষ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়।

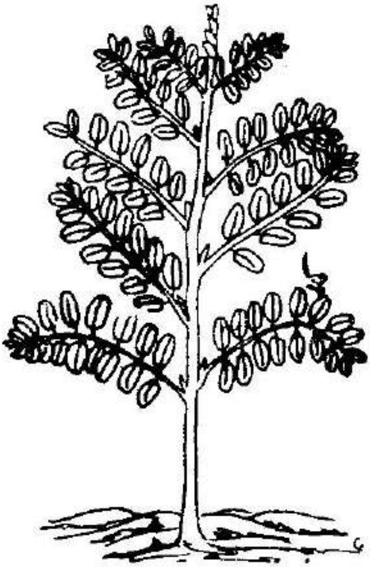

চিত্র : ১২.১ ধইঞ্চা গাছ

ধইঞ্চা চাষের জন্য জমিতে অন্যান্য নিয়মিত শস্যের ন্যায় চাষবাসের প্রয়োজন হয় না। দুই তিনটি চাষ ও একটির মতো মই দিলেই চলে। সার ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন হয় না, তবে টি. এস. পি হেক্টর প্রতি ৩৫ কেজি এবং মিউরেট অব পটাশ ২৪ কেজি হারে প্রয়োগ করলে গাছের শিকড়ের গুটিতে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন সঞ্চিত হয় আর তা ছাড়া অব্যবহৃত ফসফেট ও পটাশ সার পরবর্তী ফসলের খুব কাজে আসে।[১]

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ধইঞ্চার বীজ বপন করতে হয়। একর প্রতি ১৫–২০ সের অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৩৮–৪৬ কেজি বীজ বপন করলেই চলে।[২] বীজ অঙ্কুরোদগমে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না হলে গাছ এত ঘন হয়ে জন্মে যে তাতে আগাছা জন্মাবার মতো কোনো ফাঁক পায় না বা তা গাছের তলায় চাপা পড়ে যায়। তাই বলা নিষ্প্রয়োজন যে ধইঞ্চা ফসল চাষে কোনো নিড়ানি–কুড়ানির প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া অন্য আর কোনো রকম যত্নাদিরও প্রয়োজন হয় না।

বপনের দুই হতে আড়াই মাসের মধ্যে গাছে ফুল ধরতে শুরু করে তখনই বুঝতে হবে গাছ সবুজ সার করার জন্য চাষ করে মাটির সঙ্গেমিশিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে। সেই সময়ই গাছগুলি ট্রাক্টর চালিত লাঙ্গল অথবা দেশী লাঙ্গল দ্বারা চাষ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। দেশী লাঙ্গলের ব্যবহারের বেলায় এবং গাছগুলি যদি কিছুটা বড় হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে

সেগুলি দা বা কাস্তের সাহায্যে কেটে দিয়ে চাষ করে মাটির সঙ্গে মিশানো সহজতর হয়। তা না হলে গাছ লাঙ্গলের সাথে আটকিয়ে গিয়ে চাষকার্যে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

বর্ষা পূর্ণমাত্রায় শুরু হলে এবং জমিতে পানি ভালোভাবে জমে উঠলে উপর্যুক্ত কাজ সম্পাদন সহজতর হয়। সেই অবস্থায় সপ্তাহখানেক পর পর চাষ ও মই দিলে ধইঞ্চা পচে মাটির সাথে মিশে যায়। অনাবৃষ্টিজনিত কারণে পানির অভাব হলে জমিতে পানি সেচের বন্দোবস্ত করতে হবে, নচেৎ ধইঞ্চা না পচে শুকিয়ে যাবে অর্থাৎ মাটির সঙ্গে মিশবে না যার অর্থ সবুজ সারের জন্য ধইঞ্চার চাষ অনর্থক হবে।

ধইঞ্চা চাষে জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে সবুজ পদার্থ যোগ হয়। তিন হতে ৫ মাস বয়স্ক ধইঞ্চার সাহায্যে জমিতে সবুজ সার প্রস্তুত করলে হেক্টর প্রতি ১০০০০ হতে ১৫০০০ কেজি সবুজ পদার্থ যোগ হয়।[২]

ধইঞ্চার সাহায্যে সবুজ সার প্রস্তুতের পর রোপা আমন ধানের চাষ করা লাভজনক। তবে কোনো কোনো সময় গোল আলু ও তামাকের চাষও করা হয়।

শণ

(Sunn-hemp)

ইহাও শিম্বী পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ ; মাঝারি উচ্চতাবিশিষ্ট ও ফিকে সবুজ রংয়ের একটি দ্রুতবর্ধনশীল শস্য। ধইঞ্চার ন্যায় এই গাছও পত্রবহুল।

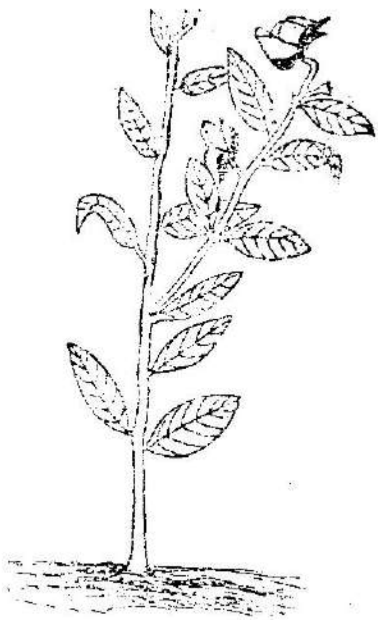

চিত্র : ১২.২ শণ গাছ

উঁচু জমিতে শণ ভালো জন্মে ও অল্প পরিমাণ পানিতেও ইহা পচান যায় বলে ধইঞ্চার তুলনায় ইহা উঁচু জমিতে সবুজ সার প্রস্তুত করার উপযোগী ধইঞ্চার মতো করে জমি চাষবাস করলেও চলে। কোনো রকম সার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না, তবে হেক্টর প্রতি ৩০–৩৫ কেজি টি. এস. পি এবং ২০–২৪ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করলে বর্তমান (শণ) এবং পরবর্তী প্রধান ফসলের অন্য বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়।[১]

বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাস বীজ বনার সময়। সেই সময় হেক্টরে ৪০/৫০ কেজি বীজ বপন করলে বেশ ঘন হয়ে চারা জন্মায়।[২] এই ঘন গাছের চাপে পড়ে আগাছা তেমন কিছু জন্মিতে পারে না, তাই নিড়ানি–কুড়ানি দিয়ে জমি হতে আগাছা পরিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন হয় না। মালচিং, পানি সেচ ইত্যাদি অন্যান্য মধ্যবর্তী পরিচর্যারও কোনো প্রয়োজন হয় না।

দুই হতে সোয়া দুই মাসের মধ্যে যখন গাছে ফুল ধরতে থাকে তখন লাঙ্গল দিয়ে গাছগুলি মাটি চাপা দিতে হয়। সপ্তাহখানেক পর পর কয়েকবার চাষ মই দিলে ৩/৪ সপ্তাহের মধ্যে গাছ পচে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ধইঞ্চার মতো শণ–গাছের কাণ্ড শক্ত হয় না। ফলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে শণ গাছ দ্রুত পচে যায় এবং ধইঞ্চার তুলনায় পচানোর জন্য অপেক্ষাকৃত কম পানির প্রয়োজন হয়।

ফসলের ভালো মন্দ অনুসারে প্রতি হেক্টরে ১০,০০০ হতে ১৫,০০০ হাজার কেজি পর্যন্ত সবুজ পদার্থ পাওয়া যায়।[২]

শণের সাহায্যে সবুজ সার করার পর আখ, তামাক, গোল–আলু অথবা বিলাতি সব্জী চাষ করা লাভজনক।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কুদ্দুস, মোঃ আঃ ও তালুকদার, ন. ই. কৃষিতত্ত্বের মৌলনীতি, ১৯৮১। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৫০–৫৬

২. মজুমদার ; মঃ পূর্ব–ভারতের ফসল, ১৯৮১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। আর্য ম্যানসন, ৬/এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা–৭০০০১৩, পৃ. ৩৩০–৩৩১

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিশেষ অর্থকরী ফসল
SPECIAL CASH CROPS

বাংলাদেশের পাহাড়ী ও পার্বত্য অঞ্চলে এমন কতকগুলি উদ্ভিদ বা ফসল জন্মে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাঁশ, রাবার, পান, পাম ইহাদের মধ্যে অন্যতম। কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের মধ্যে সেগুন, শাল, গর্জন, ইত্যাদিও অতীব মূল্যবান সম্পদ।

গ্রামবাসীদের অতি প্রয়োজনীয় বাঁশ কাগজ ও রেয়ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এ পরিচিত বাঁশ সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি। যানবাহনের চাকা হতে আর রকমারী খেলনা, বৈদ্যুতিক কেব্‌ল, ইনসুলেটার প্রভৃতি প্রস্তুতে ব্যবহৃত রাবার যে গ উৎপন্ন হয় এবং দেশে যে বেশ কিছু পরিমাণ রাবার চাষ হয় সেই কথাটিও হয়ত অ জানা নেই। সয়াবীন তৈলের পর আমরা যে পাম তৈল খেতে শিখেছি সে গা বাংলাদেশে জন্মে সে কথাই বা কয়জনের জানা আছে? অনেকের ধারণা, কাঠ উৎপা দামি গাছ সেগুন ও শাল কেবল স্বাভাবিকভাবে বনেজঙ্গলে জন্মে, কৃত্রিম উপায়ে চাষবাস হয় না। আমরা কি ভালোভাবে জানি সিলেটের খাসিয়া আদিবাসীরা কেবল পানের চাষ করে জীবনধারণ করে।

বর্তমান অধ্যায়ে এই বনজ শস্যগুলি সম্বন্ধেই বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বাঁশ

বাঁশ বাংলার পল্লী-বাসীদের কাছে একটি অতি পরিচিত নাম। তাদের বসত আশেপাশে একটিও বাঁশঝাড় নেই এমন একটি বাড়ি গ্রাম বাংলায় আছে বলে কল্পনা যায় না। বাঁশ ছাড়া চাষী তথা পল্লীবাসীদের সমাজ-জীবনে একবারে অচল। তাই অ দেশে বাঁশকে "গরিব লোকের কাঠ" (poor man's timber) নামে অভিহিত কর কেননা বাঁশ তাদের গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য যাবতীয় কাজে কাঠের চাইতে বেশি ব্যবহৃত

বাঁশ প্রকৃতপক্ষে একটি বনজ উদ্ভিদ। তাই লক্ষ্য করা যায় সিলেট, চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে এবং লোকালয়েও রকমারি প্রচুর বাঁশ জন্মে যা বাংলাদেশের আর অঞ্চলেই দেখা যায় না। ঐ অঞ্চলগুলির বনাঞ্চলে আজও স্বাভাবিকভাবে অনে জন্মাতে দেখা যায়। কর্ণফুলি কাগজের মিলের জন্য যে পরিমাণ বাঁশের দরকা অধিকাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের বন হতেই সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বাঁশের একটি গু বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা বাংলাদেশের সর্বত্রই কম বেশি জন্মাতে পারে। পাহাড়ি পরি বাইরে সহজেই খাপ খাওয়াতে পেরেছে বলে এদেশের সর্বত্রই কম বেশি বাঁশ দেখা যায়

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

বাঁশের আদি জন্মস্থান ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশ (Thailand)[৫] চীন ও জাপানে বহু পুরানো যুগ হতেই বাঁশের চাষ হয়ে আসছে। জাপান, চীন ও বাংলাদেশে প্রচুর বাঁশ হওয়া ছাড়াও আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশে বাঁশ জন্মায়। আজকাল ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলেও বাঁশ দেখা যায়।

মাটি জলবায়ু

অধিক জৈবপদার্থযুক্ত দোঁয়াশ ও পলিমাটি বাঁশের জন্য বিশেষ উপযোগী। জমির অবস্থান এমন হাওয়া চাই যাতে পানি সহজেই নিষ্কাশিত হতে পারে। চাষীদের এমন ধারণা আছে বলেই তারা বসতবাড়ির আশেপাশে উঁচু জায়গায় বাঁশ লাগিয়ে থাকেন এবং বাঁশের গোড়ায় খড়-কুটা, পচাপাতা ইত্যাদি প্রয়োগ করে থাকেন।

গ্রীষ্মমণ্ডলের উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত বাঁশের জন্য অনুকূল পরিবেশ। গ্রীষ্মের উষ্ণতা ৩২.৫° সে. এবং শীতের তাপমাত্রা ২৮° সে. হতে পারে আর বৃষ্টিপাত ২৫৪–৩৮০ সে. মি. এর মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঠাণ্ডা পরিবেশেও কোনো কোনো জাতের বাঁশ জন্মাতে পারে যদি সে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। তবে যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০২ সে. মি. এর কম এবং শীতকালে বরফ পড়ে তেমন অঞ্চলে বাঁশ কদাচিৎ জন্মে।[৯]

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও শ্রেণি বিভাগ

আশ্চর্যজনক হলেও বাঁশ ধান, গম, ভুট্টা, প্রভৃতির সমপরিবারভুক্ত উদ্ভিদ Graminae পরিবারভুক্ত এবং Bamboosoidae উপ-পরিবারভুক্ত এই উদ্ভিদের কয়েক শত প্রজাতি আছে যার মধ্যে ৯০টি প্রজাতির চাষ প্রচলিত আছে।[৫]

বাঁশকে প্রধানত তিনটি বর্গ বা গোত্রে ফেলা যায় ; প্রথম গোত্র 'অরুণডিনাড়িয়া' (Aroundinaria), দ্বিতীয় গোত্র 'ফাইলাসট্যাকিস' (Phyllostachys) এবং তৃতীয় গোত্র- 'সাসা' (Sasa)। প্রথমোক্ত বর্গে বাঁশের বেশি প্রজাতি রয়েছে। দ্বিতীয় গোত্রের বাঁশ ইহা হতে মোটা এবং শক্ত। শেষোক্ত গোত্রের বাঁশ খর্বাকৃতির।

বাঁশ দণ্ডাকৃতি গাঁইটযুক্ত ফাঁপা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। উহা ঝাড় বেঁধে একসঙ্গে অনেকগুলি জন্মায়। কোনো কোনো জাতের বাঁশের মাঝামাঝি হতে আগা পর্যন্ত প্রতি গাঁইট হতে ডালা বা কঞ্চি বের হয়। আবার অন্য জাতের বাঁশে কেবল আগার দিকে কঞ্চি দেখা যায়। পাতা সরু বর্শাকৃতির ও ঘন সবুজ রংয়ের। ধানের মতো বাঁশের গোড়ায় গুচ্ছমূল জন্মে ও তা মাটির উপরের স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাঁশে সাধারণত ফুল দেখা যায় না, তাই কেউ কেউ ভেবে থাকেন বাঁশে ফুল ধরে না, কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। তবে বাঁশে ফুল ধরার ব্যাপারটি বৈচিত্রপূর্ণ। কোনো কোনো বাঁশের জাতে মাঝে মধ্যে অল্পস্বল্প ফুল দেখা যায়, আবার কোনো কোনো জাতে ২০–৩০ অথবা ৩২০–৫০ বৎসর পর ফুল ধরে এবং পর পর দুই বৎসর প্রচুর ফুল ধরে।[৯] ফুল ও ফল ওটের (oat) ফুল ও বীজের ন্যায়। বীজ হতে ঘাসের ন্যায় চারা জন্মায় এবং তা হতে ৭/৮ বৎসর পরে পূর্ণাঙ্গ বাঁশ জন্মায়। বংশবৃদ্ধির জন্য বাঁশ সাধারণত গোড়ার দিকে হতে হতে প্রতি বৎসর শোষক (sucker) ছাড়ে। শোষকগুলি

জন্মাবার পর হতে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অল্প সময়ের (মাস দুয়েক) মধ্যে পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হয়। এই সময় বংশদণ্ড কচি থাকে এবং প্রতি পর্ব এক রকম অমসৃণ খোলস দ্বারা ঢাকা থাকে। প্রতি গাইটে সংযুক্ত এই খোলস বংশদণ্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে খুলে পড়ে যায়। আস্তে আস্তে কাণ্ডে কঞ্চি ও পাতা দেখা দেয় এবং এক সময় বাঁশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

বাংলাদেশে যে সমস্ত বাঁশ জন্মে সেগুলির শ্রেণিবিভাগের জন্য এ পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত কোনো রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলিয়া মনে হয় না। সেজন্যই হয়ত কোনো রকম শ্রেণিবিভাগ দৃষ্ট হয় না। কয়েকটি উদ্ধৃতিতে[৫, ৭] কেবল দেখা যায় এদেশে ১৫ জাতের দেশী ও ২৪ জাতের বিদেশী বাঁশ জন্মে। বাঁশগুলির কোনো কোনোটি দেশী ও কোনোটি বিদেশী তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। বাঁশের প্রচলিত নামেরও কোনো স্থিরতা নেই। দেশের এক এক জায়গায় একই বাঁশ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। বিভিন্ন অঞ্চলে বাঁশের প্রচলিত নাম নিম্নোদ্ধৃত তিনটি ভাগে দেখালেই এই কথা প্রমাণিত হবে :

প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
বাউরা, জাই বাকাল, মুলি, পাউড়া, মিঠিঙ্গা, কালী, দেও, পেচা, ডুলু ও বাজাইল।	শালবরাক, তুলী বরাক, জালীবরাক, মুলীবরাক, মাকালবাঁশ, বন বাঁশ, নল বাঁশ তল্লা, মোড়ল ও জাওয়া।	ওড়া, লাঠি বাঁশ, মুলি, ডলু, মিতেঙ্গা, কালিছেরি, বরাক, বাজালী, জাগুয়া দেও, পারুয়া ও পেঁচা।

উপর্যুক্ত তিন শ্রেণির বাঁশের মধ্যে তৃতীয় ও প্রথম শ্রেণির যে নামকরণ দৃষ্ট হয় তা হতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে একই বাঁশের নামের পরিবর্তন ঘটেছে, যেমন— তৃতীয় বিভাগের ডলু বাঁশকে প্রথম বিভাগে বলা হয়েছে ডলু বাঁশ, তদ্রূপ বাজালী বাঁশকে বলা হয়েছে বাজাইল, মিতেঙ্গাকে বলা হয়েছে মিঠিঙ্গা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে দৃষ্ট কিছু প্রধান প্রধান বাঁশের প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম ও উহাদের মধ্যে কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হলো :

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
মুলি	Melocanna bambosoides
মিতেঙ্গা	Bambusa tulda Roxb
কালিছেরি	Oxytenanthera nigrociliata
ডলু	Teinostachyum dullosa
ওড়া	Dendrocalamus longispathus
বাড়িয়ালা	Bambusa vulgaris Schradex Wendl
বাজালি	Teinostachyum griffithil
কালী	Bambusa auriculata
পেচা	Dendrocalamus hamiltonii

মুলি বাঁশ : ইহার সরল ও হাল্কা ধরনের এক রকম বাঁশ। অন্যান্য জাতের বাঁশের মতো ঝাড়ে ঠাসাঠাসি করে ঝোপ বেঁধে জন্মে না, এক একটি করে ফাঁকা ফাঁকা হয়ে জন্মে। বাঁশে কঞ্চি জন্মে না বললেই চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামেই এই বাঁশ সব চাইতে বেশি জন্মে, তবে সিলেট ও চট্টগ্রামের বনেও এই বাঁশ দেখা যায়। বনের প্রধান প্রধান গাছের নিচে অথবা

একক—এই দুইভাবেই জন্মে। অতীতে যে সমস্ত পাহাড়ে ঝুম চাষ করা হয়েছে সেগুলিতেই এককভাবে মুলি বাঁশ জন্মাতে দেখা যায়। ইহার কারণ, সেই সমস্ত পাহাড়ে অন্যান্য গাছ ঝুম চাষের জন্য পুড়ায়ে ফেলা হলেও বাঁশ আগুণে নিঃশেষ হয়নি ; উপরের অংশ পুড়া গেলেও মাটির নিচে বেঁচে থাকা রাইজোম (Rhizome) হতে পরবর্তী সময় প্রচুর বাঁশ জন্মিয়েছে।

মুলি বাঁশে বৎসর বৎসর ফুল ধরে না, অনেক বৎসরের ব্যবধানে ফুল ধরে এবং তখন কয়েক বৎসর এক নাগাড়ে ফুল ধরতে থাকে। যতদূর জানা গেছে মুলি বাঁশে ৪৫–৬০ বৎসর পর পর ফুল ধরে এবং ফুল ধরার পর সমস্ত বাঁশ মারা যায়। তৎপর মাটিতে পড়ে থাকা বীজ হতে চারা গজিয়ে সময়ান্তরে নতুন বাঁশবনের সৃষ্টি করে। এই নতুন বাঁশঝাড়ের বাঁশ ব্যবহারপোযোগী হতে ৬–৮ বৎসর সময় লাগে। বাংলাদেশে মুলি বাঁশে ১৯৫৯–৬০ এই দুই বৎসর ফুল ধরেছিল। তৎপর ৬/৭ বৎসরের মধ্যে আবার নতুন বাঁশবনের সৃষ্টি হয়েছে।

মুলি বাঁশ ৫০–৭০ ফুট অর্থাৎ ১৬–২৩ মিটার লম্বা ও ১–৪ ইঞ্চি বা ২.৫–১০ সে. মি. ব্যাসযুক্ত। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বংশদণ্ড খুবই সোজা। গিট বা গিড়া (node) দণ্ডের সঙ্গে মিশানো। দণ্ডের আবরণ বেশ পাতলা বলে ঘরের বেড়া, ছাদ, চালা প্রস্তুতির কাজে একচেটিয়া ব্যবহৃত হয়।

মিতেঙ্গা বাঁশ : এই বাঁশ বেশ মোটা ; ব্যাস ২–৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫–১৫ সে. মি. এবং লম্বায় ৩০–৭০ ফুট। অর্থাৎ ৯.৫–২৩ মিটার বাঁশ ঝাঁড় বেঁধে ঠাসাঠাসি করে জন্মে, প্রতিটি গিট হতে প্রায় কঞ্চি বাহির হয় এবং দণ্ডের রং সবুজ।

বনের মধ্যে ছোট বড় নালা বা খালের দুই পাশের নরম মাটিতে এই বাঁশ জন্মাতে দেখা যায়। বন ছাড়াও ইহা দেশের অন্যত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে।

ঘরের খুঁটি ও কাঠ ভাসানোর কাজেই মিতেঙ্গা বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

কালিছেরী বাঁশ : ইহা একটি পুরুজাতের বাঁশ। গাঢ় সবুজ রংয়ের ও মাঝে মাঝে হলুদ রংয়ের দাগ মিশ্রিত এই বাঁশ লম্বায় ৪০–৭০ ফুট অর্থাৎ ১৩–২৩ মি. ও ব্যাসে ২–৪ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫–১০ সে. মি. হয়। কতদিন পর পর ফুল ধরে তা জানা নেই, তবে মাঝে মধ্যে ছিটেফোটা ফুল ধরতে দেখা যায়। প্রধানত কাছালঙ্গ ও সীতা পাহাড় এলাকায় কর্ণফুলী নদীর দুই ধারের রসাল নরম মাটিতে কালিছেরী বাঁশ ঠাসাঠাসি অবস্থায় ঝাড় বেঁধে জন্মায়। অন্যান্য যে যে জাতের বাঁশের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে জন্মে তম্মধ্যে ডুলু বাঁশই প্রধান।

বেড়া দেওয়া, ডালা, কুলা ও মাদুর প্রস্তুতের কাজে এই বাঁশ প্রধানত ব্যবহৃত হয়।

ওড়া বাঁশ : ইহা একটি বৃহদাকার জাতের বাঁশ। মিশ্র বনের মধ্যে নালাসমূহের দুই ধারের উর্বর দোঁয়াশ মাটিতে ঝাড় বেঁধে জন্মে। বংশদণ্ড লম্বায় ৫০–৮০ ফুট অর্থাৎ ১৬–২৬ মি. ও ব্যাসে ৪–৬ ইঞ্চি বা ১০–১৫ সে. মি.। মাঝে মধ্যে ছিটাফোটা ও বহুদিন পর প্রচুর ফুল ধরে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে শেষবারের মতো ১৯২৭ সালে ছিটাফোটাও ১৯৭৯ সালে প্রচুর ফুল ধরতে দেখা গিয়েছিল।

মাদুর ও বেড়া নির্মাণের কাজে এই বাঁশে ব্যবহার করা হয়।

বাঁশ বাগান সৃষ্টি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় বনাঞ্চলে প্রচুর বাঁশ জন্মে। বনবিভাগীয় কর্মচারীদের মতে ঐ সমস্ত বনাঞ্চলে কৃত্রিম উপায়ে আর বাঁশবন বা বাগান সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে কর্ণফুলী কাগজের মিলের জন্য যে বাঁশের প্রয়োজন তার কিছু অংশের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ বাঁশবন সৃষ্টি করতে পারেন। আজকাল বাঁশ একটি দামি বস্তু। ইহার চাষ বৃদ্ধি করতে পারলে চাষীরা অবশ্যই লাভবান হবেন।

লোকালয়ে চাষীদের বসত বাড়ির আঙ্গিনার পিছনে সাধারণত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে কিছু কিছু বাঁশের চাষ করা হয়। ইহাতে তাহাদের সারা বৎসরের চাহিদা মিটে গেলেই তারা সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু আর কিছুটা বেশি চাষ করতে পারলে যে তারা যথেষ্ট লাভবান হতে পারেন তেমন ব্যাপারটা খুব হয়ত চিন্তা করে দেখেননি। উল্লেখ্য যে, বাঁশ চাষে তেমন একটা খরচও লাগে না।

বাড়ির আঙ্গিনা অথবা মাঠের বা বনের যে জায়গাই বাঁশ চাষের জন্য নির্বাচন করা হউক না কেন তা এমন উঁচু ধরনের হওয়া উচিত যাতে বৃষ্টির পানি সহজেই গড়িয়ে যায় আর মাটি জৈব পদার্থযুক্ত দোঁয়াশ বা বেলে—দোঁয়াশ হয়। বাঁশ চাষের জন্য জমিতে তেমন কোনো চাষের প্রয়োজন হয় না। তবে ঘাসগাছড়া বেশি থাকলে দুই একটা চাষ দিয়ে তা পরিষ্কার করে নেওয়ার পর নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা তৈয়ার করতে হয়। এক মাদা হতে অন্য মাদার দূরত্ব ১২ হতে ১৪ ফুট অর্থাৎ ৪–৫ মিটার রাখা যেতে পারে ; আর প্রতি মাদা ১৮ ইঞ্চি (৪৬ সে. মি.) ও ৯ ইঞ্চি (২৩ সে. মি. গভীরতা বিশিষ্ট হতে পারে। মাদায় পচা গোবর অথবা আজর্বনা সার দিয়ে ভরাট করতে হবে। ইহার পর উপযুক্ত সময়ে প্রতি মাদায় আগে হতে প্রস্তুত চারা লাগাতে হবে।

চারা প্রস্তুত : বাঁশের বীজ হতে চারা হলেও সে চারা দ্বারা বাঁশ জন্মাতে হলে ৭/৮ বৎসর সময় লেগে যায়। তাছাড়া বাঁশে বীজ সচরাচর একটা হয় না। এজন্য অঙ্গজ উপায়েই বাঁশ হতে চারা উৎপন্ন করে তা দ্বারা বংশবৃদ্ধি করা হয়। অংগজ উপায়ে চারি প্রকারে চারা উৎপাদন করা যেতে পারে : —

১. রাইজোম বা মূল কাটিংস (Rhizome cuttings) : সব রকম বাঁশের রাইজোম হয় ; সেই রাইজোম হতেই বাঁশঝাড়ে প্রতি বৎসর নতুন চারা বের হয়। অবশ্য বাঁশদণ্ডের গোড়ার চোঁখ হতেও নতুন নতুন চারা বের হয়। কোনো কোনো জাতের বাঁশের রাইজোম দ্রুত চারিদিকে ছড়ায়ে যায় আবার কোনো কোনো জাতে রাইজোম খুব একটা ছড়ায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত জাতের বাঁশের চাষে চারা উৎপাদনের জন্য রাইজোম ব্যবহার করা যেতে পারে। এক বৎসর বয়স্ক রাইজোমগুলি বাঁশঝাড়ের গোড়া হতে উঠায়ে প্রতিটি আলাদা আলাদা করে নিয়ে বীজতলায় পুঁতে দিতে হবে। দশ ইঞ্চি (২৫ সে. মি.) দূরত্ব ও ৬ইঞ্চি (১৫ সে. মি.) গভীরতায় প্রতিটি রাইজোম খাড়া করে এমনভাবে পুঁততে হবে যাতে ইহার কিছুটা অংশ মাটির উপরে থাকে। পরবর্তী বসন্তকালে রাইজোম নির্দিষ্ট বাগানের মাদায় লাগাতে হবে।

২. **বাঁশের কাণ্ডমূল** (Clump cuttings) : চারা প্রস্তুতের এই পদ্ধতিতে বাঁশঝাড়ের মধ্যবয়সী বাঁশ নির্বাচনের পর তা কোদাল বা শাবলের সাহায্যে মাটি খুড়ে গোড়াসহ তুলে নিতে হবে। আগভাগেই বাঁশের প্রায় সমুদয় অংশ কেবল মাটির উপর হতে ১ মিটার গোড়ার সঙ্গে রেখে কেটে নিলে কাজ খুব সহজতর হয়। তৎপর সেগুলি বীজতলায় পুঁতে রাখতে হয়। বসন্তের আগমণে সেগুলিতে নতুন পাতা, শিকড়, রাইজোম ও শোষক (sucker) গজানোর পর সেগুলি নির্দিষ্ট বাগানে লাগানো হয়। আমাদের চাষী সমাজ সাধারণত এই পদ্ধতিতেই চারা করে নতুন বাঁশঝাড় সৃষ্টি করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে তারা চারা সরাসরি বাগানে লাগিয়ে থাকেন। বস্তুত বাঁশের বংশবৃদ্ধির জন্য ইহা একটি পুরাতন পদ্ধতিও বটে।

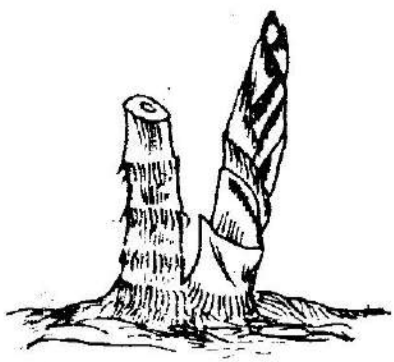

চিত্র : ১৩. ১ : বাঁশের কাণ্ডমূলের চারা

৩. **পর্বসন্ধি বা গাইটের কাটিংস** (Nodal cuttings) : আখের দণ্ড দুই তিনটি গাইটসহ কেটে টুকরা টুকরা করে চারার জন্য যেভাবে ব্যবহার করা হয় বাঁশের বেলাতেও তা সম্ভব। আঁখ ও বাঁশ একই পরিবারভুক্ত বলে হয়ত তা সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিতে সাধারণত এক হতে দুই বৎসর বয়সের বাঁশ দুই হতে তিনটি চোঁখ বা গাইটসহ করাতের সাহায্যে টুকরা টুকরা করে কেটে নেয়ার পর বীজতলার নরম মাটিতে বা বালিতে ৪৫° কোণ করে পুঁতে দেওয়া হয়। দুই বা তিন মাসের মধ্যেই কাটিংসে শিকড় ও চারা বের হয়। পর পরই সেগুলি বাগানের নির্দিষ্ট মাদায় রোপণ করে দিতে হয়।

৪. **বাঁশের গোড়ার কাটিংস** (Basal cane cuttings) : এক হতে দুই বৎসর বয়স্ক বাঁশ আগার দিক হতে কিছুটা বাদ দিয়ে দশ সে. মি. গভীর পরীখাতে সমান্তরালভাবে পুঁতে দিত হয়। দুই বৎসর পর প্রত্যেক গাইটের চোঁখ হতে চারা বের হয়। নির্দিষ্ট সময়ে চারাগুলি আলাদা আলাদা করে বাগানের প্রতিটি মাদায় বা গর্তে লাগায়ে দিতে হয়।

বাগানের চারা রোপণ : উপরে বর্ণিত যে কোনো পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করে সেগুলি নির্দিষ্ট বাগানে সময়মত রোপণ করতে হবে। চৈত্র–বৈশাখ হতে আরম্ভ করে বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত মাদায় চারা রোপণ করা যায়। রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে চারার

গোড়া আগে যে পর্যন্ত মাটির নিচে ছিল সেই পর্যন্ততই যেন পোঁতা হয় আর চারার আগা যেন ভেঙ্গে না যায়। রোপণের পর পরই গোড়ায় কিছু পানি দিতে হবে।

বাগানের পরিচর্যা : প্রথম দুই এক বৎসর বাগান ফাঁকা থাকে বলে তাতে প্রচুর ঘাস জন্মাতে পারে। এই সময় ঐ সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। ইহা ছাড়া তেমন আর কোনো পরিচর্যা নেই।

বাঁশের কচি ডগা গরুবাছুর ও অন্যান্য জীবজন্তু খেয়ে নষ্ট করতে পারে। সেজন্য ৪/৫ বৎসর পর্যন্ত বাগান যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে হবে। পরবর্তী কয়েক বৎসরে বাঁশবাগান ঘন হয়ে ঝাড় বেঁধে গেলে তখন কোনো জীবজন্তু বাগানের আর তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

বাঁশবাগানের পরিচর্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রতি বৎসর বাগানে ঝাড়ের গোড়ায় মাটি ও জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা ও বাগানের তলা পরিষ্কার রাখা। তাই খনার বচনে দেখা যায়—

ফাল্গুনে আগুন
চৈতে মাটি
এই হলো বাঁশের পরিপাটি

বাঁশবাগান পরিচর্যায় খনার উপর্যুক্ত বচন নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানসম্মত, কারণ মাটি ও আবর্জনা বা পচা গোবর সার প্রতি বৎসর ঝাড়ের গোড়ায় দিলে সুস্থ ও সবল শোষক বের হতে দেখা যায়। আগুন দিলে বাগানের সমস্ত ঝড়া পাতা ও আবর্জনা পুড়ে ছাই হয়ে সারের কাজ করে ; তদুপরি অনিষ্টকারী রোগ জীবাণু ও কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়ে যায়। তবে আগুন দিবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে তা যেন মৃদুভাবে দেওয়া হয় ও সে কাজ অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করা হয় ; তাতে তখন কচি শোষক ও বাঁশ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না।

সার হিসাবে 'ফিস্‌মিল' (Fish-meal) বা শুটকী মাছের গুড়াও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যে জৈব সারই ব্যবহার করা হোক না কেন তা ঝাঁড়ের মাটি হাল্কাভাবে কোপায়ে তৎসঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটি বেশি গভীরভাবে কোপালে ঝাড়ের ক্ষতি করা হবে, কারণ বাঁশের শিকড় মাটির বেশ উপরের স্তরেই থাকে, ফলে সেগুলি অধিক হারে কাটা পড়বে।

রোগ-বালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ বঁশঝাড়ে অন্যান্য ফসলের চাইতে কম হলেও কোনো কোনোটির আক্রমণে ঝাড়ের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। কাজেই সেদিকে দৃষ্টি রেখে বাগানের পরিচর্যা করতে হয়। কখনো কখনো বাঁশে ইঁদুরের উপদ্রব দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন যে বৎসর বাঁশে ফুল ধরে সেই সময়ই নাকি ইদুরের আক্রমণ অনেক বেশি হয়।[৫] ওয়ারফারিন (Warfarin) নামক ঔষধ দ্বারা ইঁদুর দমনে রাখা যায়। বাঁশের গোড়ার দিকে কোনো কোনো সময় উঁইপোকার আক্রমণ দেখা যায়। অলড্রিন (Aldrin) অথবা ডাইঅলড্রিন (Dialdrin) দ্বারা বাঁশের গোড়ার মাটি ৭-৮ সে. মি. পর্যন্ত ভিজিয়ে দিলে উঁইকোপা দমন করা যায়। কুকুর, বিড়াল, শুকর ও হাতীর পাল বাঁশের কচি ডগা নষ্ট করতে পারে। উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সেগুলির হাত হতে বাঁশবাগান রক্ষা করা প্রয়োজন। Earwring Thrips নামে এক প্রকার পোকা বাঁশের পাতা খেয়ে বাঁশপাতা নষ্ট করে দিতে পারে। [illegible] নামক এক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ [illegible] পোকার আক্রমণ বন্ধ করা [illegible]

গ্রীষ্মকালে বাঁশে স্মাট (smut) নামে এক রকম রোগ দেখা দিতে পারে। স্মাট রোগ বাংলাদেশসহ ভারত ও ব্রহ্মদেশেও দেখা যায়। রোগ দেখা দেওয়া মাত্র আক্রান্ত গাছ সমূলে উৎপাটন করে অনেক দূরে ফেলে দিতে হবে অথবা শুকায়ে আগুণে পোড়ায়ে ফেলতে হবে। 'মেলানকোনিয়াম' (melan conium) আর এক প্রকার রোগ বাঁশে দেখা দিতে পারে। ইহার আক্রমণে কঁচি বাঁশের গোড়ায় আক্রান্ত স্থানে প্রথমে কালো দাগ পড়ে এবং আস্তে আস্তে তাহা উপরের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আক্রান্ত গাছ যথাশীঘ্র কেটে ফেলতে হবে। যত দিন পর্যন্ত না নিরোগ শোষক বাহির হবে ততদিন পর্যন্ত বাঁশ বার বার কেটে ধ্বংশ করে দিতে হবে। বাঁশের কাটা স্থানে গন্ধক চূর্ণের প্রলেপ দিলে ভালো হয়।

বাঁশ কাটা : বাঁশ তিন বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরিপক্কতা লাভ করে। কাজেই ঝাঁড়ের তিন বছরী বাঁশ সব সময় কাটতে হয়। কাটার সময় মাটির উপর হতে একটি মাত্র গিট রেখে বাঁশ কাটা বাঞ্ছনীয়। বেশি লম্বা করে কাটলে বাঁশঝাড়ের ক্ষতি হয়, তাছাড়া পরবর্তী সময়ে বাঁশ কেটে ঝাড় হতে বের করে আনা খুব কষ্টসাধ্য হয়। সময়ের কথা বিবেচনা করলে পৌষ মাঘ মাসে অর্থাৎ শীতের সময় বাঁশ কাটা উচিত।

বাঁশ ব্যবহারে সুফল লাভ করতে হলে সব সময়ই সুপরিপক্ক বাঁশ কাটতে হবে। কাঁচা অবস্থায় বাঁশ কাটিলে তা দুর্বল হয় ; যে কাজেই তখন তা ব্যবহার করা হউক না কেন এক রকম বাঁশ ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণে তা জর্জরিত হয়ে যায়।

বাঁশের ব্যবহার : বাঁশের ব্যবহারের কথা বলে শেষ করা যায় না। বাঁশ চাষী তথা পল্লীবাসীদের যেন চিরসাথী। জন্মের পর হতে যে বাঁশের সঙ্গে তার পরিচয় মৃত্যুর পরও সেই বাঁশ তার কবর ও চিতায় সাথী হয়। ঘর-বাড়ি নির্মাণের সরঞ্জাম হতে কৃষি সরঞ্জাম যেমন খুঁটী, চালা, বেড়া, জোয়াল, মই, ডুলা, কুলা, চালনী ইত্যাদি বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত হয়। মাছ ধরার রকমারি ফাঁদ যেমন চাই, ডিয়র, পল, খলই, ছিপ, চাষীরা বাঁশ দ্বারা তৈরি করে থাকেন। বাজারে বেতের যে সমস্ত আসবাবপত্র দেখা যায় সেগুলির অধিকাংশ বাঁশ সহযোগে প্রস্তুত হয়। নানা রকম খেলনা ও সৌখিন দ্রব্য যেমন ফুলদানি, ছাইদানি, নৌকা ইত্যাদি বাঁশ হতে তৈরি করা হয়ে থাকে। জাপানে বাঁশ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যেমন স্লাইড রুল (Slide rule) প্রস্তুতেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

শহরে-বন্দরে দালানকোঠা নির্মাণের কাজে বাঁশ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সহজেই চোখে পড়ে। পার্বত্য এলাকায় কাঠ কাটার পর পার্বত্য নদীপথে ভাসিয়ে লোকালয়ে আনার কাজে বাঁশকে ভেলারূপে (Raft) ব্যবহার করা হয়।

কচি বাঁশের ডগা সব্জীর মতো চীন ও জাপানে প্রচুর ব্যবহার করা হয়। এই দু'দেশ হতে বাঁশের ডগা ইউরোপ ও আমেরিকার কোনো কোনো দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে।

বাঁশ ব্যবহারের চমকপ্রদ ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। কথিত আছে রেশম কীটের ডিম সুদূর চীনদেশ হতে পশ্চিম গোলার্ধে বাঁশের চোঙের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছিল। বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কোপোলোর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ দেখা যায় যে চীনারা মাটির নিচ

হতে বাঁশের চোঙের সাহায্যে তৈল উত্তোলন করতো। ঔষধ-পত্র তৈরিতেও চীনারা বাঁশের ব্যবহার করতো—বাঁশের মধ্যকার এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য অসুখ-বিসুকের প্রতিশেধক হিসেবে প্রয়োগ করা হতো। গাঁইটের মধ্যকার সিলিকা (Silica) কোনো কোনো খাদ্যদ্রব্য পরিশোধনে ব্যবহার করা হতো। প্রাচ্যের সাহিত্যে বাঁশকে চারিটি মহৎ উদ্ভিদের (noble plants) একটি ধরা হয় ; অপর তিনটি উদ্ভিদ হলো ১. অর্কিড (Orchid, ২. পাম (palm) এবং ৩. চন্দ্রমল্লিকা (Crysenthemum)।

রাবার

আধুনিক সভ্য দুনিয়ার এক বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে রাবার। মটরগাড়ি, বাস, ট্রাক, পিক্-আপ, উড়োজাহাজ, মটর সাইকেল বাই-সাইকেল ইত্যাদি যান-বাহনের চাকার টায়ার ও টিউব তৈয়ার হয় এই রাবার হতে। ইহা ছাড়া আরো বহুবিধ জিনিস, যেমন— ফুটবল, ভলিবল খেলনা ও বৈদ্যুতিক তারের 'ইনসুলেশন' (Insulation) প্রস্তুত করা হয় রাবার দ্বারা। Hevea brasiliensis Muell. Arg. নামে এক প্রকার বৃহদাকার গাছের দুগ্ধবৎ কষ বা রসই হলো রাবারের সর্বপ্রধান ও সর্বোত্তম উৎস। এই গাছ ব্রাজিল দেশের প্যারা প্রদেশে স্বাভাবিকভাবে প্রচুর জন্মে। এই প্যারা প্রদেশের নাম অনুসারেই এই জাতীয় রাবার 'প্যারা রাবার' (para-rubber) নামেও অভিহিত। প্যারা রাবার ছাড়া আরো ছয় প্রকার বৃক্ষ এবং সাত প্রকার ছোট ও লতাজাতীয় গাছ হতে রাবার কষ পাওয়া যায়। সেই গাছগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ১০

1. Manihat glaziovii (Cerea-rubber)
2. Castalloa elastica (Castalloa rubber)
3. Ficus elastica (Assam rubber)
4. Mimusops globosa (Balata rubber)
5. Fentuma elastica
6. Bleekrodea tonkinensis
7. Landolplina (Kirkii, Watsonii, spps.)
8. Cryptostegia grandiflora (Madagascar rubber)
9. Parthenium argentatum (guayale rubber)
10. Taraxicum spps, (Russian dandelion)

উপরোক্ত গাছগুলির কষ হতে রাবার প্রস্তুত করা গেলেও ব্যবসাভিত্তিক রাবার উৎপাদনের দিক হতে সুবিধাজনক নয় এবং মানগত দিক হতেও প্রথমোক্ত প্যারা-রাবারের চাইতে অনেক নিকৃষ্ট। এই কারণে প্যারা-রাবারই পৃথিবীর রাবার উৎপাদনকারী সমস্ত দেশে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে এবং ব্যবসাভিত্তিক হিসেবে ইহার চাষ করা হচ্ছে। তবে Russian dandelion আজকাল রাবার উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সেই দেশে যথেষ্ট পরিমাণে চাষ করা হচ্ছে।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্যারা রাবারের আদি নিবাস ব্রাজিল দেশ। আমাজান নদীর নিম্নাঞ্চলের উভয় তীরে প্যারা প্রদেশে ইহা স্বাভাবিকভাবে প্রচুর জন্মে।[১৪] সেই অঞ্চল হতে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে হেনরী উইকহ্যাম নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের চাতুর্যে প্রাচ্যের দেশ শ্রীলঙ্ককায় প্রথমে ইহা আনীত হয় এবং সার্থকভাবে ইহার চাষ সে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৪] তৎপর এখান হতে অন্যান্য নিরক্ষীয় ও অবঃনিরক্ষীয় দেশসমূহ যেমন— মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া (জাভা, সুমাত্রা বোর্ণিও) বার্মা ও ভারতের দক্ষিণাত্যে রাবার চাষ সম্প্রসারণ লাভ করে। ইহা ছাড়া পরবর্তীকালে পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকা, ভেনিজুয়েলা; ইকুয়েডর, কলম্বিয়া এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রাবার চাষ বিস্তার লাভ করে।

বাংলাদেশে রাবার চাষ

বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে ১৯৮১ সাল হতে রাবার চাষ শুরু হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিলেট, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় মোট ১১টি বাগানে ১০১১৭ হেক্টর জমি রাবার চাষের আওতায় আনা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮৬–৮৭ সালে মধুপুর এলাকায় ৬০৭০ হেক্টর জমিতে রাবার চাষ আরম্ভ করা হয় এবং ১৯৯৫ সালের মধ্যে তা সম্পন্ন হয়। এতে করে বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থার রাবার চাষ প্রকল্পের অধীনে ১৬১৮৭ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের কাজ সমাধা করা হয়। অপরদিকে ভূমিহীন ও প্রান্তিক উপজাতীয় পরিবারদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ৩২৩৭ হেক্টর জমিতে রাবার চাষ করা হয় এবং সে জমির গাছে ১৯৯১ সাল থেকে উৎপাদন শুরু হয়। দেশে রাবার চাষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি খাতের সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করত থাকেন। এ উদ্দেশ্যে সরকার ৮০৯৪ হেক্টর পতিত খাস জমি ব্যক্তি মালিকানায় বরাদ্দের এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন। এ পরিকল্পনার অধীনে বান্দরবন পার্বত্য জেলায় ইতোমধ্যে ১০ হেক্টর করে ৩৮৭ জন লোককে মোট ৩৯১৫ হেক্টর জমি বরাদ্দ করা হয়। তাছাড়া সিলেট ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন পায় ৩০টি রাবার বাগানে কাজ শুরু করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে ১৯৯২ সাল নাগাদ ৮০৯৪ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের কাজ সম্পন্ন হয়।[৪]

মাটি ও ভূমির উষ্ণতা

বিভিন্ন প্রকার মাটিতে রাবার গাছ জন্মাতে পারে। নদ–নদী বিধৌত উপত্যকার যেখানে প্রতি বৎসর নতুন পলিমাটি জমে এমন জমি হতে শুরু করে বোঁদ মাটি (swampy soil), অধিক জৈব পদার্থযুক্ত পীট মাটির ন্যায় মাটি এবং পাহাড়ি অঞ্চলের অধিক নাইট্রোজেনযুক্ত উর্বর মাটি রাবার চাষের জন্য সুপোযোগী। লাল লেটারাইট (red laterite), দোঁয়াশ ও এটেঁল

দোয়াশ মাটিতেও রাবার চাষ করা যায়। লৌহ এবং এলুমিনার আধিক্য ভারতের রাবার জমির একটি বৈশিষ্ট্য।[১০]

চা, কফি ও রাবার – এই তিনটি বনজ ফসলই পার্বত্য অঞ্চলের গভীর ও সুনিষ্কাশিত মাটিতে ভালো জন্মে। তবে নিম্ন সমভূমি বা উপত্যকায় যেখানে পানি নিষ্কাশন অসন্তোষজনক বা পানির স্তর মাটির উপরিস্তরের খুব কাছাকাছি এমন ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ফসল দুইটি অর্থাৎ চা ও কফির চাষ অসম্ভব, সেক্ষেত্রে বৈচিত্রের বিষয় এই যে তেমন জমিতেও রাবার চাষ সম্ভবপর হয়।

উপর্যুক্ত বর্ণনা হতেই বোধগম্য হয় যে রাবার বিভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট জমিতে জন্মাতে সক্ষম। তাই পৃথিবীর রাবার উৎপাদনকারী দেশগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে রাবার সমুদ্র সমতল হতে আরম্ভ করে ১০০০ হতে ১৩০০ মিটার উচু পর্যন্ত ভূমিতেও উৎপাদিত হচ্ছে।

জলবায়ু

রাবার চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন আর বৃষ্টিপাত সারা বৎসর সমভাবে বিস্তৃত থাকলে অধিক ফল লাভ হয়। বৎসরে কমপক্ষে ৬০ ইঃ অর্থাৎ ১৫২ সে. মি. বৃষ্টিপাতের দরকার তবে ১০০ ইঃ অর্থাৎ ২৫৪ সে. মি. পর্যন্ত বৃষ্টি হলেও কোনো ক্ষতি হয় না।

তাপমাত্রার কমবেশির দিক হতেও রাবার বেশ সহনশীল যদিও আদি নিবাস ব্রাজিলে সারা বৎসর প্রায় একই রকম তাপমাত্রার মধ্যে রাবার জন্মায়। শ্রীলঙ্কা ও ভারতে দেখা গিয়েছে যেখানে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ অপ ৫৩° সে. এবং শীতকালে সর্বনিম্ন ৩৩° সে. হয় সেই পরিবেশেও রাবার বাগান বিনা ক্ষতিতে টিকে থাকে। তবে বেশির মধ্যে ১৫২০–১৭৮০ মিঃ মিঃ সুবিস্তৃত বৃষ্টিপাত, অধিক আর্দ্রতা এবং ৩৬° হতে ৪৭° সে. পর্যন্ত তাপমাত্রা রাবার চাষের জন্য আদর্শ স্থানীয়।[১০]

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়

প্যারা রাবারের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম যে Hevea brasiliensis Muell Arg তা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইহা Euphorbiaceae পরিবারভুক্ত বহুবর্ষজীবী একটি বৃহদাকার উদ্ভিদ। আমগাছের ন্যায় ইহার প্রধান মূল বেশ গভীরতায় প্রবেশ করে ; পার্শ্বদেশ হতে বড় বড় শাখামূল বের হয় এবং গাছ বেশ লম্বা হয় (২৪–২৭ মি.)। কাণ্ড সরল ও মসৃন এবং বেশ উচু পর্যন্ত কোনো শাখা প্রশাখা বের হয় না, পরে গাছের আগায় অনেক শাখাপ্রশাখাযুক্ত সবুজ পত্রাচ্ছাদন লক্ষ্য করা যায় (আলোকচিত্র ১৩.২)। গাছ পত্রমোচী হলেও দুই তিন সপ্তাহের বেশি পত্রবিহীন থাকে না। একই গাছে ঘন্টাকৃতির পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ধরে ; ফল একটি কেপসুল। যথাসময়ে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর–অক্টোবর মাসে ফল পাকার পর তা ফেটে বীজ বের হয়ে আসে। উল্লেখ্য যে রাবার বীজ তৈলযুক্ত, তাতে শতকরা ৩৫ ভাগ তৈল থাকে।[১০]

রাবার বাগান সৃষ্টি

রাবার গাছ যে পরিবেশে অর্থাৎ মাটি ও জলাবায়ুতে জন্মায় তা বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে বর্তমান রয়েছে বিশিষ্ট বিজ্ঞজনের ইহাই অভিমত। তাদের মতে দেশের এক বিরাট অঞ্চল রাবার চাষের আওতায় আনয়ন করা যায়। সেই প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের রামু পাহাড়ি এলাকায় প্রথমে রাবার বাগান সৃষ্টি করা হয় ১৯৫০ সালে আর সেই বাগান হতে উৎপাদন শুরু হয় ১৯৫৯ সালে।[১৫] তৎপর রাবার বাগানের এলাকা কি পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে তা ইতঃপূর্বেই আলোচনা হয়েছে।[২] নতুন রাবার বাগান কিভাবে সৃষ্টি করা যায় এমন তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে।

১. **জঙ্গল পরিস্কার করা :** বাগানের জন্য নির্ধারিত ও চিহ্নিত এলাকা হতে পাহাড়ি ঝোপ–জঙ্গল কেটে পরিস্কার করে নিতে হয়। তৎপর আগুন লাগায়ে দিলে বাকি জঙ্গল পুড়ে একেবারেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ইহাতে আরো লাভ হয় যে মাটিতে বসবাসকারী কীটপতঙ্গ ও রোগ–জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মাটিতে কিছু পরিমাণ পটাশ সারের যোগসাধন হয়।

চিত্র : ১৩.২ বাগানে রাবার গাছ

২. পিট (pit) বা মাদা তৈরি করা : বাগানে গাছ ঘন কি পাতলা করে লাগান হবে তার উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাদা তৈরি করতে হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে রাবার উৎপাদনের আশায় বেশি গাছ রোপণ করে পরবর্তী পর্যায়ে কিছু সংখ্যক গাছ কেটে দিবার পরিকল্পনা থাকলে সেই ক্ষেত্রে ১০´ × ১০´ (৩ মি. × ৩ মি.) অথবা ১২´ × ১২´ (৩.৮ মি × ৩.৮ মি) মাপে মাদা তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থায়ী গাছ রোপণের পরিকল্পনা থাকলে সেই ক্ষেত্রে ২০´ × ২০´ (৬.৫ মি. ৬.৫ মি.) মাপের ব্যবধানে পিট প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। আড়াই হতে তিন ফুট অর্থাৎ ৭৬ সে.-১ মি বর্গাকার ও গভীর করে প্রতিটি মাদা তৈরি করত তার প্রত্যেকটিতে জঙ্গলের পচা পাতাসহ উর্বর মাটি দিয়ে ভর্তি করে দিলে চারা রোপণের জন্য মাদা প্রস্তুত হয়ে যায়।

৩. চারা উৎপাদন : দুইভাবে রাবারের চারা উৎপাদন করা যায়—বীজ দ্বারা অথবা চোঁখ কলম দ্বারা। রাবার চাষের প্রথম অবস্থায় পৃথিবীর সর্বত্র বীজ হতেই চারা তৈরি করা হতো। সর্বপ্রথম ১৯১৫ সালে জানা গেল যে চোঁখ কলমের সাহায্যেও চারা উৎপাদন করা যায়।[৫] সেই সময় হতেই শেষোক্ত প্রকার চারা উৎপাদন করার প্রবণতা দেখা যায় এবং আজকাল এই প্রথায় চারা উৎপাদন করেই প্রধানত রাবার বাগান সৃষ্টি করা হয়।

আমাদের দেশে মালয়েশিয়া হতে বাড় (bud) বা চোঁখ আমদানি করে এইরূপ চারা উৎপাদনের মাধ্যমে নতুন বাগান সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ক. বীজ হতে চারা উৎপাদন ও রোপণ : রাবার জীবনী শক্তি খুবই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং বীজ সংগ্রহ করার পর পরই বীজতলায় বপন করে ফেলতে হয়। রাবার গাছের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে একই পরিবেশে বাগানের কোনো কোনো গাছ হতে অধিক পরিমাণে কষ উৎপাদন করে। কাজেই যে গাছগুলি বেশি পরিমাণে কষ তথা রাবার উৎপাদনে সক্ষম তেমন গাছসমূহ হতে বীজ সংগ্রহ করা সুবিবেচনার কাজ। এইভাবে বীজ সংগ্রহ করার পর সারি করে বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে—এক সারি হতে অন্য সারির মধ্যে দূরত্ব ৩০ সে. মি. এবং সারিতে এক বীজ হতে অন্য বীজের দূরত্ব ২৩ সে. মি.। বীজতলার উপরে ৩/৫ মিটার উচু করে একটি খড়কুটার চালা উঠিয়ে কঁচি চারাকে রোদ-বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করতে হয়। বীজতলায় লাগানোর ১০/১২ দিন পর বীজ অঙ্কুরিত হয়। পরবর্তী সময়ে বীজতলায় আগাছা পরিষ্কার এবং সময় ও প্রয়োজনমতো পানি সেচ করলে রাবারের চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ছয় মাসের মধ্যে চারা ৩/৪ ফুট অর্থাৎ ১ মিটারের মতো উঁচু হয়। এই বয়সের চারাই বাগানের পূর্ব প্রস্তুত মাদায় লাগায়ে দিতে হয়। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে বীজতলায় চারা না উঠায়ে বাঁশের ছোট ছোট খাঁচায় অথবা মাটির ভাণ্ডে মাটি ভর্তি করে তাতেও চারা উঠানো যায়। এভাবে উৎপাদিত চারা সহজেই নাড়াচাড়া করা যায় এবং বাগানে লাগাবার পর কদাচিৎ মারা যায়। উপর্যুক্ত দুই প্রথার কোনোটিতে না যেয়ে বীজ সরাসরি বাগানের মাদায় বপন করে দেওয়া যায়। এই নিয়মে প্রতি মাদায় দুই তিনটি করে বীজ বপন করতে হয় ; চারা জন্মাবার পর সব চেয়ে বলবানটি রেখে বাকিগুলি উঠায়ে দিতে হবে।

খ. চোঁখ কলমের সাহায্যে চারা উৎপাদন ও রোপণ : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রাবার বাগানের একই পরিবেশে একই বয়সের চারা একটি অপরটি হতে অধিক পরিমাণে কষ উৎপাদন করে থাকে। এই পার্থক্য এতই প্রকট যে দেখা গিয়েছে কোনো একটি গাছ

অপর আরেকটি গাছ হতে দশগুণ অধিক রাবার উৎপাদনেও সক্ষম। গত কয়েক বৎসরের এইরূপ ফলাফল দেখে বাগানের কয়েকটি গাছ চিহ্নিত করতে হয়। গাছের এইরূপ চিহ্নিতকরণকে বলা হয় 'ক্লোনাল নির্বাচন' (Clonal selection) এইরূপে নির্বাচনের মাধ্যমে জাভা, সুমাত্রা ও মালয়েশিয়ায় রাবার হতে উৎকৃষ্ট মানের ক্লোন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। উহাদের কয়েকটির উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো।[১০, ১৫]

১. AVROS (সুমাত্রা)
২. B.D (জাভা)
৩. The Tiar (জাভা)
৪. Dis (জাভা)
৫. Sabrang (মালয়েশিয়া)
৬. Rubana (মালয়েশিয়া)

এইরূপ নির্বাচিত ক্লোন হতে চোঁখ কলম নিয়ে বীজতলায় জন্মান এক হতে দেড় বৎসর দ্রুত বর্দ্ধনশীল চারা গাছে তা লাগাতে হয়। কুয়াশা ও মেঘমুক্ত দিনে কলমের কাজ করা বিধেয়। বাগানে সরাসরি লাগান চারা গাছেও এইভাবে বর্ম চোঁখ কলম সংযোজন করা যায়। বীজতলায় চারাগাছ লাগান কলম লেগে উঠলে তৎপর সেই গাছ বাগানে স্থানান্তর করতে হয়। এই সময় যদি চারা গাছের উচ্চতা ছয় ফুট অর্থাৎ প্রায় ২ মিটারের বেশি হয় তা হলে সেই উচ্চতার কিছু উপরে গাছের ডগা (আগা) ভেঙ্গে দিলে ভালো হয়। পরবর্তী সময়ে চারাগাছ যখন কষ আহরণোপযোগী বয়ঃসীমায় পৌছাবে তখন সেটির কাণ্ড সুঠাম ২ মিটার দৈর্ঘবিশিষ্ট হবে যা হতে যাতে কষ আহরণ করা সুবিধাজনক হবে।

বাংলাদেশে আগে যে সমস্ত রাবার বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলি বীজের চারা দ্বারাই করা হয়েছে। আজকাল রাবার চাষে অগ্রগামী অন্যান্য দেশের মতো এই দেশেও চোঁখ কলমের চারা উৎপন্ন করে বাগান সৃষ্টি করা হচ্ছে। মালয়েশিয়া হতে এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত উন্নতমানের ক্লোন হতে চোঁখ আমদানি করা হয় সেগুলির হলো — 1. PRIM 600, 2.PB 5/51, 3. PR 107, 4. PB 160 ইত্যাদি।*

৪. **বাগানের পরিচর্যা :** চা ও কফি বাগানের মতো রাবার বাগানে কোনো ছায়া প্রদানকারী গাছ জন্মাবার প্রয়োজন হয় না। বাগানে চারা লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছু আগে সারির মাঝে শিম্বীজাতীয় গাছ, যেমন– বগা মেড্রলা (Tephrosia candida), বরবটি বা ম্যাটিকলাই চাষ করতে হয়। যথাসময়ে সেই গাছ কেটে ও কোপায়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে জমিতে জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের যোগসাধন হয় যা চারা রাবার গাছের বৃদ্ধির জন্য অতীব প্রয়োজন। এইভাবে প্রথম কয়েক বৎসর রাবার বাগান কোপালে আগাছা দমন হয়। জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন যোগ হয়। এতে চারা গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় ; যুপোযোগী পরিবেশে বৃদ্ধি এত দ্রুত হয় যে প্রতি বৎসরে তা ১ মিটার পর্যন্ত হতে এবং এই হারে বৃদ্ধি ৪/৫ বৎসর পর্যন্ত চলতে পারে। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে একটি রাবার গাছ ২৬ মিটার পর্যন্ত উচু এবং ৪ মিটার ঘেরযুক্ত (girth) হতে পারে।

---

* রাবার প্রকল্পের পূর্বতন ম্যানেজার ড. রুহুল আমিনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে

উর্বর জমি হলে রাসায়নিক সার ব্যবহার না করলেও চলে, তবে অনুর্বর জমিতে ও পুরানো বাগানে নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ইহাতে গাছের বৃদ্ধি সুঠাম হয় এবং গাছ অধিকতর কষ প্রদান করে। ফসফরাস ও পটাশ সার ব্যবহারে তেমন কোনো ফল পাওয়া যায় না।

রাবার গাছে কীট পতঙ্গের আক্রমণ তেমন কিছু না হলে ও রোগের আক্রমণ যথেষ্ট হয় এবং কোনো কোনোটির আক্রমণ বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষণে এইরূপ কয়েকটি মারাত্মক রোগের কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

ক. গোলাপি ছাতাপরা রোগ (Pink disease) : Corticum salmoniolour নামে প্রকার ছাতার আক্রমণে এই রোগ দেখা দেয়। সাধারণত গাছের আনুভূমিক ডালাগুলির (Horizontal branches) তলদেশের চামড়া বা বাকলে রোগের আক্রমণে গোলাপি অথবা সাদা আবরণ পড়ে। আক্রান্ত অংশের চামড়া ফেটে গিয়ে ডালের কাষ্ঠাংশ হতে খসে পড়ে এবং পরিশেষে ডালা মারা যায়। বাগানে ছায়ার ভাগ কিছু কমলে ও ডালায় বোর্দো-মিকচার ছিটালে ক্ষতির হাত হতে কতকটা রক্ষা পাওয়া যায়। যে সমস্ত, গাছ মারা যাবার উপক্রম হয়েছে সেগুলি যথাশীঘ্র কেটে পুড়িয়ে ফেলাই ভালো।

খ. ব্রাউন ব্লাস্ট (Brown blast) : এই রোগের আক্রমণে প্রথমে গাছের কাটা অংশবিশেষ (Tapping area) হতে কষ পড়া বন্ধ হয়ে যায় ; তৎপর কাটা অংশের উপরে বাদামি দাগ পড়ে এবং পরিশেষে শুটী বা দানার সৃষ্টি হয়, তাতে আর কষ সংগ্রহ করা যায় না কোনো কোনো গাছ হতে অধিক কষ ক্ষরণ—এই রোগের একটি কারণ বলে মনে হয়। কষ নেওয়া বন্ধ করা, মাঝে-মধ্যে কষ নেওয়া অথবা আক্রান্ত অংশ ছেটে ফেলে তার উপর টার (Tar) অথবা সমজাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করলে কমবেশি সুফল পাওয়া যায়। আক্রান্ত অংশ হতে রোগ ছড়ায় বলে সেই অংশ cambium পর্যন্ত কেটে কষ নালীগুলি সম্পূর্ণরূপে ফেলে দেওয়াই মঙ্গল।

গ. কালসুতী রোগ (Black thread : Phytopthora meadii) নামে এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ দেখা দেয়। কষ নেওয়ার জন্য গাছের যে অংশ কাটা হয় সেই অংশের চামড়া প্রথমে ফুলে উঠে, তৎপর কাঠসহ চামড়া পচতে শুরু করে ; ক্রমান্বয়ে সমস্ত কাটা অংশ কালো গুড়াতে ঢেকে যায়। এই পরিস্থিতিতে কষ খুবই কম পাওয়া যায় এবং কষের গুণাগুণও নিম্নমানের হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে গাছের পাতাও ঝরতে থাকে, ফলে গাছ খুবই দুর্বল হয়ে যায়। রোগের আরো যাতে বৃদ্ধি না ঘটে সেজন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রথমত আর কষ না নিয়ে গাছকে সাময়িকভাবে বিশ্রামে দেওয়া ভালো আর দ্বিতীয়ত কাটা অংশের উপরে ইজাল (Izal) অথবা কার্বোলিনিয়াম (carbolineum) দ্বারা ঢেকে দিতে হবে অথবা টার (Tar) এবং টেলোর (Tallow) মিশ্রণের প্রলেপ দিতে হবে।

ঘ. ডাই ব্যাক রোগ (Die Back) : বীজতলার চারাগাছ ও বাগানের স্বল্প বয়স্ক গাছ এই রোগে আক্রান্ত হয়। মাটিতে বসবাসকারী এক প্রকার ছত্রাক গাছের জখমি থেতলানো অংশের মধ্য দিয়ে গাছে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করে। রোগাক্রান্ত গাছের ডালা শুকিয়ে আগা হতে নিচের দিকে মরে যেতে থাকে এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ গাছই মারা যায়। আগাছা,

জঙ্গল প্রভৃতি কেটে পুড়ে বীজতলা এবং বাগানের মাটি ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে এবং আক্রান্ত ডালাপালা কেটে ফেললে রোগের প্রসার দমনে রাখা যায়।

রাবারের কষ নেওয়া (Tapping for latex)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে রাবারের মূল উৎস হলো রাবার কষ। কাজেই বাগান মালিকের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সময়মতো গাছ হতে রাবার কষ নেওয়া। বাগানের গাছ যখন উচ্চতায় ও বেড়ে বেশ বড় হয়ে উঠে তখনই কেবল কষ নেওয়ার সময় হয়েছে বলে বুঝতে হবে। গাছের ৬/৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই এই উপযুক্ত সময় হয়, তবে যে বাগানের ঘন গাছ কিছু দিনের মধ্যে কেটে ফেলা হবে অথবা যখন রাবারের দাম বেশি—এই অবস্থায় ৪ বৎসর বয়সের গাছ হতেও কষ সংগ্রহ করা যায়। তবে এই কথা মনে রাখতে হবে যে কম বয়সী গাছের কষ হতে রাবার কষ পাওয়া যায় এবং প্রস্তুত রাবারও নিম্নমানের হয়।

ক. কষ নেওয়ার নিয়ম ও পদ্ধতি : রাবার গাছ হতে কষ বের করার জন্য যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি পালন করা আবশ্যক। গাছ ছয় ফুট উচ্চতার মধ্যে কাটা ভালো। কারণ, এই উচ্চতায় একজন লোক মাটিতে দাঁড়িয়ে সুবিধাজনকভাবে গাছ কাটতে পারে। গাছ কাটার কাজ দিবাভাগের প্রথম দিকে অর্থাৎ সকাল ৫টা হতে ১১টার মধ্যে করা ভালো ; দেখা গিয়েছে এই সময়ের মধ্যেই গাছ হতে কষ ক্ষরণ সর্বাধিক ও নিয়মিত হয়।

খেজুর গাছ কেটে যেভাবে রস বের করা হয়, রাবার গাছ কিছুটা সেইভাবে কেটেই রস বা কষ বের করা হয়, তবে প্রধান পার্থক্য হলো এই যে, খেজুর গাছের যেমন আগার দিকে কেটে রস বের করা হয় সে ক্ষেত্রে রাবার গাছের বেলায় তা করা হয় না, রাবারের কষ বের করার জন্য গাছ গোড়ার দিকে অর্থাৎ মাটি হতে ২ মিটার উচ্চতার মধ্যে কাটা হয় আর কাটার জন্য বিশেষ এক ধরনের চাকু ব্যবহার করা হয়।

দেখা গিয়েছে গাছের বাকল বা চামড়ার নিচে বেশ কিছু রাবার কষ-নালী কেম্বিয়ামের (Cambium) খুব কাছাকাছি দিয়ে উপর-নিচে চলে গিয়েছে। সুতরাং কষ পেতে হলে এই নালীগুলিকে আড়াআড়িভাবে কাটতে হবে। তবে খুব সাবধান থাকতে হবে যে কেম্বিয়াম যেন কখনো কাটা না পড়ে, কাটলে গাছের বিশেষ ক্ষতি হবে।

উপরোক্ত পূর্ব-শর্তগুলির কথা মনে রেখে রাবার গাছ কাটার নানা রকম পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ :—

১. স্পাইরেল কর্তন পদ্ধতি (Spiral cut method) : এই পদ্ধতিতে গাছের পরিধি বা ঘেরের (girth) অর্ধেক বা সমস্তটা তির্যকভাবে নিয়ন্ত্রিত গভীরতায় বিশেষ ধরনের চাকুর সাহায্যে কাটা হয়। কর্তনের শেষ বিন্দুতে একটি চুঙ্গি বা নালিকা (খেজুর গাছের ন্যায়) বসিয়ে তার নিচে একটা সংগ্রহপাত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। (আলোকচিত্র ১৩. ২)। রাবার-কষ নালিকা বেয়ে সেই সংগ্রহপাত্রে জমা হয়।

২. হেরিং মাছের কাটার ন্যায় পদ্ধতি (Herring-bone method) : এই পদ্ধতিতে গাছের ত্বক হেরিং মাছের কাটার ন্যায় কর্তন করা হয়। মাঝ বরাবর খাড়া কর্তিত লাইনের দুই দিকে অথবা এক দিকেও কাটা যায় (চিত্র ১৩. ২) যেভাবেই কাটা হউক না কেন রাবার-কষ কর্তিত পথে বাহির হয়ে মাঝ বরাবর কাটা পথের শেষ প্রান্তে প্রোথিত নালির মাধ্যমে সংগ্রহপাত্রে জমা হয়।

৩. **ভি-কাটা পদ্ধতি** (V-cut method) : সহজেই বোধগম্য যে এই পদ্ধতিতে রাবার গাছের ত্বক বা ছাল ইংরেজি 'V' অক্ষরের দুই ডানার মতো করে কাটা হয়। (চিত্র ১৩.২)। ইহাতে গাছের কষ দুই ডানা বেয়ে উহাদের মিলনস্থানে জমা হয়ে সেই স্থানে প্রোথিত নালীপথে সংগ্রহপাত্রে জমা হয়।

উপরে বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথমোক্ত অর্ধেক স্পাইরেল কাটা (Half spiral cut) পদ্ধতিই সর্বোত্তম। আমাদের দেশেও এই পদ্ধতিতে রাবার-কষ নেওয়া হয়। প্রতিদিনই গাছের ত্বক খুবই পাতলা পর্দার ন্যায় করে কেটে নিতে হয়। কাটা ঠিক হলে সঙ্গে সঙ্গেই কষ বের হয় এবং সংগ্রহপাত্রে জমা হয়। সংগ্রহ-ভাণ্ড প্রতিদিন গাছে লাগাবার আগে ইহার তলায় জমে যাওয়া রাবার-কষের পাতলা আবরণ উঠিয়ে ফেলে দিতে হয়। দুধ যেমন ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি জীবাণুর আক্রমণে ফেটে যায়, রাবার-কষও তেমনিভাবে ফেটে যেতে পারে। ফেটে যাওয়া কষ হতে ভালো রাবার প্রস্তুত করা যায় না। সেইজন্য গাছে ভাণ্ড বসাবার আগে তাতে কয়েক ফোঁটা ফরমালিন (formalin) যোগ করতে হয়, তা হলে কষ আর জমে না অর্থাৎ ফেটে যায় না।

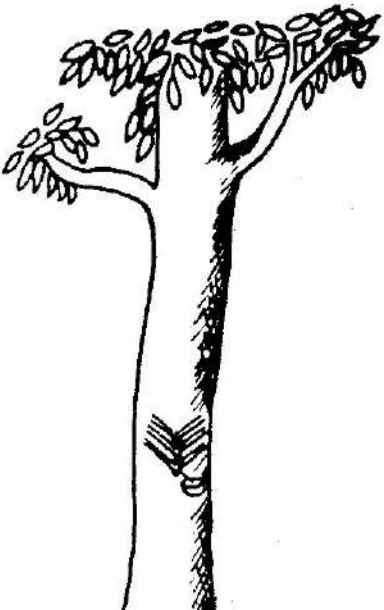

চিত্র : ১৩.২ হেরিং পদ্ধতিতে রাবার-কষ সংগ্রহ

খ. গাছ কাটায় বিরতি (Tapping interval) : খেজুর গাছ যেমন এক নাগাড়ে না কেটে মাঝে মাঝে বিরতি সহযোগে কেটে রস নেওয়া হয়, তদ্রূপ রাবার গাছেও মাঝে-মধ্যে বিরতি দিয়ে গাছ কাটা এবং কষ সংগ্রহ করা হয়।

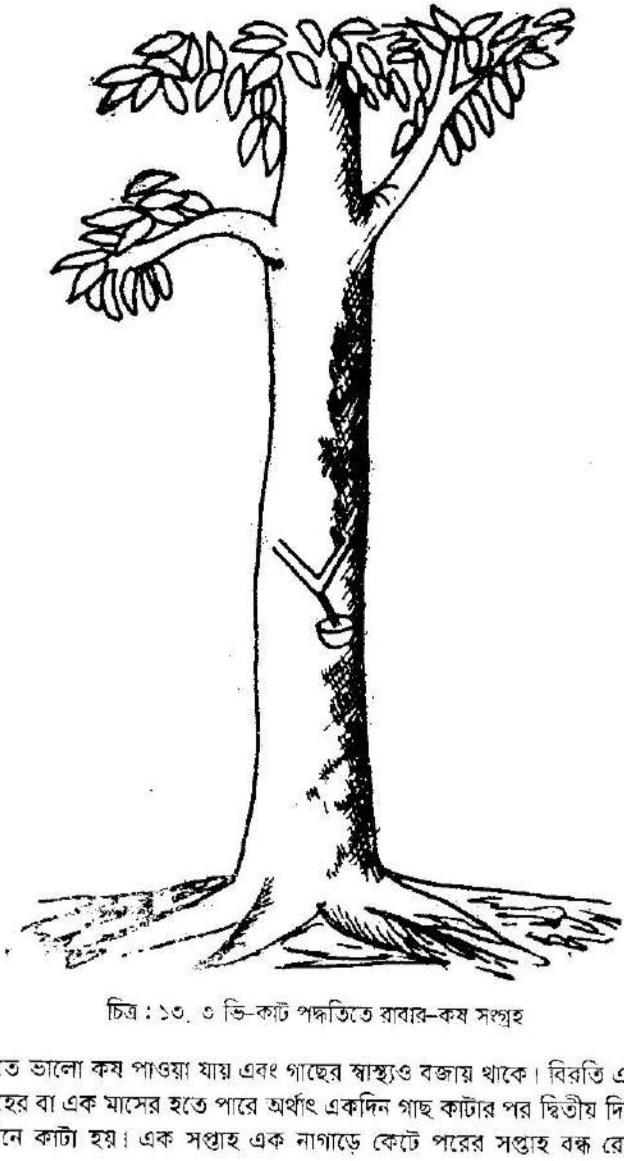

চিত্র : ১৩. ৩ ভি-কাট পদ্ধতিতে রাবার-কষ সংগ্রহ

ইহাতে ভালো কষ পাওয়া যায় এবং গাছের স্বাস্থ্যও বজায় থাকে। বিরতি এক দিনের, এক সপ্তাহের বা এক মাসের হতে পারে অর্থাৎ একদিন গাছ কাটার পর দ্বিতীয় দিন না কেটে তৃতীয় দিনে কাটা হয়। এক সপ্তাহ এক নাগাড়ে কেটে পরের সপ্তাহ বন্ধ রেখে আবার

পরবর্তী সপ্তাহ কাটা হয় ; এক মাসে ক্রমাগত কেটে দ্বিতীয় মাসে আর না কেটে তৃতীয় মাসে আবার কাটা হয়। এইভাবে কাটলে এক বৎসরে একটি গাছ ১৩০ হতে ১৬০ দিনের মতো কাটা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাবার গাছ হতে যখন পাতা ঝরতে থাকে এবং দিন মেঘলা ও বাদলা থাকে সেই সময়ও গাছ কাটা বন্ধ রাখা উচিত। যে রকম বিরতি সহযোগেই রাবার গাছ কাটা হউক না কেন তার অর্থ গাছকে কিছু না কিছু দুর্বল করে দেওয়া। সুতরাং এই রকম বিরতি ও পদ্ধতিতে গাছ কাটিতে হবে যাতে গাছের জীবন বিপদাপন্ন না হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, গাছের যে অংশ কষ সংগ্রহের কর্তন উপযোগী সেই অংশ বা অঞ্চলকে লম্বালম্বি তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে। এখন একটি অংশ এক বৎসর কাটিলে প্রতিটি অংশ দুই বৎসর করে বিশ্রাম পাবে। এই দুই বৎসরের বিশ্রামকালীন সময়ের মধ্যে সেই প্রতিটি অংশে আবার নতুন করে ত্বকের সৃষ্টি হবে যা কষ সংগ্রহের জন্য পুনর্বার কাটা যাবে। অন্যদিকে গাছ মায়াহীনভাবে কাটলে প্রতিদিন বা একদিন অন্তর গাছ কাটা হবে ; অর্ধেক স্পাইরেল কর্তন না দিয়ে পূর্ণ কর্তন দেওয়া হবে ; আবার অর্ধেক স্পাইরেল কাটলে একই সঙ্গে দুইটি অংশ কাটা হবে ইত্যাদি। এইভাবে বাগানের গাছ কাটিলে অচিরেই বিপদ দেখা দিবে। বাগানের মালিক একদিন দেখবেন অধিকাংশ গাছই দুর্বল হইয়া পড়েছে এবং কষ তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

গ. বাগানে সমস্ত কষ সংগ্রহ : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বাগানের প্রতিটি কর্তিত গাছে নালীর নিচে একটি কষ সংগ্রহ-পাত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই পাত্র এনামেল, টিন, এ্যালুমিনিয়াম অথবা নারিকেলের মালার অর্ধাংশ দ্বারা তৈরি হতে পারে। আমাদের দেশে মাটি নির্মিত ভাণ্ড ব্যবহার করতে দেখা যায়। প্রতিটি ভাণ্ডে সঞ্চিত কষ এক এক করে বড় একটি ভাণ্ডে, যেমন বালতিতে জমা করা হয়। এইভাবে বালতি ভর্তি কষ রাবার তৈরির কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই কারখানা রাবার বাগানের মধ্যেই অথবা নিকটবর্তী কোনো স্থানে হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে প্রতিদিনের সংগৃহীত কষ একই মানের হয় না। কোনো দুই চারিটি গাছের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, গাছের বয়স, কষ সংগ্রহের দিন বা ঋতু প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত কষ হতে বিভিন্ন পরিমাণ রাবার পাওয়া যায়। কষের গুণাগুণের এইরূপ তারতম্যের দরুন প্রতি গ্যালনে অর্থাৎ প্রতি $৪\frac{১}{২}$ লিটারে ১–১.৮ কেজি রাবার উৎপাদিত হতে দেখা যায়।[১৩]

কষ হতে রাবার প্রস্তুত : বাগানের সমস্ত কষ সংগ্রহ করে কারখানায় নিয়ে রাবার প্রস্তুত করা হয়। দুগ্ধে যেমন চর্বি ফোটায় ফোটায় ছড়ানো ও ভাসমান থাকে রাবার কষেও ঠিক অনেকটা সেইমতো রাবার সূক্ষ্ম দানার আকারে মিশ্রিত ও ভাসমান থাকে। কষে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে প্রোটিন, শর্করা (চিনি) এবং খনিজ পদার্থ থাকে। রাবার প্রস্তুত করতে হলে কষের পানি ও এই সমস্ত পদার্থ হতে রাবারের দানা পৃথক করতে হয়।

কারখানায় যেভাবে রাবার প্রস্তুত করা যায় নিম্নে তাহা আলোচনা করা হলো :—

১. রাবার-দানা জমানো (coagulation of rubber molecules) : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে রাবার প্রস্তুত করতে হলে কষে ভাসমান রাবারদানা জমিয়ে নিতে হয়। প্রথমত সংগৃহীত রাবার কষ ছাকনির সাহায্যে ছেকে নিতে হয় ; ইহাতে কষ হতে ডালপালার অংশ, গাছের ছাল, মাটি ইত্যাদি দূরীভূত হয়ে যায়। ছাকবার আগে কষে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ

কষের পরিমাণের দ্বিগুণ পানি দিয়ে পাতলা করে নিতে হয়। তৎপর পাতলা পরিচ্ছন্ন কষ অগভীর টবে ঢেলে দেওয়া হয়। সাধারণত এক একটি টবের মাপ হয় লম্বায় ১০ ফুট (৩ মিটার), প্রস্থে ৩ ফুট (১মিটার) ও গভীরতায় ১৪ ইঃ (৩৫.৫ সে. মি.)। এইরূপ টব বা ট্যাঙ্কই (Latex tank) আমাদের দেশের রাবার কারখানায় দৃষ্ট হয়। টবে রস ঢেলে দেওয়ার পরই তাতে সাইট্রিক এসিড (citric acid) অথবা ফরমিক এসিড (formic acid) যথাক্রমে শতকরা এক ভাগ ও অর্ধভাগ হারে যোগ করে তা রসের সঙ্গে নেড়েচেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। তৎপর টবের মাপ অনুযায়ী অর্থাৎ ৩ × ১৪ (১ মি. × ৩৫. ৫ সে. মি.) মাপের পাতলা এলুমিনিয়ামের পাত $\frac{৩}{৪}$ (২ সে. মি.) দূরে দূরে রাবার-কষের টবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। টবে রস কানায় কানায় ভর্তি থাকলে প্রতিটি এলুমিনিয়ামের পাত রসে ডুবে থাকবে। বিকাল ১-২ টার মধ্যে এই সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করার পরের দিন সকালে টবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এলুমিনিয়ামের পাত বরাবর রাবারের টুকরা জমে উঠেছে। এক্ষণে একটি করে পাত ও একটি করে রাবারের টুকরা পর পর টুকরা হতে উঠিয়ে লওয়া যায়। প্রতিটি টুকরাকে তৎপর দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

২. রাবারের টুকরায় ছাপ দেওয়া : উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত রাবারের টুকরায় চাপ দিয়ে পানি ও তৎসঙ্গে দূষিত উপাদান, যেমন—প্রোটিন, রেজিন ও শর্করা দূরীভূত করতে হয়। তৎজন্য রাবারের টকুরাগুলি দুটি রোলারের মাধ্যেমে চাপ দিয়ে পানি বের করে দেওয়া হয়। রোলারের উপরিভাগ কখনো সমতল, কখনো খাচকাটা এবং কখনো হীরকাকৃতির করা হয় বলে তদ্রূপ ছাপ রাবারের টুকরায় পড়ে।

৩. রাবারের টুকরায় ধুয়া প্রয়োগ ও তা শুষ্ক করা : একটি ঘরের প্রকোষ্ঠে কাঠ পুড়িয়ে ধুয়া ও উত্তাপের মধ্যে রাবার শুকানো হয়। ধুয়া প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হলো রাবার যাতে পরবর্তী সময়ে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ধূয়ার মাধ্যমে যে ক্রিয়োজোট (Creosote) ব্যবহার করা হয় তাই এই শোধনের কাজ সম্পূর্ণ করে। ধূয়া দেওয়ার পর রাবারের টুকরাগুলি মুক্ত বায়ুতে শুষ্ক করে নেয়া হয়। এভাবে উৎপন্ন হলুদ-বাদামি রংয়ের রাবারের টুকরাগুলি যথাসময়ে বাজারজাত করা হয়।

ফলন : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বীজের চারা হতে সৃষ্ট রাবার বাগানের চাইতে চোখ-কলমের দ্বারা সৃষ্ট বাগান হতে অধিক পরিমাণে রাবার কষ তথা রাবার উৎপন্ন হয়। ভারতের প্রথমোক্ত শ্রেণির বাগান হতে প্রতি হেক্টরে পাওয়া যায় ৭০০ পা: অর্থাৎ ৩৩৮ কেজি রাবার আর শেষোক্ত শ্রেণি হতে দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থাৎ ১৫০০-১৭৫০ পাঃ অর্থাৎ ৬৭৫-৭৮৮ কেজি রাবার। তবে শ্রীলঙ্কা, জাভা, সুমাত্রা, ও মালয়েশিয়ায় চোঁখ-কলমের দ্বারা সৃষ্ট বাগান হতে প্রতি হেক্টরে ৩৭৫০ পাঃ অর্থাৎ ১৭০০ কেজি পর্যন্তও রাবার পাওয়া যায়।[১০] বাংলাদেশের রাবার বাগানে প্রতি একরে গড়-পড়তা ৪৮০ পাঃ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ২১৮ কেজি রাবার উৎপন্ন হয়।[১১]

অয়েল পাম (Oil palm)

অয়েল পাম গাছ দেখতে অনেকটা খেজুর গাছের মতো ; তবে গাছ আকারে বড় এবং পাতা তত সূচালো নয়। গাছের পরিপক্ক ফল হতে তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল ভোজ্য এবং

পৃথিবীর সমস্ত ভোজ্য তৈলের মধ্যে ইহা সব চাইতে সস্তা। ইদানিং বাংলাদেশ মালয়েশিয়া হতে কিছু পরিমাণ পাম তৈল আমদানি করে যাচ্ছে।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

অয়েল পামের আদিনিবাস আফ্রিকা মহাদেশ। মধ্য আফ্রিকার ৩°উঃ এবং ৭°দঃ অক্ষাংশ বরাবর ইহা জমিতে দেখা যায়, তবে উত্তর গোলার্ধে ১৬° অক্ষাংশ পর্যন্তও ইহার চাষ দেখা যায়।[১১] স্বাগতিক দেশ আফ্রিকা ছাড়াও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া ও আমেরিকার কোনো কোনো দেশে অয়েল পামের বাগান দেখা যায়। মালয়েশিয়া পাম অয়েল উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। সে তার নিজের চাহিদা মিটিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ তৈল বিদেশে রপ্তানি করে।

বাংলাদেশ বন বিভাগের গবেষণা শাখা ১৯৬৪ সালে মালয়েশিয়া হতে প্রায় ১ কেজি অয়েল পামের বীজ আনয়ন করে। হাজারীখিল ও রসুলপুর বন গবেষণা কেন্দ্রে সেই বীজ বপন করা হয়। হাজারীখিলের উৎপাদিত গাছে ১৯৬৯ সালে ফল উৎপাদিত হয়। পরবর্তীকালে রাবার প্রকল্পের অধীনেও কিছু গাছ লাগানো হয়। সেই গাছ হতে উৎপন্ন ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে সেগুলি মালয়েশিয়ার গাছের মতো তৈল উৎপাদনে সক্ষম।[১৫] এইরূপ উৎসাহব্যঞ্জক ফল দেখে ১৯৭৯ সাল হতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট বনাঞ্চলে অয়েল পামের বাগান সৃষ্টি করা হয়। আজ পর্যন্ত এই তিনটি অঞ্চলে ৭৮৪ একর অর্থাৎ ৩১৭.৪ হেক্টর জমিতে অয়েল পামের গাছ লাগানো হয়েছে। ১৯৭৯ সালে যে গাছগুলি রোপণ করা হয়েছিল সেগুলিতে ফুল ধরা শুরু হয়েছে, তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সেগুলির অধিকাংশ পুরুষ গাছ।[১১]

মাটি ও জলবায়ু

দো–আঁশ ও এঁটেল–দোঁয়াশ মাটি অয়েল পামের জন্য উপযোগী এবং সেই মাটি উর্বর হওয়া বাঞ্ছনীয়। সারা বৎসর ধরে সুবিস্তৃত অধিক বৃষ্টিপাত অয়েল পামের জন্য আদর্শস্থানীয় ; বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮০ ইঃ অর্থাৎ ২০৩০ মি. মি. বা ততোধিক হতে পারে। মাঝারি ধরনের তাপমাত্রা উপযোগী ; সর্বাধিক গড় তাপমাত্রা ৭২° ফাঃ–৭৫° ফাঃ অর্থাৎ ৪০–৪১.৬°সে. এর মধ্যে থাকলে ভালো। অয়েল পামের বাগানে বৎসরের সব সময় দৈনিক কমপক্ষে ৫ ঘণ্টা করে রৌদ্র থাকা আবশ্যক এবং বিশেষ করে কয়েক মাসে দৈনিক কমপক্ষে ৭ ঘণ্টা রৌদ্র থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে জলবায়ুর প্রয়োজনীয়তার দিক হতে এই গাছ যথেষ্ট সহনশীল, কম বৃষ্টিপাত, কম তাপমাত্রা ও কম সূর্যালোকের দেশেও অয়েল পাম লাভজনকভাবে চাষ করা হচ্ছে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় ও জাত

অয়েল পাম Palmaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম Elacis guineensis. আগেই উল্লেখ করা হয়েছে গাছটি দেখতে অনেকটা খেজুর গাছের মতো (চিত্র ১৩.৪)। গাছের বয়স ২/৩ বৎসর হইলেই ফুল ধরা শুরু হয়। ফুলের ছড়া কতকটা সুপারির ছড়ার মতো ; তবে আকারে বড় কাটাযুক্ত এবং তা কাণ্ডের সঙ্গে আটসাট

অবস্থায় পাতার ডাটের গোড়ার নিচে অনেকটা লুকানো থাকে। ফল দেখতে কিছুটা সুপারির মতো, ইহার খোসা ও শাস হতে মোট ৩৫% তৈল পাওয়া যায়।[৩]

অয়েল পামের কিছু জাত রয়েছে। উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডেলী (Deli), কিং পাম (King palm), আবে পা (Abe-pa), ওপাপাং কোরো, পোটশী ইত্যাদি। মালয়েশিয়া হতে আনীত যে জাতটির চাষ আমাদের দেশে করা হচ্ছে সেটির নাম 'ডোরা'। সেই দেশ হতে 'পিসিফেরা' (Picifera) নামে আরেকটি জাত আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

অয়েল পামের বাগান সৃষ্টি

অয়েল পামের জন্য নির্বাচিত জমি ভালোভাবে চাষবাস করে তাতে ১০ মি. × ১০ মি. দূরে দূরে ত্রিভুজাকার পদ্ধতিতে গর্ত বা মাদা তৈরি করতে হয়। প্রতিটি মাদার মাপ হবে ১মি. × মি.। মাটি অনুর্বর হলে মাদার মাটির সঙ্গে ১৫ সের (১৪ কেজি) গোবর অথবা তিন ছটাক ইউরিয়া, ½ সের হাড়ের গুড়া, ১ সের সরিষার খৈল এবং দুই সের ছাই অথবা ৪ ছটাক মিউরেট অব পটাশ দিয়ে মিশিয়ে দেওয়া ভালো।[১] সার মিশানোর দুই তিন সপ্তাহ পর মাদার চারা রোপণ করা সঙ্গত।

চারা তৈরি করা : বীজতলায় চারা তৈরি করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব–উত্তাপিত (Pre-heated) বীজ ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে মালয়েশিয়া হতে এইরূপ বীজ আনয়ন করা হয়। সেই বীজ অঙ্কুরোদ্গম যন্ত্রে ২৮° সে.–৩০° সে. তাপমাত্রায় গজানোর জন্য বসানো হয়। দুই মাস অর্থাৎ ৬০ দিন পর যে সমস্ত বীজ গজিয়ে উঠে সেগুলি বীজতলার মাটিতে অথবা পলিবেগে (Poly-beg) বপন করা হয়। গজায়মান চারা এক রকম ছত্রাকের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে থিরাম (Thiram) অথবা ক্যাপটেন (Captan) নামক ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। কক্সবাজার নার্সারির চারা ১৯৮০ সালে এরূপ ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হলে ক্যাপটেন ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম ডিভিশনের ১৭০০০ রোগাক্রান্ত চারা ঔষধের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

বীজতলায় রসের অভাব হলে সময়মতো পানি সেচ অত্যাবশ্যক। অন্যথায় চারা হলুদ হয়ে যায় এবং বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে পড়ে। কাজেই সুস্থ সবল চারা পেতে হলে বীজতলায় পানি সেচের সুবন্দোবস্ত রাখতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজনের কিছু অতিরিক্ত চারা উঠানো প্রয়োজন। কোনো মাদায় চারা মারা গেলে অথবা বদলির প্রয়োজন হলে সেই অতিরিক্ত চারা তখন ব্যবহার করা যায়।

মাদায় চারা রোপণ : সাধারণত ১২-১৪ মাস বয়স্ক চারা বাগানের পূর্ব প্রস্তুত মাদায় রোপণ করতে হয়। তবে বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের বাগানে ৬৪ একর (২৬ হেক্টর) জমিতে যে চারা রোপণ করা হয় সেগুলির বয়স ছিল ৬ মাস।[১১] পরবর্তী দুই বৎসরে আরো ১৮৬ একর (৭৫.৩ হেক্টর) এবং ৫৪৩ একরে (২১৬ হেক্টর) অয়েল পামের চারা লাগানো হয় অর্থাৎ ১৯৮১ সাল পর্যন্ত মোট ৭৮৪ একর (৩১৭.৪ হেক্টর) জমিতে অয়েল পামের বাগান সৃষ্টি করা হয় (তালিকা নং–৪০)।[১১]

চিত্র ১৩.৪ : অয়েল পামের চারা গাছ

সারণি : বাংলাদেশে অয়েল পামের বাগানে জন্মানো গাছের সংখ্যা

এলাকা	১৯৭৯ (একরে)	১৯৮০ (একরে)	১৯৮১ (একরে)	মোট একরে
চট্টগ্রাম ডিভিশন	২৯	৫০	২০০	২৭৯
কক্সবাজার ডিভিশন	২৫	১০০	২০০	৩২৫
সিলেট ডিভিশন	১০	৩৬	১০৪	১৮০
মোট	৬৪	১৮৬	৫৩৪	৭৮৪

পরবর্তী পরিচর্যা : বন্য হস্তী, শূকর ও ইহার সমগোত্রীয় অন্যান্য প্রাণী অয়েল পামের চারা নষ্ট করে থাকে। সুতরাং এগুলির হাত হতে চারা রক্ষা করার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করা অবশ্য কর্তব্য। কক্সবাজারের বাগানের অনেক চারা বন্য হস্তী নষ্ট করে দিয়েছে। চট্টগ্রাম এবং সিলেটের বাগানের অনেক চারাও বন্য শূকর প্রভৃতি জন্তু দ্বারা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে সারণি।[১১] দেখা গিয়েছে কম বয়স্ক চারাই এই সমস্ত বন্যপ্রাণী কর্তৃক বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং লক্ষ্য রাখতে হবে বাগানে যেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক চারা রোপণ করা না হয়। কক্সবাজার বাগানে প্রতিটি চারাগাছের চতুর্দিকে কাষ্ঠনির্মিত ঘের নির্মাণ করে তা বন্য পশুর আক্রমণ হতে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে—তবে ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ।

সারণি : ৪১ অয়েল পামের বিভিন্ন বাগানে চারা ধ্বংসের খতিয়ান

এলাকা	যে বৎসরে চারা লাগান হয়েছে	লাগান চারার সংখ্যা	যে বন্য প্রাণীকর্তৃক যত চারা ধ্বংস হয়েছে		মোট	ধ্বংসপ্রাপ্ত চারার শতকরা হার
			হাতি কর্তৃক	শূকর প্রভৃতি কর্তৃক		
চট্টগ্রাম	১৯৭৯	১৪৫০	—	৪১৫	৪১৫	২৮.৬২
	১৯৮০	২৫০০	—	৮০০	৮০০	৩২.০০
	১৯৮১	১২০০০	—	৪৮৭	৪৮৭	৪.০৬
কক্সবাজার	১৯৭৯	১২৫০	১৫৯	৮৭	২৪৬	১৯.৬৮
	১৯৮০	৬১৬৩	৩৭	২২২৮	২২৬৫	৩৬.৭৫
	১৯৮১	১০,০০০	৭২	২৬১৩	২৬৮৫	২৬.৮৫

বাগানে চারা রোপণ করার সাথে সাথে সারির মধ্যবর্তী জায়গায় আচ্ছাদন শস্য, যেমন-- বরবটী, মাটিকলাই অথবা ধইঞ্চা জন্মিয়ে তা যথাসময়ে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে একদিকে যেমন মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে বাগানের আগাছা দমনের কাজও হয়ে যায়। কিন্তু কোনো কোনো বাগানে তা করা হয় নি বরং ঝুম চাষ করে বাগানের ভয়ানক ক্ষতি করা হয়েছে। ইহা নিঃসন্দেহে অয়েল পাম বাগান পরিচর্যার একটি পরিপন্থী কাজ।

গাছের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বৎসর সার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। বয়স্ক নারিকেল গাছে যে নিয়মে সার ব্যবহার করা হয় সেভাবে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। সেই হিসেবে পরবর্তী পৃষ্ঠার তালিকা অনুযায়ী উল্লিখিত সার ব্যবহার করতে হবে।[২]

ফল সংগ্রহ : পাম গাছের বয়স ৩ বৎসর হলে ফল ধরা শুরু হয়। নয় দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গাছে সর্বাধিক ফল ধরে এবং ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ফল ভালোরূপে আহরণ করা যেতে পারে। তৎপর বাগান ভেঙ্গে দিয়ে সেই স্থানে নতুন বাগান করাই যুক্তিসঙ্গত।

নারিকেল গাছে যেরূপ সারা বৎসর ফুলের ছড়া বের হয় সেইরূপ অয়েল পাম গাছেও বের হয়। তবে ফুলের ছড়া খাটো, খাড়া কাঁটাযুক্ত এবং কৌনিক আকারে (Conical-shaped)। ফল সুপারির মতো এবং সংখ্যায় অনেক। সারা বৎসর ফল পাওয়া গেলেও আগস্ট হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সর্বাধিক ফল পাওয়া যায়। ফলের খোসা ও শাস–এই অংশ হতেই তৈল পাওয়া যায় ; প্রথমোক্ত অংশ হতে ২৮% এবং শেষোক্ত অংশ হতে ৭% তৈল নিষ্কাশিত হয়।

সারণি : ৪২ অয়েল পাম গাছে সার ব্যবহারের পরিমাণ

সার	এক বৎসর বয়স্ক গাছের জন্য	বাৎসরিক বৃদ্ধির হার	দশ বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক গাছের জন্য
গোবর সার	৩৭ কেজি	৯ কেজি	১১১ মণ
ইউরিয়া	২৩৩ গ্রাম	৫৮.৩ গ্রাম	১ কেজি
হাড়ের গুড়া	$\frac{১}{২}$কেজি	১৪৬ গ্রাম	১.৮ কেজি
ও টি. এস. পি	২৩৩ গ্রাম	৬০ গ্রাম	১.৮ গ্রাম
ছাই	২.৮ গ্রাম	১ কেজি	১০ কেজি
অথবা			
মিউরেট অব পটাশ	২৩০ গ্রাম	১১৭ গ্রাম	১.২৫ কেজি

বাংলাদেশে অয়েল পাম চাষের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশে ভোজ্য তৈলের যে তীব্র অভাব ও সঙ্কট সেই প্রেক্ষিতে এই দেশে যে কোনো তৈল উৎপাদনকারী নতুন ফসলের চাষ একান্ত কাম্য। তবে সেই নব্য ফসলটির নবাগত দেশে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা, অন্যান্য ফসলি জমির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা, উৎপাদিত তৈল জনগণের মধ্যে গ্রহণের আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা করার প্রয়োজন থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–তৈল উৎপাদনকারী সয়াবীন ফসলটির বাংলাদেশে বেশ কিছু দিন আগে হতেই পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ; ইহার তৈলও আজ লোকজনের কাছে অপছন্দনীয় নয়। তবুও ইহার চাষ দেশে বৃদ্ধি না পাওয়ার প্রধান কারণ, ইহা চাষীদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফসল, যেমন— গম, গোল আলু, তামাক প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে— সেই জন্য সয়াবীন চাষে খুব কম চাষীই আগ্রহ প্রকাশ করে। উপরন্তু সয়াবীন বীজ হতে সরিষার বীজের ন্যায় সহজে তৈল বের করা যায় না। অন্যদিকে অয়েল পাম গাছ নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে ইহা আমাদের দেশের জলবায়ু ও মাটির কথা বিবেচনা করে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটে সে ফসলটির চাষাবাদ করার উপযোগী। কিন্তু অন্যান্য পরিবেশগত কিছু কারণে এই ফসলটির সার্থক চাষ করা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। বাগান গড়ে তুলার জন্য চারা রোপণ করলে অধিকাংশ চারা বন্য হাতি ও শুকর নষ্ট করে ফেলে তাছাড়া চারা তৈরি করার খুব কঠিন কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগের আক্রমণে অনেক চারা মারা যায়।

এ সমস্ত কারণে বাংলাদেশে অয়েল পাম সার্থকভাবে জন্মানোর আশা অনেকটা নিরাশায় ভরপুর। বনবিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে এ ফসলটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তাই বলা যায় বাংলাদেশে অয়েল পামের ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই।

পান

পানের ইতিহাস অতি প্রাচীন! খ্রিঃ পূঃ ৩০৪ অব্দে দার্শনিক হিরোডোটাসের বিবরণে পানের উল্লেখ দেখা যায়।[১১] পান একটি লতাজাতীয় গাছ। পাতার জন্যই ইহার চাষ করা হয়। সুপারি, নরম চুন এবং কোনো কোনো সময় খয়ের ও অন্যান্য মসলা সহযোগে বাংলাদেশের গ্রাম বা শহরের অনেকেই পান খেয়ে থাকে। বস্তুত পান চিবানো বাঙ্গালীদের একটি চিরাচরিত অভ্যাস। শহরবাসীদের চাইতে গ্রামবাসীরা আবার পান বেশি খেয়ে থাকে। প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও বিকাল বেলা আহারের পর পান ও তামাক খাওয়া যেন একেবারে নিয়মসিদ্ধ ; অতিথি–মেহমানদের আর না হলেও পান পরিবেশন করা হয়। প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পান না দেওয়ার কথা তারা চিন্তাই করতে পারে না। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের অধিবাসীরাও পান চিবাতে অভ্যস্ত। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাবাসীরাও পান চিবাতে পছন্দ করে। ইহা ছাড়া নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশ, যেমন— পূর্ব–চীন, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেও পান খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

পান চিবানোর অভ্যাস নিশাকর হলেও তামাক ও সিগারেট সেবনের মতো ক্ষতিকর নয়। কেউ কেউ মনে করে পান বরং হজমীকারক ও মুখের দুর্গন্ধনাশক। পানকে এইরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে বলেও মনে হয়, কারণ ভারতের এক পান গবেষণা কেন্দ্রে বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে[১১] যে পানপাতার বেশ কিছু পরিমাণে ভিটামিন–বি ও ভিটামিন–সি রয়েছে ; তদুপরি লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম ফসফরিক এসিড, পটাশ এবং নাইট্রোজেনও যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান রয়েছে।

পানে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আগের দিনে বেশ কিছু পরিমাণ পান পাকিস্তানে রপ্তানি করা হতো। পান বাংলাদেশের পাহাড়ি ও সমতল—এই দুই অঞ্চলেই জন্মে। সিলেট জেলার খাসীয়া আদিবাসীরা পাহাড়ীয়া অঞ্চলে পানের চাষ করে থাকে। দেশের সমতল অঞ্চল তথা বরিশাল, রংপুর, খুলনা, ঢাকা, যশোহর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রচুর পান জন্মে। দেশে ২৮৬১৫ একর অর্থাৎ ১১৫৮৫ হেক্টর জমিতে পান চাষ করা হয় আর তাতে উৎপন্ন হয় ২৩৪৯৪ মেঃ টন পান। [৩, ১৬]

পান চাষ

পান চাষ একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। খাসিয়া আদিবাসীরা ছাড়া এদেশের হিন্দু সমাজের বিশেষ এক সম্প্রদায় যারা 'বারুই' নামে পরিচিত তারাই একচেটিয়া পানের চাষ করতো। তাদের সামান্য কিছু জমিতে দুই একটি পান বোরুজ করে সেই আয় দ্বারা স্বচ্ছন্দে

তাদের সংসার চালাতো। মুসলমানেরা কুসংস্কারের দরুন পান চাষ করতো না। তবে দেশবিভাগের পর বারুইদের অনেকের দেশ ত্যাগের ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই পান চাষ করতে শিখেছে।

এঁটেল মাটি পান চাষের জন্য সব চেয়ে উপযোগী। তবে দোয়াশ ও বেলে-দোঁয়াশ মাটিতেও উপযুক্ত পরিমাণ সার পানি ব্যবহার করে পান চাষ করা যায়। উল্লেখ্য যে, মাটি যে ধরনের হউক না কেন তা সুনিষ্কাশনযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জমির অবস্থান সমুদ্র সমতল হতে ৩০০০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ১০০০ মিটার উচু পর্যন্ত হলেও চলে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া পানের জন্য উপযোগী, তবে উষ্ণতার মাত্রা কম হতে হবে। সরাসরি সূর্য কিরণে পান মোটেই ভালো হয় না অর্থাৎ পান চাষে ছায়ার ব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজন

পান Piperaceae পরিবারের অন্তর্গত একটি লতাজাতীয় বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Piper betle L. গাছের লতা অন্য গাছ বা দণ্ডের অবলম্বনে বৃদ্ধি পায় ; লতার গোলাকার কাণ্ডের চতুর্দিকে একটির পর একটি হৃদয়াকৃতির (heart-shaped) সবুজ পাতা জন্মে (রেখা চিত্র : ১৩.৪)। লতার আগার দিকে কেবল কয়েকটি শাখা জন্মে। গাছে ফুল হয় না বললেই চলে, কদাচিৎ গুলমরিচ গাছের ফুলের মতো ছড়া দেখা যায় এবং তাতে দুই একটি ছোট ছোট ফুল জন্মে।

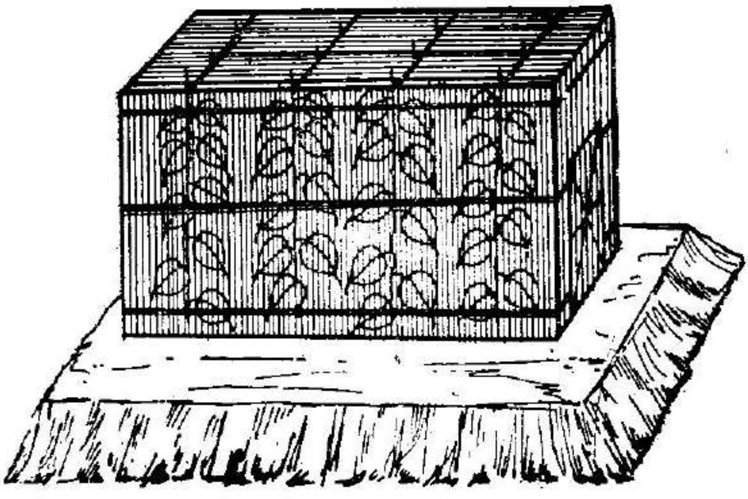

চিত্র ১৩.৪ : বোরুজ পান গাছ

পান-চাষীদের হাতে যে কয়েক রকম পান দেখা যায়। তাই তারা চাষ করে থাকে। এক এক জেলা বা অঞ্চলে একই পান ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। তবে পানকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ১. গেছো পান ও ২. বোরুজ পান। খাসীয়া আদিবাসীরা যে পান গাছে

গাছে জন্মিয়ে থাকে তাকে 'গেছো পান' বলা হয়ে থাকে। আর বারুইরা যে পান বোরুজে জন্মিয়ে থাকে তাকে বলা হয় 'বোরুজ পান'। গেছো পান আকারে বড়, খসখসে ও পুরু। যারা বোরুজ পান খায় তারা এই পান হঠাৎ করে খেতে অস্বস্থি বোধ করে। বোরুজ পান মসৃণ, পাতলা ও নানা আকারের। এই শ্রেণির পানের যে কয়টি জাত দেখা যায় তার বিবরণ নিম্নরূপ দেওয়া যেতে পারে :

ক. সাঁচি পান : বোঁটাসহ পান একটু লালচে ধরনের ; আকারে ছোট, পাতলা ও সুগন্ধযুক্ত। লোকে ইহাকে পছন্দ করে, বাজারে কম পাওয়া যায় এবং অন্যান্য জাতের পানের চাইতে বেশি দামে বিক্রি হয়।

খ. ডোলডগ পান : পান এবং বোটা সাদাটে ; পাতা বড়, পুরু এবং অনেকটা গোলাকার।

গ. রাজশাহী পান : অনেকটা ডোলডগ পানের মতো, তবে পাতার আকার মাঝারী ধরনের।

ঘ. ইছালিয়া পান : রাজশাহী পানের অনুরূপ।

গেছো পান ও বোরুজ পানের চাষাবাদ পদ্ধতি ভিন্ন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্নভাবে সে দু রকম পানের চাষাবাদ পদ্ধতি আলোচনা করা হবে।

গেছো পানের চাষ : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বৃহত্তর সিলেট জেলায় এই পানের চাষ হয়। সিলেট, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার পাহাড়ীয়া অঞ্চলে বসবাসকারী খাসীয়ারা এই পানের চাষ করে। খাসীয়ারা যে যে এলাকায় একত্রে বাস করে তাকে বলা হয় 'পুঞ্জি'। এই রকম [illegible]টি পুঞ্জিতে ৪২০০০ খাসীয়া বাস করে এবং একটি মাত্র ফসল গেছো পানের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে।[১৩] আজকাল অবশ্য পান চাষে মড়ক দেখা দেওয়ায় এবং গাছওয়ালা পাহাড়ের অভাব হেতু কিছু কিছু সম্পন্ন খাসীয়ারা বহুবিধ ফসল, যেমন— আনারস, কমলা, সুপারি, গোল মরিচ, তেজপাতা ইত্যাদি চাষে উদ্যোগী হয়েছে। পাহাড়ের ঢালে অথবা পাদদেশের ছোট-বড় গাছ যেগুলির ব্যাস ৩ ইঞ্চি হতে ৪ ফুট অর্থাৎ ৭.৫ সে. মি.— ১ মিটার পর্যন্ত সেগুলির প্রতিটির গোড়ার মাটি নরম করে একটি একটি করে পানের চারা রোপণ করা হয়। পানের লতার টুকরা চারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে [illegible] হতে ২৫০০টি টুকরা লাগান হয়। লতার ডগা যখন বড় হতে থাকে তখন গাছের সাথে তা বেঁধে দেওয়া হয়। ইহাতে লতা গাছের সাথে ভালোভাবে আটকিয়ে থাকে এবং আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। গাছের বয়স তিন বৎসর হলে পান তোলা শুরু হয়। বৎসরে তিনবার পান উঠানো হয়, তাতে প্রতি বৎসর একটি গাছ হতে গড়ে ৩০ বিড়া অর্থাৎ ৩০ × ১৪৪ = ৪৩২০টি পান পাওয়া যায়। পানের চারা রোপণের আগে ও পরে গাছের ডালপালা বেশ কেটে ফেলা হয়। ইহাতে পান ভালো হলেও গাছের ভয়ানক ক্ষতি হয়। গেছো পানের চাষ করে খাসীয়া চাষীরা প্রতি হেক্টরে ১৫০০০ টাকার মতো আয় করে। এই গেছো পান চাষে মাঝে মাঝে একটি ভয়ানক মড়ক দেখা দেয়। অধুনা জানা গিয়াছে ইহা Phytopthora parasitica এবং Rhizoctonia Spps. সংঘটিত একটি রোগ। এই রোগের আক্রমণে পান গাছের মূল, কাণ্ড ও পাতা পচে যায়। যে অঞ্চলে রোগ দেখা দেয় সে অঞ্চলের সমস্ত গাছই

আক্রান্ত হয় এবং তাতে পান চাষীরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চাষীরা সাধারণত আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলে মাটিতে গর্ত করে সেখানে পুড়িয়ে ফেলে।

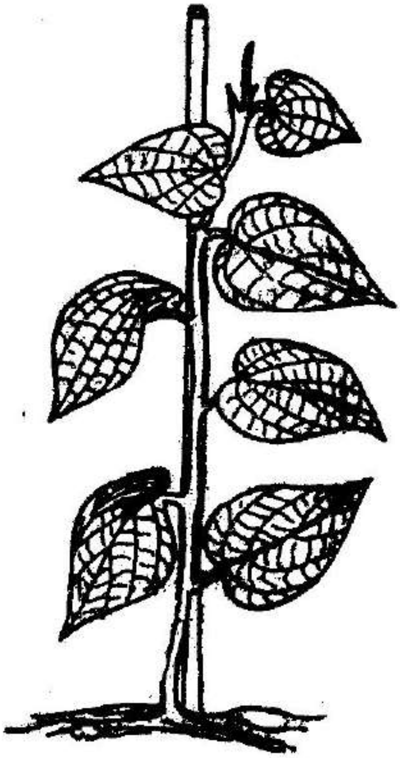

চিত্র : ১৩.৫ : গেছো পান

এই রোগ দমনের জন্য ১৯৬২ সালে কিছু কিছু গাছে পেরেনক্স (parenox) নামক ঔষধ ছিটানো হয়েছিল। তাতে ফল শুভ হয় নাই, ঔষধ ছিটানোর ২/৩ দিনের মধ্যে সমস্ত গাছই মারা যায়। সুতরাং সেই ঔষধ ছিটানোর কাজ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৬] তবে আজ পর্যন্তও এই রোগ দমনের জন্য কোনো কার্যকারী ঔষধ পাওয়া যায় নি।

বোরুজ পানের চাষ : পানের চাষ উপরি বর্ণিত পাহাড়ী এলাকা ছাড়া দেশের সর্বত্র বোরুজে পান চাষ করা হয়। বাঁশ ছন, পাট-খড়ি ইত্যাদির সাহায্যে চতুর্দিকে আবদ্ধ ঘরের মতো তৈরি করে যেটির অভ্যন্তরে পানের চাষ করা হয় তাকে 'পান বোরুজ' বা 'পানের বর' বলে। বোরুজের ভিতরে আসা-যাওয়ার জন্য একটি মাত্র দরজা থাকে।

বোরুজের মাটিতে বেশি চাষের প্রয়োজন নেই, কারণ খনার বচনেই আছে— 'চার চাষে ধান, বিনা চাষে পান' তবে মাটি ঘরের ভিটির মতো অনেকটা উঁচু করে তৈরি করে নিতে হয় যাতে বৃষ্টি বা সেচের পানি সহজেই নিষ্কাশিত হয়ে যেতে পারে। জমি হতে ঘাস-গাছড়া ও অন্যান্য জঞ্জাল অবশ্যই ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। তৎপর ১ মিটার দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ৫০ সে: মি: দূরে দূরে জোড়া কাঠি পুঁতে দিতে হয়। পরবর্তীকালে এই কাঠি অবলম্বন করেই পানের চারা বৃদ্ধি পায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পান গাছের লতা টুকরা টুকরা করে কেটে নিয়ে চারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। লতার উপরের অংশ হতে গৃহীত টুকরা হতে ভালো চারা উৎপন্ন হয়। সাধারণত প্রতিটি লতাকে তিনটি টুকরা করা হয় ; এক একটি টুকরা লম্বায় ৩০ সে: মি: ৪৫ সে. মি: হবে। দেশীয় প্রথায় টুকরা অর্থাৎ চারা সরাসরি বোরুজে লাগান হয়। কিন্তু উন্নত পদ্ধতিতে কাটা টুকরা শিকড় গজিয়ে নিয়ে তৎপর রোপণ করা হয়। তাতে কোনো চারাই নষ্ট হয় না। কাটা টুকরাগুলি আঁটি করে বোরুজের একটু কাদা করা মাটিতে যত্ন সহকারে রেখে দিলে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে শিকড় গজিয়ে যায়।

জুন-জুলাই অথবা অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চারা লাগাতে হয়। তবে প্রথমোক্ত সময়ে চারা রোপণ করাই শ্রেয়, কারণ সেই সময়কাল মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

সাধারণত বোরুজের মাটি প্রস্তুত করার সময় প্রতি হেক্টরে ১৪-১৯ টন পচা গোবর সার এবং ৯৫-১৪২ কেজি টি. এস. পি ব্যবহার করতে হয়। বোরুজে চারা লাগানোর দুই মাস পর প্রথমবারের মতো সরিষার খৈল ৩০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৬ গ্রাম প্রতি গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হয়। তৎপর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার এবং মার্চ-এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে তৃতীয় বা শেষবারের মতো সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

শুধু শুষ্ক মৌসুমেই নয়, এমনকি বর্ষাতি মৌসুমেও যদি দীর্ঘকালীন সময়ে অনাবৃষ্টি দেখা দেয় তাহা হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পান বোরুজে পানি সেচের বন্দোবস্ত করতে হবে। অন্যথায় পানের উৎপাদন যথেষ্ট কমে যাবে।

বোরুজে চারা লাগানোর দ্বিতীয় বৎসর হতে পান তোলা শুরু করা যায়। মূল গাছ এবং শাখা-প্রশাখা হতে পান পাতা তোলা হয়। পাতা উঠানোর সময় লক্ষ্য করে কেবল মাত্র গোড়ার দিকের পুষ্ট পাতা তোলা উচিত। পান তোলার সাথে সাথে প্রয়োজনমতো পানের লতাকে টেনে নিচের দিকে নামিয়ে বাঁশের কাঠির গোড়ায় ওঠিয়ে রাখা হয় যাতে কোনো সময়ই পান গাছের ডগা বা আগা বোরুজের চালা ভেদ করে বের হয়ে না আসে।

একটি পান বোরুজ ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারলে তা ১০ হতে ২০ বৎসর পর্যন্ত পান তোলা যায়। এক হেক্টরের পান বোরুজ হতে বৎসরে দুএকটির মতো পান পাতা তোলা যেতে পারে।[৩, ১২]

সেগুন

সেগুন একটি উঁচু মানের কাঠ। দামি ও সৌখিন আসবাবপত্র প্রস্তুতের জন্য আমরা 'টিক' নামে যে কাঠের কথা শুনে থাকি তা সেগুন গাছ হতেই উৎপন্ন হয়। 'চিটাগাং টিক' ও 'বার্মা টিক' একই কাঠ, তবে প্রথমটির মান দ্বিতীয়টির মানের চেয়ে কিছুটা নিম্ন পর্যায়ের।

বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের কোনো কোনো বনাঞ্চলে সেগুন গাছ জন্মিতে দেখা যায়। তবে তা স্বাভাবিক নহে, বন বিভাগের কর্মীদের দ্বারা সেই অঞ্চলে সেগুনের বন সৃষ্টি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে বার্মা হতে বীজ আনয়ন করে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সেগুনের চাষ করা হয়।[৬, ১৪]

বার্মা ও থাইল্যান্ডের বনাঞ্চলে প্রচুর সেগুন গাছ জন্মে এবং সেই দুটি অঞ্চলে সেগুন একটি স্বাভাবিক বনজ গাছ। বস্তুত এই দুই দেশকেই সেগুনের আদি জন্মস্থান বলে ধরা যায়।[৬] ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ, যেমন— জাভাতেও স্বাভাবিকভাবে সেগুন জন্মে।

মাটি ও জলবায়ু

গভীর পলিজ ও পাহাড়ের ঢালের নুড়ি বা পাথর মিশ্রিত বেলে বা বেলে-দোঁয়াশ মাটি সেগুনের জন্য উত্তম। পাহাড়ের উপর বা পাদদেশের সমতল ভূমিতেও ভালো সেগুন জন্মিতে পারে যদি সেখানকার মাটি সুনিষ্কাশনযুক্ত হয়। সেগুন চাষের জন্য মাটির প্রকৃতি ও অবস্থান এমন হওয়া চাই যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে পানি গড়িয়ে শুষে মাটির গভীর তলদেশে চলে যায়। সেগুনের মূল শিকড় মাটির অনেক গভীরতায় পৌঁছাতে পারে বলে সেই পানি তখনও তা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। সেগুনের জন্য মাঝারি হতে অধিক বৃষ্টিপাত উপযোগী। লক্ষ্য করলে দেখা যায় পৃথিবীর যে যে দেশে সেগুন জন্মে সে দেশগুলির কোনো কোনোটিতে বাৎসরিক ১৫০-২০০ ইঞ্চি অর্থাৎ ৩৮১০-৫০৮০ মি. মি. পর্যন্তও বৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের যে একটি জেলায় সেগুনের চাষের প্রবর্তন করা হয়েছে সে অঞ্চলেও বৎসরে সব চাইতে বেশি বৃষ্টি হয়। তবে সেগুন চাষের জন্য বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১২৭০ হতে ৩৮১০ মি. মিটারের মধ্যে হলেও চলে। বার্মার যে অঞ্চলে ভালো টিক জন্মে সে অঞ্চলে বার্ষিক উপর্যুক্ত (১২৭০-৩৮১০ সি. মি.) পরিমাণ বৃষ্টি হতে দেখা যায়। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৫৭°সে. হতে ৬১°সে. এবং সর্বনিম্ন ২২°সে. হতে ২৮°সে. সেগুনের জন্য উপযোগী।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়

সেগুন ভারবেনেসি Verbenaceae পরিবারভুক্ত সুদৃশ্যজাতের একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Tectona grandis বনের সুপরিবেশে সেগুন একটি লম্বা সরল ডালাপালাহীন দণ্ডাকৃতির গাছ, তবে গোড়ার দিকটা কখনো কখনো চেপ্টা ধরনের হয়। ভারতের কয়েম্বাটোরের টেক্কাদি বনে একটি গাছের বেড় (girth) ৬ মিটার হতে দেখা গিয়েছিল এবং যা হতে ৭১১ ঘনফুট কাঠ পাওয়া গিয়েছিল। বার্মার গোয়েথ জঙ্গলে ৫ মিটার বেড় বিশিষ্ট একটি গাছ পাওয়া যায় যেটির দৌড় (Bole) ছিল ১১৪ ফুট অর্থাৎ ৩৭ মিটার।[১৮]

সেগুন গাছের পাতা বেশ বড়— গোলাকার বা কিছুটা ডিম্বাকৃতির ; লম্বায় ১ হতে ২ ফুট অর্থাৎ ৩০-৬০ সে: মি:। চারা গাছ এবং কপিস গাছের পাতা পূর্ণবয়স্ক গাছের পাতা হতে বেশ বড়। গাছের প্রধান মূল ও শিকড় চারা অবস্থা হতেই দ্রুত মাটির গভীর স্তরে প্রবেশ করতে থাকে এবং পরিণত বয়সে তা অনেক গভীর স্তরে পৌঁছে যায়।

গজারী বা শাল বৃক্ষের মতো সেগুনও একটি পর্ণমোচী বৃক্ষ অর্থাৎ শীতকালের শেষে গাছের পাতা ঝড়ে যেতে থাকে, তবে সমস্ত পাতাই ঝরে যায় না ; গজারীর মতোই গাছে কিছু কিছু পাতা থেকে যায়। বসন্তকালের আগমনে গাছে নতুন পাতা গজাতে থাকে এবং আস্তে আস্তে বর্ষাতি মৌসুমে গাছ বন পল্লবে ঢেকে যায়। কিছু দিনের মধ্যে গাছের থোকা পুষ্পমঞ্জরী দেখা দেয়। এক একটি পুষ্পমঞ্জরীতে অনেক ফল ধরতে দেখা যায়। ডিসেম্বর–জানুয়ারি মাসের মধ্যে সেগুনের বীজ পরিপক্কতা লাভ করে। বীজগুলি কেপসুলজাতীয় এবং বেশ শক্ত, সহজে অঙ্কুরিত হয় না এবং জীবনীশক্তি বেশ কিছু দিন টিকে থাকে।

সেগুন বন সৃষ্টি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের দেশের পাহাড়ী বা পার্বত্য অঞ্চলে সেগুনের বন অন্য দেশ হতে বীজ এনে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৩ সালে হতে এই দেশে সেগুনের চাষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতোমধ্যে কোনো কোনো এলাকার গাছ কাটা হয়েছে এবং কিছু পরিমাণ কাঠ ১৯৭৭–৭৮ সালে বিদেশের বাজারে ছাড়া হয়েছে। গুণগত বিচারে এই সমস্ত কাঠ বার্মা সেগুন কাঠের চাইতে খুব একটা নিকৃষ্ট নয়।

কিভাবে ঐ সমস্ত বনে সেগুনের চাষ করা হয়েছে এবং করা যায় নিম্নে তা বিস্তৃত আলোচনা করা হলো :

বীজ সংগ্রহ : ডিসেম্বর–জানুয়ারি মাসে সেগুনের বীজ পাকে। চারা উৎপাদনের জন্য সুপরিপক্ব, নীরোগ ও পুষ্ট বীজ সংগ্রহ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে মধ্য বয়স্ক সতেজ ও বালবান বৃক্ষ হতে ডালা ঝাকিয়ে বা কুটার (Bamboo pole) সাহায্যে ছোট ছোট ডালা ভেঙ্গে বীজ সংগ্রহ করা যায়। এইভাবে বীজ সংগ্রহ করার পর সেগুলি হতে রোগাক্রান্ত ও অপুষ্ট বীজ বেছে ফেলে দিয়ে বাকি বীজ দুই তিন দিন রৌদ্রে শুকানোর পর বস্তাবন্দী করে আলো-হাওয়াযুক্ত গুদাম ঘরে রেখে দিতে হবে। মাঝে মাঝে বীজ রৌদ্রে শুকানো প্রয়োজন।

বীজ ফাটানো (Cracking the seeds) : সেগুনের বীজ খুব শক্ত বলে তা সহজে অঙ্কুরিত হতে চায় না। এই হেতু বীজতলায় বীজ বপন করার আগে সেগুলি ফাটিয়ে নেয়া বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে বীজগুলি প্রথমে একটি পাটের ছালা বা কাপড়ের থলিতে রেখে বালতিতে অথবা পানির টবে ৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। তৎপর বীজ ছালা বা থলে হতে বের করে নিয়ে সেগুলি ছায়াযুক্ত স্থানে ৪৮ ঘন্টাকাল শুকিয়ে নিতে হবে। এইবার বীজগুলি গোবর গোলা পানিতে মাখিয়ে নিতে হবে। তৎপর গোবর পানিতে মাখান বীজ একটি গর্তে চাপা দিয়ে রাখতে হবে। গর্তটি ১মি. × ১মি. × ১মি. মাপের করে খুড়ার পর সেটি ভালোমত ভিজিয়ে দিতে হবে। গর্ত শুকানোর পর সেটির তলা ও চারিপার্শ্ব সেগুনের বা কলার পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তৎপর গর্তে ৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৮ সে: মি: পুরু এক স্তর গোবর পানি মাখানো বীজ রেখে দেয়ার পর তা কলা বা সেগুন পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সেই ঢাকনার উপর আবার আরেক স্তর বীজ রেখে পুনরায় সেগুন বা কলা পাতা দিয়া ঢেকে দিতে হবে। এইভাবে স্তরে স্তরে রেখে গর্তটি ভরে ফেলতে হবে। পরিশেষে গর্তের মুখ মাটি চাপা দিয়ে ভর্তি করে দেওয়ার পূর্বে গর্তের চারিকোণা ও মধ্যে মোট পাঁচটি বাঁশের চোঙ্গা খাড়া

করে দিতে হবে। পরবর্তী সময়ে এই চোঙগুলির মাধ্যমে একদিন অন্তর অন্তর গর্তে পানি সেচ করা হবে। দশ বারো দিন পর গর্তের মাটি খুঁড়ে দেখতে হবে বীজগুলি ফোটেছে কীনা? যদি দেখা যায় অনেক সংখ্যক বীজে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং মাঝে মাঝে কয়েকটি বীজে অঙ্কুর বের হয়েছে তখন বুঝতে হবে বীজগুলি বীজতলায় বপন করার সময় হয়েছে।

বীজতলায় বীজ বপন (sowing seeds in the seed bed) : উপযুক্ত জায়গা দেখে বীজতলার জন্য জমি নির্বাচন করতে হবে। বীজতলার জন্য জমি ঢালু ধরনের হওয়া চাই। প্রতিটি বীজতলা দৈর্ঘ্যে ১৩ মিটার ও প্রস্থে ১ মিটার হলেই চলবে। বীজতলার মাটি বেশ গভীরভাবে অর্থাৎ ৩৮ সে. মিটারের মতো গভীর করে কোপাতে হবে। সেগুনের মূল শিকড় চারা অবস্থায়ই মাটির গভীরতায় পৌছাতে চায় বলে এইভাবে জমি প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। জমি ভালোভাবে কুপিয়ে মাটি নরম ঝুরঝুরা ও পরিষ্কার করে প্রস্তুত করতে হবে।

এপ্রিল-মে মাসে বীজতলায় ফাটানো বীজ বপন করত হবে। বীজ ছিটিয়ে অথবা তিন ইঞ্চি অর্থাৎ ৭.৫ সে: মি: (দীঘে-পাশে) দূরে দূরে সারিতে পুতে বপন করা যায়। এই নিয়মে বীজ বুনলে উপর্যুক্ত মাপের বীজতলা হতে এগারো/বারো শত চারা পাওয়া যায়। উন্নতমানের বীজ হতেই কেবল এমন সংখ্যক চারা পাওয়ার আশা করা যেতে পারে।

অঙ্কুরিত হওয়ার পর সেগুনের চারা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিন মাসের মধ্যেই চারার উচ্চতা প্রায় ১ মিটার হয়ে যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে বীজতলার আগাছা বার দুয়েক পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। এক বৎসর পর্যন্ত চারা বীজতলাতেই থাকবে।

সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিকে চারাগাছের সমস্ত পাতাই ঝরে যাবে। ইহাতে যেন মনে করা হয় চারাগাছগুলি মরে গিয়েছে। সেগুন গাছ পর্ণমোচী অর্থাৎ পাতাঝরা গাছ বলে এমন মনে হয়—আসলে চারাগুলি তাজাই থাকে।

বীজতলায় চারাগাছের পাতা কখনো কখনো Hyblea purea নামক পোকার শূককীট দ্বারা আক্রান্ত হয়।[৬] উপযুক্ত ঔষধ ছিটিয়ে পোকা ধ্বংস করে চারা গাছগুলির রক্ষা করতে হবে।

বাগানের চারা রোপণ : (planting the seedlings) বাগানের জন্য নির্বাচিত জমি হতে ছোট-খাটো গাছ-গাছড়া বা জঙ্গল পরিষ্কার করে নিতে হবে। মাঝে মাঝে স্তূপ করে রেখে জঙ্গল পুড়িয়ে দিলে ভালো হয়। তৎপর জমিতে ২ × ২ মিটার মাপের সারি টেনে প্রতিটি চিহ্নিত স্থানে ১' × ১' × ১' অর্থাৎ ৩০ × ৩০ × ৩০ সে: মি: মাপের মাদা বা থল (pit) প্রস্তুত করতে হবে। এইবার প্রতিটি থলে একটি করে চারা লাগাতে হবে।

বাগানে সেগুনের চারা বীজতলা হতে সরাসরি উঠিয়ে রোপণ করা হয় না। রোপণের পূর্বে প্রতিটি চারাকে বিশেষ নিয়মে প্রস্তুত করে নিতে হয়। এই নিয়মে প্রথমে বীজতলা হতে এক বৎসর বয়সের হাতের বুড়া আঙ্গুলের মতো মোটা চারা টেনে তুলতে হয়। তৎপর চারার কাণ্ড ও মূলের সংযোগস্থল হতে কাণ্ডের দিকে এক ২.৫ সে: মি: এবং মূলের দিকে ১৫-২৩ সে: মি: রেখে কেটে ফেলতে হয়। প্রধান মূল হতে যে সমস্ত শাখা মূল বের হয়ে গিয়েছে সেগুলিও কেটে দিতে হবে। এখন এইভাবে প্রস্তুত দণ্ডাকৃতির প্রতিটি চারাকে বলা হয় স্টাম্প (Stamp)। স্টাম্পের কাণ্ড ও মূলের সংযোগ স্থলে চারা তুলবার সময় সেটুকু মাটির ভিতর

ছিল সেটুকু মাটির ভিতর থাকবে এবং মাথাটুকু উপরের দিকে থাকবে। লক্ষ্য রাখতে হবে মাদায় স্টাম্প যেন একটু কাৎ করে লাগানো হয়। ২ × ২ মিটার দূরত্বে লাগালে প্রতি হেক্টরের জন্য ৩০২৫ হতে ৩৩৩০ টি স্টাম্পের প্রয়োজন হবে।[১৮]

বাগানে পরবর্তী কাজ : মাদায় লাগান প্রতিটি স্টাম্প হতে ২/৩টি বা ততোধিক চারা গজতে পারে। এই চারাগুলি এত দ্রুত বর্ধনশীল যে ৭/৮ মাস বয়সেই সেগুলি ১ হতে দুই মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। দ্বিতীয় বৎসরে প্রতিটি স্টাম্পের একটি সবল সতেজ চারা রেখে বাকি সবগুলি কেটে ফেলতে হবে। কাটা স্থানে আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে দিলে ভালো হয়। তাতে ছাতা (Fungus) বা পোকার আক্রমণের ভয় থাকে না। তৃতীয় বা চতুর্থ বৎসরে যদি দেখা যায় কোনো চারা দো–ডালা হয়ে গিয়েছে তা হলে সতেজ ডালটি রেখে বাকিটি কেটে ফেলতে হবে।

সেগুন বাগানে প্রথম বৎসর হতে আরম্ভ করে চতুর্থ বৎসর পর্যন্ত আগাছা পরিস্কারের কাজ করতে হবে। প্রথম বর্ষে তিনটি, দ্বিতীয় বর্ষে দুটি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে একবার করে আগাছা দমনের কাজ করতে হয়। প্রয়োজনবোধে আগাছা নিধনের কাজ আরো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত করা যেতে পারে।

গজারী বাগানের মতো সেগুনের বাগানেও বাছাই–কাটাই করতে হয়। পঞ্চম বর্ষে প্রথম বাছাই–কাট দিতে হয়। শীতের সময় প্রতি সারির একটি বাদে একটি রেখে বাকি গাছগুলি কেটে ফেলতে হয়। এই কাটাইয়ের সময় গাছের ভালো মন্দ দেখা হয় না— হিসাবমতো যেটি কাটার কথা সেটিই কাটিতে হয়। এইরূপ বাছাই–কাটাইকে 'মিকানিকেল থিনিং (Mechanical thinning) বলে। এইরূপ কাটাইয়ের পর প্রতি হেক্টর ১৪৯৪ হতে ১৬৪৫টি চারা গাছ থাকে।

উপর্যুক্ত নিয়মে প্রথম বাছাই–কাটাইয়ের পর সেগুন বাগানে দশম বৎসরে দ্বিতীয় কাটাই, পঞ্চদশ বর্ষে তৃতীয় কাটাই, বিংশতি বর্ষে ৪র্থ কাটাই এবং ত্রিশতম বর্ষে ৫ম কাটাই দিতে হয়। এই সমস্ত কাটাইয়ের সময় বাগানে গাছের অবস্থা দেখে বাছাই–কাট দিতে হয়। সে গাছগুলি কীট বা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যেগুলির বৃদ্ধি তত ভালো নয় অথবা আঁকাবাঁকা হয়ে অন্য গাছের উপর ঝাপিয়ে পড়ে গিয়েছে সেগুলি কেটে ফেলতে হবে। এই সময় লক্ষ রাখতে হবে গাছের বেড় যেন বৃদ্ধি পাবার সুযোগ পায়।

আজকাল আরো আধুনিক নিয়মে সেগুন বন বাছাই–কাটাই করার কথা বলা হয়। সেই আধুনিক নিয়ম বা পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।[১৪]

বাছাই–কাটাই'র রকমফের	বাছাই–কাটাই'র সময় গাছের বয়স	কিভাবে বাছাই–কাটাই করতে হবে
১ম বাছাই–কাটাই	গাছের ৫ম বর্ষ বয়ঃক্রম কালের শেষে	যথেচ্ছা বাছাই–কাটাই (mechanical thinning) নয়, দেখেশুনে নিকৃষ্ট গাছ কেটে প্রথম শ্রেণিতে কাঠ উৎপাদনের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০০০ গাছ, দ্বিতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ১২৫০ গাছ এবং তৃতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ১৩৭৫টি গাছ রেখে দিতে হবে।

২য় বাছাই-কাটাই	গাছের ১০ম বয়ঃক্রম কালের শেষে	দেখে শুনে নির্বাচনের মাধ্যমে নিকৃষ্ট গাছ কেটে ফেলে প্রথম শ্রেণির কাঠ উৎপাদনের জন্য প্রতি হেক্টরে ৬২৫টি গাছ, দ্বিতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ৮১৫টি গাছ এবং তৃতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ১১২৫টি গাছ রেখে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে গাছের পরস্পর দূরত্ব যেন মোটামুটি চলনসই থাকে।
৩য় বাছাই-কাটাই	গাছের ২৫তম বয়ঃক্রম কালের শেষে	দেখেশুনে নির্বাচনের মাধ্যমে নিকৃষ্ট গাছ কেটে ফেলে প্রথম শ্রেণির কাঠ উৎপাদনের জন্য প্রতি হেক্টরে ৩১২টি গাছ, দ্বিতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ৫০০টি গাছ এবং তৃতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ৭৫০টি গাছ রেখে দিতে হবে। এই ক্ষেত্রেও যেন গাছের পরস্পর দূরত্ব চলনসই থাকে।
৪র্থ বাছাই-কাটাই	গাছের ৩৫তম বয়ঃক্রম কালের শেষে	দেখে শুনে নির্বাচনের মাধ্যমে নিকৃষ্ট গাছ কেটে ফেলে প্রথম শ্রেণির কাঠ উৎপাদনের জন্য প্রতি হেক্টরে ২০০টি গাছ, দ্বিতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ৩২৫টি গাছ এবং তৃতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ৫০০টি গাছ রেখে দিতে হবে। এই বারেও যথাসম্ভব গাছের পরস্পর চলনসই দূরত্ব যেন বজায় রাখা হয়।
৫ম বাছাই-কাটাই	গাছের ৪৫ তম বয়ঃক্রম কালের শেষে	দেখে শুনে নির্বাচনের মাধ্যমে নিকৃষ্ট গাছ কেটে ফেলে প্রথম শ্রেণির কাঠের জন্য প্রতি হেক্টরে ১২৫টি, দ্বিতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ২২৫টি এবং তৃতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ২৭৫টি গাছ রাখতে হবে। এই বারেও লক্ষ্য রাখতে হবে গাছের পরস্পর দূরত্ব যেন যথাসম্ভব চলনসই থাকে।
৬ষ্ঠ তথা গাছ-কাটার পূর্ববর্তী বাছাই-কাটাই	গাছের ৫৫ তম বয়ঃক্রম কালের শেষে	নির্বাচনের মাধ্যমে দেখে শুনে মৃত, মৃতপ্রায় ও নিকৃষ্ট গাছ কেটে ফেলে দিয়ে প্রথম শ্রেণির কাঠের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০০টি, দ্বিতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ১৬২টি এবং তৃতীয় শ্রেণির কাঠের জন্য ১৮৮টি গাছ রাখতে হবে। পূর্ববৎ লক্ষ্য রাখিতে হবে গাছের পরস্পর দূরত্ব যেন চলনসই থাকে।

দেশের এমন কিছু সেগুন বন রয়েছে সেগুলিতে নানা কারণে বাছাই–কাটাই দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেগুন একটি অত্যন্ত মূল্যবান বনজবৃক্ষ। এই বৃক্ষের বনে বাছাই কাটাই না দেওয়ার অর্থ এই মূল্যবান সম্পদের বিরাট অপচয়। এই অবস্থায় বনে নিম্নমানের কাঠ উৎপাদনের মাধ্যমে এক বিরাট অঙ্কের আয় হতে দেশকে বঞ্চিত করা। এইরূপ সেগুন বনে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে[১৪] বাছাই–কাটাই করলে অবস্থার উন্নতি বিধান করা যায় :

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই যে, পাহাড়–পর্বতের উচুনিচু পরিবেশে ও বিশালকায় সেগুন বনে বাছাই–কাটাইর কাজটি তত সহজসাধ্য নয়, তদুপরি কাজটিতে অনেক অর্থ ব্যয় করারও প্রয়োজন হয়। এই কথা মনে রেখে প্রথম শ্রেণির বনে গাছ ৮' × ৮' অর্থাৎ ২.৫ × ২.৫ মিটার দূরত্ব এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৬' × ৬' অর্থাৎ ২ × ২ মিটার দূরত্বে রোপণ করা যুক্তিসঙ্গত।

সারণি ৩৯ সেগুন বনে বাছাই–কাটাই'র পরিবর্তিত পদ্ধতি

গাছের বয়স বৎসরে	বাছাই–কাটাইর পর প্রতি হেক্টর যতটি গাছ থাকবে							
	প্রথম শ্রেণির কাঠ উৎপাদনে		দ্বিতীয় শ্রেণির কাঠ উৎপাদনে		তৃতীয় শ্রেণীর কাঠ উৎপাদনে		চতুর্থ শ্রেণির কাঠ উৎপাদনে	
	গাছের গড় উচ্চতা মিটার	প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা	গাছের গড় উচ্চতা মিটার	প্রতি হেক্টর গাছের সংখ্যা	গাছের গড় উচ্চতা মিটার	প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা	গাছের গড় উচ্চতা মিটার	প্রতি গাছের সংখ্যা
৫	১৪.৬	১০০০	১২.৪	১২৫০	১০.৩	১৩৭৫	৮.৩	১৫০০
১০	২১.০	৬২৫	১৮.০	৮৭৫	১৫.০	১১২৫	১২.১	১২৫০
১৫	২৫.০	৫০০	৩১.০	৭৫০	১৮.০	১০০০	১৪.৩	১১২৫
২০	২৮.০	৪০০	২৪.০	৬২৫	২০.০	৮৭৫	১৫.৮	১০০০
২৫	৩১.০	৩১৩	১৬.০	৫০০	২১.৪	৭৫০	১৭.১	৮৭৫
৩০	৩২.০	২৫০	২৭.০	৩৭৫	২২.৬	৬২৫	১৮.৩	৭৫০
৩৫	৩৩.৫	২০০	২৯.০	৩২৫	২৩.৮	৫০০	১৯.২	৬২৫
৪০	৩৫.০	১৬৩	৩০.১	২৭৫	২৫.১	৩৭৫	১৯.৮	৫০০
৪৫	৩৬.৬	১২৫	৩১৩	২২৫	২৬.০	২৭৫	২০.১	৩৭৫
৫০	৩৭.৫	১১৩	৩২.৩	১৮৮	২৭.০	২২৫	২১.৪	২৭৫
৫৫	৩৯.০	১০০	৩৩.০	১৬৩	২৭.৫	২০০	২২.১	২২৫
৬০	৪০.০	৮৮	৩৪.০	১৩৮	২৮.২	১৭৫	২২.৬	—
৭০	৪১.৫	৭৫	৩৫.৬	১০০	২৮.৮	১৫০	—	—

সেগুন গাছ আহরণ করার বয়ঃসীমা (Felling age of Teak)

সেগুন গাছ সুপরিপক্ক হতে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। বনে গাছ রোপণের ৬০–৮০ বৎসর পর গাছ আহরণ করা বিধেয় ; ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গাছে কাটাই শ্রেয়, কারণ এই বয়সের গাছ হতে সুপরিপক্ক তথা উন্নত মানের কাঠ পাওয়া যায়।

জানা গিয়েছে দেশে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম—এই তিন অঞ্চলের মধ্যে শেষোক্ত সব চাইতে ভালো সেগুন জন্মে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সেগুন বনের শস্যচক্র হতে ৮০ বৎসরের এবং অন্যান্য অঞ্চলের শস্যচক্র হতে ৬০ বৎসরের অর্থাৎ পূর্বোক্ত অঞ্চলের বন হতে ৮০ বৎসরের এবং শেষোক্ত বনাঞ্চল হতে ৬০ বৎসর বয়সের গাছ আহরণ করতে হবে।

শাল

ঢাকার ভাওয়াল ও ময়মনসিংহের মধুপুর গড় এবং দিনাজপুর ও রাজশাহীর তদ্রূপ বনাঞ্চল যে সুদৃশ্য বৃক্ষরাজির সমারোহে সৃষ্টি হয়েছে তাই শাল বৃক্ষ। ইহার অপর নাম গজারী। কারো কারো ধারণা শাল ও গজারী ভিন্ন ভিন্ন গাছ—কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়, আসলে এই দুটি একই গাছের নামান্তর।

বাংলাদেশের বিশেষ এক ধরনের মাটি যা লাল মৃত্তিকাঞ্চল (Red Soil Tract) ও বরেন্দ্র ভূমি (Barind Tract) নামে অভিহিত তাতেই কেবল শালগাছ জন্মে। মৃত্তিকাঞ্চলের বিশেষত্ব— মাটির রং লালচে হতে হলুদাভ, পি. এইচ (PH) ৪.৫–৬.৫ প্রকৃতি দোঁয়াশ হতে ঈষৎ এঁদেল, ফসফরাস ও নাইট্রোজেনের অভাব। কেবল ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশে গারো পাহাড়ের পাদদেশের ছোটখাটো টিলায় যে গজারী বন দেখা যায় সে অঞ্চলের মাটি বেলে-দোঁয়াশ ও তাতে ও পাথর বা নুড়ি মিশ্রিত। শালবনের মৃত্তিকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে তার মাঝে মাঝে নিচু অঞ্চলে বা বাইদ দেখা যায় যেখানে শালগাছ একটিও জন্মে না। ইহা হতে বুঝা যায় সুনিষ্কাশনযুক্ত মাটিই শালগাছের জন্য উপযোগী।

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া শালগাছের জন্য উপযোগী। তাই দেখা যায় চৈত্র–বৈশাখ মাসে যেই দুই এক পশলা বৃষ্টি হয় তখন গাছে গাছে নতুন পাতা ধরতে থাকে এবং সারা বর্ষাকালে গাছ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পৌষ–মাঘ মাসের ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিহীন অবস্থায় গাছের বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যায় এবং শালবনের মরামরা এক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়

শালগাছের বৈজ্ঞানিক নাম Sarhea robusta। ইহা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। চারা অবস্থা হতেই ইহার মূল শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে থাকে এবং পরিণত বয়সে তা খুব গভীরতায় পৌঁছে। মূল শিকড় হতে চতুর্দিকে অনেক শাখাপ্রশাখা মূল বের হয়। শালগাছের পাতা গোলাকার এবং এক একটি পাতা বেশ বড়। স্বাভাবিকভাবে ঘন পরিবেশে সরল দণ্ডাকৃতির গাছে তেমন কোনো ডালপালা গজায় না—কেবল পাতলা পরিবেশেই দুই চারটি ডালপালা গজায়।

শালগাছ পর্ণমোচী বৃক্ষ অর্থাৎ বৎসরের কোনো এক সময়ে (ফাল্গুন-চৈত্র মাসে) গাছের প্রায় সমস্ত পাতা ঝড়ে যায়, তবে এই অবস্থায় বেশি দিন থাকে না, বৈশাখ মাসে বৃষ্টি পড়া শুরু হতেই গাছে নতুন পাতা গজাতে থাকে। আস্তে আস্তে অল্প সময়ের মধ্যেই গাছ নব পহলবে সুসজ্জিত হয়ে উঠে। কিছুদিনের মধ্যে গাছে ফুল ও ফল ধরে। প্রতি ফল হতে মাত্র একটি বীজ পাওয়া যায়, বীজ পরিপক্ক হতে প্রায় তিন হতে সাড়ে তিন মাসের মতো সময়

লাগে। মে মাসের শেষ এবং জুন মাসের প্রথম দিকে বীজ পরিপুষ্ট হয়। বীজের এক মাথায় পাঁচটি পাখার মতো অংশ থাকে। ইহার ফলে বীজ সহজেই বাতাসে ভর করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে পারে। বীজ পেকে হলুদ ও ইহার পাখনা বাদামি রং ধারণ করলেই বুঝা যাবে যে বীজ সুপরিপক্ক এবং আহরণ করার সময় হয়েছে।

শালবন সৃষ্টি (Artifical Regeneration of Shal Forest)

বাংলাদেশে শালবন স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কেউ তা বিদেশ হতে এনে সৃষ্টি করেনি বরং এদেশে অনেক শালবন ধ্বংস করে আবাদি জমিতে পরিণত করা হয়েছে। এইভাবে বনজঙ্গল ধ্বংস করার অশুভ পরিণতি দেখা দেওয়ায় আজকাল অবশ্য নতুন শালবন সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

বীজ হতে যে চারা জন্মায় তা দ্বারা শালবন সৃষ্টি করা যায়। স্বাভাবিক বনাঞ্চল হতে গাছ কেটে নিলে দেখা যায় সেটির গুড়ি হতে চারা গজায়, সেই চারার (Coppice sapplings) সাহায্যেও শালবন সৃষ্টি করা যায়। তবে এই উপায়ে যে বন সৃষ্টি করা হয়, তাহার কাঠ নিকৃষ্ট মানের হতে দেখা যায়। সেই জন্য বীজের চারার সাহায্যে নতুন বন সৃষ্টি করা ভালো। ইহাতে গাছ পরিণত বয়সে সুউচ্চ এবং অধিক বেড়যুক্ত হয়।

জমি প্রস্তুতি : শালবন সৃষ্টি করার জন্য নির্বাচিত এলাকায় ছোট-খাটো গাছ-গাছড়া বা জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তৎপর সেগুলি জায়গায় জায়গায় স্তুপ করে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। ইহাতে লাভ ও সুবিধা এই যে একদিকে জঙ্গল ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং অন্যদিকে মাটির শুদ্ধিকরণের কাজ হয় অর্থাৎ এতে বসবাসকারী কীট-পতঙ্গ ও রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়।

এখন সমস্ত জমিতে ৬ ফুট অর্থাৎ ২ মিটার দূরে দূরে ১৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ৪৬ সে. মি. প্রশস্ত করিয়া লম্বায় যতদূর হয় সেইরূপ সারি টেনে নিতে হয়। এ কাজটি এপ্রিল-মে মাসের প্রথম বৃষ্টিপাতের সময় করলে ভালো হয়। প্রতি সারির মাটি ১৫ ইঞ্চি অর্থাৎ ৩৮ সে. মি. এর মতো গভীর করে ভালোভাবে কোপাতে হবে। সারির মধ্যকার ৯ ইঞ্চি বা ২৩ সে. মি. পরিমাণ মাটিই সব চাইতে ভালোভাবে নরম করে নিতে হয়। প্রতি সারি বরাবর এই ২৩ সে. মি. প্রশস্ত মাটিতে আবার ৭৫ সে. মি. দূরে দূরে ৩টি লাইন টেনে যেতে হবে।[৮]

বীজ সংগ্রহ ও বীজ বপন : গজারীর বীজ খুব সাবধানে ও সময়মতো সংগ্রহ করতে হবে। বীজের জীবনীশক্তি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। মাত্র ৭২ ঘন্টা তা বজায় থাকে।[৮] কাজেই বীজ পরিপক্ক হওয়ার পর পরই তা সংগ্রহ করা বিধেয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মে মাসের শেষ এবং জুন মাসের প্রথম ভাগে বীজ গাছে পরিপক্ক হয়। বীজ হলুদ-সবুজ বর্ণ এবং বীজের পাখাসমূহ বাদামি রং ধারণ করলেই বুঝতে হবে বীজ সুপরিপক্ক ও আহরণ করার সময় হয়েছে। এই পরিপক্ক বীজ দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে ঝরে পড়ে ও নিঃশেষ হয়ে যায়। সুতরাং এই অবস্থা ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাল গাছের বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

বীজ সংগ্রহের জন্য সবল, সতেজ, কম ডালপালাওয়ালা ও মধ্যম-বয়সী গাছ বেছে নেয়া বিধেয়। এভাবে সনাক্ত ও নির্বাচিত গাছের তলায় চতুর্দিকের কিছু পরিমাণ জায়গা পরিষ্কার করে রাখতে হবে। প্রতি ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে সমস্ত বীজ আপনা-আপনি বা কিছুটা ঝাকি দিলে ঝরে পড়বে সে সমস্ত বীজ এক সঙ্গে জড় করে নিয়ে তা হতে অপুষ্ট রোগাক্রান্ত বীজ ফেলে দিতে হবে।

এভাবে সংগৃহীত বীজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাগিয়ে ফেলতে হবে। আগের দিনের বিকাল বেলায় সংগৃহীত বীজ পরদিন সকাল বেলার মধ্যেই বপন করে ফেলাই কর্তব্য। পূর্বোল্লিখিত সারি প্রস্তুত করা জমিতে সাড়ে সাত সে. মি. দূরে দূরে বীজ লাগাতে হবে। বর্ষণসিক্ত দিনের সকাল বেলা হতেই বীজ বপনের কাজ শুরু করা ভালো। বীজগুলি মাটিতে বপন করার সময় একটু কাৎ করে রাখতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বীজের পাখনাগুলি মাটির উপরে থাকে।

দুই সপ্তাহের মধ্যে বীজ গজিয়ে উঠে এবং চারা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখা গিয়েছে বীজ সঠিকভাবে সংগ্রহ করে ও সঠিক সময়ে বপন করলে শতকরা একশতটি বীজেরই অঙ্কুরোদগম হয়।

বীজতলায় চারা উৎপাদন করে সেই চারার সাহায্যে গজারী বন সৃষ্টি করার কোনো পরিকল্পনা না করাই ভালো, কারণ চারার প্রধান মূল এত দ্রুত মাটির গভীরতায় চলে যায় যাতে চারা তোলার সময় ভীষণ অসুবিধা হয়। প্রায় চারাই মরে যায়, তদুপরি তাতে অযথা শ্রম ও খরচ বাড়ে।

আগাছা দমন : শালবনে চারা বৃদ্ধির সাথে সাথে যথেষ্ট আগাছা জন্মাতে থাকে। আগাছার মধ্যে ছন ও উলু ঘাস (Sun grass) বেশি জন্মে। বনে প্রাথমিক অবস্থায় জায়গা পরিষ্কার থাকার দরুন ঘাস–গাছড়ার জোরও বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই বনে বীজ বপনের প্রথম বৎসর হতেই আগাছা দমনের কাজ শুরু করতে হয়। প্রথম বৎসর তিনবার আগাছা পরিষ্কারের কাজ করতে হয়—বর্ষার প্রথম দিকে একবার, মাঝামাঝি আরেক বার ও বর্ষা শেষে তৃতীয় বার। পাহাড়ি ঝুমিয়াদের দ্বারা ধান ও অন্যান্য ফসল ফলিয়ে আগাছা দমনে রাখা যায়। 'বগা মেডুলা' (Boga medula) নামে এক প্রকার শিম্বীজাতীয় গাছ সারির মধ্যে ২ মিটার অন্তর অন্তর প্রথম বৎসরেই লাগিয়ে দিলে সেগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে আগাছা দমনে রাখে, প্রখর সূর্য তাপের হাত হতে জমির রস রক্ষা করে ও জমিতে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন যোগ করে।

দ্বিতীয় বৎসরে দুই বার (জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণে) ও তৃতীয় বৎসরে একবার (জ্যৈষ্ঠ / আষাঢ়ে) আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। এই সময়ে যদি দেখা যায় বগা মেডুয়ার ডালপালা শালের চারাকে ঢেকে ফেলেছে তবে ঐ গাছের ডালা কেটে দিয়ে চারার মাথা এমনভাবে বের করে দিতে হবে যাতে তা সহজেই আলো বাতাস পেতে পারে।

গরু–বাছুর ও শূকরের আক্রমণ হতে চারা রক্ষা করা : গরু–বাছুর খুব ঘাসের অভাবে না পড়লে গজারীর পাতা খায় না। তবে কোনো অবস্থাতেই দশ বৎসর পর্যন্ত গজারী বাগানে গরু–বাছুরের দল চড়াতে নেই।

বন্য শুকর গজারীর চারার খুব ক্ষতি করতে পারে। এ বন্য প্রাণীগুলি চারা উঠায়ে তার মূল চিবায়ে খেতে পছন্দ করে। শুকরের দল এইভাবে যাতে চারা নষ্ট করতে না পারে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাগানের গাছ পাতলা করা ও লতা কাটা : পঞ্চম বৎসর হতে নতুন গজারী বনের চারা পাতলা করার কাজ শুরু করতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গায় নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেখে সেগুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাপে বৃদ্ধি পাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া। প্রতি সারিতে ২ মিটার দূরে দূরে যথাসম্ভব একটি সবল ও সতেজ চারা রেখে

বাকিগুলি কেটে ফেলতে হয়। এই সময় খেয়াল করে দেখে কোনো কোনো গাছে প্যাচ দিয়ে থাকা লতা কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া বিধেয়। লতা ছোট গাছের খুবই ক্ষতি করে থাকে। সেজন্য এই কাজটি করা যেন ভুল না হয়। বাগানে এই সময় এখানে–সেখানে মুথা হতে জন্মান চারা দেখা যেতে পারে। সারিতে মাপমতো রেখে বাকি সবগুলি চারাই কেটে ফেলতে হবে।

ইহার পর দশম, পঞ্চদশ ও বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গাছ পর পর কেটে পাতলা করে দিতে হবে। এই বিভিন্ন পর্বে গাছ এমনভাবে পাতলা করতে হবে যাতে রোগাক্রান্ত লিকলিকে ও খারাপ গাছগুলি কেটে ফেলে বাগানে এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় যাতে বাকি গাছগুলি প্রচুর আলো ও হাওয়া পেতে পারে।

লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে শাল গাছের চারা (বীজ হতে) প্রথম দশ বৎসর পর্যন্ত খুব আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। এই সময়ের মধ্যে তিন চার মিটারের বেশি হয় না। তৎপর পনেরো হতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে এগুলির খুব দ্রুত বৃদ্ধি হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছে। পঁচিশ হতে চল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে উচ্চতার বৃদ্ধি খুব ধীর গতিতে হলেও এই সময় গাছের বেড়ের বৃদ্ধি পেতে থাকে।

গাছের ত্রিশ বৎসর বয়স হওয়ার পর দশ বৎসর অন্তর অন্তর বাগানে বাছাই কাট দিতে হয়। চল্লিশ হতে আশি বৎসর বয়সের মধ্যে একবার বা দুইবার বাছাই করলেই চলে। এই বাছাইর প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য হলো গাছগুলিকে মোটা, দীর্ঘ ও উত্তম কাঠ উৎপাদনে সক্ষম করে তোলা।

কীটপতঙ্গ ও আগুন হতে গাছ রক্ষা করা : 'শাল কাঠের কাণ্ড ছিদ্রকারী' এক প্রকার পোকা এই কাঠের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে থাকে। পোকার শুককীটগুলি সারা কাণ্ডে সুরঙ্গের মতো ছিদ্র করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে কাঠ ব্যবহারের অনপোযোগী হয়ে পড়ে। আক্রমণ কোনো কোনো সময় মহামারীর আকার ধারণ করে। পোকার আক্রমণ নজরে আসা মাত্রই আক্রান্ত গাছগুলি কেটে ফেলে পুড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে আক্রমণ আর ছাড়াতে পারবে না। বাগানে পুড়ে থাকা ডালপালা পোড়ায়ে দেওয়া কর্তব্য। আর এক প্রকার মথজাতীয় পোকার শুককীট গাছের কচি পাতা ও পুষ্পমঞ্জরী খেয়ে ক্ষতি সাধন করে। বিরাট এলাকা জুড়ে আক্রমণ হয় বলে সাধারণ নিয়মে ইহার নিরোধ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। উড়োজাহাজের সাহায্যে উপযুক্ত ঔষধ ছড়াতে পারলে এই পোকার আক্রমণ দমন করা যায়।

দাবানলে শালবন ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। ফাল্গুন–চৈত্র মাসে বাগানের সব কিছু শুকায়ে এমন পরিবেশের সৃষ্টি হয় যাতে একটু অসতর্ক হলেই বনজঙ্গলে সহজেই আগুন ধরে যায়। এইভাবে আগুন দ্বারা যাতে নতুন বাগানের ক্ষতি হতে না পারে তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। বাগানের চতুর্পার্শ্বে ৩০ ফুট অর্থাৎ ১০ মিটার প্রশস্ত জায়গায় অন্য বনজ গাছ লাগালে সম্ভাব্য অগ্নি সংযোগের ঘটনা হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

গাছ কাটা (Felling the trees) : আশি বৎসর বয়সে শাল কাঠ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এই বয়ঃসীমা পৌঁছানোর পরই গাছ কাটা কর্তব্য। যতদূর সম্ভব মাটির উপর বরাবর গাছ কাটতে হবে।

পূর্ণবয়স্ক গাছ হতে যে কাঠ পাওয়া যায় তা খুব উঁচু মানের হয়। তবে ৩০/৪০ বৎসর বয়সে যে বাছাই-কাটারই কাঠ পাওয়া যায় তাহাও ব্যবহার করা যায়।

শাল কাঠের ব্যবহার

এই কাঠ অত্যন্ত শক্ত, টেকসই এবং অগ্নি প্রতিরোধক। ভালোভাবে শুকানো (১২½% রসযুক্ত) এক কিউবিক ফুট কাঠের ওজন ৫৪ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৪ কেজি।

শাল কাঠের ব্যবহার নানাবিধ। ঘর ও টেলিফোন লাইনের খুটি, লঞ্চ, নৌকা, ট্রাক, গরু ও মহিষের গাড়ির বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত করতে এই কাঠ ব্যবহার করা হয়। রেল লাইনের স্লিপার হিসেবেও শাল কাঠের ব্যবহার উপযোগী। চেরাই কাঠের সরঞ্জাম, ধান ও আখ মাড়াই কল, চৌকি, খাট ইত্যাদি নির্মাণেও শাল কাঠ ব্যবহার করা হয়। কোদালি, কুঠার, দা হাতুড়ী, বাটাল প্রভৃতি যন্ত্রপাতির বাট নির্মাণের জন্যও শাল কাঠ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দালান-কোঠার ভিটের নিচে ও বাঁধ নির্মাণের জন্যও শাল কাঠের ব্যবহার দেখা যায়। মাটি ও পানি নিচে প্রোথিত অবস্থায়ও শাল কাঠ অনেক দিন পর্যন্ত টিকে থাকে।

মুথার চারা হতে শালবন সৃষ্টি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে গজারী গাছ কেটে নিলে সেটির মুথা হতে অনেক সতেজ ডালা বা চারা গজায়। এই চারাগুলিকেই 'কপিস চারা' নামে অভিহিত করা হয়। এই চারা হতেও গজারী বন সৃষ্টি করা যায়।

কপিসের চারা বৃদ্ধি প্রথম অবস্থায় খুব দ্রুত। প্রথম বৎসরেই চারাগুলির উচ্চতা ৫/৬ ফুট অর্থাৎ প্রায় ২ মিটার হয়ে যায়। এইগুলির বয়ঃসীমা তিনে পড়লেই জঙ্গলের আগাছা ও লতা পরিষ্কার করে দিতে হবে। পঞ্চম বর্ষে প্রতি মোথায় তিনটি সতেজ চারা রেখে বাকিগুলি কেটে ফেলতে হবে। এই সঙ্গে লতা কাটার কাজও সম্পূর্ণ করতে হবে ; সপ্তম বর্ষে আবারো লতা কাটতে হবে।

চারার বয়স যখন দশ বৎসর হবে তখন প্রত্যেক মোথায় দুইটি করে সতেজ ও সবল চারা রেখে বাকি একটি কেটে দিতে হবে। সপ্তদশ বর্ষে মুথায় মাত্র একটি চারা রেখে বাকিটিও কেটে ফেলতে হবে। এই সময় বনে নিচে পড়ে থাকা বিশেষ করে বীজ হতে জন্মান চারার কোনোটি না কোনোটি রেখে দেওয়া ভালো। ইহাতে বন রক্ষার কাজ সহজতর হয়। গাছের বয়স যখন ত্রিশ বৎসর হবে তখন আর একবার গাছ পাতলা করে দিত হয়। এই সময় লতা কাটার দিকেও লক্ষ্য করতে হয়। এখন হতে গাছের বেড় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালের গাছ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তখন আর দেরি না করে গাছ কেটে ফেলা উচিত। দেরি করলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, কারণ চল্লিশ বৎসর হতে গাছের গোড়া ঢুরা বা ফাঁপা হয়ে যেতে পারে।

কপিসের চারা হতে সৃষ্ট গড় বা বন হতে যে গাছে পাওয়া যায় তা খাটো ও সরু হয়। এইজন্য এই সমস্ত গাছ বা কাঠ কেবল ঘর ও টেলিফোন লাইনের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করার উপযোগী। কেবল গোড়ার দিকে হতে এক খণ্ডী 'চিরাইয়ের কাঠ' পাওয়া যেতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আহাম্মদ, কাঃ ফুল-ফল ও শাক-সব্জী, ১৯৭০। প্রকাশনায় আলহাজ কামিছউদ্দিন আহমদ। দাশদী, চাঁদপুর, কুমিল্লা। পৃ. ৩০৮-৩০৯

২. ঐ, পৃ. ৪৯৩-৪৯৪

৩. কুদ্দুস, মোঃ আঃ পূর্ব পাকিস্তানে পানের চাষ। কৃষিকথা-অক্টোবর, ১৯৬৭ কৃষি কমপ্লেক্স, শেরে-বাংলা নগর ঢাকা।

৪. খান, সু. কাঃ পাবর্ত্য চট্টগ্রাম হিভিয়া রাবার চাষ প্রকল্প ও প্রক্রিয়াজাত... ১৯৯১

৫. তালুকদার, মু. রঃ বাঁশের চাষ। কৃষিকথা-জুলাই, ১৯৭২। কৃষি কমপ্লেক্স, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৬. বাংলাদেশ কৃষি তথ্য সংস্থা ঃ সেগুন । কৃষি কমপ্লেক্স শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

৭. বাংলাদেশ বনবিভাগের পক্ষে কৃষিজাত সংস্থা : বাঁশের চাষ। কৃষি কমপ্লেক্স শেরে-বাংলা নগর ঢাকা।

৮. শাল (গজারি) বাংলাদেশ কৃষি তথ্য সংস্থা, বন/ প্রঃ পুঃ ৯/৭৭। কৃষিকমপ্লেক্স শেরে বাংলা নগর ঢাকা।

৯. Ahmad. S : Bamboo and its regeneration in Bangladesh (A memiogragh copy presented before a seminar held at Dhaka in 1982).

১০. Aiyar, A. K. Y. N : Field crops of India. 1947. Bangalore. Printed by the Superintendent at the Govt. Press. pp. 563-623.

১১. Ali M. A : Culivation of Oil Palm in Bangladesh (A memiograph copy presented in a Seminar held at Dhaka. in 1972).

১২. Alim, A : An Introduction to Bangladesh Agriculture. Publisher : M. Alim. 220. garden Road, Kawran Bazar, Dhaka. P. 367-68.

১৩. Baten . S. A : Thinning of Teak Plantation (A memigraph copy presented in a Seminar held at Dhaka. in 1982).

১৪. Das. S : Introduction of exotics in plantation forestry of Bangladesh (A memiograph copy presented before a Seminar held at Dhaka. in 1982).

১৫. Ghani. O. C : Rubber Plantation in Bangladesh (A memiograph copy presented before a Seminar held in 1982).

১৬. Howladar. N. I : Problem of Khasia population in Sylhet district with special reference to cultivation of 'pan' in Govt. forest land (A memiograph copy presented in a Seminar held at Dhaka. in 1982).

১৭. Ministry of Agriculture & Forest : Development Statistics of Bangladesh Agriculture. Series No. 6 Dec. 1981.

১৮. Troup. R. S : The Silviculture of Indian Tress. Vol. II. Oxford. The Clarendon press. 1921.